দুই বাংলার
প্রেমের উপন্যাস

সম্পাদনা

সমরেশ মজুমদার

সুপ্রীম পাবলিশার্স
১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Dui Banglar Premer Upanyas
A collection of novels about love written by the authors of West Bengal and Bangladesh
Editor : Samaresh Majumdar

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক :
ভোলানাথ দাস
১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

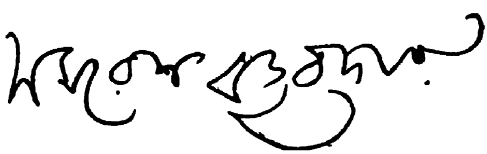
প্রচ্ছদ : গণেশ বসু

মুদ্রাকর :
প্রতাপরঞ্জন রায়
রামকৃষ্ণ প্রেস
১৭, রামধন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৪

দুই বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য

কয়েকটি কথা

এই কিছুকাল আগেও বাংলা সাহিত্য বলতে আমরা বুঝতাম কলকাতা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী। জেলায় জেলায় যেসব বই ছাপা হয় তারা যেমন কোন গুরুত্ব পায়নি, পাকিস্তান আমলে মুষ্টিমেয় কিছু বই ছাড়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত বই-এর সম্ভারকে তেমন মর্যাদা দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্য নিয়ে যে তুলকালাম কান্ড ঘটতে শুরু করেছে তার খবর পশ্চিমবঙ্গের পাঠকরা খুব কমই রাখতেন। কিন্তু ঢাকার সাহিত্য এবং কলকাতার সাহিত্য মিলেই এখনকার বাংলা সাহিত্য। একে অন্যের পরিপূরক। শুধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে পড়লে আপনার বাংলা সাহিত্য পড়া হবে না, আপনাকে পড়তে হবে হুমায়ূন আহমেদ এবং ইমদাদুল হক মিলনকেও। এরকম একটা ভাবনার ফসল এই সংকলন যেখানে আমার কোন রচনা স্থান পাক তা আমি চাইনি। প্রকাশকের ইচ্ছে মানতে হয়েছে, কারণ আজকাল তো চক্ষুলজ্জা বেশ কমে যাচ্ছে। দুই বাংলার পাঠক, অস্বীকার করবেন না, আমৃত্যু প্রেম আমাদের বুকে থাকবেই। বাংলা ভাষায় যাঁরা কথা বলেন তাঁদের জন্যে এইসব হৃদয়ঘটিত কাহিনীমালা নিবেদন করা হল।



লেখক পরিচিতি



১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। শখ . ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। প্রথম উপন্যাস · 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'ভয়ঙ্কর সুন্দর'। ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ . 'পূর্ব পশ্চিম', 'নীললোহিতের চোখের সামনে', 'কালো রাস্তা সাদা বাড়ি', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' ও 'সেই সময়'। 'সেই সময়' তাঁর সব থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাস।

২. হুমায়ূন আহমেদ

জন্ম : ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর ময়মনসিংহের নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ গ্রামে। আমেরিকার নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার কেমিস্ট্রিতে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনারত। বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে সমসাময়িক কালে জনপ্রিয় পাঠক-নন্দিত লেখক। এক বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ। গল্প, উপন্যাস, নাটক, টিভি নাটক, কল্পবিজ্ঞান—যেখানেই হাত দিয়েছেন তা হয়ে উঠেছে পাঠক ও দর্শকের কাছে সোনার কাঠি। তাই পেয়েছেন

অসম্ভব জনপ্রিয়তা। মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন, হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, চাওয়া-পাওয়া বেশ নিপুণভাবে তাঁর অসংখ্য লেখায় ধরা পড়েছে। তাঁর প্রতিটি বইয়ের কাহিনী বিন্যাস ও প্রসাদগুণ পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে রাখে। শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনায় তার রয়েছে যথেষ্ট পারঙ্গমতা। অন্যদিকে কল্পবিজ্ঞান লেখাগুলোতে রয়েছে নিজস্ব ভঙ্গী ও মনোমুগ্ধকর রচনাশৈলী। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, শিশু একাডেমী পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন পদক, ওসমানী পদক, আলাওল সাহিত্য পদক, বাচসাস পুরস্কার, হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার, কুমিল্লা ফাউন্ডেশান পদক, দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা স্মৃতি পদক, লায়লা সামাদ সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদিতে সম্মানিত। সম্প্রতি আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'অনারারি ফেলো ইন রাইটিং' হিসেবে সম্মানিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'পোকা', 'মে ফ্লাওয়ার', 'মিশির আলি অমনিবাস', 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' ইত্যাদি।

৩. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ২ নভেম্বর, ১৯৩৫। দেশ--ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। মোক্তার দাদু আইন ব্যবসা জমাতে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন ময়মনসিংহে। সেখানে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে জন্ম। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলে চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় কুচবিহার। মিশনারি স্কুল ও বোর্ড-এর জীবন। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই-এ। কলকাতার কলেজ থেকে বি-এ। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুল-শিক্ষকতা দিয়ে কর্ম-জীবনের শুরু। এখন বৃত্তি—সাংবাদিকতা। 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রজীবনের ম্যাগাজিনের গণ্ডী পেরিয়ে প্রথম গল্প—দেশ পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'। 'দেশ' শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'দূরবীন', 'মানবজমিন', 'যাও পাখি', 'পারাপার'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। এর আগে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। পরেও আরেকবার 'দূরবীন'-এর জন্য। খেলায় তাঁর উৎসাহ অদম্য। বক্সিং, টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস সম্পর্কে যেমন, অ্যাথলেটিকসেও তেমনই আগ্রহী। জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি জীবনের প্রতি আস্থা ফিরে পান শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে। নিরামিষাশী। ঠাকুরের মন্ত্র-শিষ্য। তাঁর রচনাতেও ঘুরে-ফিরে আসে আধ্যাত্মিক অন্বেষণ। পাঠক হিসেবে সর্বগ্রাসী। ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রিয়, প্রিয় থ্রিলার এবং কল্পবিজ্ঞানও।

৪. ইমদাদুল হক মিলন

জন্ম : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫, বিক্রমপুরের মেদিনী মণ্ডল গ্রামে। ১৯৫৯ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে সামাজিক অর্থনীতির স্নাতক। পরের দু'-বছর চাকরির খোঁজে কাটিয়েছেন পশ্চিম জার্মানিতে। প্রথম প্রকাশিত ছোটদের গল্প 'বন্ধু' 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকায়, ১৯৫৩ সালে। সেই বছরেই কলকাতার 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বড়দের গল্প 'শঙ্খিনী'। প্রথম উপন্যাস 'যাবজ্জীবন' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমী পত্রিকা 'উত্তরাধিকার'-এ, ১৯৫৬ সালে। পরের বছরেই ১২টি প্রেমের গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় প্রথম বই 'ভালবাসার গল্প'। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'পরাধীনতা', 'দ্বিতীয় পর্বের শুরু', 'রাজাকারতন্ত্র' ও 'কালাকাল'। উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ 'নিরন্নের কাল'। মোট গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। পেয়েছেন বিশ্ব জ্যোতিষ সমিতি পুরস্কার (১৯৫৬), ইকো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৫৭), হুমায়ুন কাদির সাহিত্য পুরস্কার (১৯৫২) এবং বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৫২)। কর্মজীবনে 'কিশোর তারকালোক' পত্রিকার সম্পাদক।

৫ সমরেশ মজুমদার

জন্ম : ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৮। শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। কলকাতায় আসেন ১৯৬০-এ। শিক্ষা : স্কটিশ চার্চ কলেজে থেকে বাংলায় অনার্স নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। লেখালিখি : প্রথমে গ্রুপে থিয়েটার করতেন। তারপর নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লেখা। প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৫৭ সালে। লেখা সম্পর্কে প্রথমে আদৌ সিরিয়াস ছিলেন না। প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' ১৯৫৫-এ 'দেশ' পত্রিকায় বের হবার পর ভাবনা পাল্টালো। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের বিষয় ভিন্ন, রচনার গতি এবং গল্প বলার ভঙ্গী পাঠকদের আন্দোলিত করে। চা-বাগানের মদেসিয়া সমাজ থেকে কলকাতার নিম্নবিত্ত মানুষেরা তাঁর কলমে উঠে আসেন রক্ত-মাংস নিয়ে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দৌড়', 'এই আমি রেণু', 'উত্তরাধিকার', 'বন্দীনিবাস', 'বড় পাপ হে', 'সওয়ার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ, 'গর্ভধারিনী' ও 'সাত-কাহন'। সম্মান : ১৯৫২ সালের আনন্দ পুরস্কার তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি। এছাড়া 'দৌড়' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসেবে বি এফ জে এ, দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার। ১৯৫৪ সালে 'কালবেলা' উপন্যাসে পেয়েছেন সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার।



সোনালি-দুঃখ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি একজন সামান্য কবি। হে প্রভুগণ, আপনারা গুণী মানী লোক, আপনারা কত পড়েছেন, কত শুনেছেন, আপনারা রসের বিচার করতে জানেন। আমি আপনাদের সভায় এসেছি, যদি অনুমতি পাই, আমি আপনাদের আজ দুজন নারী-পুরুষের ভালোবাসার গান শোনাবো। ভালোবাসার জন্যই মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়, কিন্তু এই যে দুজন—এদের মতো এমন তীব্র-মধুর ভাবে কেউ বোধহয় কখনও ভালোবাসেনি। আপনারা মহৎ, আপনারা উদার, আপনারা জানেন ভালোবাসা হচ্ছে আগুনের মতো, যাতে কোনো পাপ স্পর্শ করে না। আপনারা অন্তর দিয়ে বুঝতে পারবেন, এই দুই হতভাগ্য প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের শক্তিতে কি করে পাপ-পুণ্য ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আহা, ওদের গান শুনলে যে-মানুষ পাহাড়ের মতো কঠোর ব্রহ্মচারী তারও বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে ঝরনা। অপ্রেমিকও প্রেমিক হয়। সুখভোগ আমোদ-আহ্লাদে-ডুবে আছে যে মানুষ, এই গান শুনে সেও মুহূর্ত থমকে যায়, তার মনে পড়ে—জীবনে কি যেন বাকি রয়ে গেল, বুকের মধ্যটা উদাস উদাস হয়ে যায়। এই গান শোনার পর, যখন আপনারা কেউ একা থাকবেন, আপনাদের মনে হবে—এই পৃথিবীতে যে জন্মালুম, জীবনটা ঠিক মতো বাঁচা হলো তো ? নাকি এক জীবন মনের ভুলেই কেটে গেল ! ভালোবাসাহীন জীবনই তো ভুল জীবন ! আমি এই গান গ্রামে-গ্রামে হাটে-বাজারে, নদীর ধারে গেয়ে বেড়াই। আজ আপনাদের সভায় এসেছি। অনুমতি করুন।

রাজকুমারের নাম দুঃখ, রাজকন্যার নাম সোনালি। কোথায়, কত দূরে ওরা ছিল, তবু দেখা হয়ে গেল। পৃথিবীতে এদের চেয়ে সুন্দর, এদের চেয়ে নিষ্পাপ নারী-পুরুষ কি আর জন্মেছে ? ওদের মতো সুখী কেউ নেই, ওদের মতো দুঃখীও কেউ নেই। ভালোবাসা মানেই তো দুঃখ, তবু মানুষ ভালোবাসতে চায়। জীবনে ভালোবাসাই একমাত্র দুঃখ, যেখানে মানুষ ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ওরা বড় বেশী দুঃখ পেয়েছে ভালোবেসে। অমন সোনার মতন শরীর, তবু বনের মধ্যে ছিন্নভিন্ন পোশাকে রোদ-বৃষ্টির নিচে দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করে যখন ঘুমিয়েছে—সে দৃশ্য ভাবলে বুক ফেটে যায়। প্রভু, আমাকে এক মিনিট ক্ষমা করুন। ওদের কথা বলার আগে আমি একটু চুপ করে বসে থাকি। ওদের কথা বলতে গেলেই আমার গলার কাছে কান্না ঠেলে আসে।

প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয়ে যায়। ওঃ! ওরা এক সঙ্গে পান করেছিল ভালোবাসা ও মৃত্যু। ওদের কাছে মৃত্যু আর ভালোবাসা এক।

যেদিন ওরা ঠোঁটের কাছে তুলে এনেছিল সেই ভয়ঙ্কর সুরার পাত্র, সেদিন যদি ওরা জানতো যে ওদের ভালোবাসা ওদের মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে—তাহলে কি ওরা ভয় পেত? ঠোঁটের কাছে এনেও সরিয়ে দিত? কি জানি! ভালোবাসায় মানুষ বরাবর একই ভুল করে। প্রেমিকরা কখনও অভিজ্ঞ হয় না। অভিজ্ঞ লোকেরা প্রেমিক হতে পারে না। রাজকন্যাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে তবু কেন রাজকুমার ফিরে আসতে লাগলো বারবার?

কিন্তু তার আগে বলি রাজকুমারের জন্মবৃত্তান্ত। ওর দুঃখিনী মায়ের কথা, যে মা নিজের সন্তানের নাম রেখেছিল, দুঃখ।

সে অনেক, অনেকদিনের আগের কথা। অনেক দূরে দেশের কথা। রূপকথা নয়, আপনার-আমার জীবনের মতই সত্যি ঘটনা। হিমালয় পেরুলে তাতার বেদুইনদের দেশ, তারপর মরুভূমি। মরুভূমিও পার হলে নীল ভূমধ্যসাগর। ভূমধ্যসাগরের ওপারের স্থলভাগকে বলে ইওরোপ। সেখানকার সব মানুষই ফর্সা। আমাদের থেকে অন্যরকম চেহারা। কিন্তু চেহারা অন্যরকম হলে কি হয়, মানুষের স্বভাব পৃথিবীর সব দেশেই একরকম। হুজুর, যুবক-যুবতীর ভালোবাসা, মায়ের কান্না, আর শত্রুর ক্রোধ—এ সব দেশেই এক। ঐ ইওরোপের একটা ছোট্ট রাজ্যের নাম কর্নওয়াল। সেখানকার রাজার নাম মার্ক। ভারী ধর্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ রাজা, প্রজারা সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। তাঁর রাজ্যে কোনো অভাব নেই, অশান্তি নেই। যুদ্ধ করার বদলে রাজা বেশি ভালোবাসেন গান-বাজনা। হঠাৎ একদিন ওঁর রাজ্য আক্রমণ করলো বাইরের এক দস্যু-রাজা। সীমান্ত পেরিয়ে শত্রু-সৈন্য গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিতে লাগলো। রাজা মার্ক প্রাণপণে লড়াই করতে লাগলেন নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য—কিন্তু দুর্দান্ত বেপরোয়া নিষ্ঠুর দস্যুদের সঙ্গে সহজে এঁটে উঠলেন না। দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চলতে লাগলো।

রাজা মার্কের দেশের একদিকে সমুদ্র। সেই সমুদ্রের ওপারে যে রাজ্য, তার নাম লিওনেস। সেই লিওনেসের রাজা রিভালেন রাজা মার্কের খুব বন্ধু। তিনি বন্ধুর বিপদের কথা শুনেই নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে ছুটে এলেন সাহায্য করতে। রাজা মার্কের সঙ্গে যদিও রিভালেনের বন্ধুত্ব, কিন্তু দুজনের চরিত্র সম্পূর্ণ দুরকম। রিভালেনের দীর্ঘ, সুঠাম চেহারা—দুঃসাহসী স্বভাব, যুদ্ধ করাই তাঁর একমাত্র শখ। রাজা মার্ককে তিনি বললেন, তুমি এবার একটু

বিশ্রাম করো, আমি যুদ্ধটা সেরে আসি ! তারপরই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্রে কি অতুলনীয় বিক্রম রিভালেনের, তাঁর নির্ভীক মুখ, স্বচ্ছন্দ গতি আর ঐ রকম সুন্দর চেহারা দেখে মনে হয়, যেন স্বয়ং দেবসেনাপতি যুদ্ধে নেমেছেন। এ যুদ্ধ জয় করতে তাঁর বেশিদিন লাগলো না। দস্যুর দলকে তিনি সীমান্ত পার করে দিয়ে এলেন।

রাজা মার্কের দেশের লোক রাজা রিভালেনকেও হৃদয়ে আসন দিল। সারা রাজ্যে শুরু হলো উৎসব। সকলেরই মুখে রিভালেনের নাম। এমন সুপুরুষ, এতবড় বীর কেউ কখনো দেখেনি। নিজের বন্ধুর জন্য কে অতখানি করে ?

রাজা মার্কের চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। তিনি রিভালেনের হাত চেপে ধরে বললেন, বন্ধু, তুমি যা করেছো আমার জন্য, জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়ের জন্যও লোকে আজকাল তা করে না। তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

রাজা রিভালেন যুদ্ধে যেমন পারঙ্গম, কথাবার্তায় তেমন নয়। তিনি লাজুক হেসে বললেন, তুমি একটু বাড়িয়ে বলেছো ! বন্ধুকে তো বন্ধু সাহায্য করবেই !

মার্ক বললেন, বিপদের সময়েই কে আসল বন্ধু, তা চেনা যায়। আমার বিপদের দিনেই জানতে পারলুম, বন্ধু হিসেবে তুমি কত মহৎ !

রিভালেন বললেন, আমি কি শুধুই তোমার জন্য যুদ্ধ করেছি ? বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করা প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যদি তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি এগিয়ে না আসতুম, তবে ক্ষত্রিয় হিসেবে নিজের কাছে আমার সম্মান কোথায় থাকতো ? তোমাকে বাঁচাতে এসে, সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজের আত্মসম্মান আর অহঙ্কারকেও বাঁচিয়েছি।

রাজা মার্ক বললেন, এ শুধু বীরেরই যোগ্য কথা। কিন্তু তোমাকে এখন আমি ছাড়ছি না। তোমাকে আমি এমন বাঁধনে বাঁধতে চাই যেখান থেকে মুক্তি পাবার সাধ্য তোমার মতো বীরেরও নেই।

—সে কোন বাঁধন, বন্ধু ? জিগ্যেস করলেন রিভালেন।

সুন্দরীর ভুজবন্ধন ! তুমি আমার বোন শ্বেতপুষ্পাকে বিয়ে কর। তাকে একবার দেখো, সে তোমার অযোগ্য হবে না।

হঠাৎ লজ্জায় মাথা নিচু করলেন তরুণ রাজা রিভালেন। শ্বেতপুষ্পাকে বুঝি তিনি আগেই দেখেছিলেন। যুদ্ধযাত্রার দিন সকালে রাজপ্রাসাদের জানলায় দাঁড়ানো রাজকুমারীকে তিনি দেখেছিলেন এক পলক। রাজকুমারী শ্বেতপুষ্পাও বুঝি তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। তখনই রিভালেনের বুকের রক্ত চমকে উঠেছিল। এমন সুন্দরও কেউ হয় পৃথিবীতে ? শ্বেতপুষ্পা সত্যিই যেন

একটা সাদা ফুল, কিন্তু কি ফুল তার নাম জানেন না রাজা, আগে কখনো এ ফুল দেখেননি। কি জানি, যুদ্ধক্ষেত্রে শ্বেতপুষ্পার মুখ মনে করেই রাজার শরীরে অতখানি বীরত্ব ও তেজ এসেছিল কি না!

শুভ তিথিতে রাজার সঙ্গে বিয়ে হলো শ্বেতপুষ্পার। টিণ্টাজেল দুর্গে সে বিবাহের সমারোহের বর্ণনা দেবো এমন শক্তি আমার নেই। প্রভু, আমি সামান্য কবি, আমি তো আর বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলুম না। তবে কল্পনা করতে পারি, তরুণ রাজা রিভালেনের পাশে শ্বেতপুষ্পাকে মানিয়েছিল ঠিক স্বর্গের দেব-দেবীর মতো।

সমস্ত কর্নওয়াল রাজ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। যুদ্ধে জেতার আনন্দ, সেই সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে। টিণ্টাজেল দুর্গের সোনার পালঙ্কে শুয়ে রিভালেন নব-পরিণীতার সঙ্গে ডুবে রইলেন এক মধুর স্বপ্নে। রণক্লান্ত যোদ্ধা এখন বিশ্রাম করছেন।

কিন্তু আপনারা সবাই জানেন, বিশ্বসংসারে সুখ বড় চঞ্চলা। কোনো নারীর অঞ্চলেই সুখ দীর্ঘকাল বাঁধা থাকে না। হঠাৎ দুঃসংবাদ এলো, রিভালেনের রাজ্য আক্রমণ করেছে পরম পরাক্রান্ত জমিদার, ডিউক মর্গান। রাজার অনুপস্থিতির সুযোগে, অর্ধেক রাজত্ব সে জয় করে নিয়েছে।

একথা শুনেই জেগে উঠলেন সুপ্ত সিংহ। রিভালেন তখনই জাহাজ সাজিয়ে যাত্রা করলেন নিজের দেশের দিকে। সঙ্গে নিয়ে চললেন নতুন রানী শ্বেতপুষ্পাকে। উপকুলের কাছেই তাঁর যে দুর্গ, সেখানে এসে উঠলেন প্রথমে। তারপর ডাকলেন তাঁর বিশ্বাসী অনুচর রোহল্টকে। রোহল্টের সততা এবং প্রভুভক্তি এমন বিখ্যাত ছিল যে সকলেই তাঁকে ডাকতো, সত্যবাহন রোহল্ট। রাজা রোহল্টকে বললেন, রোহল্ট, তোমাকে আমি রেখে গেলাম রানীকে পাহারা দিতে। রানী শ্বেতপুষ্পা নিজের দেশ ছেড়ে এসেছেন নতুন দেশে, তুমি কখনও এঁর পাশ ছেড়ে যাবে না। আমি শয়তনটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ফিরে আসছি।

রাজা তারপর রানী শ্বেতপুষ্পার কপালে চুম্বন দিয়ে বললেন, আমার ভিন-দেশী ফুল, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো এখানে, কোনো ভয় নেই তোমার, আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই ঐ ছুঁচো মর্গানটাকে বন্দী করে নিয়ে আসছি তোমার পায়ের কাছে। মাত্র এক সপ্তাহ, তুমি একটু কষ্ট করে একা থাকো!

যাবার সময় রাজা জেনে গেলেন না যে রানী তখন গর্ভবতী!

তারপর একদিন যায়, দু'দিন যায়, রাজার আর কোনো খবর নেই। সাতদিনও কেটে গেল। রাজা এলেন না। রানী শ্বেতপুষ্পা সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন

জানলায়। রানী খান না, ঘুমোতে যান না। রানী ঠায় দাঁড়িয়ে জানলায়, শেষকালে একদিন ভগ্নদূতের মুখে খবর এলো, রাজা রিভালেন মারা গেছেন গুপ্তঘাতকের ছুরিতে, তাঁর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। বাকি সৈন্যরা সবাই জড়ো হয়ে শুধু রক্ষা করছে এই উপকূলের দুর্গ।

রিভালেনের মৃত্যুর খবর শুনে দুর্গে কান্নার রোল পড়ে গেল। কাঁদলেন না শুধু রানী। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে খবরটা শুনলেন। তারপর একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে এতদিন পর এই প্রথম স্নান করে একটু জল মুখে দিয়ে শুতে গেলেন। তার পরদিনও রানীর চোখ শুকনো, কোনো কান্না নেই। কেউ কেউ আড়ালে বললো, উঃ, রানী কি নিষ্ঠুর! এক ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেললে না, স্বামীর মরণের খবর শুনে একটু হা-হুতাশ নেই! অন্তত লোক দেখানোও তো খানিকটা করতে হয়।

একমাত্র সত্যবাহন রোহল্ট আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। নিভৃতে এসে রানীর পায়ের কাছে বসে বললেন রোহল্ট, মা, একি মরণপণ তোমার? এক ফোঁটা চোখের জল ফেলো, তাই দেখে আমরা বাঁচি! কেন তুমি নিজেকেও মারতে চাইছো? দুঃখের বোঝা বাড়াবার চেয়ে হালকা করার চেষ্টা করাই তো উচিত সবার। যে জন্মায় তাকে তো একদিন মরতেই হবে! বরং কারুর মরার খবর শুনলে, যে বেঁচে আছে তার আরও বেশি করে বাঁচার চেষ্টা করা দরকার।

রানী শ্বেতপুষ্পা ম্লান হেসে বললেন, তোমার ভয় নেই, তোমার ভয় নেই রোহল্ট, আমি অত সহজে মরবো না।

রানীর মুখ এমন পাষাণের মতো শান্ত যে দেখলে বুক কেঁপে ওঠে।

কিছুদিনের মধ্যেই রানী শ্বেতপুষ্পা একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। সেই পুত্রকে দু'হাতে তুলে ধরে রানী বললেন, বাছা, তোর প্রতীক্ষাতেই আমি বেঁচে ছিলাম, আজ তোর দেখা পেলাম। তোর মতো এমন সুন্দর সন্তান বুঝি পৃথিবীতে আর কোনো নারী জন্ম দেয়নি। কিন্তু বড় দুঃখের দিনে তুই এসেছিস। বড় দুঃখের মধ্যে আমি এসেছি এদেশে। বড় দুঃখে আমার কেটেছে এ-কটা দিন। ওরে, বড় দুঃখের মুহূর্তে তোর জন্ম। আরও কত দুঃখ তোর সামনে আছে কি জানি! এত দুঃখ তুই ললাটে নিয়ে এসেছিস, তাই তোর নাম রাখলাম আমি 'ত্রিস্তান', অর্থাৎ দুঃখের সন্তান। দুঃখের সন্তান, তুই আর এক দুঃখ।

এই কথা বলে রানী শিশুর কপালে চুম্বন করে রোহল্টের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, রোহল্ট, তুমি এই শিশুকে রক্ষা করো। তোমার প্রভুকে তুমি ভালো-

বাসতে, সেইরকম ভালোবাসা দিয়েই এই শিশুকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো। নাও!
তার সঙ্গে সঙ্গেই রানী লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। রোহল্ট রানীকে তুলতে গিয়ে দেখলো রানীর দেহে প্রাণ নেই। শিশুকে রোহল্টের হাতে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই রানী প্রাণত্যাগ করেছেন। শুধু এই মুহূর্তটির জন্যই বেঁচে ছিলেন।

কিন্তু তখন শোক করারও সময় নেই। দুর্গের বাইরে শত্রু। এতদিন প্রতিরোধ করে রাখার পরও দুর্গকে আর রক্ষা করা গেল না। শত্রুসেনা দুর্গের প্রাচীর ডিঙিয়ে ঢুকতে শুরু করেছে। রোহল্ট সাদা পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। স্বীকার করে নিলেন ডিউক মর্গানের অধীনতা। কিন্তু মর্গান কি এই শিশুটিকে বাঁচতে দেবে? শত্রুর কেউ শেষ রাখে না। বোহল্ট তখন সেই শিশুকে রেখে এলেন নিজের স্ত্রীর কাছে, চারিদিকে রটিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন।

ক্রমে সাত বছর বয়েস হলো শিশুর। রোহল্ট তখন তার জন্য একটি আলাদা গুরু ঠিক করলেন। সেই গুরু হলেন সর্ববিদ্যাপারঙ্গম গরভেনাল। গরভেনাল অবাক হয়েগেলেন বালক ত্রিস্তানকে দেখে। এই বালকের যে সর্বশরীরে রাজলক্ষণ, অথচ এ রোহল্টের পুত্র! হুজুর, আপনারা জানেন, সিংহের শাবক সিংহই হয়। কোকিলের ছানা কাকের বাসায় বেড়ে ওঠে, কিন্তু তা বলে সে কাক হয়ে যায় না, বড় হয়ে কোকিলই হয়। ঝরনার পাশ থেকে তুলে এনে গোলাপের চারা ছায়-গাদায় পুঁতলে তাতে গোলাপ ফুলই ফুটবে। ত্রিস্তানের স্বভাবে ফুটে উঠতে লাগল রাজকীয় সমস্ত গুণ। বর্শাচালনা, তলোয়ার খেলা, ধনুক বাণ ছোঁড়া, ঘোড়ায় চড়ে লাফিয়ে নদী পার হওয়া—এসব সে শিখে নিল অতি সহজেই। সেই সঙ্গে গুরু গরভেনাল তাকে আরও শেখালেন পৃথিবীর সমস্ত মিথ্যা ও নীচতাকে ঘৃণা করা, এবং প্রাণ দিয়েও শপথ রক্ষা করা। শুধু যুদ্ধ নয়, ত্রিস্তান আরো শিখলো—বেহালা বাজানো, গান, ছবি আঁকা। পনেরো বছরের কিশোর ত্রিস্তান যখন সাদা ঘোড়ায় চড়ে পথ দিয়ে যেত, তখন পথচারীরা থেমে দাঁড়িয়ে দেখতো তার যাওয়া, বলাবলি করতো, কি ভাগ্য রোহল্টের এমন সন্তানের পিতা হয়েছে! এরকম সুঠাম, সুকুমার, সর্বগুণের আধার এই সন্তানের নাম সে 'দুঃখ' রেখেছে কেন? সত্যবাহন রোহল্ট কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য পরলোকগত প্রভু রিভালেন এবং রানী শ্বেতপুষ্পার কথা ভোলেননি। ত্রিস্তানের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পড়তো তাঁর। ত্রিস্তানকে তিনি বাইরে নিজের পুত্রের মতো স্নেহ করলেও মনে মনে ভক্তি করতেন প্রভুপুত্র হিসেবে।

হঠাৎ একদিন রোহল্ট চোখে সর্বনাশ দেখলেন। ত্রিস্তান নেই। ত্রিস্তান চুরি

হয়ে গেল। নরওয়ে থেকে একটি বাণিজ্য-জাহাজ এসেছিল। ত্রিস্তান সমুদ্রের পাড়ে একা একা দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল সেই জাহাজের দিকে। এই জাহাজ কত দেশ ঘুরে ঘুরে এসেছে! দেখেছে কত জনপদ, কত রকম মানুষ! ত্রিস্তানের ইচ্ছে হয়, সেও একদিন এরকম একটা জাহাজে চড়ে দূরদেশে চলে যাবে। সমুদ্রের যেখানে শেষ হয়ে গেছে, তার ওপারে কোন দেশ আছে সে গিয়ে দেখবে। জাহাজের নাবিকেরা এসে ত্রিস্তানের সঙ্গে ভাব করে। ত্রিস্তানকে দেখে লোভে তাদের চোখ চক্‌চক্‌ করে ওঠে। এমন সুন্দর, সুঠাম কিশোরকে যদি তারা ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করতে পারে, কত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় তাহলে! তারা ত্রিস্তানকে বললো, এসো না, আমাদের জাহাজের ওপরে উঠবে? উঠে ঘুরে ঘুরে গোটা জাহাজটা দেখে যাও না। বণিকরা ত্রিস্তানকে কথায় কথায় ভুলিয়ে একবার সেই জাহাজে তুলেই জাহাজ ছেড়ে দিল। অনেকক্ষণ ত্রিস্তান বুঝতে পারেনি, যখন সে বুঝতে পারলো তখনই সে ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো লড়াই করে চেষ্টা করলো সমুদ্রে লাফিয়ে পড়বার। কিন্তু অতজনের সঙ্গে সে একা পারবে কেন বলুন? তা ছাড়া তার সঙ্গে কোনো অস্ত্র ছিল না। ত্রিস্তান ওদের হাতে বন্দী হয়ে রইলো।

কিন্তু আপনারা জানেন, সমুদ্র কখনও পাপের বোঝা বয় না। ওরকম পাপের জাহাজ সমুদ্রে নিরাপদে যেতেই পারে না। আকাশ কালো করে ঝড় উঠলো, বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় দিক হারিয়ে সে জাহাজ কোন দিকে ভেসে চললো কে জানে! ক্রমাগত আটদিন ঝড়। তারপর, জাহাজের নাবিকেরা ঝড় ও কুয়াশার মধ্যেই দেখতে পেল সামনেই একটা খাড়া পাহাড়, জাহাজ সেদিকেই তীরবেগে এগিয়ে চলেছে। সেখানে গিয়ে ধাক্কা দিলেই জাহাজসুদ্ধ সকলের মৃত্যু। দুঃখে অনুতাপে তারা তখনই হাঁটু গেড়ে বসে সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'হে সমুদ্র, আমরা এরকম পাপ আর কখনো করবো না। এই নিরপরাধ কিশোরকে আমরা এখনি মুক্তি দিচ্ছি।' এ কথা বলেই তারা একটা ছোট্টো নৌকো নামিয়ে কিছু খাবার-দাবার দিয়ে ত্রিস্তানকে সেখানে বসিয়ে দিল। সেই সঙ্গে খুলে দিল হাত-পায়ের বাঁধন। কি জানি সমুদ্র ওদের প্রার্থনা শুনেছিল কিনা, কিন্তু হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি কমে গিয়ে কুয়াশা কেটে গেল। আস্তে আস্তে ভেসে চললো ত্রিস্তানের নৌকো। ঠেকলো এসে সমুদ্রের পাড়ে।

সামনেই খাড়া পাহাড়। আর কোনো পথ নেই। অতি কষ্টে, প্রাণ হাতে নিয়ে, ত্রিস্তান বেয়ে উঠলো খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর। উঠে দেখলো সামনে এক বিস্তৃত বনভূমি, নিচে সমুদ্র। আর কোথাও কিছু নেই। তখন ত্রিস্তানের

একবার তার বাবা, গুরু গরভেনাল, আরও সকলের কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো নিজের দেশ লিওনেসের কথা। আর এখন সে কোথায় এসে পড়লো? দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো সে হঠাৎ। জনশূন্য সমুদ্রতীরে একা বালক বসে বসে কাঁদতে লাগলো। আপনারা ভেবে দেখুন সেই অসহায় দৃশ্য।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দূরে মানুষের শব্দ পেয়ে ত্রিস্তান চোখ মুছলো। কয়েকজন অশ্বারোহী একটা হরিণকে তাড়া করে আসছে। বাণবিদ্ধ হরিণটা এসে লুটিয়ে পড়লো ত্রিস্তানের কাছেই। অশ্বারোহীরা নেমে এলো। ত্রিস্তান একটা গাছের আড়ালে লুকিয়েছে—শিকারীরা ওকে দেখতেই পায়নি। ওদের মধ্যে একজন তলোয়ার খুলে এক কোপে হরিণটার মাথা কেটে ফেলতে গেল। তাই দেখে ত্রিস্তান চেঁচিয়ে উঠলো, ওকি, ওকি, অমন সুন্দর হরিণের চামড়াটা নষ্ট করছেন?

অশ্বারোহীরা চমকে উঠলো। তারা এসে জিগ্যেস করলো, তুমি কে? কি তোমার নাম?

ত্রিস্তান জবাব দিল, আমার নাম ত্রিস্তান, লোকে আমাকে দুঃখ বলেও ডাকে। আমি বলছিলুম, আপনারা হরিণটার গলা কেটে ফেলছিলেন, এতে যে চামড়াটা নষ্ট হয়ে যায়।

তুমি অন্যরকম ভাবে চামড়াটা ছাড়াতে জানো নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যদি অনুমতি করেন, আমিই চামড়া ছাড়িয়ে দিতে পারি।

একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে নিপুণ হাতে ত্রিস্তান হরিণটাকে চিরতে লাগলো। একটু পরেই মনে হলো, ওখানে যেন দুটো হরিণ আছে। একটা হরিণের খোসা, আর একটা ছালহীন মাংসময় হরিণ। তারপর ত্রিস্তান হরিণের মাংসগুলোও পৃথক ভাবে কাটতে লাগলো।

অশ্বারোহীরা জিগ্যেস করলো, তুমি কোন দেশ থেকে এসেছো? তোমার বাবা কে? এ রকম চমৎকার ভাবে হরিণ ছাড়াতে তো এ দেশের কেউ জানে না।

ত্রিস্তান এখন বুঝেছে, সব জায়গায় সব কথা বলা উচিত নয়। সে বললো, আমার দেশের নাম লিওনেস, আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী। আমি বাবার সঙ্গে জাহাজে করে ভারতবর্ষের পথে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমাদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ে। জাহাজ ভেঙে ভাসতে ভাসতে আমি এসেছি এখানে। জানি না, অন্য আর কেউ বেঁচে আছে কিনা।

অশ্বারোহীরা দুর্ঘটনার কথা শুনে দুঃখিত হলো। ত্রিস্তানের মধুর ব্যবহার দেখে বললো, বাঃ! লিওনেসের ব্যবসায়ীর ছেলেরাও এমন অভিজাতের মতো

হয়? তুমি আমাদের রাজার কাছে যাবে? আমাদের রাজা মার্ক তোমাকে দেখলে খুব খুশী হবেন। তুমি তাঁর কাছে আশ্রয়ও পেতে পারো।

ত্রিস্তান রাজা মার্ক সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সে আগ্রহের সঙ্গেই রাজার কাছে যেতে চাইলো। অশ্বারোহীরা ওকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললো।

বন পেরিয়ে জনপদ। দূর থেকে দেখা যায় বিশাল দুর্গ টিণ্টাজেল। সেই দুর্গের দেওয়াল বেয়ে উঠেছে আঙুরলতা। সাদা আর নীল পাথরের চৌকো চৌকো দেওয়াল, দূর থেকে দেখায় পাশা খেলার ছকের মতো। লোকে বলে, পুরাকালের দৈত্যেরা এই দুর্গ বানিয়েছে—নইলে মানুষের কি সাধ্য, এতবড় দুর্গ বানানো। টিণ্টাজেল দুর্গ দেখে ত্রিস্তান অভিভূত হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলো, আমি কি এ দুর্গের মধ্যে কোনোদিন ঢুকতে পারবো? তখনও সে জানে না, এই দুর্গের মধ্যেই তার ভাগ্য তাকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলা খেলবে।

রাজা মার্ক বন্ধু-সামন্তদের সঙ্গে বসেছিলেন, অশ্বারোহীরা ত্রিস্তানকে তাঁর সামনে নিয়ে এলো। তারপর সবিস্তারে বলতে লাগলো কি করে ত্রিস্তানকে ওরা আবিষ্কার করেছে। রাজা ত্রিস্তানকে দেখেই চমকে উঠলেন, এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। রাজা মার্ক ত্রিস্তানের জন্মকথা কিছুই জানেন না। তিনি জানেন তাঁর বোন শ্বেতপুষ্পা আর তাঁর বন্ধু রিভালেন মারা গেছেন নিঃসন্তান অবস্থায়। তবু ত্রিস্তানকে দেখে তাঁর মনে হতে লাগলো, এ মুখ বহুদিনের চেনা। ওকে দেখেই মনের মধ্যে কেমন মায়া আর ভালোবাসা জেগে উঠলো। রাজা মার্ক ওর দিকে তাকিয়ে তন্ন তন্ন করে ভাবতে লাগলেন, কেন এই মুখ দেখেই তাঁর হৃদয় দুলে উঠলো! কিছুই ভেবে পেলেন না। কিন্তু, আপনারা জানেন, রক্ত রক্তকে চেনে। রাজার রক্ত ত্রিস্তানের রক্তকে চিনেছিল। রাজা ত্রিস্তানকে ডেকে নিয়ে পাশে বসালেন। বললেন, তুমি এখানেই থাকো।

সেই দিন সন্ধেবেলা গান-বাজনার মজলিস। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ গায়ক বীণা বাজিয়ে গান ধরেছেন। ত্রিস্তান রাজার পাশে বসে। গান চলেছে, এক প্রণয়ী যুগলের ব্যর্থ প্রেমের করুণ গান, হঠাৎ ত্রিস্তান গায়ককে বলে উঠলো, গুণী, এই গানটা এত মধুর, তার চেয়েও মধুর আপনার গলা, কিন্তু মাঝের একটু অংশ বাদ দিলেন কেন? সে অংশটা যে সবচেয়ে সুন্দর!

গায়ক নিজের গান শেষ করে বললেন, আমি মাঝের অংশটা জানি না। তুমি জানো নাকি? লিওনেসের ব্যবসায়ীরাও কি তাদের ছেলেদের এ সব উচ্চাঙ্গের গান শেখায়? তুমি সেই অংশটা গেয়ে দেখাতে পারবে?

ত্রিস্তান বিনীতভাবে বীণা যন্ত্রটা তুলে নিয়ে গান ধরলো। সেই সুরের

মূর্ছনা বাতাসের স্তরে স্তরে ঘুরতে লাগলো। যেন বাতাসই হয়ে গেল সুর। সেই ভাষায় সুর ছাড়া আর কিছু নেই। পুরুষের কৈশোরের কণ্ঠস্বর নারীর চেয়েও অনেক মিষ্টি অনেক সুরেলা হয়। ত্রিস্তানের সেই মিষ্টি রিণরিণে গলার সুরে সভাগৃহ যেন কাঁপতে লাগলো।

গান যখন শেষ হলো, তারও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সভাস্থল নিস্তব্ধ। রাজা উঠে এসে ত্রিস্তানকে আলিঙ্গন করে বললেন, ধন্য সেই গুরু, যে তোমাকে গান শিখিয়েছে। তোমাকে দেখা মাত্রই আমার মনে আনন্দও হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। কেন জানি না, বৎস, তোমার গান আমাকে অনেক দুঃখ ভুলিয়ে দিল। এ রকম শুদ্ধ সঙ্গীত মানুষের মনও শুদ্ধ করে। ত্রিস্তান, তুমি আমার কাছে থাকো। তুমি আর কোথাও যেও না। আমার হৃদয় বাববার তোমাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

অভিভূত হয়ে ত্রিস্তান বললো, মহারাজ যদি দয়া করেন, আমি থাকবো আপনার ভৃত্য হয়ে। আমি হব আপনার শিকারের সঙ্গী, আপনার বীণাবাদক।

সেখানেই থেকে গেল ত্রিস্তান। তিন বছর কেটে গেল। রাজা মার্কের কোনো ছেলে ছিল না। ত্রিস্তানের প্রতি এত টান জন্মালো যে এক মুহূর্তের জন্য তিনি ওকে কাছ ছাড়া করেন না। রাজকার্যের সময়ও তিনি ত্রিস্তানকে ডাকেন পরামর্শ দিতে! রাজার মন খারাপ হলে ত্রিস্তান বীণা বাজিয়ে শোনায়, রাত্রে রাজা যখন শুতে যান, ত্রিস্তান শুয়ে থাকে তাঁর পাশের ঘরে। দেশের সব লোকও ভালোবাসে ত্রিস্তানকে।

প্রভুগণ, আপনারা জানেন, সৎকবি কখনও কাব্য গাথা অনাবশ্যক দীর্ঘ করে না। বাজে কবিরাই কাহিনীকে অকারণে ফেনিয়ে তোলে। রাজা মার্ক ত্রিস্তানকে কত রকম ভাবে স্নেহ দেখাতেন সে কথার আর বর্ণনা করে লাভ নেই। আমাদের মূল বিষয় ত্রিস্তানের বুক-পোড়ানো ভালোবাসা। সে কথায় আমরা এখনো আসিনি। তার আগে তার পূর্বকথা সংক্ষেপেই সেরে নিতে চাই।

প্রভুভক্ত সত্যবাহন রোহল্ট ত্রিস্তানকে হারিয়ে এক মুহূর্ত শান্তিতে ছিলেন না। তিনি নিজেই ছদ্মবেশে ত্রিস্তানকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। অনেক দেশ ঘুরে, বহুদিন পর রাজা মার্কের দেশ কর্নওয়ালে এসে ত্রিস্তানের দেখা পেলেন। ত্রিস্তানকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে রোহল্ট বললেন, 'দুঃখ, তুমিই আমার একমাত্র সুখ ছিলে! ত্রিস্তান, তুমি আমার সন্তান নও, তুমি রাজপুত্র। এবার এসো, নিজের রাজ্য জয় করে নাও!'

রোহল্ট রাজা মার্ককে দেখালেন রানী শ্বেতপুষ্পার অভিজ্ঞান। বললেন, ত্রিস্তান অজ্ঞাত কুলশীল নয়, রাজারই আত্মীয়, তাঁর প্রিয় বোনের সন্তান। এখন

ত্রিস্তান বড় হয়েছে। এখন ত্রিস্তানের উচিত, বাহুবলে নিজ রাজ্য উদ্ধার করা এবং পিতৃহত্যার শোধ নেওয়া।

রাজা মার্ক একথা শুনে আনন্দে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। তখনই তিনি দেশে ফেরার জন্য ত্রিস্তানকে সব রকম সাহায্য দিলেন—অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য-সামন্ত। লিওনেসে ফিরে এসে ত্রিস্তান ঘোরতর যুদ্ধে মেতে উঠলো। পিতৃহন্তা মর্গানের সঙ্গে সম্মুখ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে খুন করলো। এবং সেই রক্তে তর্পণ করলো পিতার। নিজের রাজ্য জয় করে ত্রিস্তান এবার হল রাজা।

কিন্তু রাজা হলেও ত্রিস্তানের সুখ নেই। রাজা হওয়া বড় আঁটসাট ব্যাপার। সব সময় ব্যস্ত আর দায়িত্বপূর্ণ থাকতে হয়। ত্রিস্তানের ভালো লাগে না। তার বয়স তখন একুশ। এতকাল সে স্বাধীনভাবে যেখানে-সেখানে, বনে-পাহাড়ে ঘুরেছে, একা একা বীণা বাজিয়ে গান করেছে, এখন মাথায় ভারী রাজমুকুট পরে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে তার অস্বস্তি লাগে। রাজসভায় যখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয়, তখন হঠাৎ তার ইচ্ছে হয় উঠে গিয়ে নিরালায় প্রাসাদের অলিন্দে চুপ করে বসে থাকতে।

ছেলেবেলা থেকে এ রাজ্যে যাদের সে ভালোবেসেছে, যাদের সঙ্গে সমানভাবে মিশেছে—আজ তারা দূরে থেকে তাকে শ্রদ্ধা করে। কেউ সহজভাবে কথা বলে না! নাঃ, রাজা সেজে থাকা তার পছন্দ হয় না! তার বারবার মনে পড়ে রাজা মার্কের কথা, তাঁর অফুরন্ত স্নেহ ভালোবাসার কথা। কেমন স্বাধীনভাবে সেখানে বীণা বাজিয়ে ঘুরে বেড়াতো। সেই জীবনই ছিল তার ভালো। তাই ত্রিস্তান তাঁর রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক আর জমিদারদের একদিন ডাকলো। ডেকে বললো :

বন্ধুগণ, ঈশ্বর এবং আপনারা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই আমি পিতৃহন্তাকে নিহত করে প্রতিশোধ নিয়েছি। আমি আমার পিতার আত্মাকে তৃপ্তি দিয়েছি। কিন্তু এছাড়াও আমার দুজন পিতৃতুল্য আত্মীয় আছেন। সত্যবাহন রোহল্ট ও কর্নওয়ালের রাজা মার্ক। এঁরাও আমার পিতা, একজন আমাকে বাল্যকালে প্রতিপালন করেছেন, একজন কৈশোরে। এঁদের কাছে আমার ঋণ আছে। আমি সেই ঋণ থেকেও মুক্ত হতে চাই।

একজন স্বাধীন মানুষের দু'রকম সম্পত্তি থাকে। নিজের শরীর আর তার জমি। এই দুই সম্পত্তি আমি উৎসর্গ করতে চাই আমার দুই পিতাকে। সুতরাং, আমার এ রাজ্য আমি রোহল্টকে দিলাম। পিতা, তুমি সর্বসমক্ষে আমার এ রাজ্য গ্রহণ করে আমাকে ঋণমুক্ত করো!

আর আমার এ শরীর আমি দেবো রাজা মার্ককে। আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো—যদিও যেতে খুব কষ্ট হবে আমার—তবুও আমি কর্নওয়ালে গিয়ে রাজা মার্কের সেবা করতে চাই। আপনারা কেউ কি এতে আপত্তি করবেন? আপনারা অনুমতি দিন আমি রাজপদের গুরুভার থেকে মুক্ত হই।

এরকম অসাধারণ মহানুভবতার কথা ত্রিস্তানের মুখে শুনে প্রথমে সকলেই কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর একসঙ্গে আন্তরিকভাবে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন ত্রিস্তানের নামে! এ ছেলেটার মানুষের শরীর কিন্তু অন্তঃকরণটা দেবতার মতো।

নিজের রাজ্য ছেড়ে ত্রিস্তান চলে এলো কর্নওয়ালে। একমাত্র গুরু গরভেনালই এতদিন পর প্রিয় শিষ্য ত্রিস্তানকে পেয়ে আর ছাড়লেন না—তিনিও সঙ্গে এলেন।

কিন্তু রাজা মার্কের রাজ্যে এসে ওরা দেখলো সর্বত্র শোকের ছায়া। বন্দরে সার দেওয়া অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজ। অন্য দেশের সৈন্য এসে কর্নওয়াল ঘিরে ফেলেছে। আর ঐ শত্রু যে সে নয়, আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্ধর্ষ সৈনাবাহিনী, যাদের অধিপতি স্বয়ং মোরহল্ট। মোরহল্টকে লোকে মানুষ বলে না, বলে দৈত্য, দৈত্যের মতোই চেহারা, অস্বাভাবিক লম্বা—প্রায় আট ফুট, আর সেই রকম স্বাস্থ্য। দেখলে মনে হয় একটা চলমান পাহাড়। তার বিক্রম আর শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কেউ নেই।

এর আগে রাজা মার্ক একবার আয়ার্ল্যাণ্ডের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, প্রতি বছর তিন মণ ওজনের সোনা দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকবছর পর আর দেননি। ভেবেছিলেন, আবার ফিরে এদেশ আক্রমণ করার শক্তি আইরীশদের নেই। রাজা মার্ক যুদ্ধ বিগ্রহে নিপুণ নন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয়, শান্তিপ্রিয় রাজা। এবারের আক্রমণে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।

দৈত্য মোরহল্ট আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজার শালা। সে রাজা মার্কের সামনে এসে ভীমের মতন কঠিন বুক ফুলিয়ে বললো, মহারাজ, খুব সোনা ফাঁকি দিয়েছেন। এক বছরের ফাঁকি পরের বছর দ্বিগুণ হয়ে যায়। এ তো পাঁচ বছর হয়ে গেল! এবার ইচ্ছে করলে আমি আপনার রাজ্য ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু দয়া করে তা দেব না। আমি এবার সোনা-দানা চাই না। আমি এবার চাই চুনী পান্নার চেয়েও দামী রত্ন। আমি আপনার রাজ্য থেকে তিনশো যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে যাবো। আমাদের দেশে দাসীর বড়

অভাব। তা আপনার দেশের মেয়েরা দাসী হিসেবে মানাবে ভালো! যে কোনো মেয়ে কিন্তু আমি চাই না। আমি নিজে বেছে নেবো। আজ থেকে তিনদিন পর আপনার রাজ্যের সব মেয়ে সকালবেলা এসে যার যার বাড়ির সামনে দরজার কাজে দাঁড়াবে—রাজবাড়ি, মন্ত্রীবাড়ি, সেনাপতিবাড়ি, সব বাড়ির মেয়েরা। আমি একজন একজন করে বেছে নেবো। তিনশো মেয়ে!

অথবা,···এবার দৈত্য মোরহল্ট অট্টহাসি করে উঠলো। অথবা, আমি কিছুই করবো না, আপনার রাজ্য ছেড়ে আমার সৈন্যরা চলে যাবে কিছুই না নিয়ে, যদি আপনার রাজ্যের কোনো বীরপুরুষ একা যুদ্ধ করে আমাকে হারাতে পারে। কি, আছে কেউ সে রকম বীর? তিন দিন সময় দিলাম, যা ঠিক করার ভেবে নিন। হয় যুদ্ধ, নয় তিনশো জন দাসী!

অধোবদন রাজা চুপ করে রইলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজ্যের সব সম্ভ্রান্ত লোকদের। অপমানে বিবর্ণ মুখে তাঁদের সামনে মোরহল্টের সব কথা বর্ণনা করে জিগ্যেস করলেন, আপনাদের মধ্যে কে আজ দেশের সম্মান বাঁচাতে এগিয়ে আসবেন? আমি রাজা, আমারই এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, আমার সে শক্তি নেই।

সভাসদরা সকলে চুপ! সকলেই মনে মনে বলতে লাগলেন, হায়, হায়, কে যাবে? মোরহল্টের ঐ চেহারা, ওর ক্ষমতা আর তেজের কথা কে না জানে? ওর সামনে যে যাবে তাকেই তো প্রাণ দিতে হবে। প্রাণ দিতে পারি কিন্তু তাতে তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, দেশের সম্মান বাঁচবে না। তবে শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ কি?

রাজা আবার জিগ্যেস করলেন কম্পিত গলায়, বলুন, কে যাবেন? সভাসদরা তখনও চুপ। মনে মনে তাঁরা কেঁদে বলতে লাগলেন, আমাদের মেয়েদের কি এতদিন মানুষ করলুম পরদেশে গিয়ে দাসীবাঁদী হবার জন্যে? মেয়েগুলোর মুখ মনে করতে গেলেই বুক মুচড়ে ওঠে। ওদেশে নিয়ে গিয়ে কত অত্যাচার করবে কে জানে! পিতা হয়ে নিজের মেয়েকে এইভাবে ত্যাগ করতে হবে? নিজের প্রাণ দিয়েও তো তাদের বাঁচাতে পারবো না।

রাজা তৃতীয়বার জিগ্যেস করলেন, আপনাদের মধ্যে কেউ এগিয়ে কি আসবেন না?

সভাসদরা তখনও নিরুত্তর। রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তবে আমাদের সব মেয়েদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হোক!

একজন সভাসদ হাহাকার করে উঠলেন, মহারাজ, তা কি করে হয়? নিজের

সন্তানদের কি করে বিষ খাওয়াবো ? তা ছাড়া, তাতেও কি মোরহল্টের রাগ কমবে ? সে রাজ্য ধ্বংস করে দিয়ে যাবে !

রাজা বললেন, এ ছাড়া আর কি উপায় আছে, বলুন ? মোরহল্টের সঙ্গে একা যুদ্ধ করতে পারে এমন কেউ নেই যখন—

এই সময় ধীর পদে এগিয়ে ত্রিস্তান রাজার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শান্ত গলায় বললো, রাজা, আপনি অনুমতি দিলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি।

—ত্রিস্তান তুমি ! না, না, তোমাকে আমি ছাড়তে পারবো না। তোমার এই তরুণ বয়েস, না ত্রিস্তান, তুমি না !

—না মহারাজ, আপনি অনুমতি দিন। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, এখন মোরহল্টের মুখোমুখি একবার অন্তত না দাঁড়ালে আমার আর কোনোদিন রাত্রে ঘুম হবে না ! কোনো কিছু একবার ঠিক করলে, আমি তার শেষ দেখতে চাই !

রাজা দেখলেন ত্রিস্তানের শান্ত মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। রাজা অনুমতি দিলেন। রাজার হৃদয় তখন গ্রীষ্মকালের দীঘির মতো, উপরের জল গরম, নিচের জল ঠাণ্ডা। একদিকে ত্রিস্তানের এই অসীম সাহসের জন্য রাজার গর্ব, অন্যদিকে ত্রিস্তানকে হারাবার ভয়।

ঠিক হলো একটু দূরে একটা দ্বীপে যুদ্ধ হবে। দুপক্ষের যোদ্ধাই যাবে একা। যুদ্ধে জয়ী হয়ে দুজনের মধ্যে একজনই শুধু ফিরে আসবে। অস্ত্রে বর্মে সজ্জিত হয়ে ত্রিস্তান একটি ছোট নৌকোয় চেপে চললো সেই দ্বীপের দিকে। তার সেই সুকুমার তরুণ মূর্তি দেখে রাজ্যের প্রতিটি লোক মনে মনে বলে উঠলো, হায় হায়, ত্রিস্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার আগে আমরা নিজেরা কেন মরলুম না ! রাজ্যের লোক ভেঙে পড়েছে সমুদ্রের পাড়ে।

ত্রিস্তান সেই দ্বীপে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মোরহল্টও তার বিশাল পাল তোলা বিলাস নৌকো নিয়ে উপস্থিত হলো। ত্রিস্তান নিজের নৌকোটা ঠেলে ভাসিয়ে দিল জলে। তখন মোরহল্ট বিদ্রূপের সঙ্গে বললো, ওকি হে ছোকরা, নৌকোটা ভেসে গেল যে ! পাড়ে বেঁধে রাখলে না ? ভয়ে এখনই হাত কাঁপছে বুঝি ?

ত্রিস্তান সরলভাবে হেসে বললো, বাঃ, বুঝতে পারলেন না ? ফেরার সময় তো আমরা একজনই ফিরবো। একটার বেশি দুটো নৌকো লাগবে কিসে ? আসুন, বরং দেরি না করে, শুরু করা যাক।

সে যুদ্ধ কেউ দেখেনি। তবে তিনবার সেই দ্বীপ থেকে বিকট আওয়াজ ভেসে এসেছিল—সেই আওয়াজে রাজ্যের লোকের বুক কেঁপেছে আর মোরহল্টের

সৈন্যদের মধ্যে উঠেছে জয়ধ্বনি। মোরহল্ট শক্তিমান, ত্রিস্তান ক্ষিপ্র। এ যুদ্ধ পশুশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের আত্মবিশ্বাসের।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর দ্বীপ থেকে একটা নৌকো ভেসে আসতে লাগলো। পাল তোলা বিশাল নৌকো। তা দেখে সমুদ্রপাড়ের লোকেরা বিষাদে আর্তনাদ করে উঠলো, হায়, হায়, মোরহল্টের নৌকো, মোরহল্ট জিতেছে! নৌকো যখন আরও একটু সামনে এলো, দেখা গেল ছাদের ওপর একজন নাইট দাঁড়িয়ে আছে। দু'হাতে দুখানা তরবারি। লোকে চিনতে পারলো, ত্রিস্তান!

তখন সে উল্লাসের তুলনা হয় না! দেশের মুখরক্ষা করেছে তাদের প্রিয় ত্রিস্তান। শুধু তাই নয়, অতবড় বীরপুরুষ মোরহল্টকে হত্যা করে আশাতীত কীর্তি স্থাপন করেছে। অসংখ্য লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো, সাঁতরে তার নৌকো আগে নিয়ে আসবে।

রাজ্যের সমস্ত লোক এলো ত্রিস্তানকে অভিনন্দন জানাতে। সমস্ত তরুণী মেয়েরা ছুটে এলো ত্রিস্তানকে চুম্বন দিতে। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে, একটা হাত তুলে ত্রিস্তান বললো, আপনারা শুনুন, মোরহল্ট সত্যিই বীরের মতো যুদ্ধ করেছে। এই দেখুন আমার তলোয়ার, এর আগা ভেঙে মোরহল্টের মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সৈন্যদের বলুন, আমাদের দেশ থেকে সেই তলোয়ারের টুকরোটাই উপহার নিয়ে এবার ওরা ফিরে যাক্!

তারপর ত্রিস্তান চললো রাজার সঙ্গে দেখা করতে। পথের দুপাশ দিয়ে অসংখ্য ফুল এসে পড়ছে তার মাথায়। হাজার হাজার যুবক যুবতী চিৎকার করে ডাকছে তার নাম ধরে। কিন্তু ত্রিস্তান যেন কিছুটা উদাসীন। কোনো দিকে তার দৃষ্টি নেই। রাজার সামনে এসে ত্রিস্তান বললো, মহারাজ, আমি এ দেশের সম্মান রাখতে পেরেছি তো? মহারাজ, আমি আপনার···এই কথা বলতে বলতেই ত্রিস্তান ধপ করে পড়ে গেল রাজার বুকের ওপর। সারা শরীর তার রক্তে রক্তময়। রাজা দেখলেন ত্রিস্তান অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মোরহল্টের সৈন্যরা, শপথ অনুযায়ী বিনা যুদ্ধে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল দৈত্যাকার মোরহল্টের মৃতদেহ। আয়ার্ল্যাণ্ডের রানী—ঐ মোরহল্টের আপন বোন। অন্যবার রানী আর রাজকুমারী বীর মোরহল্ট যুদ্ধ থেকে ফিরলে সেবা শুশ্রূষা করে শরীরের ক্ষত সারিয়ে তোলেন, কারণ রানী আর রাজকুমারী অনেক রকম বুনো ওষুধ-পত্তর জানেন, কিন্তু এবার শত ওষুধ লাগিয়েও কিছু হলো না। মৃত্যু মৃত্যুই, তার আর চিকিৎসা হয় না। মৃত মোরহল্টের মাথায় বিঁধে রয়েছে সেই তলোয়ারের ভাঙা টুকরোটা। রাজকুমারী

সেটা খুলে যত্ন করে রেখে দিলেন একটা হাতির দাঁতের বাক্সে। তারপর দুজনে প্রাণ উজাড় করে কাঁদতে লাগলেন মোরহল্টের জন্য। সেই সঙ্গে তাঁরা অভিসম্পাত দিতে লাগলেন মোরহল্টের হত্যাকারী ত্রিস্তানকে। লিওনেসের ত্রিস্তানের নাম সেদিন থেকে হলো রানী ও রাজকুমারীর দু'কানের বিষ। রানী ঘোষণা করলেন, ত্রিস্তানের মৃত্যু সংবাদ যে আনতে পারবে, তাকে রানী নিজের গলার মুক্তামালা উপহার দেবেন।

এদিকে ত্রিস্তানও তখন মৃত্যুমুখে। তার শরীরের প্রত্যেকটি ক্ষতে দগদগে ঘা হয়ে গেল। সেখান থেকে অনবরত ঝরছে পুঁজ আর রক্ত। ডাক্তার কবিরাজ এসে বললে, নিশ্চয়ই মোরহল্টের তলোয়ারে বিষ মাখানো ছিল। তাদের হাজার ওষুধেও ত্রিস্তানের ক্ষত সারলো না। বরং তার সারা শরীর ফুলে পচে বিশ্রী গন্ধ বেরুতে লাগলো। ত্রিস্তানের ক্ষতের গন্ধ এমন জঘন্য যে কেউ আর তার সামনে থাকতে পারে না। শুধু গুরু গরভেনাল, রাজা মার্ক এবং দিনাস নামে এক জমিদার ত্রিস্তানের পাশে থাকতেন—দুর্গন্ধ সহ্য করেও। কারণ, ওঁদের ভালোবাসা ঘৃণাকে জয় করতে পেরেছিল।

কিন্তু ত্রিস্তান বুঝতে পারলো, লোকে তাকে করুণা করছে। বহুলোক তাকে দেখতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নাকে রুমাল চাপা দেয়। রাজা যখন পাশে বসে থাকেন, তখনও তাঁর মুখ অবিকৃত। কিন্তু ত্রিস্তান বুঝতে পারে—তিনি অতিকষ্টে ঘৃণা দমন করছেন। এ জীবন ত্রিস্তান চায় না। একদিন সন্ধেবেলা সে নিজেই টলতে টলতে অতিকষ্টে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো দুর্গ থেকে, তারপর সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে প্রায় গড়াতে গড়াতে এলো জলের কিনারায়। তখন রাত্রির অন্ধকার, কোথাও কেউ নেই, ক্ষতস্থানে বালি লেগে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ত্রিস্তানের। নিজেকে তার চরম অসহায় ও একা লাগলো। ত্রিস্তান কেঁদে ফেললো। অভিমান নিয়ে একবার ভাবলো, এই দেশেরই সম্মান বাঁচাবার জন্য আমি মৃত্যুর মুখে গিয়েছিলাম, অথচ আজ আমি একা। এ দেশের কেউ আমার সঙ্গে নেই। রাজা মার্ক আমাকে ত্যাগ করতে চান? না, না, এখনও তিনি আমাকে ভালোবাসেন, আমার জন্য প্রাণও দিতে পারেন, কিন্তু প্রাণের বিনিময়েও তো প্রাণ পাওয়া যায় না। যাক্, আমাকে মরতেই হবে। আর আমার উপায় নেই। তা হলে এখানে থেকেই সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে মরি। বন্ধ ঘরে শুয়ে শুয়ে মরার চেয়ে সে-মৃত্যু আমার অনেক ভালো। অথবা আত্মহত্যা করলে কেমন হয়? এই জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে? কিংবা—এই সময়ে তার মাথায় অন্য চিন্তা এলো। বরং জলে ভাসতে ভাসতে আমি চলে যাই—যেদিন মৃত্যু

আসবে সেদিন মরবো, লোকচক্ষুর আড়ালে।

খানিকক্ষণ বাদে রাজা মার্ক দলবল নিয়ে ত্রিস্তানকে খুঁজে পেলেন। ত্রিস্তান বললো, মহারাজ, আমি আর বাঁচবো না, বুঝতে পেরেছি। আমাকে ছোট নৌকোয় করে জলে ভাসিয়ে দিন। রাজা বললেন, ত্রিস্তান, তুমি কেন অভিমান করে আমাকে ছেড়ে যেতে চাও! আমি নিজের প্রাণের বিনিময়েও তোমাকে বাঁচাবো। অথবা, দুজনেই মরবো একসঙ্গে!

কিন্তু ত্রিস্তান বারবার নৌকোর কথা বলতে লাগলো। নৌকোয় ভাসতে ভাসতেই সে মরতে চায়! সে নৌকোয় দাঁড় থাকবে না,—কারণ ত্রিস্তানের বাইবার ক্ষমতা নেই। পাল থাকবে না—কারণ সে পাল গুটোতে পারবে না। অস্ত্র থাকবে না—কারণ অস্ত্র ধারণক্ষমতা আর তার নেই। থাকবে শুধু বীণা, সে ভাসতে ভাসতে চলে যাবে বীণা বাজিয়ে।

তাই চলে গেল ত্রিস্তান। ছোট্ট ডিঙি নৌকোয় চেপে সে মৃত্যুর দেশে যাত্রা করলো। সাত দিন সাত রাত্রি ধরে ভেসে চললো নৌকো। তারপর ঠেকলো এসে এক অজানা দেশের পাড়ের কাছে। জেলেরা মাছ ধরছিল, হঠাৎ শুনতে পেল টুং টাং শব্দ। একটা নৌকোয় একটা মরা মানুষ, অথচ বীণা বাজছে। আসলে ত্রিস্তান তখনও মরেনি, আর একটু পরেই মৃত্যু হবে—কিন্তু একটা হাত তবু বীণায় শেষ সুর তোলার চেষ্টা করছে।

জেলেরা প্রথমে ভেবেছিল বুঝি অলৌকিক কিছু। প্রথমে ভূতের ভয় পেয়েছিল তারা। তারপর একটু একটু করে এগিয়ে এসে ত্রিস্তানের অবস্থা বুঝতে পেরে মায়া হলো ওদের। ওরা ধরাধরি করে ত্রিস্তানকে নিয়ে গেল সামনের দুর্গে। সেখানে রানী ও রাজকুমারী আছেন। ওরা নানা রকম ওষুধ জানেন, যদি এই বিদেশীকে দয়া করেন। যদিও রানী ও রাজকুমারী তখন শোকে ডুবে আছেন!

ভাগ্যের কি পরিহাস। এরাই আয়ার্ল্যান্ডের রানী ও রাজকুমারী, মোরহল্টের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। ওদের কাছে এসে পৌঁছলো মোরহল্টের হত্যাকারী ত্রিস্তান। কিন্তু তখন ত্রিস্তানকে চেনবার কোনো উপায় নেই। মোরহল্টের সৈন্যরাও তাকে চিনতে পারবে না। এমন মুমূর্ষু বিকৃত চেহারা হয়েছে তার।

রাজকুমারী জানতেন নানারকম লতাপাতার ওষুধ। মুমূর্ষু বিদেশীকে দেখে দয়া হলো, তিনি তাকে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন। অথচ তিনি যদি জানতেন ওর সত্যিকারের পরিচয়, তবে ওষুধের বদলে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতেন নিশ্চয়।

সাতদিন পর জ্ঞান হলো ত্রিস্তানের। কোথায় সেই সমুদ্রের কল্লোল, তার বদলে সে শুয়ে আছে দুধের ফেনার মতো নরম বিছানায়। মাথার কাছে এক পরমাসুন্দরী কুমারী। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ত্রিস্তান বুঝতে পারলো, সে এসেছে শত্রুপুরীতে। তাকে বাঁচতে হবে। ত্রিস্তানের শরীর দুর্বল, কিন্তু বুদ্ধি নষ্ট হয়নি। চট্ করে সে বানিয়ে গল্প বললো, সে একজন পর্যটক, স্পেনে যাচ্ছিল নক্ষত্রবিদ্যা শিখতে, জলদস্যুরা জাহাজ আক্রমণ করার পর অতিকষ্টে সে ছোট নৌকোয় চড়ে পালাতে চেয়েছিল।

ত্রিস্তানের মধুর গলার আওয়াজ শুনে রাজকুমারী তার কথা বিশ্বাস করলেন। সুন্দর মুখে সকালের আলোর মতো হাসি হেসে বললেন, আচ্ছা বিদেশী, তোমাকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেবো। কিন্তু তার বদলে তুমি কি দেবে আমায়?

ত্রিস্তান বললো, রাজকুমারী, আমি তো নিঃস্ব। আপনাকে প্রতিদান দেবার মতো আমার কিছুই নেই।

চাপা হাসির সঙ্গে রাজকুমারী বললেন, যতদিন প্রতিদান না দিতে পারো তুমি তবে এখানেই থাকো। তোমার যদি অন্য দেশ না থাকে, তুমি এদেশেই থেকে যাও না চিরকাল। রাজকুমারীর অপরূপ উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়েও ভয়ে ত্রিস্তানের বুক কাঁপতে লাগলো। তার সত্য পরিচয় শুনলে, এই সুন্দর মুখও এই মুহূর্তে ভয়ংকরভাবে বদলে যাবে। না, তার এখানে থাকা হবে না। এই মধুর হাতের সেবা ছেড়েই তাকে চলে যেতে হবে। তার নিজের মুখের আসল চেহারা ফিরে আসার আগেই। সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগেই চলাফেরা করার একটু ক্ষমতা যেই পেল ত্রিস্তান, ধরা পড়ার ভয়ে গোপনে পালিয়ে এলো সেখান থেকে। রাজকুমারী তখন ঘুমিয়ে, শেষবার ত্রিস্তান তাঁর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলো।

রাজা মার্কের রাজ্যে এখন নি[illegible] দেশ শত্রুমুক্ত, ত্রিস্তান ফিরে এসেছে। রাজা মুগ্ধ হয়ে ত্রিস্তানের বীণার বাজনা শোনেন।

কিন্তু হুজুর, আপনারা জানেন, দিনের আলোয় যখন সারা দুনিয়াটা ঝক্‌মক্ করে, তখনও মানুষের ছায়া পড়ে। জীবন কখনও সরল পথে চলতে জানে না! যতই আলো থাক্, তার মধ্যেও ছায়া থাকবে। রাজা মার্কের রাজ্যে সবাই ত্রিস্তানকে ভালোবাসে, শুধু চারজন নাইট ছাড়া। এই চারজনই রাজার

একটু একটু আত্মীয়, আগে ছিল রাজার প্রিয়পাত্র, এখন ত্রিস্তান এসে সে জায়গা কেড়ে নিয়েছে। সুতরাং ত্রিস্তানের ওপর ওদের ঈর্ষা হবে—এ তো মানুষেরই ধর্ম।

এ চারজন সারা রাজ্যে ফিসফিস গুজগুজ করে রটাতে লাগলো যে, ত্রিস্তান একজন যাদুকর। নইলে এ রকম অসম্ভব অলৌকিক ঘটনা একটা মানুষের জীবনে বারবার ঘটে কি করে? মোরহল্টের মতো অমন একজন দৈত্যের মতো বীরপুরুষকে মারলো সেটাই আশ্চর্যের কথা। তারপর ওরকম মুমূর্ষু অবস্থায় সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হলো—তবু বেঁচে ফিরে এলো কি করে! রাজার ছেলেপুলে নেই, শেষ পর্যন্ত ত্রিস্তানকেই হয়তো যুবরাজ করবেন। শেষ পর্যন্ত দেশটা চলে যাবে যাদুকরের হাতে। সে যুগের মানুষ মায়াবী বা যাদুকরের নাম শুনলেই ভয় পেতো! কত মেয়েকে ডাইনী মনে করে পুড়িয়ে মেরেছে আপনারা জানেন! হা কপাল, ডাইনীই যদি হবে, তবে সে পুড়ে মরবে কেন?

তখন তারা ধরে পড়লো রাজাকে বিয়ে করতে হবে। রাজার একটি বংশধর চাই। রাজা এ কথাতে কান দিতে চান না। অথচ সেই নাইট চারজন প্রত্যেকদিন রাজসভায় এসে এ-কথা বলতে লাগলো।

যেদিন ত্রিস্তান বুঝতে পারল ঐ নাইট চারজনের উদ্দেশ্য কি, তখনই লজ্জায় তার মরে যেতে ইচ্ছে হলো। ছি, ছি, তাকে এত নীচ ভাবে ওরা! সে কি নিজের রাজ্য ছেড়ে দিয়ে আসেনি? রাজা মার্ককে যে সে ভালোবাসে, সে কি রাজ্যের লোভে? তখন ত্রিস্তানও রাজাকে জোর করতে লাগলো বিয়ে করার জন্য। নইলে ত্রিস্তান রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। রাজ্যের লোকের সন্দেহের কারণ সে হতে চায় না।

রাজা মার্ক দেখলেন মহা মুশকিল। কিছুতে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ত্রিস্তান থাকতে তাঁর আর পুত্রের দরকার কি! কিন্তু হঠাৎ উপায় পেয়ে গেলেন। একদিন তিনি স্নান করছেন, এমন সময় জানলায় দুটো দোয়েল পাখি উড়ে এসে বসলো। তারপর ফুরুত করে উড়ে যাবার সময় মুখ থেকে একগাছি সোনালি চুল ফেলে গেল একটা পাখি। রাজা তুলে দেখলেন সাধারণ সোনালি চুল নয় ঠিক যেন সোনার পাতলা সুতো—সেই রকম রং, সেই রকম উজ্জ্বলতা, অথচ চুল যে তাও অবিশ্বাস করা যায় না।

রাজা সেই চুলটা এনে রাজসভায় বললেন, আমি বিয়ে করতে পারি একটি মাত্র মেয়েকে। সে কোথায় আছে আমি জানি না। কিন্তু এই তার মাথার চুল। একে তোমরা খুঁজে দিতে পার তো বিয়ে করবো! এমন মুচকি হাসলেন রাজা,

যার মানে, কেমন জব্দ করেছি তোমাদের! এরকম মেয়ে তো আর কোথাও পাবে না কেউ!

এ কথায় নাইটরা সবাই কালো মুখে ত্রিস্তানের দিকে তাকালো। সকলেই ভাবলো, এ নিশ্চয়ই ত্রিস্তানের কারসাজি। ত্রিস্তানই রাজাকে এই পরামর্শ দিয়েছে তাদের ঠকাবার জন্য।

সেই সোনালি চুলটা দেখে ত্রিস্তানের যেন অস্পষ্টভাবে একটা ছবি মনে মনে পড়লো। একটি প্রস্ফুটিত সুন্দর মুখ. দুটি হ্রদের মতো গভীর চোখ আর এক মাথা সোনালি চুল। তার শিয়রের পাশে বসেছিল। হ্যাঁ মনে আছে. সে যখন মাথা দুলিয়ে হেসেছিল, তখন ঝিলমিল সোনালি চুলের গুচ্ছ কেঁপে উঠেছিল শরৎকালে সোনাঝুরি গাছের মতন! স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ত্রিস্তানের সেই মুখ। সেই কন্যা তাকে তাঁর রাজ্যে থাকতে বলেছিলেন। তাঁর চাঁপার কলির মতো আঙুল বুলিয়েছিলেন ত্রিস্তানের কপালে।

ত্রিস্তান যেন ঘুম ভেঙে উঠে বললে, রাজা, আমি জানি কোথায় আছে সেই কন্যা। কিন্তু সে যে আমার পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর দেশ। আমি সেখানে গেলে বোধহয় প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবো না। তবু আমাকে যেতেই হবে। নইলে আপনার নাইটরা ভাববে, আমি আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সোনালি চুলের কথা বলেছি। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি এবারও যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি।

সঙ্কটের মধ্যে পড়ে রাজার শরীর কাঁপতে লাগলো। তাঁর মুখে ভাষা নেই। ত্রিস্তান নতজানু হয়ে রাজার সামনে বসে বললো, মহারাজ, যদি শেষ পর্যন্ত প্রাণ থাকে, আমি সেই রাজকন্যাকে জয় করে এনে আপনার হাতে সঁপে দেবো। এই আমার শপথ!

ত্রিস্তান একশোজন বাছা বাছা সৈন্য সঙ্গে নিয়ে একটা বিরাট জাহাজ সাজালো। সঙ্গে নিল প্রচুর খাদ্য ও মদ. মধু, রেশমী পোশাক, জরির কিংখাব। সৈন্যদের সাজালো ব্যবসায়ীর বেশে। তারপর জাহাজ ছেড়ে দিলো।

দুদিন যাবার পর সৈন্যরা জিগ্যেস করলো, প্রভু, আমরা কোন দেশে যাচ্ছি?

—আয়ার্ল্যান্ড! সোজা হোয়াইটহ্যাভেন বন্দরের দিকে জাহাজ চালাও।

—আয়ার্ল্যান্ড? সে কি? সৈন্যরা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ত্রিস্তানের কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই সেদিন মোরহল্টকে হত্যা করার পর আয়ার্ল্যান্ডের সৈন্যরা অপমানে ফিরে গেছে। এখন ত্রিস্তানকে হাতে পেলে ওরা ছিঁড়ে ফেলবে না? তাও ত্রিস্তান যাচ্ছে মাত্র একশোজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে।

—ভয় কি, আমরা তো যাচ্ছি ছদ্মবেশে! বুকে যদি সাহস থাকে কেউ ছদ্মবেশ ছিঁড়তে পারবে না।

আয়ার্ল্যান্ডের বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়লো। সবাই জানলো দূর দেশ থেকে একটা বাণিজ্য জাহাজ এসেছে। অবশ্য এ জাহাজের বণিকরা একটু অদ্ভুত ধরনের। ব্যবসায়ে বিশেষ মন নেই, দিনরাত তাশ পাশা খেলে কাটায়। দিন কাটাতে লাগলো, ত্রিস্তান রাজবাড়িতে যাবার কোনো সুযোগ পেল না। কিছুটা অভিমান ও ঝোঁকের মাথায় সে চলে এসেছে, কিন্তু জানে না কি করে শত্রুপুরীর রাজকন্যাকে জয় করবে। কোনো উপায় সে ভেবে পায় না।

হঠাৎ এক সকালে সুযোগ এলো। ভোরবেলা ত্রিস্তান বন্দরের পাড় দিয়ে হাঁটছে, হঠাৎ পালাও পালাও রব উঠলো। লোকজন ছুটে পালাতে লাগলো, একজন অশ্বারোহী ভীত মুখে পালিয়ে গেল ঝড়ের বেগে। ত্রিস্তান একজন পলায়মানা রমণীর হাত চেপে ধরে বললো, কি ব্যাপার, পালাচ্ছেন কেন? কি হয়েছে?

রমণী কাতরস্বরে বললো, আমায় ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি।

—কেন পালাচ্ছেন, না বললে কিছুতেই ছাড়বো না।

—তুমি জানো না? ড্রাগন এসেছে। রোজ এসে শহর থেকে একটা করে মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে খায়। আজ একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

—ঠিক আছে, ভয় নেই। আমি যাচ্ছি ওটাকে আটকাতে।

—খবরদার, ওরকম মুর্খোমি করো না। তুমি পাগল নাকি!

—কেন, ওকে মারা কি মানুষের পক্ষে অসম্ভব?

—তা জানি না, তবে এটুকু জানি কুড়িজন নাইট ওকে মারতে গিয়ে নিজেরাই মরে গেছেন। এদেশের রাজা ঘোষণা করেছেন, যে ওটাকে মারতে পারবে, তার সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে দেবেন।

একথা শুনে ত্রিস্তান হাসলো। হারলে মৃত্যু জিতলে রাজকুমারী। এই তো সে চেয়েছিল! তারপর জাহাজে ফিরে বর্মে সজ্জিত হয়ে আবার বেরিয়ে এলো। সব লোক যেদিক থেকে ছুটে পালাচ্ছে ত্রিস্তান একা এগিয়ে গেল সেদিকে সাদা ঘোড়ায় চড়ে। তার তরুণ মুখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই। একটু পরে ত্রিস্তান জানোয়ারটাকে দেখতে পেল। মুখটা শুয়োরের মতো, জ্বলন্ত কাঠকয়লার মতো দুটো চোখ, সিংহের মতো থাবা, কিন্তু শরীরটা কুমীরের। এই সেই ভয়ংকর ড্রাগন। ত্রিস্তান সোজা ঘোড়া চালিয়ে গিয়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো ওকে। ঠক্ করে লেগে বর্শাটা ভেঙে গেল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে

গেল ঘোড়াটা। ত্রিস্তান তখন খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়ালো। ড্রাগনটা এগিয়ে আসতেই ত্রিস্তান তলোয়ার চালালো, কিন্তু ঠং করে শব্দ হলো শুধু, একটুও আঘাত লাগল না ওর। ড্রাগনটা থাবা মেরে ত্রিস্তানের বর্ম ধরে টান মারতেই, বর্মটা সামনের দিকে খানিকটা ভেঙে গেল। ত্রিস্তানের বুক তখন উন্মুক্ত। এবার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তলোয়ার চালালো ত্রিস্তান, কিন্তু বৃথাই, জন্তুটার শরীর যেন ইস্পাতের তৈরী। জন্তুটা নাক দিয়ে এমন আগুনের হাল্‌কা ছাড়লো যে বুকের কাছটা সম্পূর্ণ ঝলসে গেল ত্রিস্তানের। ত্রিস্তান বুঝলো সে আর দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু মরার আগে প্রতিশোধ নিয়ে যাবে না? আর এক পা সামনে এগিয়ে এলো ত্রিস্তান। ড্রাগনটা এবার হাঁ করে ওকে গিলতে এলে, ত্রিস্তান সোজা তলোয়ার চালিয়ে দিল ওর মুখের মধ্যে। সেই এক আঘাতেই জন্তুটার হৃদ্‌পিণ্ড চিরে গেল। বিকট চিৎকার করে পড়ে গেল জন্তুটা। ত্রিস্তানও তখন টলছে। নিচু হয়ে ওটার জিভটা কেটে নিয়ে নিজের মোজার মধ্যে রাখলো। তারপর কয়েক পা এগিয়ে আসতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ত্রিস্তান। গড়াতে গড়াতে নিচের ঝোপে গিয়ে আটকালো। জন্তুটার বিষ নিঃশ্বাসে ত্রিস্তানের বুক পুড়ে গেছে।

প্রথমেই ত্রিস্তান ঝড়ের বেগে যে অশ্বারোহীকে পালাতে দেখেছিল, সে হচ্ছে লাল-চুলো নাইট। তার মাথার চুল লাল বলে লোকে তাকে লাল-চুলো বলে। লোকটা নাইট হলেও, ভীতুর ডিম আর লোভী। রাজকুমারীকে বিয়ে করার খুব ইচ্ছে ওর, রোজই একবার ড্রাগনটাকে মারার জন্য সেজেগুজে আসে, তারপর ড্রাগনটার প্রথম ডাক শুনেই পালিয়ে যায়। আবার পরের দিন আসে। ভালোবাসার এমনই টান যে কাপুরুষকেও দুঃসাহসী হতে লোভ দেখায়! সেদিন হঠাৎ কি হলো, প্রথমবার পালিয়ে যাবার পর লাল-চুলোর মনে অনুতাপ এলো। রোজই এরকম পালিয়ে যাওয়া? নাঃ, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্, হয় ড্রাগন মরুক নয় আমি মরি।

লাল-চুলো ফিরে এসে দেখে ড্রাগনটা মরে পড়ে আছে, আশেপাশে আর কেউ নেই। তখন আনন্দে সে একা একাই একটু নেচে নিলো! সে ভাবলো, ভাগবানই বুঝি তার হয়ে ড্রাগনটাকে মেরেছেন! লাল-চুলো তখন তাড়াতাড়ি এসে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে ড্রাগনটার মাথা কেটে ফেললো, তারপর সেই ছিন্নমুণ্ড হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে রাজার কাছে গিয়ে বললো, কই মহারাজ, এবার রাজকুমারীকে ডাকুন!

আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজকুমারীর নাম সোনালি চুল ইসল্ট। অনেকে তাঁকে ডাকে

সোনালি চুল বলে, অনেকে ডাকে শুধু সোনালি। রাজকন্যা সোনালি যখন শুনলেন ঐ ভীতুর ডিম লাল-চুলো নাইটই ড্রাগনকে মেরেছে এবং সে-ই তাকে বিয়ে করবে—তখন তিনি হাসতে হাসতে আর বাঁচেন না। তারপর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে হাসতে হাসতেই কাঁদতে লাগলেন। ঐ লাল-চুলো মেরেছে ঐ ড্রাগন। সূর্য তো পশ্চিম দিকে ওঠেনি। পাখিরা তো বোবা হয়ে যায়নি। সমুদ্র তো নিস্তব্ধ হয়নি হঠাৎ, তবু এই অসম্ভব কাণ্ড হলো কি করে? নিশ্চয়ই কোনো জোচ্চুরি আছে! রাজকন্যা ঠিক করলেন, সখীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি গোপনে মরা ড্রাগনটা দেখে আসবেন।

ড্রাগনের পাশে একটা ঘোড়া মরে আছে। ঘোড়ার এরকম সাজ-পোশাক তো এ দেশের নয়। রাজকন্যা বুঝলেন, কোনো বিদেশী এসে ড্রাগনটা মেরেছে, কিন্তু কোথায় সে বিদেশী? সে কি এখনও বেঁচে আছে! সখীরা খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। শেষে প্রিয়সখী বিরজা দেখতে পেল, দূরে ঝোপের মধ্যে কার শিরস্ত্রাণ চকচক্ করছে! ছুটে গেলেন সবাই। তখন জ্ঞান নেই ত্রিস্তানের, কিন্তু অল্প অল্প নিশ্বাস পড়ছে। ধরাধরি করে গোপনে ত্রিস্তানকে নিয়ে আসা হলো রাজপুরীর মধ্যে। সোনালি তাঁর মাকে শুধু বললেন সব কথা, দেখালেন সেই বীরপুরুষের অজ্ঞান দেহ। ওর মা তাড়াতাড়ি ওষুধ লাগাবার জন্য, ত্রিস্তানের পোশাক খুলতে গিয়ে জুতোর মধ্যে দেখতে পেলেন সেই ড্রাগনের জিভ। মা আর মেয়ে চোখাচোখি তাকালেন। তারপর খুব তেজী ওষুধে অল্প সময়েই জ্ঞান ফেরালেন ত্রিস্তানের।

চোখ মেলতেই রানী বললেন, বিদেশী, তুমি কে জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝেছি, তুমিই ড্রাগনকে হত্যা করেছো। এদিকে লাল-চুলো নামে একজন নাইট দাবী করছে সে-ই মেরেছে ড্রাগনটাকে। তুমিই আমার মেয়ের যোগ্য স্বামী, তোমার সঙ্গেই ওকে মানাবে। ঐ কাপুরুষটার সঙ্গে নয়! এমন সোনার প্রতিমা আমার মেয়ে, তার সঙ্গে কি ঐ বাঁদরটাকে মানায়! তুমি দুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে ওর সঙ্গে লড়াই করে ওকে হারাতে পারবে? তোমাকে পারতেই হবে। তোমাকে যে আমার খুব পছন্দ হয়েছে!

প্রভুগণ, দেখুন, ঈশ্বরের কি কৌতুক। রানী এক পলক দেখেই ত্রিস্তানকে পছন্দ করে ফেললেন। অথচ ওই রানীই ত্রিস্তানের মৃত্যুসংবাদ শুনলে নিজের গলার মুক্তামালা দেবেন, ঘোষণা করেছেন!

ত্রিস্তান বললো, দেবী আপনি ওষুধ দিয়ে আমার গায়ে জোর ফিরিয়ে আনুন! আমি ড্রাগনকে মেরে রাজকুমারী সোনালিকে জয় করেছি, ঐ নাইটকে

হারিয়েও আর একবার জয় করতে পারবো !

রাজপুরীর মধ্যে গোপনে ত্রিস্তানের সেবা করছেন রাজকন্যা সোনালি নিজে ! পরদিন সকালে ত্রিস্তানকে স্নান করিয়ে ক্ষতের জায়গায় মলম লাগাতে এসেছেন রাজকুমারী। ত্রিস্তান তখনও ঘুমিয়ে। ত্রিস্তানের তেজস্বী সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজকুমারী একটা আদরের দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই মুখ যেন অল্প অল্প চেনা লাগছে। হয়তো, পূর্ব জন্মে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল ! ইস্, এর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি লাল-চুলোর সঙ্গে বিয়ে হত ? লজ্জায় আত্মহত্যা করতে হত তা হলে। এই বিদেশী আমাকে বাঁচিয়েছে। কালকে এর পক্ষে লাল-চুলোকে হারানো তো কিছুই না !

ঘুম ভেঙে ত্রিস্তান দেখলো সোনালিকে। একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মনে মনে ভাবলো, সোনালি চুল রাজকন্যাকে তাহলে আমি সত্যিই খুঁজে পেলাম। এই ভেবে ত্রিস্তান একটু হাসলো। সেই হাসি কেমন যেন অদ্ভুত, রাজকন্যা দেখে চমকে উঠলেন। ওরকম ভাবে হাসলো কেন বিদেশী ? আমার কি কিছু ভুল হয়েছে ? আমার পোশাক অগোছালো না তো ! তবে, ওরকম ভাবে হাসলো কেন ? কি জানি !

রাজকুমারী তখন ত্রিস্তানের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য বার করলেন। আহা, কি সুন্দর শিরস্ত্রাণ, ওব মতো বীরেরই যোগ্য। কি বিশাল তলোয়ার ! এই তলোয়ার দিয়ে ড্রাগনকে মেরেছে, কাল লাল-চুলোকেও মারবে। একি, তলোয়ারের ডগাটা ভাঙা কেন ? ড্রাগনকে মারতে গিয়ে ভাঙলো ! ভাঙা তলোয়ার দেখে সোনালির কি রকম যেন অস্বস্তি লাগলো। যতখানি ভাঙা, সে রকম একটা টুকরো যেন তিনি কোথায় দেখেছেন। কোথায় ? ও ! শঙ্কায় সোনালির বুক দুলে উঠলো। তাঁর মামা মোরহল্টের মাথার খুলির মধ্যে তো এই রকম একটা টুকরো ঢুকে ছিল। হে ভগবান, যেন তা না হয় ! তাড়াতাড়ি গিয়ে হাতির দাঁতের বাক্স খুলে টুকরোটা বার করে আনলেন। জোড়ে জোড় মিলে গেল। ওঃ ! এই বিদেশীই তবে লিওনেসের ত্রিস্তান ! মোরহল্টকে খুন করেছে এই লোকটাই ! হায়, আমার ভাগ্য !

রাগে রাজকুমারী তলোয়ার হাতে ছুটে এলেন ত্রিস্তানকে খুন করার জন্যে। ত্রিস্তান তখন স্নান করছে, জলভর্তি বড় গামলার মধ্যে শুয়ে, দুর্বল, অসহায় নিরস্ত্র ত্রিস্তান। তলোয়ার উঁচিয়ে ক্রোধে কঠিন গলায় ত্রিস্তানকে বললেন রাজকুমারী, শয়তান, তুমিই মোরহল্টের হত্যাকারী ? সত্যি করে বলো, তুমিই কি লিওনেসের ত্রিস্তান ? তাহলে এবার মৃত্যুর জন্য তৈরী হও।

ত্রিস্তানের পালাবার উপায় নেই। সে শুয়ে থেকে মৃদু হেসে বললো, রাজকুমারী, তোমার হাতে মরবো, তাতে আমার দুঃখ কি। এ জীবন তো তোমারই। মরার আগে একটা কথা বলবো। আমার জীবন তুমিই দু'বার বাঁচিয়েছো! মনে আছে সেই মুমূর্ষু বীণাবাদকের কথা? জেলেরা তোমার কাছে এনেছিল? সে আমি। তখনও তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছো। এবারও ড্রাগনকে হত্যা করার পর আমি ঝোপের মধ্যে পড়েছিলাম, আমার বাঁচার কথা ছিল না—তুমিই তুলে এনে আমাকে বাঁচালে, এখন একবার হত্যা করবে, এ আর বেশী কথা কী। আমাকে হত্যা করলেও আমি তোমার কাছে ঋণী থেকে যাবো।

রাজকুমারী বললেন, প্রথমবারই যদি জানতুম তোমার সত্যিকার পরিচয় তখনই তোমাকে মেরে ফেলতাম!

—তার বদলে এখন মারো! এরপর লাল-চুলো নাইটকে বিয়ে করে সুখে থাকবে তুমি। একবারও তোমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়বে না এ কথা ভেবে যে একজন বিদেশী তোমাকে পাবার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তারপর অসহায় অবস্থায় পেয়ে স্নানের ঘরে তুমি তাকে হত্যা করেছো।

—এ সব কি অসম্ভব কথা? তুমি মোরহল্টকে হত্যা করেছো—এ দেশ তোমার শত্রুর দেশ। আর তুমিই এসেছো এ দেশের রাজকন্যাকে পেতে। বুঝেছি, মোরহল্ট গিয়েছিল তোমাদের দেশ থেকে ক্রীতদাসী আনতে, তার বদলে তুমি এসেছো এ দেশের রাজকন্যাকে ক্রীতদাসী করে নিয়ে যেতে।

রাজকুমারী, না, না, ও কথা ভেবো না। একদিন একটা দোয়েল পাখি মুখে করে এনেছিল একগাছি সোনালি চুল। তা দেখে আমার মনে পড়েছিল তোমার কথা। তাই তোমাকে পাবার জন্য আমি জীবন তুচ্ছ করে এসেছি এ দেশে। দেখো, আমার জামার সঙ্গে সেই সোনালি চুলটা সেলাই করা আছে। তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আর বেঁচে ফিরতে চাই না!

তলোয়ার হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপতে রাজকুমারী। এই লোকটাই হত্যা করেছে তাঁর মায়ের একমাত্র ভাইকে। এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরকে। ওকে মারতে তাঁর হাত কাঁপছে কেন? কেনই বা গলা রুদ্ধ হয়ে আসছে, ডাকতে পারছেন না প্রহরীদের?

ত্রিস্তান আবার বললো, দ্বিধা করছো কেন, রাজকুমারী? আমাকে মারো, আমি বুক পেতে দিয়েছি। আমি তোমার হাতেই মরতে চাই। পরের জন্মে আমি আবার আসবো তোমার কাছে, তোমাকে জয় করতে। সেবারও হয়তো আমি মরবো তোমার হাতে। তখনও হয়তো তোমার রাগ যাবে না। কিন্তু

আমি বারবার জন্মজন্মান্তরে ঘুরে আসবো তোমাকে জয় করতে। আমি তোমাকে চাই।

তলোয়ার ফেলে দিয়ে সোনালি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এই বিদেশী এসেছে তাঁকেই ভালোবেসে, একে কি করে খুন করবেন নিজের হাতে।

—কেন এলে নিষ্ঠুর বিদেশী, কেন এলে এই দেশে? কেন আমাকে এই দ্বিধার মধ্যে ফেললে!

—রাজকুমারী, আমি এসেছি শুধু তোমারই জন্য, আমি আমার নিজের জীবনের কথাও ভুলে গেছি। তুমি অথবা মৃত্যু, এই দুজনের একজন এসো আমার কাছে।

রাজকুমারী আর স্থির থাকতে পারলেন না। এ রকম কথা তিনি কখনও শোনেননি। সোনালি এগিয়ে এসে দুর্বল ত্রিস্তানের ওষ্ঠ চুম্বন করে বললেন, আমি হেরে গেলাম। আজ থেকে তুমি আমার চিরদিনের বন্ধু, তুমি আর কখনও আমার ওপর নিষ্ঠুর হয়ো না! ত্রিস্তান তখন আবার সেই আগের মতো অদ্ভুতভাবে হাসলো। তার গৌরবর্ণ মুখে সেই হাসিটুকু যেন অন্ধকারের মতো দেখালো। রাজকুমারী এবারও তার মানে বুঝতে পারলেন না।

রানী ও রাজকন্যা রাজাকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন। ত্রিস্তানেব পরিচয়, তার বীরত্বের কথা। রাজা প্রথমে খুব রেগে উঠলেন সে-ই মোরহল্টের হত্যাকারী শুনে। তারপর বুঝলেন, ত্রিস্তান ন্যায় যুদ্ধেই মোরহল্টকে হারিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ত্রিস্তানকে ক্ষমা করলেন তিনি।

লাল-চুলো নাইট ত্রিস্তানের পরিচয় শুনে ভয়ে আর লড়াই করতে চাইলো না। রাজা তাকে জেলে পুরলেন। ঠিক হলো কয়েকদিন পর ত্রিস্তানের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হবে।

বিরাট জমকালো রাজসভায় ত্রিস্তান ও সোনালীকে পাশে নিয়ে রাজা ঘোষণা করলেন বিবাহের কথা। ত্রিস্তান ছাড়া কেউ ড্রাগনকে হত্যা করতে সাহস পায়নি—সে-ই রাজকন্যার যোগ্য অধিকারী। রাজসভায় ত্রিস্তানের সেই একশোজন সৈন্য ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ রাজার কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে ত্রিস্তান বললো, মহারাজ, আমি ড্রাগনকে হত্যা করেছি। এবং আপনার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আমি রাজকন্যাকে আমার জাহাজে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমার অন্য একটা প্রস্তাব আছে। আমি এসেছি কর্নওয়ালের রাজা মার্কের অনুচর হিসেবে। মহারাজ, আমি কেউ নই। আমি রাজা মার্কের ভৃত্য মাত্র। রাজকুমারীকে আমি বিয়ে করবো না, ওঁকে বিয়ে করবেন রাজা

মার্ক। তার ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে কর্নওয়ালের চিরকালের বিবাদ মিটে যাবে। সমস্ত কর্নওয়ালের লোক রাজকুমারী সোনালির অনুগত হবে তাদের রানী হিসাবে।

একথা শুনে কেউ আশ্চর্য হলো না। হায়, পদমর্যাদার প্রতি মানুষের এমন ভক্তি! সবাই ভাবলো, এদেশের রাজকন্যার সঙ্গে ওদেশের রাজার বিয়ে হবে, সেই তো স্বাভাবিক! ত্রিস্তান! আবার কে? সে তো ভৃত্য মাত্র। সবাই আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। রাজা এ প্রস্তাবে আন্তরিক ভাবে খুশী হলেন।

রাজা ত্রিস্তানের হাতের ওপর রাজকন্যার হাত রেখে বললেন, ত্রিস্তান, তুমি রাজা মার্কে'র প্রতিনিধি হিসাবে আমার মেয়েকে গ্রহণ করলে। এখন প্রতিজ্ঞা করো, তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বস্তভাবে একে স্বামীর কাছে পেঁাছে দেবে?

রাজকুমারী সোনালি তখন লজ্জায়, অপমানে, রাগে থরথর করে কাঁপছেন। এই ছিল লোকটার মনে? ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর! সোনালি চুলের কথা, ভালোবাসার কথা সব মিথ্যে। নিজে জয় করে এখন অবহেলায় দিয়ে দিচ্ছে অন্যকে! নিজের হাতে সে তাঁকে অন্যের হাতে তুলে দেবে! ওঃ, এর আগে তাঁর মৃত্যু হলো না কেন? বিশ্বাসঘাতক ত্রিস্তান! ও লোকটার হৃদয় নেই। রাজকন্যা সভার মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন!

ত্রিস্তান রাজার সামনে প্রতিজ্ঞা করলো।

যেদিন জাহাজে ত্রিস্তান রাজকুমারীকে নিয়ে যাবে, সেদিন রানী তাঁর মেয়ে সোনালিকে সাজিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ অচেনা অজানা দেশে তুই যাবি, তোর সখী বিরজাও তোর সঙ্গে যাক্। যাক্ আরও দাস-দাসী। তাহলে তোর একা একা লাগবে না। ভয় করবে না। সোনালি বললেন, মা, আমাকে তোমরা পাঠাচ্ছো শত্রুর দেশে। আমি আর ক'দিন সেখানে বাঁচবো? আমার কিছু দরকার নেই। রানী বললেন, আমার চোখে জল আসছে, কিন্তু তবু আমি কাঁদবো না। ওরা যে তোকে জয় করে নিয়েছে!

তারপর রানী বিরজাকে আলাদা ডেকে বললেন, বিরজা, তোর ওপরেই ভার দিলুম ওকে দেখাশোনা করার। তুই ছেলেবেলা থেকে ওর সঙ্গে আছিস। তোকে ছাড়া ও বাঁচবে না। আর এই নে এই কলসীটা। এটা খুব গোপনে রাখবি। খুব সাবধান। এতে আছে মন্ত্রপূত আরক। বিয়ের দিন এই আরক তুই রাজা মার্ক আর সোনালিকে দিবি। দুজন নারী পুরুষ যদি পাশাপাশি বসে এই

আরক খায়, তবে তারা সারাজীবন পরস্পরকে ভালবাসবে। ওদের ভালোবাসা আর মৃত্যু এক সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। দুজনের প্রত্যেক মুহূর্ত, প্রত্যেক নিশ্বাস মিলে যাবে এক ভালোবাসায়, এক মৃত্যুতে। দেখিস, খুব সাবধান। সাবধানে লুকিয়ে রাখিস কলসীটা।

আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক চোখের জলে বিদায় দিল ওদের। জাহাজ সমুদ্রে ভাসলো। অকূল সমুদ্র, এ জাহাজ চলেছে কোন অচেনা দেশে, এ কথা ভেবে রাজকুমারী বিরজার সঙ্গে বসে কাঁদেন। ত্রিস্তানকে তিনি দু' চোখে দেখতে পারেন না। ত্রিস্তান কাছে এলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। এই লোকটা তার জীবনে এলো কোন শনিগ্রহ হয়ে! এ খুন করলো মোরহল্টকে, বাবা মায়ের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে এনে এখন তুলে দেবে কোন অচেনা লোকের হাতে! অথচ, এই লোককেই তিনি দু' দু'বার বাঁচিয়েছেন! সমুদ্র, তুমি এ পাপ সহ্য করছো? ঝড় তুলে বরং তুমি আমায় ডুবিয়ে মারো! এ অপমান আমার আর সহ্য হয় না!

একদিন সমুদ্রে একটুও হাওয়া নেই। পাল তোলা জাহাজ হাওয়া ছাড়া চলে না। জাহাজের সব সৈন্যরা কাছাকাছি একটা দ্বীপে নেমে গেল বনভোজন করতে। রাজকুমারী কিছুতেই যাবেন না। সৈন্যরা তখন অনেক অনুনয় করে বিরজাকে টেনে নিয়ে গেল। ত্রিস্তান একা রইলো সোনালিকে পাহারা দিতে।

ত্রিস্তান কাছে এসে বললো, রাজকুমারী, আমার ওপর রাগ করো না।

সোনালি বললেন, তুমি দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে! নইলে আমি জলে ঝাঁপ দেবো!

ত্রিস্তান দূরে সরে গেল। দাঁড়িয়ে রইলো একা।

ত্রিস্তান একা জাহাজের রেলিং-এ ভর দিয়ে ভাবে, রাজকুমারী কেন তাকে ভুল বুঝলো? সে যা কিছু করেছে, সবই তো কর্তব্যের জন্য। রাজার কাছে শপথ রক্ষার জন্য! কিন্তু তার নিজের মনও ঠিক মানতে চায় না। বাইরে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুক টনটন করে ওঠে। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় রাজকুমারীর দিকে। তার বড় ইচ্ছে করে, রাজকুমারী সোনালির পাশে গিয়ে বসতে, তার সুন্দর মুখ থেকে দু' একটা কথা শুনতে। যত সামান্য কথাই হোক না।

ঐ যে ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটা বাহুতে মুখ ডুবিয়ে বসে আছে, ছড়িয়ে পড়েছে একমাথা সোনার রেশমের মতো চুল—ওর ওই শরীরে কি মায়া লুকানো

আছে—যা তাকে টানছে বারবার। অন্য কোনো কাজে তার মন নেই—এই নির্জন জাহাজে ত্রিস্তানের সমস্ত মনপ্রাণ ঐ মেয়েটির দিকে। অথচ ওর কাছে যেতে পারছে না।

ত্রিস্তান এতদিন কোনো মেয়ের সংস্পর্শে আসেনি। মেয়েদের কথা কখনও তার তেমন করে মনেই পড়েনি। সোনালিই একমাত্র মেয়ে—অসুস্থ অবস্থায় ত্রিস্তান যার স্পর্শ পেয়েছে। ত্রিস্তান সারা শরীর দিয়ে অনুভব করতে লাগলো সেই স্পর্শ। এককম অনুভব তার জীবনে আগে কখনও হয়নি। একা দাঁড়িয়ে ত্রিস্তান ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। অতবড় বীরপুরুষ সে, কিন্তু রাজকুমারীর কাছে যেতে আজ তার ভয় হচ্ছে। জোর করে কাছে গেলে কি যেন একটা ভেঙে যাবে। কি যেন একটা সে সারাজীবনের মতো হারাবে। মেয়েদের সম্পর্কে তার তেমন কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তবু কেমন করে যেন জেনে গেছে—জোর করে মেয়েদের কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যায় না।

প্রভুগণ, আপনারা বুঝতে পারছেন ত্রিস্তানের অবস্থা? এতদিন তার শরীর বৃদ্ধি পেলেও সে ছিল বালক। বালক স্বভাবের লোকেরাই যুদ্ধবিগ্রহ বেশী ভালোবাসে। এতদিনে, আজ ত্রিস্তান পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, সে কোনো যুদ্ধেই জেতেনি। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে এখনও পায়নি।

খানিকক্ষণ পর রাজকুমারী চেঁচিয়ে উঠলেন, ওঃ, আমার তেষ্টা পেয়েছে। কেউ আমাকে একটু শরবত বা সুরা দিতে পারে না! কেউ নেই এখানে?

জাহাজে আর কেউ নেই, ত্রিস্তান ছুটে এসে বললো, আমি দিচ্ছি! বিষম ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে ত্রিস্তান কিছুই পায় না। হঠাৎ চোখে পড়লো বিরজার সেই লুকানো কলসী। কি চমৎকার টলটলে আঙুরের মদ তার মধ্যে। একটা বড় গেলাসে ঢেলে রাজকুমারীকে দিল। সোনালি প্রথমে ইতস্তত করতে লাগলেন। এই অকৃতজ্ঞ, বিবেকহীন লোকটার হাত থেকে নিয়ে তিনি পান করবেন? না। সোনালি মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

ত্রিস্তান অনুনয় করে বললো, রাজকুমারী আমায় ক্ষমা করো। আমি সামান্য ভৃত্য, আমার হাত থেকে পান করতেও তোমার ঘৃণা?

তৃষ্ণায় রাজকুমারীর বুক ছট্‌ফট্‌ করছে। ত্রিস্তানের দিকে না তাকিয়ে অবহেলাভরে গ্লাসটা নিলেন। এক চুমুকে অনেকটা খেয়ে গেলাসটা ফিরিয়ে দিতেই ত্রিস্তান নিজে বাকিটুকু খেয়ে ফেললো। তারপর দুজনে সম্পূর্ণভাবে তাকালো দুজনের দিকে।

তারা কি পান করলো। এ তো সুরা নয়, এ যে তীব্র কামনা আর আনন্দ এ যে অন্তহীন আকর্ষণ আর ছট্‌ফটানি! এ যে মৃত্যু!

সখী বিরজা ফিরে এসে দেখে, নিঃশব্দ দুটি পাথরের মূর্তির মতো ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে বসে আছে। যেন জোর করে ওদের কেউ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার নজর পড়লো সেই শূন্য কলসীর দিকে। হায় হায় করে উঠলো বিরজা। একি, এর আগে কেন আমার মরণ হলো না! এ আমি কি পাপ করলুম! সখী সোনালি, হতভাগ্য ত্রিস্তান, এ তোমরা কি কাজ করেছো! বিশ্বাসঘাতকতা! এ যে সর্বনেশে ভালোবাসা, এ যে মৃত্যু!

জাহাজ আবার চললো, কিন্তু ত্রিস্তান এখন অন্য মানুষ। ত্রিস্তানের মনে হলো, তার রক্তের মধ্যে যেন শিকড় ফুটিয়েছে একটা ফুলগাছ, তার তীব্রগন্ধ-ফুল ফুটে উঠেছে তার শরীরে। এক মুহূর্ত তার স্বস্তি নেই, বারবার ছুটে যেতে ইচ্ছে আর একটা ফুলগাছের কাছে। যে ফুলগাছ রয়েছে সোনালির শরীরে। ত্রিস্তান আর্তকণ্ঠে গুমরে উঠলো, ঠিকই বলেছিল সেই চারজন নাইট। আমি বিশ্বাসঘাতক! রাজা মার্ক তুমি অসহায় অবস্থায় আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে, আজ আমি তোমার বিশ্বাসঘাতক! রাজা, সোনালি তো তোমারই, আমি তোমার অনুচর মাত্র। সোনালি তোমারই, আমি তোমার পুত্রতুল্য। সোনালি তোমার, সে আমাকে ভালোবাসবে কেন!

কিন্তু কোথায় গেল সোনালির ঘৃণা! তার সমস্ত রক্তে ত্রিস্তানের নাম! এ নাম যেন একটা নতুন সুর। সমুদ্র এই নাম বলে, বাতাস এই নাম বলে, সোনালির রক্ত এই নাম বলে। দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ তুমি ত্রিস্তান, তুমিই আমার সুখ।

বিরজা দূর থেকে ওদের দুজনকে লক্ষ্য করে অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলো।

দুদিন ত্রিস্তান বসে রইল নিজের ঘরে। তৃতীয় দিন আর পারলো না, এগিয়ে এলো সোনালির দিকে। সোনালি মাটিতে বসে ছিলেন, ত্রিস্তানকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এসো ত্রিস্তান, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি কেন আমাকে একা ফেলে রেখে কষ্ট দিচ্ছো?

—না, না, তুমি রানী, তুমি অমন করে আমাকে ডেকো না! তুমি আমাদের প্রভুপত্নী, আমি তোমাদের অনুচর মাত্র।

—আমি আর কিছুই জানি না ত্রিস্তান, তুমিই আমার প্রভু, আমি তোমার দাসী। ওঃ মুমূর্ষু বীণাবাদক হয়ে যেদিন এসেছিলে, সেদিন তোমার ক্ষতস্থানে কেন আমি ওষুধের বদলে বিষ দিইনি! ড্রাগনকে মারার পর যখন ঝোপের মধ্যে

পড়েছিলে—কেন আমি তুলে এনেছিলাম ! এখন যে আমার উপায় নেই ! আমি যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি !

—কিসের যন্ত্রণা তোমার রানী ?

—জানি না। জানি না। আকাশ আমায় যন্ত্রণা দিচ্ছে। সমুদ্র আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমার শরীর, আমার জীবন আমাকে যন্ত্রণায় পুড়িয়ে মারছে।

সোনালি কাছে এগিয়ে ত্রিস্তানের দুই কাঁধে হাত রাখলেন। তাঁর শরীর, তাঁর চোখ, ওষ্ঠ থরথর করে কাঁপছে। ত্রিস্তান আবার জিগ্যেস করলো মৃদু স্বরে, কি তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, রানী ?

—তুমি ! তুমি ! আমার ভালোবাসা ! তুমি আমাকে বাঁচাও !

ত্রিস্তান সোনালির ওষ্ঠে ওষ্ঠ ছোঁয়ালো। দুজনে গভীরভাবে তাকালো দুজনের দিকে। তারপর পূর্ণ আলিঙ্গন করে দুজনে ডুবিয়ে দিল দুজনের ওষ্ঠাধর।

বিরজা হাত বাড়িয়ে ছুটে এসে বললো, থামো, থামো, এখনও থামো। এ কোন সর্বনাশের পথে চলেছো, আর যে ফিরতে পারবে না। এ ভালোবাসা যে তোমাদের দুঃখ দিয়ে মারবে ! ত্রিস্তান এখনও সরে যাও, অনেক দুঃখ সইতে হবে তোমায়।

ত্রিস্তান ম্লান হেসে বললো, দুঃখে আমার ভয় নেই ! আমার নাম দুঃখ, আমার জন্ম দুঃখের দিনে, দুঃখকে আমার ভয় নেই।

—কিন্তু এ দুঃখ যে তোমাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে !

—তবে আসুক মৃত্যু !

একথা বলে ত্রিস্তান সোনালিকে আবার চুম্বন করলো। তারপর মাটিতে বসে পড়ে সোনালির পায়ে চুমু খেলো। সোনালি দ্রুত পা সরিয়ে নিয়ে, ত্রিস্তানের করতলে তাঁর চম্পক বর্ণ মুখখানি ঢাকলেন। ত্রিস্তানের শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, আমি জানতাম, তুমি আমার নিয়তি ! পাশেই সোনালির বিছানা। সেদিকে তাকিয়ে ত্রিস্তান সোনালিকে বললো, এসো ! সোনালি নিজেই হাত ধরে ত্রিস্তানকে নিয়ে এলেন বিছানায়। তারপর দৃঢ়ভাবে ত্রিস্তানকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমরা দুজনে দুজনের জন্য মরবো। এসো আমরা আজ সেই মৃত্যুকে ভোগ করি।

সমুদ্র পাড়ে রাজা মার্ক এসেছেন রানীকে অভ্যর্থনা জানাতে। পাশে নগরসুদ্ধ লোক। ত্রিস্তান রাজকন্যার হাত ধরে জাহাজ থেকে নামলো। তারপর সেই হাত সঁপে দিল রাজার হাতে। রাজা মার্ক বললেন, ধন্য সেই দোয়েল পাখি, যে আমাকে তোমার সোনালি চুল এনে দিয়েছিল। সেই চুল দেখে আমি তোমার সৌন্দর্য কল্পনা করেছিলুম। কিন্তু আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছো তুমি। আর ত্রিস্তান, তুমিও ধন্য। ধন্য তোমার সাহস আর বীরত্ব!

নগরবাসীরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। মহাসমারোহে রাজকুমারীকে নিয়ে আসা হলো টিণ্টাজেল দুর্গে।

আঠারো দিনের দিন রাজা সোনালিকে বিয়ে করলেন! সে কি আনন্দ, সে কি উৎসব, সে কি প্রাচুর্য! শুধু তিনজনের মনে আনন্দ নেই। ত্রিস্তান আর সোনালি ছাড়াও আনন্দ নেই বিরজার চোখে। ভয়ে তার বুক দুরুদুরু করছে। আজ ফুলশয্যার সময় রাজা যখন দেখবেন, তাঁর নতুন রানী কুমারী নয়, তাঁর কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে, তখন কে বাঁচাবে রাজার ক্রোধ থেকে? রাজা তো সবাইকে মেরে ফেলবেন সেই মুহূর্তে! বিরজা সোনালির সঙ্গে এক পরামর্শ করলো। ফুলশয্যার রাত্রে সব উৎসবের শেষে যখন রাজার ঘরে আলো নিবে যাবে, তখন সোনালি বেরিয়ে আসবেন ঘর থেকে—কোনো এক ছুতোয়, তারপর বিরজা নিজেই ঢুকবেন সোনালির পোশাক পরে। অন্ধকারে বিরজার সঙ্গে সোনালির তফাত বোঝা যাবে না।

ঠিক সেই রকমই হলো। হুজুর, আপনারা ভেবে দেখুন বিরজার আত্মত্যাগের মহত্ত্ব। নিজের সখীর সম্মান রাখার জন্য, বিরজা সেদিন নিজের কুমারীত্ব বিসর্জন দিল রাজার কাছে।

তারপর থেকে রাজকুমারী সোনালি হলেন রানী সোনালি। রাজ্যের সবাই তাঁকে ভালোবাসে। রাজা মার্ক তাঁকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন। রাজা কত মণিমুক্তা, কত অলংকার দিলেন তাঁকে। নানান দেশ থেকে এলো দুষ্প্রাপ্য আভরণ। কিন্তু রানীর মনে শুধু এক চিন্তা কখন ত্রিস্তান কাছে আসবে। অলংকার, বস্ত্র, সুগন্ধি কিছুর প্রতিই তাঁর ভালোবাসা নেই, সব ভালোবাসা শুধু ত্রিস্তানের জন্য। দেখা হয় দুজনে গোপনে। ত্রিস্তান আগের মতোই শোয় রাজার পাশের ঘরে। মাঝরাত্রে ঘুমন্ত রাজার পাশে সোনালি উঠে আসে ত্রিস্তানের কাছে। দুজনে তখন বিশ্বসংসার ভুলে যায়। ভুলে যায় পাপপুণ্য, ভুলে যায় জীবন-মৃত্যুর কথা। দোষ কিংবা গুণ—আপনারা যাই বলুন,

ভালোবাসা এই রকমই, সে আর সব কিছুকে আড়াল করে দেয় !

কিন্তু সব সময়ই দুজনের ভয়। কে কখন দেখে ফেলে। ভয়, অথচ দুজনে না মিলিত হয়েও পারে না। ওদের মৃত্যুভয় নেই, ওদের শুধু আর দেখা-না-হবার ভয় ! মরবে জেনেও চুম্বকের পাহাড়ের গায় জাহাজ যেমন ধাক্কা মারে, ওরা সেই রকম ছুটে আসে দুজনে। আর সখী বিরজা সব সময় ওদের পাহারা দেয়। একমাত্র সে জানে ওদের গোপন মিলনের খবর।

কিন্তু ভালোবাসা কি গোপন থাকে ? এই উন্মাদ, দুর্দান্ত ভালোবাসা যে মারী গুটিকার মতো সারা শরীরে ফুটে বেরোয়। ভালোবাসা যেন এক বিশাল বাজ পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর। ওদের দেহ এই ভালোবাসার আক্রমণে ছিন্নভিন্ন। ভালোবাসা আলোর মতো শরীর ফুঁড়ে বেরোয়। ওদের শরীরে সেই ভালোবাসার দীপ। গোপন প্রেম, সে তো প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি কথাবার্তা, হাঁটা চলা থেকেই ফুটে বেরোয়। তীব্র সুরার মতো ভালোবাসা মিশেছে ওদের শোণিতে, ওদের নেশাগ্রস্তের মতো দেখাবে না ? কেউ ওদের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখে ফেলেনি, তবু লোকে ওদের সন্দেহ করতে লাগলো। যেন ওদের দু'জনেরই শরীরে গোপন প্রেমের গন্ধ !

অন্তত সেই চারজন হিংসুটে নাইট। তারা তীব্র ঈর্ষা আর ক্রোধে জ্বলতে লাগলো। একদিন রাজাকে বলেই ফেললো, মহারাজা, আপনি ত্রিস্তানকে বড় বেশী বিশ্বাস করেছেন। ও আপনার সর্বনাশ করবে। এখনো ওকে সরান ! ও কি রাণীকে জয় করে আনলো শুধু শুধু ? লোকে যে এই নিয়ে নানা কথা বলছে। মহারাজ, ওকে বিশ্বাস করবেন না। আমরা জানি, ও রানীর প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছে।

শুনে রাজা ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন। ভীরু, কাপুরুষের দল ! ত্রিস্তানকে বিশ্বাস করবো না তো কাকে বিশ্বাস করবো ? যেদিন দানব মোরহল্ট এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল—সেদিন তোমাদের মুখ কোথায় ছিল ! সেদিন কে বাঁচিয়েছিল এ দেশের সম্মান ? তোমরা তাকে হিংসা করো ? কি শুনেছো, কি দেখেছো তোমরা ত্রিস্তানের অবিশ্বাসের কাজ ?

—কিছুই না। আপনিও চোখ খুললে, কান খুললে তা দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন। সময় থাকতে সাবধান হোন মহারাজ !

রাজা তাদের দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু কথাটা রয়ে গেল তাঁর মনের মধ্যে। সব সময় খচ্ খচ্ করতে লাগলো। বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল রাজার মধ্যে। ঈর্ষা জিনিসটা এমন—তা যে কি অবলম্বন করে কখন

বেড়ে ওঠে কেউ জানে না। ত্রিস্তানকে সন্দেহ করতে রাজার নিজেরই মন ছি ছি করে ওঠে। আর ঐ ফুলের মতো পবিত্র রানী, তাকে কখনও সন্দেহ করা যায়? তবু রাজার মন ঘুরে ফিরে ও কথাই ভাবে। তাঁর মনের মধ্যে কাঁটা গেঁথে গেল। রাজা গোপনে নজর রাজতে লাগলেন ওদের দুজনের ওপর। বিরজা কিন্তু রাজার মনের অবস্থা টের পেয়ে ওদের সাবধান করে দিল।

রাজা একদিন ত্রিস্তানকে ডাকলেন। মুখ নিচু করে গম্ভীরভাবে বললেন, ত্রিস্তান, তুমি রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাও। আমি কোনো কারণ দেখাতে পারবো না। তোমাকে বিদায় দিতে বুক ফেটে যায়। কিন্তু নিন্দুকেরা তোমার সম্বন্ধে খারাপ কথা বলছে। সে এমন কথা, যা আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারবো না। আমি জানি সে কথা মিথ্যে। তবু, আমার মনে সে কথা গেঁথে যাচ্ছে। তুমি যাও। আমার মন শান্ত হলে আবার তোমাকে ডাকবো। তুমি যাও! ত্রিস্তান, আমায় ক্ষমা করো। তুমি এখনো আমার প্রাণের মতো প্রিয়।

ত্রিস্তান একটি কথাও না বলে বেরিয়ে এলো। কিন্তু কতদূর যাবে? চুম্বকের পাহাড়ের সঙ্গে যে সে বাঁধা! শহর ছেড়ে একটু বাইরে সে গুরু গরভেনালের সঙ্গে একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করে রইলো। কয়েকদিন পরই পড়লো অসুখে। গুরু গরভেনাল অনেক সেবা করলেন। কিন্তু এ অসুখ সারবে কিসে! শায়িত ত্রিস্তানের আত্মা বারবার উড়ে গিয়ে আঘাত করতে লাগলো দুর্গের দরজায়।

ওদিকে রানীর অসুখ। কিন্তু এ অসুখ আরও মারাত্মক। রানীকে বাইরে অসুখী থাকলে চলে না, মুখে হাসি ফোটাতে হয়। প্রতিদিন শুতে হয় রাজার সঙ্গে এক শয্যায়। তিনি স্বপ্ন দেখেন, তিনি ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছেন ত্রিস্তানের কাছে। প্রহরীরা তার ডানা কেটে দিল। সমস্ত রাজপুরীতে রানীর রক্ত। সে রক্ত চোখে দেখা যায় না।

প্রেমিক-প্রেমিকা দুজন হয়তো মরেই যেতো। কিন্তু সখী বিরজা উপায় বার করলো। সে খুঁজতে খুঁজতে এলো ত্রিস্তানের বাড়িতে। এবং গোপন মিলনের পথ বলে দিল।

দুর্গের পিছন দিকে বাগানের শেষ প্রান্তে নানা রঙের ফুলগাছ আর আঙুর লতার ঝোপ। একটা লম্বা পাইন গাছ সেখানে দাঁড়িয়ে। তার নিচ দিয়ে ঝরনা চলে এসেছে। সেই ঝরনাটা বয়ে এসেছে একেবারে রাজপুরীর মধ্যে, রানীর স্নানের ঘরে। ত্রিস্তান রাত্রিবেলা লুকিয়ে সেই ফুলগাছের ঝোপে দাঁড়িয়ে ঝরনার জলে একটা গোলাপ ফুল ফেলে দেবে। ফুলটা ভাসতে ভাসতে

রানীর স্নানের ঘরে গেলে, রানী বুঝতে পারবেন ত্রিস্তানের সঙ্কেত। তিনিও চুপিচুপি বেরিয়ে আসবেন বাগানে পাইন গাছের নিচে।

প্রত্যেক সন্ধেবেলা ত্রিস্তান গিয়ে সেই ঝোপে লুকিয়ে ঝরনার জলে গোলাপ ফুল ফেলে দেয়। রাজা তখন রাজকার্যে ব্যস্ত। রানী সোনালী গোপনে এসে মিলিত হন। রানীর আসার সময় প্রতি মুহূর্তে ভয়, প্রতি মুহূর্তে সতর্কতা। তারপর একবার ত্রিস্তানের আলিঙ্গনের মধ্যে এলে আর কোনো ভয় থাকে না। সেই আলিঙ্গনের মধ্যেই যে সমস্ত বিশ্ব।

একদিন রাত্রে সোনালি বললেন, ত্রিস্তান, আমরা কোথায় বসে আছি ? আমি গল্প শুনেছি এই দুর্গটা পরীরা তৈরী করেছে। বছরে দুবার এই দুর্গটা অদৃশ্য হয়ে যায়। আজ সেই অদৃশ্য হবার দিন। আজ দুর্গ নেই প্রহরী নেই, রাজা নেই, নেই কোনো সতর্ক চোখ। আমরা বসে আছি এক মায়া কাননে, এই গাছ এই ফুলের গন্ধ, এই জ্যোৎস্না—সবাই আমাদের বন্ধু। আজ আমরা এখানে সারারাত থাকবো।

ঠিক তখনই দুর্গের ফটকে ন'টার ঘণ্টা বাজলো।

ত্রিস্তান বললো, না সোনালি, এ সেই মায়া কানন নয়, এ দুর্গ অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তবে, একদিন আমরা এক অপরূপ দেশে যাবো, যেখান থেকে কেউ ফেরে না। সেখানে আছে এক সাদা পাথরের দুর্গ, তার এক হাজারটা জানলার প্রত্যেকটিতে আলো জ্বলে, প্রত্যেক ঘরে সুর ভেসে বেড়ায়, সেখানে সূর্য ওঠে না কিন্তু আলোর অভাবে কেউ অনুতাপ করে না। সেই চিরসুখের দেশে একদিন আমরা দুজনে চলে যাবো, চিরকাল থাকবো এক সঙ্গে। এখন এক নিষ্ঠুর, বাস্তব দুর্গে তুমি ফিরে যাও।

সোনালি ফিরে পেয়েছেন তাঁর আনন্দ। রাজা মার্কের মন থেকে মুছে গেছে সন্দেহের কুয়াশা। কিন্তু সেই হিংসুকেরা নিবৃত্ত হয়নি। রানীকে দেখে তখনও তাদের সন্দেহ হয়। এখনও কেন রানীর সর্ব অঙ্গে সুখের শিহরণ ? অথচ কিছুই ধরতে পারছে না !

তখন তারা একজন গণৎকারের কাছে গেল। এই গণৎকারটি মাটিতে খড়ির দাগ কেটে অনেক কিছু বলতে পারে। লোকটা দেখতে যেমন কুৎসিত, তেমনি লোভী। সব শুনে সেই লোকটা আনন্দে নেচে উঠলো। সে কুৎসিত বলেই কোনো সুন্দর জিনিস সহ্য করতে পারে না। ত্রিস্তান আর সোনালির প্রেমের কথা শুনে সে খলখল করে হেসে উঠলো। ওর নিজেরই গরজ হলো ওদের নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেবার। সে খড়ির দাগ কেটে বললো, আপনারা আজই তো

ওদের ধরতে পারবেন !

সকলে মিলে এলো রাজার কাছে। বললো, মহারাজ, এবার হাতে হাতে প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি, ত্রিস্তান কতখানি অবিশ্বাসী ! আপনি আজই ঘোষণা করে দিন, সাতদিনের জন্য আপনি শিকারে যাচ্ছেন। সেই মতো সৈন্যসামন্ত, শিকারের সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। তারপর একা গোপনে ফিরে এসে, আপনি লুকিয়ে উঠে বসে থাকুন বাগানের উঁচু পাইন গাছে। দেখবেন, সেখানে ওদের কাণ্ড-কারখানা !

শুনে রাজার ঘৃণা হলো ওদের কথায়। কিন্তু উড়িয়ে দিতেও পারলেন না। প্রেমে ঈর্ষা এমনই আশ্চর্য বস্তু, যে তা পরম মহৎ লোকেরও হৃদয় কুরে খেতে পারে ! রাজা মুখে বললেন, তোমরা দূর হয়ে যাও, কুকুরের দল ! কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা, গোপনে রাজা উঠে বসে রইলেন পাইন গাছে।

সেই রাতে জ্যোৎস্নায় চারিদিক সাদা হয়ে গেছে। দিনের আলোর মতো ফট্‌ফট্‌ করছে জ্যোৎস্না। ত্রিস্তান পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে এলো ঝোপের মধ্যে। তারপর নিচু হয়ে ঝরনার জলে গোলাপ ফুল ফেলে দিলো। কিন্তু ফুলটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝরনার জলে দেখলো মানুষের ছায়া, ছায়ার মাথায় রাজমুকুট। ত্রিস্তান ভয়ে কেঁপে উঠলো। বুঝতে পারলো, গাছের ওপর বসা কার ছায়া পড়েছে জলে। কিন্তু ততক্ষণে ফুল ভেসে গেছে। সোনালিকে যে আর ফেরাবার উপায় নেই ! ঈশ্বর ওদের রক্ষা করুন !

তখন আর ত্রিস্তানের পালাবারও উপায় নেই ! কারণ রানী তো আসবেনই। দূর থেকে দেখা গেল রানী আসছেন। ত্রিস্তান পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। একটুও সাড়া-শব্দ করলো না, হাত তুলে ইশারা করলো না। রানী ভাবলেন, আজ কি হলো ত্রিস্তানের, সে তো আমার দিকে ছুটে আসছে না। তবে কি ওর শরীর অসুস্থ ? অথবা কোনো শত্রুকে দেখতে পেয়েছে ? রানী একটু দূরে থমকে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে রইলেন ত্রিস্তানের দিকে। তবু ত্রিস্তানের শরীর নিস্পন্দ। এবার রানী জিগ্যেস করলেন, কে ওখানে ? কোনো সাড়া এলো না ! এবার স্পষ্ট সন্দেহ করে, রানী সোনালি অনুচ্চ স্বরে বললেন, তুমি যদি ত্রিস্তান হও, তবে তুমি কোন সাহসে এত রাত্তিরে আমাকে ডেকেছো ? তুমি অনেকবার আমাকে ডেকেছো, আমি আসিনি। কিন্তু তুমিই আমাকে জয় করে এনে এ রাজ্যের রানী করে সুখী করেছো। তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আছে। বলো, তুমি কি বলতে চাও আজ ?

রানীর কথা শুনে ত্রিস্তান মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো। একটু

আগেই সে শুনেছে গাছের ওপর খুব মৃদু একটা শব্দ। অর্থাৎ রাজা ধনুকে বাণ পরিয়েছেন। যে কোনো মুহূর্তে বাণ এসে বুকে বিঁধতে পারে। কিন্তু ভয় পেল না সে। করুণ গলায় ত্রিস্তান বললো, রানী আপনি একবার আমার হয়ে রাজাকে অনুরোধ করুন। আপনাকে এই জনাই বারবার খবর পাঠিয়েছি, আপনি আসেননি। কিন্তু, আপনি আমাকে দয়া করুন। রাজা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি জানি না কেন! কিন্তু রাজাকে ছেড়ে থাকতে আমার মন কাঁদে। রানী, আপনার দয়ার প্রাণ, আপনি আমার হয়ে রাজাকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমার কি দোষ?

কান্নায় তখন সোনালির শরীর কাঁপছে। তবু তিনি সখেদ গলায় বললেন, ত্রিস্তান, এ কি দুর্বুদ্ধি তোমার! এই কি প্রার্থনা জানাবার সময়! আমি জানি তুমি নির্দোষ! কিন্তু রাজা তোমাকে সন্দেহ করেন—সে যে কি সন্দেহ আমি মুখ ফুটে বলতে পারব না! রাজা হয়তো আমাকেও সন্দেহ করেন। ঈশ্বর সাক্ষী আছেন, কুমারী অবস্থায় যার বাহুতে আমি প্রথম ধরা দিয়েছি, তাকে ছাড়া আর কারুকে আমি ভালোবাসি না! তোমার জন্যে রাজার কাছে দয়া ভিক্ষা করলে যে রাজা আমাকে আরও সন্দেহ করবেন! বিশেষত, এত রাত্রে আমি তোমার কাছে এসেছি, তিনি জানতে পারলে, আমাকে পুড়িয়ে তিনি আমার ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেবেন।

ত্রিস্তান যেন আরও ভেঙে পড়ে বললো, রাজা, তুমি কেন আমায় সন্দেহ করলে? আমার অপরাধের কি প্রমাণ পেয়েছো তুমি?

রানী বললেন, না ত্রিস্তান, রাজা মার্ক উদার, তিনি নিজে থেকে এমন নিচ সন্দেহ করতেই পারেন না। দুষ্ট লোকেরা রাজার মন বিষিয়ে দিয়েছে। রাজা তো এমন ছিলেন না! কিন্তু আমি আর থাকতে পারছি না, আমি যাই। ত্রিস্তান তোমার দুর্ভাগ্য, মিথ্যে সন্দেহে রাজা তোমার মতো বন্ধুকে ত্যাগ করলেন। রাজারও দুর্ভাগ্য!

—তবে তাই হোক, আমি এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো। রানী, আপনি শুধু রাজাকে বলুন, যেন আমি সসম্মানে চলে যেতে পারি। যাবার আগে রাজা যেন আমাকে তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় করেন। নইলে দেশ-বিদেশে যে আমার নামে কলঙ্ক রটে যাবে।

—না ত্রিস্তান, আমি কোনো অনুরোধই করতে পারবো না তোমার হয়ে। যদি রাজার কাছে তোমার নাম উচ্চারণ করলেই তিনি রেগে ওঠেন? এ দেশে আমি একা, রাজা ছাড়া আর কারুকে আমি নির্ভর করতে পারি না। তিনি

নির্দয় হলেও আমাকে তা সহ্য করতে হবে। তুমি যাও ত্রিস্তান, একাই চলে যাও এ রাজ্য ছেড়ে গোপনে। রাজা তোমাকে ক্ষমা না করলেও ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করবেন।

এই কথা বলে রানী ফিরে গেলেন। ত্রিস্তান আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো, তাকিয়ে দেখলো, দূরে রানীর ঘরের জানলায় আলো জ্বলে উঠেছে। তখন ত্রিস্তান সরবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপন মনেই বললো, রাজা, আমি তোমার জন্যে বারবার জীবন বিপন্ন করেছি, আর তুমি তার এই প্রতিদান দিলে? আচ্ছা, আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি!

ত্রিস্তান চলে যেতে রাজা গাছ থেকে নেমে এলেন। মৃদু হাস্য করে বললেন, কি সৌভাগ্য যে আজ এখানে এসেছিলাম। সব ভুল ভেঙে গেল। না ত্রিস্তান, তোমার অন্য দেশে যাওয়া হবে না।

পরদিনই রাজা ত্রিস্তানকে ফিরিয়ে আনলেন দুর্গে। ত্রিস্তান আগের মতোই রাজা-রানীর শয়ন ঘরের পাশে জায়গা পেল। রাজার মন এখন মেঘমুক্ত আকাশের মতো সন্দেহহীন, ঈর্ষাহীন। ত্রিস্তান আর সোনালির মধ্যে আবার নিয়মিত গোপনে দেখা হতে লাগলো। আবার ওদের ভালোবাসা উদ্দাম হয়ে উঠলো।

এবার রাজার মনে পড়লো সেই চারজন নাইট আর গণৎকারের কথা। ওদের শাস্তি দেবার জন্যে রাজা পাঁচজনকেই ডেকে পাঠালেন। সামনে আসতেই রাজা বললেন, এই পাজী গণৎকারটাকে ফাঁসি দেবো আর তোমাদের—

নাইটরা বললো, মহারাজা, আপনি আমাদের যতই ঘৃণা করুন, তবু আমরা বলবো, ত্রিস্তান রানীকে ভালোবাসে, ওদের গোপনে মিলন হয়। এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

গণৎকার বললো, রাজা আমাকে ফাঁসি দিন ক্ষতি নেই। কিন্তু, তবুও শেষ পর্যন্ত বলে যাবো, আমার গণনা কখনো মিথ্যা হয় না। আমার কথা মতো গিয়ে আপনি ওদের দেখতে পেয়েছিলেন কি না? আমি আবার বলছি, এখনও ওদের মিলন হয়।

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করলেন। ভাবলেন, আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমার প্রজাদের মুখ বন্ধ করি কি করে?

গণৎকার আবার বললে, ফাঁসি দেবার আগে, মহারাজ, আমাকে আর একবার

সুযোগ দিন ! এবার হাতে হাতে ধরিয়ে দেবো ।

মেঘগর্জনের স্বরে রাজা বললেন, যদি না পারো ?

—তবে আমি নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরবো । মহারাজ, আমার গণনা মিথ্যা হয় না ।

এই কুৎসিত গণৎকারটার কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল, রাজা অবহেলা করতে পারলেন না ।

তিনি বললেন, কি ব্যবস্থা তুমি করতে চাও ?

—মহারাজ, আপনি ত্রিস্তানকে আজই ভোর রাত্রে কোনো দূর দেশে পাঠান কয়েকদিনের জন্য, কিছু একটা কাজের ভার দিয়ে । আদেশটা দেবেন আপনি রাত্তির বেলা । তারপর যা করার আমি করবো । হঠাৎ বাইরে যাবার কথা শুনলে, ত্রিস্তান সবার আগে একবার রানীর সঙ্গে দেখা না করে পারবে না !

সেই রাত্রে রাজা শুতে যাবার আগে প্রতিদিনের মতো ত্রিস্তান এলো রাজার সামনে বীণা বাজাতে । রাজা বললেন, আজ আর গান ভালো লাগছে না । তা ছাড়া, ত্রিস্তান, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে । তোমাকে একটা গোপন চিঠি নিয়ে যেতে হবে রাজা আর্থারের কাছে । তুমি ওখান থেকে উত্তর নিয়ে আসবে ।

ত্রিস্তান বললো, আমি কালই রওনা হবো ।

—কাল নয়, আজই ভোর রাত্রে । খুব জরুরী চিঠি ত্রিস্তান, তোমাকে ছাড়া আর কারুর হাতে দিতে পারি না ! এখন বরং খানিকটা ঘুমিয়ে নাও ।

ত্রিস্তান শুতে গেল । রাজা গেলেন নিজের ঘরে অথচ ত্রিস্তানের বুকে একটা অসম্ভব ইচ্ছে ঝাপটা মারছে । সাত দিন অন্তত বাইরে থাকতে হবে, যাবার আগে একবার রানীর সঙ্গে দেখা হবে না ? একবার না দেখলে—সারাটা পথ যে ত্রিস্তানের বুক খাঁ-খাঁ করবে । রোদ্দুর তাকে বেশী জ্বালা দেবে, শীত তাকে বেশী কষ্ট দেবে—পথ মনে হবে অনন্ত, যদি একবার যাবার আগে রানীর সঙ্গে দেখা না হয় !

রাজার চোখে ঘুম নেই, সারারাত তিনি জেগে । গণৎকারের পরিকল্পনা মতো গভীর রাত্রে রাজা একবার উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন । জাগ্রত ত্রিস্তান তা লক্ষ্য করে ভাবলো, এই তো সুযোগ । নিমেষের জন্য একবার রানীর সঙ্গে দেখা করে আসা যায় । হঠাৎ ত্রিস্তান দেখলো, একটা বেঁটে মতো কুৎসিত লোক অন্ধকারের মধ্যে তার আর রাজার ঘরের মধ্যে যে বারান্দা সেখানে কি যেন ছড়াচ্ছে ! এ সেই গণৎকার, সারা বারান্দায় ময়দা ছড়িয়ে দিচ্ছে । ত্রিস্তান বা

রানী যে কেউ একজন ঘর থেকে বেরুলেই পায়ের ছাপ পড়ে যাবে। আর সেই পায়ের ছাপ বলে দেবে কে কোন দিকে গেছে।

ত্রিস্তান অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে সব লক্ষ্য করলো। মনে মনে হাসলো ঐ বামনটা ভেবেছে ঐ দিয়ে তাকে ধরবে? অন্য যে-কেউ হলে সে রাত্রে আর দেখা করার সাহস পেতো না। কিন্তু ত্রিস্তানের কথা আলাদা। সে আলাদা ধাতু। বিপদের গন্ধ পেয়েই যেন ত্রিস্তানের ইচ্ছে আরও উদ্দাম হয়ে উঠলো। গণৎকার চলে যেতেই ত্রিস্তান নিজের ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে এক লাফ দিয়ে বারান্দা পেরিয়ে চলে গেল রানীর ঘরে। কোনো পায়ের ছাপ পড়লো না। তারপর ত্রিস্তান গিয়ে ঘুমন্ত রানীর মুখচুম্বন করে তাকে জাগালো।

কিন্তু সেদিন সকালবেলা হরিণ শিকারে গিয়ে ত্রিস্তানের পায়ের গোড়ালির খানিকটা কেটে গিয়েছিল। এখন লাফাবার সময়ই সেই ক্ষত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়লো বারান্দায়। ত্রিস্তান টের পায়নি। ওদিকে রাজা গিয়ে মিলিত হলেন সেই চারজন অপেক্ষমাণ নাইটের সঙ্গে, একটু পরেই গণকঠাকুর কাজ সেরে এলো। তারপর মাটিতে খড়ির দাগ কেটে গুনতে গুনতে হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো, এইবার, এইবার, এসেছে, চলুন, এখনই গিয়ে ধরতে হবে!

উন্মুক্ত তরবারি হাতে নাইট চারজন ছুটে এলো রাজার সঙ্গে সঙ্গে। ওদের আসার শব্দ পেয়েই ত্রিস্তান একলাফে ফিরে গেছে নিজের ঘরে। আবার ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়লো বারান্দায়। ত্রিস্তান জানে কোনো পায়ের ছাপ পড়েনি। সে মনে মনে হেসে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো।

রাজা এসে দেখলেন রক্তের দাগ। নাইট চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরলো ত্রিস্তানকে। তারপর বললো, এই দেখুন মহারাজ, ওর পায়ের কাটা ঘা, ওখান থেকে রক্ত পড়েছে। ময়দার ওপর দু'সারি রক্তের দাগ—তার মানে একবার এসেছে একবার গেছে। কি সাহস, আপনি একটু বেরিয়েছেন তার মধ্যেই! আর ঐ যে ও ঘরে আপনার রানী পড়ে আছেন ঘুমের ভান করে, মনে হয় যেন সতী সাধ্বী কিন্তু ওঁর পাপও সমান সমান।

রাজা ঘৃণায় মুখ নিচু করলেন। ত্রিস্তান শুধু বললো, না, রানীর কোনো দোষ নেই।

রাজা গভীর বিষাদের স্বরে বললেন, ত্রিস্তান, আর আমার সন্দেহ রইলো না। আমি তোমায় বিশ্বাস করেছিলুম, সেই বিশ্বাসের এই মূল্য দিলে তুমি? তুমি আমার প্রিয় ভগিনী শ্বেতপুষ্পার ছেলে—কিন্তু তোমার মুখ দেখতেও আজ আমার ঘৃণা হচ্ছে। কাল সকাল বেলাতেই তোমাকে মরতে হবে।

ত্রিস্তান কাতরভাবে বলে উঠলো, মহারাজ দয়া করুন ! দয়া—

—তোমার দয়ার কথা বলতে লজ্জা হয় না ত্রিস্তান ?

—আমার জন্য দয়া নয়। আমি কি মরতে ভয় করি ? তাহলে কি এই চারটে কাপুরুষকে আমার গায়ে হাত ছোঁয়াতে দিতাম ? আমার জন্য দয়া নয়, রানীকে দয়া করুন। ওঁর কোনো পাপ নেই। এরা যে আমার নাম জড়িয়ে রানীকে অপবাদ দিতে চায়—আমি এদের প্রত্যেকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজী আছি। কিন্তু রানীর নামে এই কলঙ্ক বাইরে ছড়াবেন না।

রাজা দুহাতে মুখ ঢেকে বললেন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি তাকাতে পারছি না এই অকৃতজ্ঞ পশুটার মুখের দিকে ! ওঃ ! কে কোথায় আছো, বেঁধে রাখো ওকে !

ত্রিস্তানকে হাত পা বেঁধে রেখে ওরা চলে গেল। রানীরও নরম শরীর বাঁধলো শক্ত দড়ি দিয়ে। কাল সকালে ওদের দুজনেরই শাস্তি হবে।

ধরা পড়েও ত্রিস্তান বেশি ভয় পায়নি। কারণ, আপনারা তো জানেন, সেকালে নিয়ম ছিল কোনো নাইটের নামে কেউ কোনো অভিযোগ আনলে, দুজনে রাজার সামনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে সেটা মিটিয়ে নিত। যুদ্ধে যে হারে সে-ই দোষী। ত্রিস্তান জানতো, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস হবে—এমন লোক সে রাজ্যে একজনও নেই। কিন্তু হায়, সে জানতো না—পরের দিন বিনা বিচারেই তার মৃত্যুদণ্ড হবে। যদি জানতো, তবে কি সে ঐ কাপুরুষ চারজন নাইটের হাতে ধরা দিত ? নিরস্ত্র অবস্থাতেও সে ওদের হত্যা করতে পারতো। হায় ত্রিস্তান ! হায় সোনালি ! দুজনে পড়ে রইলো দু'ঘরে হাত পা বাঁধা।

রাত্রির অন্ধকার থাকতেই ছড়িয়ে পড়লো ত্রিস্তান আর সোনালির কলঙ্কের কথা। লোকে শুনলো রাজা ওদের দুজনকেই প্রকাশ্যে ফাঁসি দেবেন। দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগলো রাজপুরীর দিকে। একি ভয়ানক কথা !

লোকেরা চেঁচিয়ে বিলাপ করতে লাগলো ওদের নাম করে। হায় ত্রিস্তান, আমাদের দেশের গর্ব তুমি, তোমাকে মরতে হবে এমন অপমানে, লজ্জায় ? হায় রানী সোনালি, তোমার সৌন্দর্য চিরকাল আমাদের দেশে প্রবাদ হয়ে থাকবে, পৃথিবীতে যে কেউ কখনো সুন্দরী মেয়ে দেখলে তোমার সঙ্গে তুলনা করবে—আর আজ তোমাকে আমরা চোখের সামনে মরতে দেখবো ? তোমাদের নামে এ কলঙ্ক কি সত্যি ? নাকি ঐ বদমাস গণৎকার ঠাকুরের কারসাজী সব ?

জাদুবিদ্যার প্রহেলিকা! মহারাজ, আপনি আগে ওদের প্রকাশ্যে বিচার করুন। আগেই মারবেন না।

ভোরের আলো ফুটতেই রাজা মার্ক বেরিয়ে এসে রথে উঠলেন। সোজা চলে এলেন বধ্যভূমিতে। তাঁর মুখ গনগন করছে। হুকুম দিলেন, দুটো বিশাল গর্ত খোঁড়ো। তার সামনে দুটো দণ্ড পুঁতে দাও। ফাঁসি নয়, আমি ঠিক করেছি ঐ শয়তান শয়তানীকে আমি পুড়িয়ে মারবো। ফাঁসিতে আর কতখানি সাজা হবে?

জনতা চেঁচিয়ে উঠলো, মহারাজ, আগে বিচার হোক! আগে বিচার! আগে ওদের মুখের কথা শুনুন! বিনা বিচারে হত্যা করা যে মহাপাপ! মহারাজ, আপনি ন্যায়পরায়ণ, আপনি—

রাজা মার্ক ধমকে উঠলেন, না, কোনো বিচার নয়, বিচার আমি মনে মনেই শেষ করেছি। আর এক মুহূর্তও ওদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই না। কে আপত্তি করছে, দেখি, এগিয়ে এসো সামনে!

কেউ এলো না ভয়ে।

রাজা প্রহরীদের বললেন, যাও ওদের নিয়ে এসো!

প্রহরীরা ছুটে গেল। একদল প্রহরী টানতে টানতে সোনালির সামনে নিতে এলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ত্রিস্তানকে। সোনালি শান্ত স্বরে বললো, ত্রিস্তান, আবাব দেখা হবে। স্বর্গ অথবা নরক কোথায় আমরা যাবো জানি না। কিন্তু আবার দেখা হবে। ত্রিস্তান বললো, সোনালি, আবার ঠিক দেখা হবে!

দুর্গ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগলো ত্রিস্তানকে, এমন সময় দূরে একজন অশ্বারোহীকে আসতে দেখা গেল। দিনাস নামে এক জমিদার, যিনি বরাবরই ত্রিস্তানকে ভালোবাসতেন। দিনাস এত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন, যে ঘোড়ার মুখ ফেনায় ভরে গেছে। দিনাস বললেন, ত্রিস্তান, আমি খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। একি অসম্ভব কথা! না, তোমাদের এভাবে মরা অসম্ভব। আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

তারপর দিনাস প্রহরীদের দিকে ফিরে বললেন, হতভাগারা, তোরা ওকে অমন ভাবে শিকলী দিয়ে বেঁধেছিস, একটু বিবেক নেই তোদের? কে তোদের রাজ্য বাঁচিয়েছে? খুলে দে শিকল। যদি ত্রিস্তান পালাবার চেষ্টা করে তোদের হাতে তলোয়ার নেই? ও একা নিরস্ত্র, আর তোরা দশজন। খুলে দে।

প্রহরীরা লজ্জায় শিকল খুলে দিলো। কিন্তু হাতে তলোয়ার নিয়ে তারা ঘিরে রইলো ত্রিস্তানকে। দিনাস ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।

এবার শুনুন হুজুর, ঈশ্বরের করুণার কথা। আপনারা জ্ঞানী গুণী, আপনাদের কিছুই অজানা নেই। আপনারা জানেন, যে পাপ করে সে রাজার হাত এড়িয়ে পালালেও ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেন। আবার যে পাপ করে না, সে রাজার হাতে ধরা পড়লেও ঈশ্বর তাকে বাঁচান। ভালোবাসা কি পাপ? তাহলে পৃথিবীতে পুণ্য বলে কিছু নেই। ভালোবাসা যদি পাপ হয়, তবে গান গাওয়াও পাপ, ঈশ্বরকে পূজা করাও পাপ। প্রেমিককে যদি ঈশ্বর না রক্ষা করেন, তাহলে বুঝতে হবে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর ত্রিস্তানকে রক্ষা করলেন।

পাহাড়ী রাস্তায় যেতে যেতে একটা চূড়ার উপর ছোট্ট একটা গীর্জা। তার একপাশে এই রাস্তা, আর একপাশে খাড়া পাহাড়ের খাদ, একেবারে নেমে গেছে সমুদ্র পর্যন্ত! ত্রিস্তান সেখানে এসে বললো, প্রহরী, আমি এই গির্জায় ঢুকে শেষবারের মতো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চাই। কিন্তু আমি একা যাবো। আমার তো পালাবার পথ নেই, একটাই তো দরজা, সেখানে তোমরা পাহারা দেবে।

প্রহরীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাজী হয়ে গেল। ত্রিস্তান ছিল তাদের রাজ্যের চোখের মণি। আজ তাকে সামান্য কয়েদীর মতো বেঁধে নিয়ে যেতে হচ্ছে। সসম্ভ্রমেই তারা ত্রিস্তানকে গির্জার মধ্যে যেতে দিলো। ত্রিস্তান গির্জায় ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর ছুটে গিয়ে লাফিয়ে উঠলো গির্জার জানলায়। কাঁধের চাড় দিয়ে দিয়ে বেঁকিয়ে ফেললো শক্ত লোহার শিক। সেখানে দাঁড়িয়ে ত্রিস্তান দেখলো বহু নিচে সমুদ্রের পাড়। এখান থেকে লাফালে নিশ্চিত মৃত্যু। ত্রিস্তান বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে সেই দেড় হাজার ফুট নিচের সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো। ওখান থেকে কোনো জীবন্ত মানুষ সজ্ঞানে লাফাতে পারে না। অসম্ভব! আজ পর্যন্ত কর্নওয়ালের লোক ঐ জায়গাটাকে বলে ত্রিস্তানের লাফ।

ত্রিস্তান মরতেই চেয়েছিল। সাধারণ চোর-ডাকাতের মতো সকলের সামনে মরার চেয়ে সে নিজেই মরতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পরনে ছিল বিশাল আঙরাখা, বাতাসে সেটা ফুলিয়ে তার পড়ার গতি কমিয়ে দিল। সে ঝুপ করে গিয়ে পড়লো সমুদ্রে। পতনের বেগে সমুদ্রের অনেক নিচে ডুবে গেল সে, কিন্তু বুকভরা নিশ্বাস ছিল বলে ভেসে উঠতে খুব অসুবিধে হলো না। তাড়াতাড়ি সাঁতরে এসে পাড়ে উঠলো।

এদিকে গুরু গরভেনাল ত্রিস্তানের বন্দী-দশার কথা শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন যথাসর্বস্ব নিয়ে। ত্রিস্তানের ওপর রাগে, রাজাও

তাকে হত্যা করবেন নিশ্চিত। ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে পালাতে গরভেনাল দেখলেন বাড়ির ওপর দিয়ে পাগলের মতো একটা লোক ছুটছে। কাছে এসে দেখলেন ত্রিস্তান। ত্রিস্তান গরভেনালকে দেখেও গ্রাহ্য করলো না। তখনো ছুটতে লাগলো। গরভেনাল তার জামা চেপে বললেন, কোথায় যাচ্ছো ত্রিস্তান?

উন্মত্তের মতো ত্রিস্তান বললো, আমায় ছেড়ে দিন, আমার আর সময় নেই। গুরুদেব, আমি মরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেঁচে গেলাম। কিন্তু কেন বাঁচলাম? সোনালিকে যদি ওরা মেরে ফেলে, তবে আমার বেঁচে লাভ কি? গুরুদেব আমাকে ছাড়ুন, আমি যাই, আমি একা খালি হাতেই ওদের ধ্বংস করে দেবো। ওরা পারবে না সোনালিকে মারতে! পারবে না!

গরভেনাল ঘোড়া থেকে নেমে ত্রিস্তানকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ত্রিস্তান, তুমি কি সত্যি পাগল হলে? তোমার যতই শক্তি থাক, তুমি একা কি করবে! ওখানে রাজার হাজার সৈন্য। তোমার বর্ম, তলোয়ার সব এনেছি আমি, তবু তুমি একা যুদ্ধ করে পারবে না। এসো বরং আমরা একধারে লুকিয়ে বসে থাকি।

—কি হবে চুপ করে বসে থেকে?

—পথ দিয়ে কত মানুষ যাচ্ছে, তাদের কথা শুনে আমরা সব ঘটনা জানতে পারবো।

—সোনালিকে যদি মেরেই ফেলে, তবে আমরা আর কি করবো?

—তুমি পালিয়েছো শুনে রাজা সোনালিকে হয়তো আজই নাও মারতে পারেন। যদি সত্যিই মেরে ফেলেন, তাহলে, ত্রিস্তান, যীশুর নামে, মা মেরীর নামে শপথ করছি, আমরা দুজনে এই রাজ্য ছারখার করে দেবো। যতক্ষণ আমাদের হাতে তলোয়ার থাকবে সোনালির মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে থামবো না! প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষত্রিয় কখনো মরতে চায় না! কিন্তু আগে দেখি, হয়তো ওরা সোনালিকে মারবে না।

অস্ত্রে বর্মে সজ্জিত হয়ে ত্রিস্তান গরভেনালের সঙ্গে পথের পাশে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলো।

ত্রিস্তানের পলায়নের খবর শুনে রাজা জ্বলে উঠলেন। যেন তাঁর সর্ব শরীরে বিছুটি দংশন করছে। তিনি বিকৃত স্বরে বললেন, আচ্ছা আগে শয়তানীকে আন, তাকে পুড়িয়ে মারি। নিজের চোখে দেখি ওর পুড়ে মরা। তারপর দেখবো সে কুকুরটা কোথায় পালায়! আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও ওকে খুঁজে বার করবো!

মাটি দিয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে টেনে আনা হলো সোনালিকে। শক্ত দড়ির বাঁধনে তাঁর সোনার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। সোনার চুল বিস্রস্ত! একটি সত্যিকারের সোনার প্রতিমাকেই যেন ধুলো মাখিয়েছে ওরা! তাঁকে এনে বাঁধা হলো সেই দণ্ডের সঙ্গে। জনতার কথায় যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ত্রিস্তান পালিয়ে গেছে, এক বিন্দু অশ্রু খসে পড়লো তাঁর চোখ থেকে। সূর্যের আলোয় আগুনের মতো জ্বলছে তাঁর সোনার চুল। তাঁর গড়িয়ে পড়া অশ্রুও যেন মনে হলো এক ফোঁটা গলিত স্বর্ণ।

প্রহরীরা আগুন লাগাতে যাবে, এমন সময় দিনাস এসে উপস্থিত হলেন। রাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, মহারাজ, ক্রোধের বশে আপনি এ কি করছেন? বিনা বিচারে কোনো সৎ রাজা কারুকে শাস্তি দেয় না। পরে এজন্য আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।

—আমি কোনো কথা শুনতে চাই না!

মহারাজ, আমি আপনার প্রজা নই। কিন্তু বহু বিপদে আপনাম পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। তার প্রতিদান হিসাবে আপনি রানীকে আমায় দয়া করুন। আপনি তো ওঁকে মেরে ফেলতেই চান, তার বদলে আমাকে দান করে দিন। অথবা বিচার করুন ওঁর অপরাধ। হয়তো পুরোটাই আপনার বোঝার ভুল। ত্রিস্তান রানীর ঘরে কয়েক মুহূর্তের জন্য গিয়েছিল, তাকে কি প্রমাণ হয়? কিছুই না।

—আমার প্রমাণের দরকার নেই। আমি সব জানি।

—মহারাজ, আর একটা কথাও ভেবে দেখুন। রানীকে যদি পুড়িয়ে মারেন, তবে আর কোনো দিন আপনার রাজ্যে শান্তি থাকবে না। ত্রিস্তান পালিয়েছে। সে কি প্রতিশোধ নেবে না? এ রাজ্যের পথ-ঘাট, পাহাড়-গুহা-জঙ্গল সব তার চেনা। সে এখানেই লুকিয়ে থাকবে। ভয়ংকর ক্রোধে, প্রতিশোধের ইচ্ছায় বারবার সে হানা দিয়ে এ রাজ্য ছারখার করে দেবে। আপনাকে সে ভালোবাসে, আপনার গায়ে সে হয়তো হাত তুলবে না, কিন্তু এ রাজ্যে আর কে আছে তার তলোয়ারের সামনে দাঁড়াতে পারে!

—এসব কথা পরে শুনবো, আগে এই পাপীয়সী, বিশ্বাসঘাতিনীর শাস্তি হয়ে যাক্।

—মহারাজ, ও যদি আপনার এতই দু'চোখের বিষ হয় তবে সোনালিকে আমায় দিয়ে দিন। আমার সেবার পুরস্কার হিসাবে। আমি ওর জন্য দায়ী থাকবো। আমি ওকে মায়ের সম্মান দিয়ে আমার প্রাসাদে রাখবো। তারপর

—দিনাস, তুমি আমার সময় নষ্ট করো না। আমি কথা দিচ্ছি, এর পর থেকে সকলের ক্ষেত্রে আমি সুবিচার করবো। কিন্তু, এই কুলটা স্ত্রীলোকটাকে আমি এক্ষুনি মেরে ফেলতে চাই। আমি ওকে ভালোবেসেছিলুম, এই তার প্রতিদান!

জমিদার দিনাস তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মহারাজ, আর কোনো দিন আমি আপনার রাজ্যে পা দেবো না। আজ থেকে আমি আর আপনার বন্ধু নই! ঘোড়ায় উঠে চলে গেলেন দিনাস। সোনালি তাঁর দিকে তাকিয়ে ম্লানভাবে হাসলেন। সেই ক্লিষ্ট হাসিতে অনেক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ছিল।

রাজার হুকুমে সোনালির পায়ের কাছের গর্তের শুকনো কাঠকুটোয় আগুন লাগানো হলো। দাউ দাউ করে পায়ের কাছে জ্বলে উঠলো আগুনের শিখা। সোনালির মাথার চুল অগ্নিবর্ণ। এমন মূর্তি কেউ কখনো দেখেনি। জনতা হায় হায় করে কেঁদে উঠলো।

এমন সময় একশোজন কুষ্ঠরোগী এলো দল বেঁধে। তাবা প্রহরীদের অগ্রাহ্য করে তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে দিল। তাদের নেতা ইভান বললো, মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন। পুড়িয়ে মারতে হয় একটু পবে মারবেন। তার আগে আমার একটা প্রস্তাব আছে। পুড়িয়ে মারলে তো ওঁর যন্ত্রণা এখুনি শেষ হয়ে যাবে। কিছু তার চেয়ে এমন উপায় যদি বলতে পারি—যাতে অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে দীর্ঘদিন দগ্ধে দগ্ধে মরবেন উনি, তাহলে—

রাজা বললেন পুড়িয়ে মারার চেয়েও বেশি যন্ত্রণার শাস্তির কথা যদি কেউ আমাকে বলতে পারে, তবে আমি তাকে পুরস্কার দেবো।

শুনে কুষ্ঠরোগীর দল খিক্‌খিক্‌ করে হেসে উঠলো। একশোজন কুঠো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—কেউ ক্র্যাচে ভর দিয়ে, কেউ লাঠি হাতে। সারা শরীরে ঘা, চোখগুলো ফোলা ফোলা, কারুর হাতের আঙুল গলে পড়ে গেছে। ওরা থাকে শহরের বাইরে, মানুষ ওদের কাছে ঘৃণায় যায় না।

ওদের নেতা ইভান বললো, মহারাজ, আমরা একশোজন খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। রানী সোনালিকে আমাদের হাতে দিন। আমরা সবাই মিলে ওঁকে ভোগ করবো। মহারাজ, আমাদের শরীরে কুষ্ঠ, তা বলে তো আমাদের ভোগ-বাসনা মরে যায়নি। কতদিন আমরা স্ত্রীলোকের স্বাদ পাইনি। রানীর এর চেয়ে বেশী শাস্তি আর কি হতে পারে। রানী আমাদের আলিঙ্গনে ঘৃণায় চোখ বুজবেন। প্রতি মুহূর্তে মরতে চাইবেন। অথচ আমরা ওঁকে সহজে মরতে দেবো না। ওঁরও শরীরে কুষ্ঠ হবে, একটু একটু করে পচে গলে যাবে ঐ রূপ,

প্রত্যেকদিন পাপের ফল ভোগ করবেন। মহারাজ, এ শাস্তি আপনার পছন্দ হয় না?

রাজা মার্ক মাথা নিচু করলেন। ক্রোধের চেয়ে বড় শত্রু তো মানুষের নেই। রাজা তখন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। ক্রোধের চেয়েও বেশী তাঁর অপমান! ত্রিস্তান আর রানীকে তিনি সত্যিই ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসার অপমানে তিনি হিংস্র হয়ে উঠেছেন। তাই বলে উঠলেন, দাও, রানীর বাঁধন খুলে ওদের হাতে দিয়ে দাও।

সোনালি এতক্ষণ একবারও কাঁদেননি। এবার, বাঁধন খুলে দেবার পর চিৎকার করে ছুটে এসে রাজার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, মহারাজ, যদি কখনো আমাকে একটুও ভালোবেসে থাকেন, তবে সে কথা মনে করে, আমাকে এখুনি মারুন। ওদের হাতে দেবেন না। আমাকে আপনি নিজের চোখের সামনে হত্যা করুন। মহারাজ—

রাজা ঘৃণায় রাণীকে পা দিয়ে ঠেলে দিয়ে বললেন, যাও, ঐ তোমার যোগ্য জায়গা!

রানী তবু আর্তকণ্ঠে বললেন, মহারাজ, আমি আপনার কাছে দয়া চাইবো না কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রাখা তো আপনারই কলঙ্ক। লোকে তো বলবে, আপনারই রানী—

রাজা গর্জন করে বললেন, এ রাজ্যে আজ থেকে যে রানীর নাম উচ্চারণ করবে, তাকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো!

কুষ্ঠীর দল আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলো। তারপর সকলে মিলে ঘিরে নিয়ে চললো সোনালীকে। সোনালি তখন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু চাইছেন। ইভান তাঁর গায়ে হাত দিতে এলে তিনি কুঁকড়ে কুঁকড়ে সরে যাচ্ছেন। সমবেত জনতার দীর্ঘশ্বাস, রানীর কান্না আর কুষ্ঠরোগীদের নিষ্ঠুর উল্লাসে কি মর্মান্তিক নিষ্ঠুর পরিবেশ!

হল্লা করতে করতে ওরা নিয়ে চললো রানীকে। জনতার এক অংশও বুক চাপা হাহাকারে চললো সঙ্গে সঙ্গে। সেই শ্মশানভূমিতে নিজের আসনে রাজা চুপ করে বসে রইলেন। একটাও কথা বললেন না। তাঁর মাথা ঝুলে পড়লো বুকের কাছে। সৈন্য-সামন্তরাও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! কেউই বুঝতে পারছে না এখন কি করবে। ঘটনার এত দ্রুত পরিবর্তনের ধাক্কা কেউ সামলাতে পারছে না। কাল সকালে এদেশ ছিল কী সুন্দর শান্তির দেশ, আর আজ সকালে এ কী দৃশ্য! সৈন্যরা অনেকে ভয় পেতে লাগলো, রাগে-শোকে-দুঃখে

মহারাজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন না তো?

কুষ্ঠরোগীরা এসে পৌঁছোলো পাহাড়ের গুহার কাছে। এই গুহার অন্ধকারে তাদের দিন কাটে। গুহার মুখে এসে রানীকে ঘিরে তারা নাচতে লাগলো। চোখ বন্ধ করে রানী দাঁড়িয়ে আছেন মাঝখানে, আর তাঁকে ঘিরে বিকৃতভাবে চিৎকার করছে একশোজন বিকলাঙ্গ মানুষ। এই দৃশ্য দেখেও সূর্য চোখ বোজেননি, বাতাস বন্ধ হয়ে যায়নি, মা বসুমতী কেঁপে ওঠেননি লজ্জায়। প্রকৃতি বড় উদাসীন, মানুষের সুখ-দুঃখ অনুযায়ী প্রকৃতির রূপ বদলায় না।

এদিকে পথের পাশের ঝোপে লুকিয়ে থেকে ছট্‌ফট্ করছে ত্রিস্তান। বার-বার গুরুকে বলছে, গুরু, আর কতক্ষণ এই রকম কাপুরুষের মতো বসে থাকবো? যদি সব শেষ হয়ে যায়, তারপর আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? এতক্ষণে হয়তো সোনালিকে পুড়িয়ে মেরেছে। না গুরুদেব, আমি যাই।

গুরু বললেন, আর একটু ধৈর্য ধরো! ওই যে দূরে একদল লোক আসছে, শুনি, ওরা কি বলে!

একদল লোক নিজেদের মধ্যে বিলাপ করতে করতে আসছিল। হায়, হায়! রাজা হঠাৎ এ কি রকম হয়ে গেলেন, তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! রানী যতই দোষ করে থাকুন, তাঁকে তিনি কুষ্ঠরোগীদের হাতে দিয়ে দেবেন? এতক্ষণ কুষ্ঠরোগীরা হয়তো রানীকে নিয়ে গুহায় পৌঁছেচে—ইস, ঐ নরকে ঢোকার আগে রানীর মরে যাওয়াই ভালো।

হলুদ বাঘ যেমন ঝোপ থেকে বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, সেইরকম বেগে গুরুকে নিয়ে অশ্বারোহী ত্রিস্তান বেরিয়ে এলো রাস্তায়—ছুটে চললো পাহাড়ের গুহার দিকে।

নাচ থামিয়ে ইভান তখন সঙ্গীদের বলছে, ভাইসব, আজ আমাদের জীবন ধন্য! কুষ্ঠরোগ দেবার জন্য আজ ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। ভাগ্যিস কুষ্ঠরোগী হয়েছিলাম, তাই তো রানী সোনালির মতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে পেলাম! কিন্তু, আমি তোমাদের সর্দার, প্রথম এক সপ্তাহ রানীকে একা একা ভোগ করবো। তারপর তোমরা এক এক করে। প্রথম সপ্তাহ রানী আমার! এসো রানী!

ইভান হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল রানীর দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে রুদ্র মূর্তিতে উপস্থিত হলো ত্রিস্তান। চেঁচিয়ে বললো, সাবধান ইভান! তুই বড় বেশী সময় রানীর পাশে থেকেছিস। বামন হয়ে তুই চাঁদের গায়ে ছায়া ফেলতে চাইছিস। সাবধান! আর এক মুহূর্তও যদি—

এতদিন পরে একজন নারীকে পেয়ে, তাও রানী সোনালির মতো রমণীশ্রেষ্ঠা—আবার হাতছাড়া হবার উপক্রম দেখে কুষ্ঠরোগীর দল ক্ষেপে উঠলো। ইভান চিৎকার করে উঠলো, ভাইসব, হুঁশিয়ার! যুদ্ধ! অমনি সব কটা কুষ্ঠী যে যার ক্র্যাচ, লাঠিসোঁটা উঁচিয়ে এলো মারমার শব্দে। সে কি হুড়োহুড়ি আর বীভৎস চিৎকার!

আপনারা যাঁরা এ কাহিনী শুনছেন, এবার একটা কথা বিচার করে দেখুন। অনেক অর্বাচীন কবি এইখানে লিখেছে যে, ত্রিস্তান নাকি তলোয়ারের কোপে ইভানের মাথা কেটে ফেলেছিল। আপনারাই বলুন হুজুর, তাও কখনো সম্ভব? ত্রিস্তানের মতো ওরকম মহৎ বীরপুরুষ কখনো একটা খোঁড়া লোকের গায়ে হাত তুলতে পারে? অমন উদার অন্তঃকরণ যার—সে কখনো দুর্বল, অস্ত্রহীন, অশক্তের গায়ে আঘাত করে না। আসল কথাটা আমি জানি হুজুর। ত্রিস্তান নয়, গুরু গরভেনালই রাগের মাথায় একটা ওক্ গাছের ডাল ভেঙে ইভানের মাথায় এমন জোরে মেরেছিলেন যে, তার মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে ছাতু হয়ে যায়। ত্রিস্তান তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে রানী সোনালিকে তুলে নিল সামনে, সেই ঘোড়ারই পেছনে তুলে নিল গরভেনালকে। তারপর ঘোড়ার মুখ ফেরালো বিপরীত দিকে। এক ঘোড়াতেই তিনজনে কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল দূরের জঙ্গলে।

এবার আরম্ভ হলো ওদের নির্বাসিত অরণ্য-জীবন। গভীর জঙ্গলের মধ্যে সারা দিন ওরা সতর্ক হয়ে লুকিয়ে থাকে। রাত্রিবেলা লতা পাতা বিছিয়ে ঘুমোয়, পরদিন আবার সে জায়গা ছেড়ে চলে যায়। এক জায়গায় কখনো বেশীক্ষণ থাকে না। কিন্তু ওদের কোনো কষ্ট নেই দুঃখ নেই। যারা ভালোবাসাকে জেনেছে তাদের কাছে দুগ্ধফেননিভ বিছানা আর তৃণশয্যায় কোনো তফাত নেই! তাদের কাছে বনের কণ্টকও মনে হয় কুসুম। প্রখর রোদ্দুরও মনে হয় চন্দনের মতো ঠাণ্ডা। রাত্রে যখন ত্রিস্তানের বিশাল বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকেন সোনালি, তখন মনে হয় ওরা স্বর্গের দুটি গন্ধর্ব, ছদ্মবেশে পৃথিবীতে রয়েছে।

একদিন বনের মধ্যে দুজন শিকারী এসেছিল, ত্রিস্তান আর গরভেনাল গাছের ওপর থেকে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের ওপর। ওদের তীর-ধনুক কেড়ে নিয়ে ত্রিস্তান বললো, তোমাদের প্রাণে মারলুম না। কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে সকলকে বলো, কেউ যদি এ অরণ্যে ঢোকে, তাহলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে

হবে না। আমি ত্রিস্তান, এ অরণ্য আমার!

ত্রিস্তানের তীর-ধনুক দরকার ছিল। জঙ্গলে তলোয়ার বেশী কাজে লাগে না। শিকারের জন্য তীর-ধনুক লাগে। হরিণ মেরে সেই মাংস পুড়িয়ে খায়। মাঝে মাঝে ত্রিস্তান ছোটোখাটো ডাকাতি করতে লাগলো। জঙ্গলে কখনো দু-একজন শিকারী ঢুকে পড়লেই ত্রিস্তান সঙ্গে সঙ্গে খুন করে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিত। সব সময় খুন করার দরকার না হলেও খুন করতো। যাতে তার নামে একটা সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। যাতে আর কেউ এসে তাদের শান্তি বিঘ্ন করতে সাহস না পায়। সত্যিই আশপাশের সবকটা রাজ্যে ত্রিস্তানের নামে একটা বিভীষিকা রটে গেল। সে তখন বেপরোয়া নিষ্ঠুর। তার সামনে পড়লে আর কারোর নিস্তার নেই।

তবু ওরা এক জায়গায় বেশীদিন থাকে না। জঙ্গলের একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যায়। ওদের পোশাক ছিঁড়ে ঝুলি ঝুলি হয়ে গেল, শরীর ক্ষতবিক্ষত, ধূলিমলিন। তবু ওদের কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। সোনালিকে আলিঙ্গন করে ত্রিস্তান যখন চুম্বন করে, তখনই ওর মনে হয় এই চুম্বন যেন মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এই ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থাতেই যেন ওরা মরতে পারে।

মাঝে মাঝে সোনালি যখন ঝরনার জলে স্নান করে, ত্রিস্তান তীরে বসে পাহারা দেয়, গরভেনাল তখন যান শিকারের সন্ধানে। ঝরনার স্বচ্ছ জলে সোনালির সম্পূর্ণ শরীর দেখতে দেখতে ত্রিস্তানের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মনে হয়, সোনালি যেন অলৌকিক মায়া। এত রূপ কি কোনো মানুষের হয়? এত রূপ বুঝি এই পৃথিবীতে মানায় না। পৃথিবীতে রূপের সঙ্গে অনেকখানি দুর্ভাগ্য জড়ানো। এ যেন স্বর্গ থেকে কোনো দেবী এসে জলকেলী করছে। এখুনি আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে। পাছে অদৃশ্য হয়ে যায়, এই ভয়ে ত্রিস্তান নিজেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনালিকে জড়িয়ে ধরে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে ওরা দেখলো বনের মধ্যে একটা পাতার কুটির। ওটা ঋষি অগরুর আশ্রম। খর্বকায়, বৃদ্ধ ঋষি ওদের দেখে বললেন, বুঝেছি, তোমরাই ত্রিস্তান আর সোনালি। এসো এসো।

ঋষি ওদের ফলমূল খেতে দিলেন। তারপর বললেন, আমি কয়েকদিন আগে নগরে গিয়েছিলাম। তোমাদের কথা শুনে এলাম। শোনো ত্রিস্তান, রাজা ঘোষণা করেছেন, যে তোমাকে ধরতে পারবে, তাকে তিনি দশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার দেবেন! কর্নওয়ালের প্রতিটি নাইট শপথ করেছে, তোমাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় বন্দী করবেই।

এ কথায় ত্রিস্তান সামান্য হাসলো।

ঋষি আবার মৃদু স্বরে বললেন, শোনো ত্রিস্তান, পাপী যদি তার পাপের জন্য অনুতাপ করে, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেন। ত্রিস্তান, এখনও সময় আছে, তুমি অনুতাপ করো।

ত্রিস্তান অবাক হয়ে বললো, অনুতাপ করবো? কেন? আমি তো কোনো পাপ করিনি! ভালোবাসা কি পাপ? আমি সোনালিকে ভালোবাসি, এ কথা আমি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে বলবো। আমি সারাজীবন বনে জঙ্গলে ফলমূল কাঁচা মাংস খেয়ে থাকবো, যদি সোনালি সঙ্গে থাকে। সোনালিকে হারিয়ে আমি পুরো পৃথিবীর সম্রাটও হতে চাই না!

—তুমি চঞ্চল, ত্রিস্তান। তোমার ভালোবাসায় তুমি এ জীবনের সুখও হারালে, পরপারের জীবনেও সুখ পাবে না। যে লোক তাঁর প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার শাস্তি, দুই ঘোড়ার মাঝখানে তাকে বেঁধে চিরে ফেলা! মরার পর যেখানে তার ছাই ফেলা হয়, সেখানে আর ঘাস গজায় না। আশেপাশের গাছপালা মরে যায়। ত্রিস্তান, এখনো তুমি রানীকে ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও তাঁর স্বামীর কাছে, ধর্মমতে অগ্নিসাক্ষী করে যাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও।

-রানীর কোনো স্বামী নেই! রাজা ওঁকে কুষ্ঠরোগীদের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন, আমি তাদের কাছ থেকে ওঁকে কেড়ে এনেছি। ওঁর ওপর রাজার আর কোনো অধিকার নেই। এখন ও আমার। কেউ ওঁকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

রানী তখন ঋষির পায়ের কাছে বসে কাঁদতে লাগলেন। অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, আমি হতভাগিনী, কিন্তু আমরাও কোনো পাপ করিনি। কোনো পাপ করিনি। আমরা যে দুজনের কাছে দুজনে বাঁধা।

ঋষি বললেন, আবার বলছি, ত্রিস্তান, এখনো অনুতাপ করো!

—না, আমি অনুতপ্ত হবো না। যদি ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা না করেন, আমিও ঈশ্বরকে ক্ষমা করবো না। আমি এই জঙ্গলের রাজা হয়ে থাকবো। কারুর সাধ্য নেই, আমাকে বাধা দেয়। ঈশ্বরেরও না। এসো সোনালি!

ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলে গেল বনের মধ্যে। কিছুক্ষণ ওদের পদশব্দ শোনা গেল।

এবার গভীর জঙ্গলের মধ্যে ওরা একটা ছোট্ট পাতার কুঁড়েঘর তৈরি করলো। রাত্তির বেলা গরভেনাল আর ত্রিস্তান পালা করে জেগে পাহারা দেয়। অনেকদিন

আর কেউ এলো না ওদের ব্যাঘাত করতে।

একদিন গরভেনাল বনের মধ্যে ঘুরছেন, দূরে দেখলেন একজন অশ্বারোহী নাইট। এ সেই বদমাইস চারজন নাইটের মধ্যে সবচেয়ে বদমাইশটি। রাজার পুরস্কারের ঘোষণা শুনে ববং নিজের বীরত্ব দেখাবার অতি উৎসাহে একা এসেছে বনে। চুপি চুপি চোরের মতো এগোচ্ছে। যদি গোপনে দূর থেকে ত্রিস্তানকে খুন করতে পারে, এই ইচ্ছে! গরভেনাল ওকে দেখে একটা বড় গাছের ওপর উঠে বসে রইলেন। ধনুক বাগিয়ে এক পা এক পা করে আসছে নাইট। ঝুপ করে তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন গরভেনাল। কিন্তু বয়েস হয়েছে, গরভেনাল শক্তিতে পারলেন না সেই তরুণ নাইটের সঙ্গে। নাইট হঠাৎ গরভেনালকে নিচে ফেলে তলোয়ার বসিয়ে দিলো। গরভেনাল মৃত্যু-চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

আওয়াজ শুনে ছুটে এলো ত্রিস্তান। গরভেনাল শুধু মরার আগে শেষ কথা বললেন, ত্রিস্তান, প্রতিশোধ! ত্রিস্তান রক্তচক্ষে তাকালেন নাইটের দিকে। তাকে যুদ্ধ করতেও হলো না। নিজের তরবারি দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করতেই নাইটের হাত থেকে তলোয়ার খসে গেল। ত্রিস্তান পাগলের মতো নাইটকে তলোয়ারে বারবার আঘাত করতে লাগলো। নাইটের মৃত্যুর বহু পরেও থামলো না। তারপর নাইটের মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে, শুধু ধড়টা বেঁধে দিল ঘোড়ার সঙ্গে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারতেই ঘোড়া ছুটে গেল শহরের দিকে। ত্রিস্তান তার দুঃখ-দুর্দিনের বন্ধু, গুরু গরভেনালের মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো শিশুর মতো।

কান্না শুনে সোনালিও ছুটে এলেন। দেখলেন, গুরু গরভেনালের রক্তমাখা বুকের ওপর শুয়ে ত্রিস্তান ছটফট করছে। সোনালি অনেক রকম ওষুধ জানতেন। কিন্তু, গরভেনালকে পরীক্ষা করে দেখলেন, তিনি সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন। তাঁর মুখ প্রশান্ত।

ত্রিস্তানের আবাল্যসঙ্গী গরভেনাল। তিনি বিবাহ করেননি, তাঁর সন্তান নেই বলেই বোধহয় ত্রিস্তানকে তিনি নিজের সন্তানের মতো দেখেছিলেন। ত্রিস্তান যখন নিজের রাজ্য ছেড়ে আসে, তিনিও এসেছেন ওর সঙ্গে। ত্রিস্তানের প্রতিটি কাজে ছিল তাঁর সমর্থন। ত্রিস্তান-সোনালির ভালোবাসার কথা জেনে, তিনি সব সময় ওদের সাহায্য করেছেন। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যাতে ওরা সুখী হয়।

ত্রিস্তান-সোনালির অরণ্য-জীবনে এই প্রথম অমঙ্গল। নির্বাসিত হয়ে ওরা

সুখে ছিল, জীবনে এমন সুখ ওরা আর কখনো পায়নি। খাদ্য নেই, বাসস্থান নেই, পোশাক ছিঁড়ে গেছে, তবু ওরা পেয়েছিল পরম সুখ। এই প্রথম দেখা দিল অশুভ সঙ্কেত।

ত্রিস্তানকে টেনে তুললো সোনালি। তারপর বনের মাটি খুঁড়ে গরভেনালকে কবর দিয়ে অনেকক্ষণ স্থিরশব্দে বসে কাঁদলো দুজনে।

কিছুদিন পর আবার সরল সুখে দিন কাটছিল ওদের। গ্রীষ্ম কেটে গিয়ে শীত এলো। সমস্ত অরণ্য ঢেকে গেল বরফে। ঝুরঝুর করে সারাদিন বরফ পড়ে। ওদের গরম পোশাক নেই, সাধারণ পোশাকও ছিঁড়ে গেছে। তবু ওদের কোনো কষ্ট নেই, শীত নেই। দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করলেই মনে হয়, সমগ্র পৃথিবী উষ্ণ হয়ে গেছে।

শীতের পর আবার বসন্ত এলো। নরম রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগলো অরণ্যের রাশি রাশি ফুল। ত্রিস্তান ছেলেবেলা থেকেই একটা বিদ্যে জানতো। পাখিদের অনুকরণ করে ও ঠিক পাখির মতো ডাকতে পারতো। কুটিরের দরজায় বসে বসে ও যখন বনের পাখিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শিস দিয়ে ওদের মতো গান গাইতো, সোনালি হেসে লুটিয়ে পড়তেন। ত্রিস্তানের ডাক শুনে হাজার হাজার পাখি এসে বসতো ওদের কুটিরের সামনে। রানী মাঝে মাঝে অভিমান করে বলতেন, ত্রিস্তান, তোমার ডাক শুনে শুধু মেয়ে পাখিরাই আসে। ত্রিস্তান, তুমি বুঝি অন্য মেয়ে চাও ?

ত্রিস্তান হেসে বলতো, না সোনালি, তোমাকে ছাড়া সারা জীবন আমি অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করিনি। করবোও না।

এবার শুনুন প্রভু, এক অদ্ভুত ঘটনা। একদিন ত্রিস্তান সারাদিন শিকারের জন্য ছোটাছুটি করছিল। হঠাৎ এক সময় ত্রিস্তানের পা মচকে গেল। তখন সে শিকার ছেড়ে ফিরে এলো কুটিরে।

ত্রিস্তান ফিরে আসতেই সোনালি বললেন, একি ত্রিস্তান, তোমাকে এমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে ? ত্রিস্তান বললো, সখী, আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। আমি একটু শুয়ে থাকি। পোশাক খোলারও তর সইলো না, সেই বারান্দাতেই শুয়ে রইলো ত্রিস্তান। তলোয়ারটা পাশে খুলে রাখলো। যেমন সব সময় রাখে, যদি হঠাৎ কোনো বিপদ এসে যায় ! রানীও ত্রিস্তানের পাশে শুয়ে ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। এমন সময় ওঁরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লেন। রানী আর ত্রিস্তান পাশাপাশি।

এদিকে হয়েছে কি, একজন কাঠুরে তার আগের দিন দূর থেকে ত্রিস্তানের

কুটির দেখতে পেয়েছিল। ত্রিস্তানকে চিনতে পেরেই সে ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কথাটা গোপন রাখতেও সে ছটফট করেছে। শেষকালে, সন্ধেবেলা রাজা মার্কের কাছে গিয়ে বললো, মহারাজ, আপনার সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে। রাজা আড়ালে গিয়ে যখন কাঠুরের কথা শুনলেন, তখন বললেন, তুমি সেই জায়গা আমাকে চিনিয়ে দিতে পারবে ? যদি না পারো, তোমার তাহলে মৃত্যু !

পরদিন, রাজা কারুকে কিছু না বলে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একা বেরিয়ে পড়লেন কাঠুরের সঙ্গে। কাঠুরে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েই পালালো। রাজা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন, তাঁর অভিমান-ভরা হৃদয়ে তিনি শপথ করলেন, আজ তিনি বা ত্রিস্তান দুজনের একজন মরবে।

সেই সময়ই ত্রিস্তান আর সোনালি পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে। মাঝখানে খোলা তলোয়ার। রাজার মুখ কঠিন হয়ে এলো।

রাজা তলোয়ার তুলে ত্রিস্তানকে খুন করতে গিয়েও হঠাৎ এক মুহূর্ত থেমে গেলেন। হঠাৎ তিনি ভাবলেন, ওরা শুয়ে আছে পাশাপাশি, অথচ মাঝখানে খোলা তলোয়ার কেন ? প্রেমিক-প্রেমিকা কি এভাবে শুয়ে থাকে ?

ওদের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ রাজার বুক দুলে উঠলো। কতদিন পর তিনি দেখছেন ত্রিস্তান আর সোনালিকে—যারা এক সময়ে ছিল তাঁর দু'চোখের দুই মণি। ঘুমন্ত মানুষের মুখ বড় সরল দেখায়। ঘুমন্ত মানুষের ওপর অতি পাষণ্ডও রাগ করতে পারে না। রাজা ভাবলেন, তাহলে ওরা কি নিরপরাধ ? আমি আগাগোড়াই ভুল ভেবেছি ? এ কথা তো সারা পৃথিবী জানে যে, নারী ও পুরুষের মাঝখানে খোলা তলোয়ার রেখে দেওয়া মানে তাদের সম্পর্ক পবিত্র। ওরা যদি উন্মাদের মতো পরস্পরকে ভালোবেসে থাকে, তাহলে কি শুয়ে থাকবে এ রকম নিষ্পাপ ভঙ্গীতে, পাশাপাশি অথচ দুজন দুজনকে না ছুঁয়ে ?

যাই হোক, আমি এখন ওদের খুন করতে পারি না। ঘুমন্ত মানুষকে খুন করলে, জীবনে আমার সে অপবাদ দূর হবে না ! আর যদি ত্রিস্তানকে জাগিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য ডাকি,…তা হলে · তা হলে, ত্রিস্তান যদি আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তলোয়ার না ছোঁয়, তবে, তখন আমি ওকে মারতেও পারব না—

আহা কি চেহারা হয়েছে ওদের ! ঐ ত্রিস্তান, যে ছিল আমার রাজ্যের সেরা সুপুরুষ, তার আজ কি হতভাগ্যের মতো দশা ! আর এই আয়ার্ল্যান্ডের রাজকুমারী, ত্রিস্তান ওকে জয় করে এনেছিল আমারই জন্য। ওর মতো রূপসী এ রাজ্যে কেউ কখনো দেখেনি, সে কিনা শুয়ে আছে শুকনো মাটিতে, ছেঁড়া পোশাকে !

ঈশ্বর কাকে কোথায় নিয়ে যান কে জানে ! যাক্ তোমাদের যেমন ইচ্ছা থাকো, আমি আর বাধা দেবো না। হয়তো তোমরাই সুখী, আমি স্বার্থপর হয়ে তোমাদের বিঘ্ন ঘটাচ্ছি। থাক, তোমরাই সুখে থাকো। আমি চলে যাই !

রাজা হাঁটু মুড়ে বসে আলতোভাবে সোনালির একটা হাত তুলে নিলেন। কত রোগা হয়ে গেছে ! বিয়ের দিন রাজা যে আংটি দিয়েছিলেন, সেটা আঙুলে ঢল্ ঢল্ করছে। রাজা আস্তে আস্তে আংটিটা খুলে নিলেন। তারপর, বিয়ের দিন যে আংটিটা সোনালি তাঁকে দিয়েছিলেন, নিজের হাত থেকে সেই আংটিটা খুলে রানীর হাতে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলেন। আংটি বদল হবার পর সোনালির হাতে একবার আলতোভাবে চুমু খেয়ে নামিয়ে রাখলেন হাত। ওদের মাঝখান থেকে তলোয়ারটা তুলে নিলেন এবার। এই সেই ডগা-ভাঙা তলোয়ার, যা দিয়ে ত্রিস্তান মোরহল্টকে হত্যা করেছিল, রাজা চিনতে পারলেন। এই তলোয়ার তাঁর রাজ্যের গর্ব। রাজা ত্রিস্তানের তলোয়ারটা নিজের খাপে ঢুকিয়ে, নিজের মণি-মুক্তাখচিত তলোয়ার রেখে দিলেন সে জায়গায়।

রাজা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, বিদায় ! তোমরা যদি সুখে থাকতে পারো, থাকো। আমি আর তোমাদের বাধা দেবো না। তারপর রাজা বেরিয়ে গেলেন।

ঘুমের মধ্যে সোনালি স্বপ্ন দেখলেন, দুটো সিংহ যেন তাঁকে পাবার জন্য লড়াই করছে প্রচণ্ডভাবে। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, জড়িয়ে ধরলেন ত্রিস্তানকে। সোনালির চিৎকার শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে তলোয়ার চেপে ধরলো ত্রিস্তান। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, একি ! ত্রিস্তান তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলো রাজার তলোয়ার। সোনালিও নিজের হাতের আংটির দিকে চেয়ে কেঁদে উঠলেন, ত্রিস্তান, আর রক্ষা নেই। রাজা আমাদের খুঁজে পেয়েছেন।

রাজা আমার তলোয়ার নিয়ে গেছেন ! বোধহয় একা এসেছিলেন, ভয় পেয়ে পালিয়েছেন। আবার ফিরে আসবেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে। আমাকে ধরে আবার পুড়িয়ে মারতে চান। চলো সোনালি, আর দেরী নয়, আমাদের পালাতে হবে !

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ওরা ছুটে পালাতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে চলে গেল একেবারে সেই অরণ্যের অন্য প্রান্তে, ওয়েলস্ দেশের সীমানার কাছে।

হায়, ভালোবাসা ওদের আর কত দুঃখ দেবে !

অরণ্যের অন্য প্রান্তে গিয়ে ওরা আবার বাসা বাঁধলো। কয়েকদিন পর ওরা আবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

একদিন কুটিরের সামনে ওরা বসে আছে, বসে বসে নানান্ গল্প করছে, এমন সময় সামনে দিয়ে ছুটে গেল একটা সুন্দর হরিণ। হরিণটা একটু অন্যরকম, সবুজ ঘেঁষা রং, সারা গায়ে হলুদ ছিট্ ছিট্। সোনালি বললো, আমায় ঐ হরিণটা ধরে দাও না! মেরো না, জীবন্ত ধরে দাও, আমি ওটাকে পুষবো।

হুজুর, এই জায়গাটা শুনে আপনাদের রামায়ণের কথা মনে পড়ে না? সেই দণ্ডক বনের কুটির প্রাঙ্গণে বসে আছেন রাম আর সীতা, সামনে দিয়ে ছুটে গেল সোনার মায়া হরিণ! কিন্তু ত্রিস্তান তো রামায়ণ গাথা জানে না!

তখনি ত্রিস্তান তীর ধনুক নিয়ে ছুটলো। ছুটতে ছুটতে যে কতদূর চলে গেল তার ঠিক নেই। তরুণ মৃগ বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছে, তার সঙ্গে ত্রিস্তান ছুটে পারবে কেন? অথচ ত্রিস্তান বাণও মারতে পারছে না, কারণ সোনালি ওটা জীবন্ত চেয়েছে। ছুটতে ছুটতে ত্রিস্তান ক্লান্ত হয়ে গেল। দূরে মিলিয়ে গেল হরিণটা। ক্লান্ত ত্রিস্তান সেখানেই ঘাসের উপর শুয়ে পড়লো।

মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ। ঠাণ্ডা বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে। একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ত্রিস্তানের হঠাৎ মনে হলো, রাজা কি সেদিন সত্যিই ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন? কেন, আমি তো ছিলাম ঘুমিয়ে। আমার প্রাণ তো ছিল রাজারই হাতে। অথবা, আমার তলোয়ার সরিয়ে নিয়ে উনি তো আমাকে জীবন্ত অবস্থাতেও বন্দী করতে পারতেন। যদি আমার তলোয়ার সরিয়ে নিলেনই, তবে আবার নিজের বহুমূল্য তলোয়ারটা রেখে গেলেন কেন? মহারাজ, মহারাজ, আমি তোমাকে চিনি! তোমার বুকের স্নেহ মমতা আবার ফিরে এসেছে। আমাকে মারতে গিয়ে তোমার মনে পড়েছে সেই বালকটির কথা, যে তোমার পায়ের কাছে বসে বীণা বাজাতো। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো! কিংবা ক্ষমা হয়তো নয়, রাজা বুঝতে পেরেছেন, ঈশ্বর আমারই পক্ষে। নইলে বারবার আমি বেঁচে গেলাম কেন? গির্জার জানালা দিয়ে লাফিয়েও মরিনি, তার মানে ভগবান আমাকে মারতে চান না। হয়তো আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে রাজার সব পুরনো কথা মনে পড়েছিল। মোরহল্টের সঙ্গে আমার যুদ্ধ, আয়ার্ল্যাণ্ড অভিযান, ওঁর জন্য আমার নিজের রাজ্য ছেড়ে আসা।

কিংবা উনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে উনি অন্যায় করেছেন। আমাকে বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কেন, আমি কি যে-কোনো লোককে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিনি? কার সাধ্য ছিল আমার নামে অভিযোগ আনার? রাজা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, আমার মতো বন্ধু উনি আর পাবেন না। ওঁর বিপদের সময় আমার মতো নিঃস্বার্থভাবে আর কে ওঁর পাশে দাঁড়াবে?

আবার কি উনি আমায় ফিরিয়ে নিতে চান ওঁর রাজ্যে ? আবার আমি বর্ম পরে যুদ্ধে যাবো রাজার শত্রুকে জয় করতে ? আবার আমি ওঁর সামনে বসে বীণা বাজাবো ? না !...এসব আমি কি আবোলতাবোল ভাবছি ! আমার কি মাথা খারাপ ! রাজার কাছে আমার ফিরে যাওয়া মানেই তো সোনালিকে ফিরিয়ে দেওয়া। আমার কাছ থেকে সোনালিকে নেয় কার সাধ্য !

মহারাজ, মহারাজ, তুমি ঘুমের মধ্যে সেদিন আমাকে হত্যা করলে না কেন ? সে যে অনেক ভালো ছিল। এ আমি কি দুর্ভাবনায় পড়লাম। সোনালিকে আমি বারবার জয় করেছি। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে, তোমার হাত থেকে, কুষ্ঠরোগী-দের কাছ থেকে। কিন্তু তুমি সেদিন যে করুণা দেখালে, তাতে এই একবার তুমিও জয় করেছো, তুমিও রানীকে জয় করেছো। সোনালি ছিল তোমার পাশে রানী, আর এখানে, আমার পাশে এসে, ও হয়েছে ভিখারিনী। ওর সোনার যৌবন বনে-জঙ্গলে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে নষ্ট হচ্ছে। কত মখমল, সিল্কের পোশাক ছিল ওর, আজ ভাল করে লজ্জা নিবারণ করতে পারে না। সোনার পালঙ্কে কি কোমল শয্যায় ও শুয়ে থাকতো, আজ শুয়েছে কঠিন পাথরে। আমারই জন্য। সবই আমার জন্য। আমি ওকে এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে টেনে এনেছি। হা ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও। আমার নিজের সুখের জন্যে সোনালিকে এত কষ্ট দেবো কেন ? ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দাও, শক্তি দাও, আমি সোনালিকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

রাজাই তার স্বামী, পবিত্র ধর্মমতে ওঁকে বিয়ে করেছেন সকলের সামনে। আমি কে ? আমি একটা চোর।

সেদিন সারারাত আর ত্রিস্তান কুটিরে ফিরে গেল না। ঐখানে, বনের মধ্যে মাটিতে শুয়ে একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার কান্না শুনলো অরণ্যের পশুরা আর আকাশের তারাদল। হয়তো সেই কান্না শুনেই হিংস্র জন্তুরা ত্রিস্তানের ক্ষতি করতেও এলো না।

ওদিকে কুটিরে সোনালি সারারাত জেগে আছেন। এতদিনের মধ্যে এই প্রথম এক রাত্রিতে ত্রিস্তান তাঁর সঙ্গে নেই। নিজের জন্য ভয় নেই তাঁর, ভয় হচ্ছে ত্রিস্তানের জন্য। হরিণ ধরতে গিয়ে কোথায় গেল ? রাজা মার্কের ফিরিয়ে দেওয়া আংটিটা দেখে সোনালির অনেক কথা মনে হতে লাগলো। যে লোক আমাকে কুষ্ঠরোগীদের হাতে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, সেই লোকই এবার আমাকে না মেরে, আংটিটা শুধু ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন ! রাজার মনে ফিরে এসেছে স্নেহ, মমতা। আমাকে উনি কত স্নেহ করেছেন, ভালোবেসেছেন। এই বিদেশে

আমাকে কোনো দুঃখ পেতে দেননি। কিন্তু আমি এলাম এ রাজ্যে কুগ্রহ হয়ে। রাজা কত ভালোবাসতেন ত্রিস্তানকে—আর আজ! যে ত্রিস্তান রাজা মার্কের জন্য নিজের রাজ্য পর্যন্ত ছেড়ে এলো, আজ সেই রাজ্যই ওর প্রধান শত্রু। কার জন্য? ত্রিস্তানের ছেলেবেলার নাম দুঃখ। সারাজীবন ওকে দুঃখই পেতে হলো কার জন্য? আমার, আমার—। আজ ত্রিস্তানের কোথায় থাকার কথা, সে এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ, তার বীরত্বের খ্যাতি পৃথিবীময়, জমকালো পোশাক পরে সে সাদা ঘোড়ায় রাজপথ দিয়ে যাবে—লোকে তার দিকে তাকাবে গভীর সম্মানের চোখে···তার বদলে, আজ সে ছন্নছাড়ার মতো বনে জঙ্গলে ঘুরছে, তার পোশাক নেই, তার কোনো আনন্দ নেই। বীর যোদ্ধা কখনও দিনের পর দিন যুদ্ধ না করে, নিজের শক্তির পরিচয় না দিযে থাকতে পারে? পাখি যেমন ওড়ে, বীর নাইট তেমনি যুদ্ধের চর্চা করে। তার বদলে এখানে সামান্য জীবজন্তু শিকার করা তার একমাত্র কাজ। রাজার যে সৈন্যরা একসময় তাকে দেখলেই অভিবাদন করতো, আজ তারাও ওকে দেখলে পশুর মতো তাড়া করবে শুধু আমার জন্য। শুধু আমার জন্য! হে ভাগবান, আমার জন্য ত্রিস্তানের এই দুর্ভাগ্য! বীর পুরুষকে সামান্য মানুষের মতন জীবন কাটাতে দেখলে মেয়েরা কখনও সুখী হয় না।

এক সময় বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল। ভোরেব আলো ফোটাব সঙ্গে সঙ্গে ত্রিস্তান ফিরে আসছে। বিষণ্ণ তার মুখ। আজ সে এসেই সোনালিকে জড়িযে ধরলো না। সোনালি তাড়াতাড়ি এসে ত্রিস্তানেব পোশাক খুলে দিতে লাগলেন। তলোয়ারটা যখন ত্রিস্তানের কোমর থেকে খুলেছেন, তখন ত্রিস্তান গম্ভীর স্বরে বললো, এ তলোয়ার রাজার, এটা তিনি আমাদের বুকে বসিয়ে দিতে পারতেন, তার বদলে উপহার দিয়ে গেছেন।

সোনালি সেই তলোয়ারের মুক্তো বসানো বাঁটে চুমু খেলেন। দু ফোঁটা জল এলো তাঁর চোখে। সেদিন দুজনের কেউ আর কোনো কথা বলতে পারলো না। · হয়তো, মনে মনে ওরা দুজনে ভাবছে একই কথা।

দু-তিন দিন পর, ত্রিস্তান ধীর স্বরে সোনালিকে বললো, সখী, আমি ভেবে দেখলাম তোমার রাজার কাছে ফিরে যাওয়াই উচিত। রাজার মন থেকে রাগ পড়ে গেছে, তিনি তোমাকে বোধহয় ফিরে পাবার জন্য কাতর। আমার জন্য তুমি এত কষ্ট সহ্য করবে এ যে আমি আর সহ্য করতে পারি না। তুমি রাজার মেয়ে, তোমার কি এত কষ্ট সহ্য করবার কথা ছিল? আমি ছেলেবেলা থেকেই দুঃখ কষ্টকে চিনি। কিন্তু, তোমার এই সোনার অঙ্গ—না, না, সোনালি—

তোমার রাজার কাছে ফিরে যাওয়াই ঠিক, রাজা যদি আমাকেও ফিরিয়ে নেন, তবে আমি তাঁর সেবা করবো। অথবা আমি চলে যাবো অন্য রাজ্যে। আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। কিন্তু আমার জন্য তোমাকে আর কষ্ট সইতে দেবো না।

সোনালি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, সত্যি ত্রিস্তান, আমার জন্য তুমি কেন এত কষ্ট সহ্য করবে? আমি এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে তোমার দুঃখ যাবে না। ত্রিস্তান, তুলে নাও তোমার তলোয়ার। আমার বুকে বসিয়ে দাও। ত্রিস্তান, ভালোবাসা কোনো মূল্য চায় না। তোমাকে ভালোবেসে আমি স্বর্গ পেয়েছি, কিন্তু তার জন্যে তোমার জীবনে এত মূল্য দিতে হবে কেন! আমার মৃত্যুই একমাত্র সমাধান!

ত্রিস্তান দুই করতলে তুলে ধরলো রানীর মুখ। দেখলো, সে মুখ বড় বিমর্ষ, ম্লান। আস্তে আস্তে সে বললো, সোনালি, মৃত্যু যদি সমাধান হয় তবে মৃত্যু আসা উচিত আমার। সে মৃত্যু তো আমি পেয়েছি, বহুবার, তোমার ঐ বুকের মধ্যে। তোমার বুকে মাথা রেখে আমি যে সুখ পেয়েছি, তা মৃত্যুর মতোই তীব্র। কিন্তু সত্যি সত্যি শারীরিকভাবে মরতে আমি পারি না, তাহলে যে তোমাকে আর দেখতে পাব না। কিংবা দেখতে যদি নাও পাই, তুমি কোথাও বেঁচে আছো, সুখে আছো, জানতে পারলেই আমার সুখ। তুমি আমার দুঃখের কথা বলছো? দেখো, আমার জন্ম থেকেই আমার সারা শরীরে দুঃখের অজস্র চিহ্ন—যেদিন থেকে আমার মা মারা যান। দুঃখ কষ্ট আমার অঙ্গের ভূষণ। সোনালি, আমার মায়ের মৃত্যুর কথা আমি অনেক পরে শুনেছি। বড় দুঃখ পেয়ে মরেছেন তিনি। তোমাকে দেখলেও আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। তোমাকে আর আমি দুঃখ সইতে দিতে পারি না। দুঃখ তোমাকে মানায় না। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে কখনো তো তুমি দুঃখের মুখ দেখোনি!

—ত্রিস্তান, আমার দুঃখ কোথায়! তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই তো আমার সারাজীবন দুঃখে কেটেছে। তোমার ভালোবাসা আমাকে যে সুখ দিয়েছে, পৃথিবীতে কোনো নারী সে সুখ কখনও পায়নি!

—না, সোনালি, আমার মনে অপরাধবোধ এসেছে। আমার মনে হয় এখন, রাজার কাছ থেকে আমি তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি শুধু আমার নিজেরই স্বার্থে। তোমাকে দেবার মতো আমার আছে শুধু ভালোবাসা, আর তো কিছু নেই। তোমার এই জীর্ণ পোশাক, আজ তোমার শরীরের রং জ্বলে যাচ্ছে রোদ্দুরে-শীতে, এ তো আমারই জন্যে।

—আর তোমার রুক্ষ শরীর, ছেঁড়া-পোশাক আজ কার জন্য!

—সে তো আমার প্রাপ্য ! আমি হীন চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—আমাকে এ চেহারাতেই মানায়। কিন্তু তুমি রানী, আমার জন্য তোমার এই দুর্দশা কেন ? তুমি রাজার কাছে ফিরে যাও। তাঁর সেদিনের ব্যবহার দেখে মনে হয়, তিনি আমাদের ক্ষমা করেছেন ! তিনি আবার তোমাকে ভালোবাসবেন, তোমার যোগ্য সম্মান দেবেন। আমি দূরে সরে যাবো।

সোনালি একটা বিরাট নিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, চলো ত্রিস্তান, আমরা ঋষি অগরুর আশ্রমে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে দয়া প্রার্থনা করি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা আবার চলে এলো ঋষির আশ্রমে। ঋষি ওদের দেখে চমকে উঠলেন। বললেন, ইস্, একি চেহারা হয়েছে তোমাদের ? দেখো, ভালোবাসা তোমাদের কতদূরে নিয়ে গেছে ! ত্রিস্তান, এখনও অনুতপ্ত হও, অনুতাপ ছাড়া মুক্তি নেই।

ত্রিস্তান গম্ভীরভাবে বললো, ঋষি, আপনি রাজার সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপনের একটা ব্যবস্থা করে দিন। আপনি রাজাকে চিঠি লিখে দিন যে রানীকে ফেরত পাঠাতে প্রস্তুত আমি, যদি তিনি তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। আমি নিজে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো—তাঁর আর চক্ষুশূল হবো না, কিন্তু রানীর সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তাঁকে !

সোনালি অগরুকে বললেন, প্রভু, আমি আমার ভালোবাসার জন্য একটি অনুতাপের বাক্যও উচ্চারণ করতে চাই না। কিন্তু আমাদের এ অবস্থার শেষ হোক।

ঋষি অগরু তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে রাজার রাজা, শেষ পর্যন্ত তুমি সব মানুষকেই সুমতি দাও ! ধন্য তোমার করুণা।

ত্রিস্তান তা দেখে অভিমানী মুখে, মনে মনে বললো, না, আমি ঈশ্বরের ভয়ে সোনালিকে ফিরিয়ে দিতে আসিনি। পাপের জন্য আমি অনুতাপও করছি না। আমি সোনালিকে ফিরিয়ে দিতে চাই অন্য কারণে। ঋষি, তুমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি সে কথা বুঝবে না !

ঋষি তারপর চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠি লেখা শেষ হলে তিনি ওদের চিঠিটা পড়ে শোনালেন। ত্রিস্তান চিঠিতে নিজের আংটির ছাপ দিয়ে দিলেন।

ঋষি জিগ্যেস করলেন, কে চিঠি নিয়ে যাবে ?

ত্রিস্তান উত্তর দিল, আমি।

—না, না, তা হয় না। তোমাকে দেখলে প্রহরীরা কোনো কথা শোনার আগেই হয়তো হত্যা করবে। না, ত্রিস্তান তুমি না !

—ঋষি, যদি মরার হতো, বহু আগেই তাহলে আমি মরে যেতাম। আমার পক্ষে মরা বড় কঠিন। ও চিঠি আমিই নিয়ে যাবো!

সেদিন সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসার পর ত্রিস্তান ঋষির কাছ থেকে একটা কালো কাপড় চেয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে মুখ ঢেকে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়লো। বন পেরিয়ে সোজা চলে এলো দুর্গের প্রাচীরের কাছে। ততক্ষণে প্রায় মধ্যরাত। সেখানে ঘোড়া বেঁধে, লাফিয়ে পার হল প্রাচীর। তারপর উদ্যানের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে এলো রাজার শয়ন ঘরের নীচে। কেউ তাকে সন্দেহ করেনি। তা ছাড়া সন্দেহ করবেই বা কে? কেউ কি কল্পনা করতে পারে ত্রিস্তান একা এসে ঢুকবে রাজপুরীতে? ওকে কেউ চিনতে পারলেও বিশ্বাস করতো না। হয়তো ভাবতো ভূত দেখছে।

ত্রিস্তান অনুচ্চ স্বরে তিনবার ডাকলো, মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ!

সেই ডাক শুনে রাজা মার্কের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ভাবলেন, তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এসে বললেন, কে ডাকছো আমায় এত রাত্রে? কে তুমি?

—মহারাজ, আমি ত্রিস্তান।

—কে, কি নাম বললে?

—ত্রিস্তান।

—ত্রিস্তান? কোন ত্রিস্তান? এদিকে আলোর কাছে এসো!

আমি সেই পুরনো ত্রিস্তান। মহারাজ, আপনার কাছে একটা চিঠি দিচ্ছি, কাল এর উত্তর লিখে ঝুলিয়ে দেবেন বনের সীমান্তে শুকনো ওক্ গাছে!

ঠক্ করে শব্দ হয়ে একটা তীর এসে পড়লো রাজার পায়ের কাছে। তার মাথায় বাঁধা চিঠি। রাজা ডেকে উঠলেন, ত্রিস্তান, ত্রিস্তান, একটু দাঁড়াও!

কোনো উত্তর নেই আর। রাজা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন বারান্দায়। বাগান তখন শূন্য—যতদূর দেখা যায় শুধু চাঁদের আলোর স্তব্ধতা। রাজা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, ত্রিস্তান, ত্রিস্তান, ওরে একটু দাঁড়া, একবার তোকে দেখি, ত্রিস্তান, ত্রিস্তান—

রাজার আকুল ডাক হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল। ত্রিস্তান তখন বহু দূরে। চিৎকার শুনে প্রহরীরা ছুটে এসে দেখলো রাজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাগলের মতো কাঁদছেন।

সেই রাত্রেই রাজা মার্ক সমস্ত সভাসদ এবং অভিজাত রাজপুরুষদের ডেকে পাঠালেন। ঘুম চোখে সবাই উঠে আসতেই রাজা বললেন, আপনারা শুনুন ত্রিস্তান কি লিখেছে। মুন্সী, পড়ে শোনাও তো চিঠিটা।

সভাসদরা মাঝরাত্রে এই কাণ্ড দেখে অবাক। প্রৌঢ় রাজার একি নব যুবকের মতো উৎসাহ। আসলে এক ধরনের মানুষ থাকে, যাদের হৃদয়ে ভালোবাসা যেমন তীব্র, ঘৃণাও তেমনি তীব্র। রাজা মার্কের হৃদয়ে ভালোবাসাই বেশী, কিন্তু কিছুদিনের জন্য সেটা চাপা পড়ে গিয়ে তীব্র ঘৃণা জেগে উঠেছিল। আবার ভালোবাসা ফিরে এসেছে। ত্রিস্তান আর সোনালি, দুজনের জন্যই ভালোবাসা।

মুন্সী রাজার হুকুমে চিঠি পড়তে আরম্ভ করলো:

মহারাজ, আপনাকে আমার প্রণাম। সভাসদদের আমার অভিবাদন। আমি ত্রিস্তান। মনে পড়ে মহারাজ, আমি সেই ত্রিস্তান যে জীবন তুচ্ছ করে আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়েছিল। মহারাজ, ওদেশের ড্রাগনকে আমিই হত্যা করেছি। ওদেশের রাজা তো আমার সঙ্গেই বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন রাজকন্যাকে। কিন্তু আমি আপনার নাম করে গিয়েছিলাম বলে, সেই রাজকন্যাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু আপনি নীচ লোকদের কথায় কান দিয়ে আমাদের সন্দেহ করতে শুরু করলেন। নীচ, কুমন্ত্রণাদাতারা আপনার মনে ঈর্ষা ঢুকিয়ে দিল—সেই ঈর্ষা থেকে জন্মালো ক্রোধ। ক্রোধের বশে আপনি বিনা বিচারে আমাদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তখন ঈশ্বর আমাদের সহায় হলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আমি উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দিয়েও মরিনি। তার পর থেকে আমি আর কি দোষের কাজ করেছি? আপনি রানীকে সঁপে দিলেন কুষ্ঠরোগীদের হাতে, আমি তাদের হাত থেকে রানীকে উদ্ধার করেছি। আমি নাইট, বিপন্না নারীকে উদ্ধার করাই আমার ধর্ম। আমরা বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। তখনই আমি রানীকে আপনার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারিনি, কারণ আপনার ঘোষণা ছিল জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আমাকে বন্দী করা। কিন্তু, এখন আমি অনুরোধ করছি, রানী আপনার ধর্মপত্নী, তাঁকে আপনি গ্রহণ করুন। রানীর বিরুদ্ধে যদি কেউ কুৎসা রটাতে চায়, তবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজী আছি। যার সত্যিকারের সৎসাহস আছে, সে-ই যেন প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে রানীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ জানায়, আড়ালে নয়। যদি এমন কেউ থাকে আপনি তাদের নাম আমাকে জানান, আমি তাদের সঙ্গে দেখা করে আমার হিসেব মিটিয়ে ফেলবো।

আমাকে আপনি পুনরায় গ্রহণ করবেন কিনা সেটা আপনার ইচ্ছে। আমি না হয় এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু মহারাজ, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি রানীকে পূর্ব সম্মানে ফিরিয়ে নিন। যদি না নিতে চান, আমি রানীকে আবার আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। ওদেশের রাজকুমারী, ওদেশেরই রানী হয়ে থাকবেন। ইতি,

প্রণত ত্রিস্তান

এই চিঠি শুনে একজন সভাসদেরও প্রতিবাদ করতে সাহস হলো না। মনে পড়লো ত্রিস্তানের দুর্ধর্ষ মুখ, ঝকঝকে তলোয়ার। সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, মহারাজ, রানীকে ফিরিয়ে আনুন। রানীর কলঙ্কের কোনো প্রমাণ নেই। রানী হলো রাজ্যের লক্ষ্মী, রানী না থাকলে কি রাজ্যে লক্ষ্মীশ্রী আসে? মহারাজ রানীকে ফিরিয়ে আনুন, কিন্তু—

—কিন্তু কি? মহারাজ গর্জে উঠলেন।

সভাসদরা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করে খানিকক্ষণ পরামর্শ করলো। তারপর বললো, মহারাজ, ত্রিস্তানকে আর ফিরিয়ে না আনাই ভালো। ও যখন অন্যদেশে চলে যেতে চায়, তবে তাই যাক্। ও ফিরে এলে আবার হয়তো নানা কথা উঠতে পারে।

মহারাজ বললেন, আপনারা আবার ভেবে দেখুন, রানীর নামে আপনাদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা। কেউ ত্রিস্তানের সঙ্গে লড়াই করতে রাজী আছেন?

সকলেই বললো, না মহারাজ, রানীর নামে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই।

রাজা তৎক্ষণাৎ মুন্সীকে বললেন, মুন্সী শিগগির চিঠি লেখো। লেখো, আমি রানীকে ফিরিয়ে নিতে চাই। এ রাজ্যের রানী হয়ে সে গাছতলায় শুয়ে আছে। শিগগির চিঠি লিখে, বনের সীমান্তে বাজেপোড়া ওক গাছটায় ঝুলিয়ে রেখে এসো।

একটু থেমে আবার রাজা যোগ করে দিলেন, আর হ্যাঁ, চিঠির শেষে আমার আশীর্বাদ জানিও। ওদের দুজনকেই।

শহর ছাড়িয়ে যেখান থেকে বন শুরু হয়েছে, তার আগে একটা খোলা মাঠ। ঠিক হলো, বনের সীমান্তে সেই মাঠে এসে ত্রিস্তান সোনালিকে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে ত্রিস্তান সোনালিকে বললো, সখী, আজ বিদায়। আর হয়তো কোনোদিন দেখা হবে না। কিন্তু আমার জন্যে তুমি যে কষ্ট সহ্য করেছো, তা ভেবে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবার কষ্ট সহ্য করবো। তবে, আমি যত দূরে দেশেই থাকি, মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে তোমার ঠিক খবর নেবো। তোমার কোনো বিপদের কথা শুনলে আবার ছুটে আসবো আমি।

সোনালি কাঁদতে কাঁদতে ত্রিস্তানের বুকে মুখ গুঁজে বললেন, দুঃখ আমার, তুমি আমার জন্য আর কত দুঃখ সইবে? ত্রিস্তান, আমার এই সবুজ পাথরের আংটিটা তুমি নাও। যদি তোমার কাছ থেকে কোনো লোক এসে আংটি দেখায়, আমি তার সব কথা বিশ্বাস করবো। সে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলে আমায়, রাজপুরীর হাজারটা দেওয়ালও আমায় আটকাতে পারবে না। আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও তোমার সঙ্গে দেখা করবো!

ত্রিস্তান কোনো কথা বলতে পারলো না। সোনালির মুখখানি উঁচু করে তুলে সে চুম্বন করলো। বহুক্ষণ, যেন সে চুম্বন আর শেষ হবে না। তারপর সেইরকম আলিঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থাতেই ওরা নীরবে বসে রইলো কিছুক্ষণ।

একটু পরে বাইরে শুনতে পাওয়া গেল ঋষি অগরুর গলার আওয়াজ। ঋষির হাতে কতগুলো দামী সিল্কের পোশাক, মুক্তোর গয়না। লজ্জিত মুখে ঋষি বললেন, রানী, আমার কাছে কয়েক টুকরো সোনা ছিল। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার তো ওসব কোনো কাজে লাগে না, তাই ওগুলো বদলে তোমার জন্যে কয়েকটা পোশাক নিয়ে এসেছি। তুমি রাজরানী, এই ছিন্নকন্থা পরে কি করে যাবে রাজসন্নিধানে। তাই যথাসম্ভব,·· মানে · জানি না অবশ্য, তোমার পছন্দ হবে কি না! মেয়েদের পোশাক পছন্দ করার অভ্যাস তো আমার নেই!

কৃতজ্ঞতায় রানীর চোখে জল এসে গেল। তিনি ছুটে এসে ঋষির পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

এদিকে রাজা পাত্রমিত্রদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেই প্রান্তরে। হাজার হাজার লোকও ছুটে এসেছে খবর পেয়ে। জমিদার দিনাসও রাজার ওপর রাগ ভুলে আবার এসে হাজির হয়েছেন। প্রতীক্ষায় সবাই উদ্‌গ্রীব। কতদিন পর আবার ত্রিস্তান আর সোনালিকে দেখবে। কি ভাবে, কোন রূপে তারা দেখা দেবে, সেই নিয়ে সকলের কৌতূহল।

হঠাৎ বন থেকে বেরিয়ে এলো ত্রিস্তান আর সোনালি। রানী সুসজ্জিত, ত্রিস্তানের পরনে শতছিন্ন ময়লা পোশাক। ঘোড়ার পিঠে রানীকে বসিয়ে দীন ভৃত্যের মতন ত্রিস্তান পায়ে হেঁটে আসছে।

ত্রিস্তান রানীর কানে কানে বললো, সোনালি, আর হয়তো তোমার সঙ্গে কথা -বলার সময় পাবো না। আমার শেষ অনুরোধ, কখনো যদি তোমাকে কোনো খবর পাঠাই, তুমি একটা উত্তর দিও।

সোনালি বললেন, ত্রিস্তান কেন বলছো ও কথা। তুমি যদি আবার কোনো-দিন আমাকে ডাক পাঠাও, পৃথিবীর কোনো শক্তি, রাজবাড়ির হাজারটা দেয়ালও আমাকে আটকে রাখতে পারবে না! তুমি তো জানো এ কথা।

- -সোনালি, তোমাকে আর আমি ডাকবো না। আর কোনোদিন তোমাকে আমি রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে আনবো না।

--ও কথা বলো না, ত্রিস্তান। আমাদের নিয়তি এক সুতোয় বাঁধা। জানি না সে কোনদিকে যাবে।

ততক্ষণে ওরা রাজার দলের খুব কাছে এসে গেছে। রানী ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, ত্রিস্তান আমার আর একটা অনুরোধ আছে। তুমি আজই এ দেশ ছেড়ে চলে যেও না। অন্তত একমাস লুকিয়ে থেকো এই জঙ্গলে। জানি না, রাজা আমাকে কি চোখে দেখবেন। যদি তিনি এই ছলে ধরে নিয়ে আবার আমাকে শাস্তি দিতে চান। তখন তুমি ছাড়া আর আমাকে অপমান থেকে কে উদ্ধার করবে? যদি সেরকম কিছু হয়, আমি লোক পাঠাবো ঋষির আশ্রমে। আমার শেষ খবর শুনে তবে তুমি যেও।

-সোনালি, আমার শরীরে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে তোমাকে কেউ অপমান করতে পারবে না। তোমার খবর না পেয়ে আমি নড়বো না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

চিন্তা আমার কোনদিন ঘুচবে না ত্রিস্তান। জাছি না ভাগ্য আমায় কোন-দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কেনই বা আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি? আমরা ভুল করছি না তো? চলো, এখনও আমরা আবার জঙ্গলে ফিরে যাই!

ত্রিস্তান ম্লান হেসে বললো, না, আর তা হয় না!

আর কথা বলার সময় নেই। ত্রিস্তান রাজার কাছে নতজানু হয়ে প্রণাম করলো। তারপর জমিদার দিনাসকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরস্বরে বললো, মহারাজ এই আপনার রানীকে গ্রহণ করুন। গ্রহণ করে এঁকে ফিরিয়ে দিন রানীর সমস্ত সম্মান। যদি রানীর বিরুদ্ধে কারুর কোনো অভিযোগ থাকে, আমি তা মুখে অথবা তরবারির সাহায্যে উত্তর দিতে প্রস্তুত।

কেউ কোনো কথা বললো না। দিনাসই এগিয়ে এসে সোনালীর হাত ধরে বললেন, এসো, তুমি আবার আমাদের রানী হও! এই বলে সোনালির হাত

ধরে এনে সঁপে দিলেন রাজার হাতে। রাজা মার্ক রানীর কপালে একটি চুম্বন আঁকলেন। জয়ধ্বনি দিলো প্রজারা। রক্ষীরা বহুমূল্য পরিচ্ছদ এনে রাখলো রানীর সামনে। সোনালি নিজের পরনের পোশাকের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন সেই ঋষির কথা। চকিতে একবার দেখলেন ত্রিস্তানকে। বললেন, থাক্।

তখন দিনাস বললেন, মহারাজ, ত্রিস্তানকেও ফিরিয়ে নিন্। ত্রিস্তানের মতো বীর আপনার রাজ্যের গর্ব। ত্রিস্তানের সব উপকারের কথা আপনি ভুলে গেলেন?

রাজা চাইলেন সভাসদদের দিকে। সকলেরই মুখে 'না' লেখা আছে।

অনেকেই প্রকাশ্যে বললো, মহারাজ, আবার সর্বনাশ ঘরে ডেকে আনবেন না। আমরা ওর নামে কোনো অভিযোগ করছি না। কিন্তু ওর এখন দূরে থাকাই ভালো। কিছুদিন পরে না হয় ডাকবেন ইচ্ছে হলে!

ত্রিস্তান গম্ভীর গলায় বললো, না, আমি এ রাজ্যে আর থাকবো না। মহারাজ, আপনি আমাকে গ্রহণ করলেও আমি আর থাকতে রাজী নই। আমি চলে যাবো।—এই বলে, ত্রিস্তান স্থির চোখ মেলে তাকালো সোনালির দিকে। এত জনতার সামনে, লজ্জায় সোনালি চোখ নামিয়ে নিলেন।

রাজা আর্দ্র গলায় বললেন, ত্রিস্তান, চলেই যখন যাবে, যাও। কিন্তু এরকম হত দরিদ্রের মতো ছিন্নভিন্ন পোশাকে তুমি এ রাজ্য ছেড়ে যেতে পারবে না। আমার ভাণ্ডার থেকে তুমি যে-কোন পরিচ্ছদ বেছে নিয়ে যাও!

ত্রিস্তান অদ্ভুত ধরনের হেসে বললো, মহারাজ, আপনার কাছ থেকে আমি পোশাক নেবো? না থাক। আমার এই ভালো।

এরপর ত্রিস্তান কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলো। আর একটিও কথা না বলে বিদ্যুৎ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মিলিয়ে গেল বনের মধ্যে। যতদূর ত্রিস্তানকে দেখা গেল, সবাই নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। শুধু রানী সোনালি শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়ার ভয়ে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রইলেন।

রানী ফিরে এসেছে, ত্রিস্তান চলে গেছে। যেন বজ্রভরা মেঘ দূরে সরে গিয়ে ফুরফুর করছে জ্যোৎস্না। রাজা মার্কের রাজ্য এখন সুখের আগার।

সাধারণ মানুষ পাপপুণ্য মানে। পরস্ত্রীকে ভালোবাসা যে মহাপাপ—সে কথা জানে সাধারণ মানুষ। কিন্তু হুজুর, আমাদের মতো কবিরাই শুধু

নিয়মহীন। আমরা সম্পর্ক মানি না, আমরা ভালোবাসা মানি। আমরা জানি, ভালোবাসা বড় দুর্লভ। নিজের স্ত্রীকেই বা ভালোবাসতে জানে ক'জন লোক? একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালোবাসেন, এর চেয়ে বড় সম্পর্ক আর কি হবে? তাই, প্রৌঢ় রাজা মার্কের পাশে আমি যখন রানী সোনালিকে মনে মনে দেখি, তখন ত্রিস্তানের জন্যে আমার মন কেমন করে। রানী আবার ফিরে পেয়েছেন রানীর সুখ, আর ওদিকে ত্রিস্তান এখনও লুকিয়ে আছে জঙ্গলে —একা শুয়ে থাকে সারাদিন, নাওয়া-খাওয়ায় মন নেই। মাটির ওপর সে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে, গাছের শুকনো পাতা ঝরে ঝরে পড়ে তার গায়।

রাজা মার্কের মনে আর একবিন্দুও সন্দেহ আর অভিমানের অস্তিত্ব নেই তখন। রানীকে তিনি তাঁর ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন। রানীও প্রাণপণ সেবায় রাজাকে খুশী করার চেষ্টা করছেন। ত্রিস্তানের নাম আর কেউ উল্লেখ করে না!

একদিন রাজা অসময়ে ফিরে এলেন অন্তঃপুরে। সমস্ত মুখ চোখ লাল। এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রানী এসেছিলেন রাজার ধরা চূড়া খুলতে, রাজার গম্ভীর মুখ দেখেই তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। তবে কি জানাজানি হয়ে গেছে যে ত্রিস্তান এখনও রাজ্য ছেড়ে যায়নি? ত্রিস্তান কি ধরা পড়লো? অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রানী জিগ্যেস করলেন, মহারাজ, আজ আপনার মন ভালো নেই। রাজ্যে কি নতুন কোনো বিপদ হয়েছে?

রাজা শুকনো হেসে বললেন, না রানী, কিছু তো হয়নি।

—কিন্তু মহারাজ, আপনার মুখের চেহারা কি রকম বদলে গেছে।

—ও কিছু না! এসো আমরা বরং পাশা খেলি দুজনে।

—মহারাজ, আপনি কি যেন গোপন করছেন। না, বলুন আমাকে।

এদিকে হয়েছে কি সেদিন সভা শেষ হবার পর সেই তিনজন বদমাস নাইট আবার রাজার কাছে এসেছিল গুজগুজ করতে। তারা বলছিল, মহারাজ, প্রজারা একটা কথা কানাকানি করছে, সেটা আপনাকে না জানিয়ে পারছি না। ওরা বলছে, আপনি বিনা বিচারে একবার রানীকে পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়ে যেমন অন্যায় করেছিলেন, এবারেও তেমনি বিনা বিচারে রানীকে ঘরে তুলে নেওয়া অন্যায়। হাজার হোক, এতদিন পরপুরুষের সঙ্গে থেকে—

—চোপরাও। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। রাজা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, এখনও তোমাদের নিবৃত্তি হয়নি। তোমাদের জ্বালায় প্রাণাধিক ত্রিস্তানকে আমি বিদায় দিয়েছি। এখন রানীকেও আবার সরাতে চাও!

ত্রিস্তান যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডেকেছিল, তখন সাহস ছিল কোথায়? আমি ঢের সয়েছি, আর নয়! দূর হয়ে যাও!

—মহারাজ, শুধু শুধু রাগ করে তো প্রজাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন না। আমরা রানীকে সন্দেহ করছি না। কিন্তু রানী যখন সতীই, তখন একবার অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়ালেই তো সব সন্দেহ মিটে যায়!

অগ্নিপরীক্ষা? আবার তোমাদের ষড়যন্ত্র? দূরে হয়ে যাও তোমরা। নইলে—

—মহারাজ রানী অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াতে রাজী না হলেই লোকে সন্দেহ করবে।

—আর একটা কথা বললেই তোমাদের আমি ফাঁসি দেবো! আমি আর সহ্য করতে পারছি না! দূরে হয়ে যাও আমার রাজ্য থেকে!

নাইট তিনজন তখন সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, মহারাজ, আমাদের নিজস্ব জমিদারি আছে। আমাদের অধীনে নিজস্ব সৈন্য আছে। আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি। আমরা চলেই যাচ্ছি। তবু যাবার আগে বলবো, রানী যখন সতীই, তখন অগ্নিপরীক্ষায় আপনার ভয় কি!

রাজা বললেন, ত্রিস্তান নেই বলেই তোমাদের আজ এত সাহস। আমি বরং ত্রিস্তানকে আবার ফিরিয়ে আনবো। তোমাদের আর মুখ দেখতে চাই না।

নাইটদের বিদায় দিয়েই রাজা রাগত মুখে ফিরেছিলেন। রানী বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন রাজার রাগের কারণ। রাজা কিছুতে বলতে চান না। তখন রানী বললেন, মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে, আমাকে নিয়ে আবার অশুভ কিছু ঘটেছে! মহারাজ, আসামীরও তো অধিকার থাকে তার নামে অভিযোগ শোনার।

রাজা বললেন, রানী, ঐ শয়তান নাইটগুলো তোমার সম্বন্ধে আবার কু-কথা বলতে এসেছিল। আমি এবার তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি রাজ্য থেকে। সুতরাং আর সে কথা তোমার শোনবার দরকার কি?

—তবু, মহারাজ, বলুন, কি কথা ওরা বলেছে?

—না, রানী, সে কথা শুনতে চেও না। ওরা অন্যায় কথা বলছে। আমি ওদের অন্যায়ের শাস্তি দিয়েছি। এখন আর তুমি তা শুনে কেন মন খারাপ করবে?

—মহারাজ, আমার মাথার দিব্যি, বলুন আপনি।

—ওরা তোমাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলছে!

—অগ্নিপরীক্ষা ? সেটা কি মহারাজ ?

—তোমাদের দেশে এ নিয়ম নেই বুঝি ? তোমাদের দেশই ভালো। রানী, অগ্নিপরীক্ষা হলো সতীত্বের পরীক্ষা। সতী নারী, তাঁর সতীত্বের শপথ করে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে এক খণ্ড লোহা হাতে তুলে নেয়। সত্যিকারের সতীর হাত পোড়ে না ! যে মিথ্যে কথা বলে তার হাত পুড়ে যায়। এর নাম 'অগ্নিপরীক্ষা'।

রানী এ কথা শুনে অবনত মুখে বসে রইলেন। এ পরীক্ষার কথা শোনার পর আর রাজী না হয়ে থাকতে পারে কোনো নারী ? সকলেই ভাববে তিনি ভয় পেয়েছেন। তাহলে তিনি বেঁচে থাকবেন কি করে। এ রাজপুরীর সকলেই তাঁকে মনে মনে ঘৃণা করবে তাহলে। সোনালি ধীরস্বরে বললেন, মহারাজ, আমি এ পরীক্ষা দেবো। আপনি ব্যবস্থা করুন।

রাজা উত্তেজিত হয়ে বললেন, না না, এ বড় ভয়ঙ্কর। যে-কোনো মুহূর্তেই তো কতরকম ভুল হতে পারে ! না, রানী, তোমাকে আমি এর মধ্যে যেতে দেবো না !

রানী বললেন, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ? আপনিও কি আমাকে বিশ্বাস করেন না ? আমি অগ্নিপরীক্ষা দেবো, আজ থেকে দশ দিন পর। কিন্তু এখানে নয়, মহারাজ আর্থারের সামনে। রাজা আর্থারকে মান্য করে না, এমন লোক পৃথিবীতে কেউ নেই। আপনার রাজ্যের পাশেই আর্থারের রাজ্য। তার মাঝখানে যে ঝরনা, সেই ঝরনার পাশে হবে অগ্নিপরীক্ষা। আপনি, রাজা আর্থার আর তাঁর বিখ্যাত গোল টেবিলের নাইটদের নিমন্ত্রণ করুন। ওঁদের সামনে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলে আর কেউ পরে অবিশ্বাস করতে সাহসী হবে না। আর কেউ আমাকে কোনো পরীক্ষা দিতে বলবে না।

রাজা মার্ক আরও আপত্তি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রানীর জেদ বজায় রইলো। শেষ পর্যন্ত রাজা দূত পাঠালেন আর্থারের কাছে। রানীর প্রস্তাবে রাজা মার্ক যে একেবারে খুশীও হননি, তাও নয়। আপনারা জানেন, মানুষের মন কি বিচিত্র !

রানী তখন খুব গোপনে পেরিনিস নামের একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে দিয়ে খবর পাঠালেন ত্রিস্তানের কাছে। বলে পাঠালেন যে, পেরিনিস গিয়ে ত্রিস্তানকে অগ্নিপরীক্ষার সব কথা বলবে। আর বলবে, ত্রিস্তান যেন গোপনে সেখানে উপস্থিত থাকে ছদ্মবেশে। ত্রিস্তান উপস্থিত থাকলে, রানী কোনো পরীক্ষাতেই ভয় করবেন না।

রাজা মার্ক নির্দিষ্ট দিনে রানী এবং বহু অনুচর সঙ্গে নিয়ে এলেন সেই ঝরনার পাশে। ঝরনার ওপাশে রাজা আর্থারের তাঁবু। সিংহাসনে বসে আছেন রাজা আর্থার, আর পৃথিবী-বিখ্যাত নাইটরা রয়েছেন তাঁকে ঘিরে। সামনে আগুন জ্বলছে, সেখানে অগ্নিপরীক্ষা হবে।

ঝরনার অন্য দিকটা অন্য রাজ্য, সুতরাং অনুচররা, সৈন্যসামন্তরা যেতে পারবে না। অনুচরেরা সবাই ঝরনার এ পাশে রইলো। শুধু রাজা মার্ক রানীকে নিয়ে একটা নৌকোয় চড়ে এলেন এপারে। নৌকো যখন পাড়ে লাগলো, তখন পাড়ের সামনে সামান্য কাদা দেখে রানী বললেন, মহারাজ, এখানে নামতে গেলে আমার কাপড় ভিজে যাবে। পায়ে কাদা লাগবে। আমি শুদ্ধভাবে পরীক্ষা দিতে চাই। আমাকে নৌকো থেকেই পাড়ে নামাবার ব্যবস্থা করুন।

পাড়ের কাছে অসংখ্য ভিক্ষুকের সঙ্গে বসে ছিল একজন তীর্থযাত্রী। লোকটির মলিন ছিন্নভিন্ন পোশাক, মুখে একমুখ দাড়ি, চুল ধুলোমাখা আঠা। কিন্তু লোকটা বেশ লম্বা আর শক্তসমর্থ জোয়ান। ভিড়ের মধ্যেও তাকে আলাদা-ভাবে চোখে পড়ে। সে দাঁড়িয়েছিল একেবারে ঝরনার পাশে। রাজা মার্ক তাকেই বললেন, ওহে, তুমি রানীকে চেয়ারসুদ্ধ তুলে পাড়ে নামিয়ে দিতে পারবে? যথেষ্ট ইনাম পাবে। শক্তি আছে তো?

—হ্যাঁ, হুজুর। নিশ্চয়ই পারবো।

লোকটি এসে অবলীলাক্রমে চেয়ারসুদ্ধ রানীকে তুলে নিল।—তারপর যখন সে জলে পা দিয়েছে, তখন রানী মুখ নীচু করে খুব আস্তে বললেন, ত্রিস্তান!

তীর্থযাত্রী পলকের জন্য মুখ তুলে তাকালো রানীর দিকে।

রানী তখুনি অন্য দিকে মুখ ফেরালেন। তারপর বললেন, কি, তুমি ঠিক পারবে তো? তোমার পা কাঁপছে কেন? ফেলে-টেলে দেবে নাকি?

তীর্থযাত্রী বললো, না রানীমা ঠিক পারবো। অনেকদিন ব্রত করে উপবাসী আছি, তাই শরীরটা একটু দুর্বল।

রানী এবার আরও আস্তে বললেন, পথিক, আমাকে পাড়ে নামাবার সময় তুমি খুব সাবধানে নামাবে। খুব সাবধানে, বুঝেছো তো?

সে খুব আলতোভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

পাড়ে এসে চেয়ারটাকে নামাবার সময় তীর্থযাত্রী হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। চেয়ারসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে যেতেই রানী ভয়ে লোকটিকে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু এক মুহূর্তেই নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ালেন।

রাজা লোকটির হঠকারিতায় ছুটে এসে পায়ের ঠোক্কর দিয়ে বললেন, হতভাগা,

সামর্থ্য নেই, তবে রাজী হলি কেন ? প্রহরীরা এসে লোকটিকে মারতে লাগলো—রানীকে ফেলে দেওয়া, এতবড় সাহস ! নিজের পোশাক ঠিক করতে করতে রানী করুণাঢালা গলায় বললেন, আহা গরীব লোক, খেতে না পেয়ে বোধহয় দুর্বল হয়ে গেছে। ওকে মেরো না তোমরা। ছেড়ে দাও। এই নাও তুমি।—রানী লোকটির দিকে একটি স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে দিলেন। মার খেয়ে লোকটি একটি কথাও বলেনি, মুদ্রাটি তুলে নিয়ে এবার ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

রানী একে একে তাঁর কানের দুল, হাতের চুড়ি, সর্বাঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলে খুলে দান করলেন সমবেত ভিখারীদের। তারপর নিজের বহুমূল্য বসনও একে একে খুলে দান করলেন। রানীর পরনে রইলো শুধু পাতলা একটা সাদা সেমিজ। রানীর অমন শ্বেত হংসীর মতো লীলায়িত রূপসী শরীর, শুধুমাত্র একটি স্বচ্ছ পোশাকে যেন শিল্পী হিসেবে প্রমাণ করলো ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের মধ্যে কোনো শিল্পী আজ পর্যন্ত ওরকম রূপের সৃষ্টি করতে পারেনি।

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। তার মধ্যে অনেকক্ষণ পুড়ে পুড়ে একখণ্ড লোহা টকটকে লাল হয়ে আছে। রানীর সর্বশরীর কাঁপছে। তবু তিনি অচঞ্চল পায়ে এগিয়ে এলেন। প্রণাম করলেন অগ্নিকে। তারপর অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, দুই দেশের নৃপতি, সমবেত বীরবৃন্দ ও দর্শকগণ ! আপনাদের সামনে আজ আমি আমার সত্যের পরীক্ষা দেবো। ঈশ্বর স্বর্গ থেকে দেখছেন ; তিনি সব সময়ে সত্যের পক্ষে। মহামান্য সম্রাট আর্থার, আপনি শুনুন, এই আমার সতীত্বের শপথ। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ আমাকে ছোঁয়নি বা আমি কারুকে ছুঁইনি—একমাত্র আমার স্বামী রাজা মার্ক, আর হ্যাঁ আর একজন—এইমাত্র যে দেখলেন—ঐ গরীব তীর্থযাত্রী আমাকে ফেলে দিয়েছিল—আমি ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, ওকে ছাড়া আর কারুকে কখনও স্পর্শ করিনি। ঈশ্বর আমার সাক্ষী। আমি অন্তর থেকে এই সত্য উচ্চারণ করছি। যদি সত্যের যথার্থ মর্যাদা থাকে—তবে আগুনও তাকে পোড়াতে পারবে না।

রানী এবার রাজা মার্কের দিকে ফিরে বললেন, মহারাজ, এই শপথই কি যথেষ্ট ? উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় রাজা মার্ক কথা বলতে পারছিলেন না, ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন। রানী তবু বললেন, আপনি আপনার প্রজাদেরও প্রশ্ন করুন, তারা আমার এই অঙ্গীকার মেনে নেবে কিনা ! রাজা তখন নদীর অন্য পারে অপেক্ষারত তাঁর দেশবাসীদের উচ্চকণ্ঠে রানীর শপথের কথা শোনালেন। তারাও সম্মতি জানালো তৎক্ষণাৎ।

রানী এবার আগুনের আরও কাছে এগিয়ে এলেন। এখন আর তাঁর শরীর কাঁপছে না। তিনি আবার বললেন, হে অগ্নি, আমার স্বামী এবং ঐ তীর্থযাত্রী এই দুজনকে ছাড়া আমি আর কারুকে কখনও স্পর্শ করিনি। এই আমার সতীত্ব।—তারপর, বিনা দ্বিধায় আগুনের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিনি লোহার টুকরোটা তুলে নিলেন। সবদিক ঘুরে সকলকে উঁচু করা নিজের হাত দেখালেন। তারপর, লোহাটা ফেলে দিয়ে প্রথমেই স্বস্তিবাচক ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলেন নিজের বুকে। হাতের মুঠো খুললেন। পরিষ্কার, অক্ষত সেই নবনীত হাত। একটু ছাইয়ের মলিনতাও লাগেনি। জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। রানীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক।

মহান রাজা আর্থার সিংহাসন ছেড়ে উঠে বললেন, আমি এই নারীর সতীত্বের সাক্ষী রইলাম। মা, আর কোনো দুষ্ট লোক যদি তোমাকে কখনও সন্দেহ করে, আমার তরবারি তাকে শাস্তি দেবে।

ত্রিস্তান আবার ফিরে এসেছে জঙ্গলে। এবার তাকে চলে যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে। রাজার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল। সোনালিরও আর কোনো ভয় নেই, এখন সে সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

দু-তিন দিন কেটে গেল, তবু ত্রিস্তানের যাওয়া হয় না। একা একা সে সেই ভাঙা কুঁড়েঘরে শুয়ে থাকে। শিকারে বেরুতে ইচ্ছে করে না, তাই অনেক সময় খাওয়া হয় না। শুয়ে সে ভাবে, সেই ঝরনার পাশে শেষবারে সোনালিব পাখির মতো দেহ কয়েক মুহূর্তের জন্য তার বুকে এসেছিল। সোনালির সুডৌল দুই বুক লেগেছিল তার বুকে, তাঁর উত্তেজনার স্পন্দন ত্রিস্তান অনুভব করেছিল। এখন যেন সোনালির শরীরের সৌরভ ত্রিস্তানের দেহে লেগে আছে। সেই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ত্রিস্তান পড়ে থাকে। তার হাতে, সোনালির দেওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রা।

রোজই ভাবে ত্রিস্তান, আজ চলে যাই। কিন্তু, আজ এমন চড়া রোদ, আজ কি যাওয়া যায়? পরের দিন ভাবে, ইস্‌, আজ এমন মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, আজ তো যাওয়া উচিত নয়। যাবার জন্য পা আর ওঠে না। কি এক প্রবল আকর্ষণ তাকে টেনে রাখে।

এমনি করতে করতে একদিন জ্যোৎস্না রাতে ত্রিস্তান সত্যি বেরিয়ে পড়লো ঘোড়া নিয়ে। বন পেরিয়ে এলো সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

পড়লো, আর দেখা হবে না। এ জন্মের মতো বিদায়, সোনালি! আর দেখা হবে না! একবার শেষ দেখা?

হঠাৎ ত্রিস্তান ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল টিণ্টাজেল দুর্গের দিকে। বাইরে ঘোড়া বেঁধে দেয়াল পেরিয়ে এলো। তখন সে যেন অন্ধ, তার কোনো বাধা নেই, কোনো ভয় নেই। আগেকার সেই মিলনকুঞ্জে দাঁড়িয়ে ত্রিস্তান পাখির মতন শিস দিতে লাগলো।

রাজার পাশে শুয়ে শুয়ে কোনো দিনই রানীর ভালো করে ঘুম আসে না। হঠাৎ শুনলেন পাখির ডাক। একটা পাখি যেন কাঁদছে। তার করুণ সুর কেঁপে কেঁপে উঠছে হাওয়ায়। রাত্রির বেলা কোন পাখি ডাকে? রানী ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর শরীর কেঁপে উঠলো। এ তো ত্রিস্তান! বনের মধ্যে ত্রিস্তান তাকে এই সুর শোনাতো। কি করুণ তার ডাক। যেন বসন্তের শেষে কোকিল তার শেষ ডাক ডেকে নিচ্ছে।

রানী মনে মনে বললেন, ত্রিস্তান, কেন ডাকছো এমন ভাবে? আমরা যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঋষির আশ্রমে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, আর দেখা হবে না। আবার দেখা মানেই তো মৃত্যু। মৃত্যু? আসুক মৃত্যু! ত্রিস্তান, তুমি ডেকেছো। আমি যাবো।

রানী ধড়মড় করে উঠে বসলেন, তারপর ঘুমন্ত রাজার পাশ থেকে নিঃশব্দে নেমে এলেন। কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা চলে এলেন বাগানে। বিস্রস্ত বেশ, আলুলায়িত চুল, রানী ছুটে গেলেন ত্রিস্তানের দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রিস্তানের বুকে।

একটিও কথা না বলে ওরা দুজনে পাগলের মতো দুজনকে চুমু খেতে লাগলো। ত্রিস্তান রানীর সমস্ত শরীরে হাজার হাজার ফুলের মতো চুমুতে ভরিয়ে দিল, পদতল পর্যন্ত। তারপর রানী ত্রিস্তানকে আলিঙ্গন করে বললেন, ত্রিস্তান, আমায় জড়িয়ে ধরো। আমাকে এমনভাবে জড়াও যেন আমি এখুনি তোমার বুকের সঙ্গে মিশে যাই। এই রাতই হোক পৃথিবীর শেষ রাত ত্রিস্তান!

ত্রিস্তান আর সোনালির শরীর এক হয়ে মিশে গেল।

সেই কুঞ্জেই ওদের রাত্রি ভোর হলো। সূর্যের আলোয় বনের একটি ফুলও ফোটার আগে, জেগে উঠলো ওরা দুজনে। ত্রিস্তান বুঝলো, এবার সত্যিই তাকে যেতে হবে। সেই রাতই তাদের জীবনের শেষ রাত হয়নি। এখনও অনেক দিন ও রাত্রির রহস্যময় খেলা বাকি আছে। সোনালিকে আবার চুম্বন করে ও বললে, সখী, আমি যাবার সময় কী সঙ্গে নিয়ে যাবো আমার!

রানী বললেন, ত্রিস্তান, আমার শরীর রইলো এখানে, তুমি আমার আত্মা নিয়ে যাবে।

—সোনালি, তোমার সবুজ আংটি দিয়ে কোনো লোককে পাঠিয়ে আমি যদি কোনো অনুরোধ জানাই, তুমি শুনবে তো?

—ত্রিস্তান, যদি কখনও তোমার ডাক শুনি, রাজবাড়ির হাজারটা দেয়ালও আমাকে আটকাতে পারবে না ত্রিস্তান তুমি জেনে রেখো, এখানে আমার একটি দিনও সুখে কাটবে না।

এই সময় রাজপুরীতে বেজে উঠলো ভোরের শানাই। ত্রিস্তান আর একটিও কথা না বলে নিঃশব্দে রানীকে চুম্বন করে উঠে চলে গেল।

এরপর অনেক দিন দিশাহারার মতো ত্রিস্তান ঘুরলো নানান রাজ্যে। কোথাও তার শান্তি নেই। কোথাও যদি কোনো যুদ্ধের খবর শোনে, ত্রিস্তান কোনো এক পক্ষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই যুদ্ধে! ওর সমস্ত শরীরে জ্বালা। কোনো যুদ্ধে ওর মৃত্যু হোক তাই ও চায়। কিন্তু মরণ অত সহজে আসে না। বরং দুর্ধর্ষ বীর হিসেবে ত্রিস্তানের নাম রটে যায় আরো।

ঘুরতে ঘুরতে ত্রিস্তান এলো নিজের রাজ্য লিওনেসে! সত্যবাহন রোহন্ট তাকে প্রচুর সম্মান করে বরণ করে নিল প্রভুর মতো। তাকে ছেড়ে দিল রাজ-প্রাসাদ, ফিরিয়ে দিল রাজসম্মান। কিন্তু ত্রিস্তানের রাজ্যলিপ্সা নেই। দীর্ঘদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে সুখভোগেও তার অরুচি এসে গেছে। ভ্রাম্যমাণ—হবার জন্য তার রক্ত ছটফট করে। আবার সে বেরিয়ে পড়লো।

মাঝে মাঝে যখনই সে কর্নওয়ালের কোনো বণিক বা পথিককে দেখে, সাগ্রহে জিগ্যেস করে সে দেশের খবর। সবার মুখেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ওরকম শান্তিময় দেশ আর হয় না, আর অমন সুন্দর যে দেশের রাজা রানী! মাঝে মাঝে রানী যখন পথ দিয়ে যান, তখন সারা শহরের মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে ওঁদের দেখে। রানী সোনালি যেন রাজ্যের লক্ষ্মী। অমন প্রাণচঞ্চলা, সকলের সঙ্গে সমান হাসিমুখে ব্যবহার—এমন রানী কে কবে দেখেছে?

ত্রিস্তান ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করে, রানী খুব সুখী?

—বাঃ সুখী হবেন না? অত সৌভাগ্য? কিসের অভাব তাঁর? একদিনের জন্যও কেউ রানীর মুখ গম্ভীর দেখেনি।

সুখী? ত্রিস্তান দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে। সুখী হবেই তো, আস্তে আস্তে সে ত্রিস্তানের কথা ভুলে যাবে। রানী জানেই না হয়তো, আমি বেঁচে আছি কিনা। জানার তার ইচ্ছেও নেই বোধহয়।

এই দুঃখকে ভোলার জন্যই ত্রিস্তান আবার পাগলা হাওয়ার মতো ঘুরতে লাগলো এক দেশ থেকে আর এক দেশ। কোথাও সে টিঁকতে পারে না। সূর্যের আলো তার অসহ্য লাগে, জ্যোৎস্না তার শরীর পুড়িয়ে দেয়। অন্ধকার তার গলা টিপে ধরে। এক মুহূর্তের জন্যেও ত্রিস্তানের নিস্তার নেই। আর ক্রমাগত সে লোকের মুখে শোনে কর্নওয়ালের রানী সোনালি কি সুখী, ভাগ্যবতী। তাঁর পয়মন্তে রাজ্যের সমৃদ্ধি উছলে উঠছে!

একদিন একটা বন পেরিয়ে এসে ত্রিস্তান একটি দুর্গের সামনে দাঁড়ালো। তখন বিকেলবেলা, ত্রিস্তান সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে ক্লান্ত। ভাবলো, দুর্গে একটু আশ্রয় পাবে। কিন্তু দুর্গটা একটু অদ্ভুত। দুর্গের সামনে সমস্ত জঙ্গল আগুনে পোড়ানো। দুর্গের দেয়ালেও আগুনের আঁচ লেগেছিল। তখনও দিনের আলো আছে অথচ দুর্গের দরজা বন্ধ। কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ত্রিস্তান ঘোড়া থামালো একেবারে দুর্গের দরজার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের কাছে এসে দুটো বর্শা পড়লো।

ত্রিস্তান হাত তুলে বললো, আমি শত্রু নই। আমি বিদেশী, অতিথি। এক রাত্রির জন্য আশ্রয় চাই!

সঙ্গে সঙ্গে যেন শত কণ্ঠে গর্জে উঠলো, আমরা কোনো বিদেশী অতিথি চাই না।

ত্রিস্তান আবার বলে উঠলো, আমি ক্লান্ত, আমাকে এক রাত্তিরের জন্যও আশ্রয় দেবে না?

এইবার দুর্গের একটা জানলা খুলে দেখা গেল একটি যুবাপুরুষের মুখ। সুপুরুষ, অভিজাত। যুবকটি বললো, তুমি বন্ধুই হও আর শত্রুই হও, আমাদের দুর্গে কারুকে আশ্রয় দেবার উপায় নেই।

—কেন? ত্রিস্তান জিগ্যেস করলো।

—আমরা দু'মাস ধরে অবরুদ্ধ হয়ে আছি এই দুর্গে। শত্রুরা আমাদের ঘিরে আছে দূরে! দুর্গে আমাদেরই খাদ্য নেই, অতিথির সেবা করব কি করে?

আমি লিওনেসের ত্রিস্তান। আমাকে অন্তত এক রাত্তিরের জন্য আশ্রয় দিন। হয়তো আমি আপনাদের কোনো কাজেও লাগতে পারি।

ত্রিস্তানের নাম শুনে যুবকের মুখে সম্ভ্রমের চিহ্ন দেখা গেল। সে বললো, আমি আপনার বীরত্বের খ্যাতি শুনেছি। কিন্তু আপনি কেন আমাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন?

ত্রিস্তান ম্লান হেসে বললো, কোনো অবস্থাই আমার কাছে আর দুর্ভাগ্য নয়!

আপনি দরজা খুলুন।

দুর্গের দরজা খুলে গেল। সেই যুবক ত্রিস্তানের হাত ধরে বললো, আমার নাম কাহারডিন। আমি ছিলাম ব্রিটানির রাজকুমার। আজ রাজ্য হারিয়ে শুধু এই দুর্গটাই আমাদের সম্বল। তাও এটা কতদিন রাখতে পারবো জানি না।

—কে এই অবস্থা করলো?

—আমাদেরই এক ভৃত্য। সে আমার বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমরা রাজী হইনি বলে, সে বিদ্রোহ করে। সে আজ মহাশক্তিশালী। কিন্তু প্রাণ থাকতে আমি আমার বোনের সঙ্গে ঐ ভৃত্যটার বিয়ে দেবো না!

কাহারডিন ত্রিস্তানকে নিয়ে গেল একেবারে অন্তঃপুরে। সেখানে ওর বাবা মা বোন সকলেই নত মস্তকে বসে আছেন। ত্রিস্তানের ছিপ্‌ছিপে, দীর্ঘ, সুকুমার চেহারার দিকে সকলেই তাকিয়ে রইলো বিস্ময়ে। কাহারডিন ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ত্রিস্তানের। রাজকুমারী—যাকে কেন্দ্র করেই এ রাজ্যের এত দুর্ভাগ্য, মুখ নিচু করে উল বুনছেন। তাঁর রূপের আলোয় ঘর ভরা, কিন্তু একটু যেন তীব্র আর প্রখর সেই রূপ। কাহারডিন বললো, এই আমার বোন রুপালি ইসল্ট। আমরা ওকে শুধু রুপালি বলে ডাকি।

নাম শুনে চমকে উঠলো ত্রিস্তান। মনে পড়লো, বহুদিন আগে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজকুমারীর নাম শুনেছিলাম, সোনালি চুল ইসল্ট। আর আজ এখানে অন্য এক রাজকুমারী, রুপালি ইসল্ট। সোনালির বিপরীত রুপালি। তার ভাগ্যও কি এবার বিপরীত দিকে যাবে? ত্রিস্তান দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, কোথায় সোনালি? সে তো আমাকে ভুলে গিয়ে সুখেই আছে।

ত্রিস্তান বললো, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

সামান্য বজরার রুটি আর খানিকটা তরকারি খেতে দেওয়া হলো ওকে। মাছ বা মাংস বা ডিম নেই। এই কি রাজপরিবারের খাদ্য? বিদ্রোহীরা জঙ্গল ঘিরে রেখেছে—দুর্গ থেকে কেউ বেরিয়ে খাবার আনতে পারে না।

যদি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এরা রাজকুমারীকে দিয়ে দিতে রাজী হয় সেই-জন্যই বিদ্রোহীরা দুর্গ শুদ্ধ অবরুদ্ধ করে রেখেছে, ধ্বংস করছে না। ত্রিস্তান তাকিয়ে দেখলো, রাজকুমারী রুপালি নিঃশব্দে বসে উল বুনছেন।

ক্লান্ত ত্রিস্তান সেদিন ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে উঠেই কাহারডিনকে বললো, চলো আমার সঙ্গে। খাদ্য লুট করে আনি।

কাহারডিন বললো, ত্রিস্তান, আমাদের দুর্গে মাত্র তিনশো সৈন্য আর ওরা

অন্তত দশ পনেরো হাজার। গিয়ে কি লাভ ?

ত্রিস্তান বললো, তুমি রাজপুত্র, নিশ্চয়ই যুদ্ধে মরতে ভয় পাও না। এসো আমার সঙ্গে।

অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওরা দুজনেই বেরিয়ে পড়লো। নিঃশব্দে চললো বনের ছায়ায় ছায়ায়। কিছুদূরে গিয়ে একটা বড় গাছের ওপর উঠে বসে রইলো দুজনে। ত্রিস্তান দেখলো দূরে বিদ্রোহীদের তাঁবু। বাইরে সৈন্যরা কুচ করছে। রোদ্দুরে ঝলমল করছে তাদের অস্ত্র। তা ত্রিস্তানের সাধ্য নেই একা সেখানে গিয়ে কিছু করে। ত্রিস্তান বললো, আমাকে চিনিয়ে দিতে পারবে, কে তোমাদের বিদ্রোহী দাস।

পাতার আড়াল থেকে কাহারডিন আঙুল তুলে দেখালো, ঐ যে দেখছো, যার গায়ে লাল মখমলের পোশাক, মোষের মতো চেহারা, ঐ আমাদের দাস রিওল! লোকটা অসম্ভব শক্তিশালী!

ত্রিস্তান রিওলকে চিনে রাখলো। খানিকটা বাদে শুনলো দূরে বনের মধ্যে গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ। একটা ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই করে মাংস আর মদ আসছে এই সৈন্যদের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে আসছে কুড়ি পঁচিশ জন প্রহরী। ত্রিস্তান কাহারডিনকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লো। তারপর সে আকস্মিক ঝড়ের মতো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রহরীদের উপর। তার তলোয়ার ঘুরতে লাগলো প্রচণ্ড বেগে। ত্রিস্তান যেন একাই পঁচিশ জন লোক হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তে সে প্রহরীদের হত্যা করে—কাহারডিনকে সঙ্গে তুলে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল। ওদিকে সৈন্যরা টের পাবার আগেই ওরা দুর্গে পৌঁছে গেছে!

সেদিন দুর্গে অনেকদিন পর বিরাট ভোজ হলো। সৈন্যরা প্রাণভরে উৎসব করলো—আর জয়ধ্বনি তুললো ত্রিস্তানের নামে।

সেইদিনই মধ্যরাত্রে দুর্গ আক্রান্ত হলো! রিওলের সৈন্যরা দুর্গের চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে—বিরাট একটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে দুর্গের দরজায় আঘাত করে ভেঙে ফেলছে। দুর্গের সৈন্যরা প্রাণ দিয়ে লড়াই করছে। ত্রিস্তান তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালের ওপর। সে তখনও যুদ্ধে যোগ দেয়নি।

হঠাৎ সে দেখলো একটা বিরাট মই ফেলে পিলপিল করে সৈন্য উঠে আসছে দুর্গের ছাদে। তখন শুরু হলো হাতাহাতি লড়াই। যুবরাজ কাহারডিন লড়াই করছে একজন ভীষণ-দর্শন যোদ্ধার সঙ্গে। যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে লড়াই করছে কাহারডিন, একসময় লোকটির বুকের মধ্যে তরোয়াল বসিয়ে দিল। এমন

সময় যমদূতের মতো রিওল এসে দাঁড়ালো তার সামনে। অট্টহাসি দিয়ে বললো, রাজকুমার, আমার ভাইকে তো মারলে! এবার আমার সঙ্গে একহাত হোক।

তখন ত্রিস্তান একলাফে হাজির হলো সেখানে। বললো, রাজপুত্র কখনও ভৃত্যের সঙ্গে লড়াই করে না! আগে ভৃত্যের সঙ্গে ভৃত্যের লড়াই হোক!

এ লোকটা আবার কে? এই বলেই রিওল বিদ্যুৎবেগে তলোয়ার চালালো ত্রিস্তানের দিকে। ঠক করে ত্রিস্তানের তলোয়ারের সঙ্গে তার তলোয়ার আটকালো। ওরা দুজনে মুখোমুখি। এ সময় তলোয়ার টেনে নেওয়া বিপদ। যার বাহুর জোর—সে-ই জিতবে। শারীরিক শক্তিতে ত্রিস্তান রিওলের সঙ্গে পারবে না। ত্রিস্তান নিচু হয়ে বসে পড়ে তলোয়ার খুলে নিল। ঝোঁক সামলাতে না পেরে রিওল হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। ত্রিস্তান তখন দ্রুত ছুটে গিয়ে উঠলো দুর্গের সর্বোচ্চ চূড়ায়। রিওলও ক্রুদ্ধভাবে ছুটে গেল সেখানে। তারপর সেখানে যুদ্ধ হতে লাগলো দুজনের। ঠং ঠং শব্দ হচ্ছে তলোয়ারের। আকাশের পটভূমিকায় ওদের সেই লড়াই, চারপাশের জঙ্গলে আগুন জ্বলছে—এ এমনই এক দৃশ্য যে, বহু লোক যুদ্ধ থামিয়ে দেখতে লাগলো ওদের।

ত্রিস্তানের শরীরে বর্ম নেই, হালকা দেহ—সে ক্ষিপ্রভাবে সরে যাচ্ছে আঘাতের সময়। রিওল—বিশাল ভারী। তার ভরসা—শারীরিক শক্তি। এক ফাঁকে ত্রিস্তান তলোয়ার চালিয়ে রিওলের বুকের বর্ম ফাঁক করে দিল। তারপর ত্রিস্তান রিওলের কব্জির কাছে এমন কৌশলে আঘাত করলো—যে তাঁর হাতের দুটো আঙুল কেটে গিয়ে তলোয়ারটা ছিটকে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পড়লো দূরের বনের মধ্যে। ত্রিস্তান রিওলের বুকে তলোয়ার ছুঁইয়ে বললো, শেষবার ভগবানের নাম করে নাও।

যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ, রিওল মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, আমার প্রাণ ভিক্ষে দাও।

ত্রিস্তান হাসলো। হেসে বললো, ভিক্ষে চাইবার সময় মানুষের আর সময়-অসময় জ্ঞান থাকে না! দু' মিনিট আগে তোমার মুখ অহংকারে টক্‌টক্‌ করছিল। আর এই মুহূর্তে সত্যিই ভিখারীর মতো করুণ হয়ে গেল। আচ্ছা, তোমায় ভিক্ষা দিচ্ছি, তার আগে তুমি চেঁচিয়ে তোমাদের সৈন্যদের বলো যুদ্ধ থামাতে। সকলের সামনে শপথ করো, তুমি আবার এ রাজপরিবারের দাসত্ব করবে। রাজকুমারের ঘোড়ার আগে আগে তুমি যাবে পায়ে হেঁটে।

রক্তাক্ত হাত জোড় করে, রিওল চিৎকার করে তার সৈন্যদের ডাকলো। সকলে অবাক হয়ে দেখলো, যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত। তার বুকের কাছে উঁচু করা

ত্রিস্তানের তলোয়ার। রিওল কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি হেরে গেছি। আমি হেরে গেছি। যুদ্ধ শেষ। ত্রিস্তানের আদেশে শৃঙ্খলিত করা হলো তাকে। সে আবার এ রাজবাড়ির দাসত্ব করতে স্বীকার করলো।

ত্রিস্তান ভাবলো, এবার তার কাজ শেষ, আবার তাকে অন্য দেশে চলে যেতে হবে। ততক্ষণে কাহারডিন এসে ত্রিস্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, ত্রিস্তান, তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার আর কেউ নেই। তোমাকে আর আমি ছাড়বো না। কাহারডিন ত্রিস্তানকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বৃদ্ধ পিতার কাছে।

রাজা তার মস্তক আঘ্রাণ করে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে করতে বললেন, কোথা থেকে তুমি এলে সৌভাগ্যের দূত! আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলে। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তুমি আমাদের রাজ্যের স্থায়ী রক্ষক হলে। বৎস ত্রিস্তান, তুমি আমার মেয়ে রুপালিকে বিয়ে করো। সে তোমার অযোগ্য হবে না।

ত্রিস্তান চুপ করে রইলো। অভিমানে তার বুক দুলছে। মন বললে, সোনালি, সোনালি। সোনালি আমাকে ভুলে গেছে। আমাকে হারিয়েও সে সুখী। আমি বেঁচে আছি কিনা তা সে জানতেও চায় না।

কাহারডিন ব্যগ্রভাবে বললো, ত্রিস্তান আমার বোন সত্যিই তোমার যোগ্য। আমরা তোমাকে আত্মীয় হিসেবে চাই।

ত্রিস্তান তবুও চুপ।

—ত্রিস্তান চুপ করে আছো কেন, সাড়া দাও।

ত্রিস্তান শুধু বললো, না।

বৃদ্ধ রাজা ধীরভাবে বললেন, ত্রিস্তান, আমাদের ভৃত্য রিওল লোভ করেছিল রুপালিকে। আমাদের সকলকে হত্যা করার আগে সে রুপালিকে অপহরণ করতে পারত না। কিংবা তখনও সে পেতো রুপালির মৃতদেহ। কিন্তু তুমি তাকে পরাজিত করে রুপালিকে উদ্ধার করেছো। রুপালি এখন আইনত তোমার। নারী সব সময়ই বীরভোগ্যা এবং বীর্যশুল্কা। তোমার বীরত্বে তুমি রুপালির অধিপতি হয়েছ। তুমি যদি তাকে পরিত্যাগ করো, তবে তার আর কোনো উপায় থাকবে না।

কাহারডিন আবার বললো, ত্রিস্তান, বন্ধু, রুপালিকে তোমার পছন্দ নয়? ঐ দেখো, দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি ওকে আরেকবার দেখো!

ত্রিস্তান চোখ তুলে তাকালো সেদিকে। দরজার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে

আছেন রূপালি। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেই রূপ। একমাথা রূপালি চুল, উজ্জ্বল মসৃণ মুখ, দীর্ঘ শরীর, একটা সাদা সিল্কের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মোমবাতির আলোর মতন তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গিটি স্নিগ্ধ কিন্তু বড় বিষণ্ণ।

রূপালির দিকে তাকিয়ে ত্রিস্তানের তবু মনে পড়লো সোনালির কথা। যে-কোনো জায়গায় কোনো সুন্দর রূপ দেখলেই সে সোনালির কথা ভাবে। যখন সে কোনো ভাল খাদ্য খায়, দেখে কোনো সুগন্ধ ফুল, কোনো হরিণশিশু, অথবা যখন আকাশ ভাসিয়ে জ্যোৎস্না ওঠে, কিংবা সে শোনে ঝরনার ছলছল শব্দ – সবই তাকে সোনালির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ পৃথিবীর সব সৌন্দর্যই তার চোখে সোনালি।

কিন্তু অভিমানে ত্রিস্তানের বুকে জ্বালা করতে লাগলো। কোথায় সোনালি? সে আমাকে ভুলে গেছে। রাজাকে নিয়ে সে সুখে আছে। বনে জঙ্গলে আমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করার পর এখন সে পেয়েছ সুখের স্বাদ। আমি তার কেউ নই! শুধু আমিই কি তার স্মৃতি বুকে বয়ে বেড়াব জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো? না—না! ত্রিস্তান আবার তাকালো রূপালির দিকে। একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে, যেন সেই দীর্ঘশ্বাসই তার এক জন্মের স্মৃতি।

তারপর মৃদুস্বরে বললো, রূপালিকে বিয়ে করতে পারা তো আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

হায়, ত্রিস্তান, তুমি কেন এ কথা বললে? প্রভু, আপনারা এ কাহিনী শুনেছেন, আপনারা ত্রিস্তানের দুঃখে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলুন। হায়, হায়, ত্রিস্তান, তুমি এ কি করলে? সেদিন থেকেই যে ত্রিস্তানের মৃত্যু শুরু হয়ে গেল। ত্রিস্তানের সঙ্গে সোনালির জীবন—ভালোবাসা ও মৃত্যু—এক সূত্রে বাঁধা। ভালবাসার একমাত্র বিপরীত জিনিস যে মৃত্যু। আর কিছু নেই। হায় ত্রিস্তান, তোমার অভিমান তোমাকে কোন সর্বনাশের মধ্যে নিয়ে গেল!

কয়েকদিন পর মহা ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হলো। বহুকাল পরে এ রাজ্যে আনন্দ ফিরে এসেছে। বহুকাল পর ত্রিস্তান বহুমূল্য উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরেছে। তাকে দেখাচ্ছে দেবতার মতো আর রাজকুমারী রূপালি, সলজ্জ সুন্দরী—তার রূপের দিকে তাকালেও চোখের পলক পড়ে না! রূপালি আস্তে আস্তে ত্রিস্তানের হাতে একটা আংটি পরিয়ে দিলেন। টুকটুকে লাল পাথরের আংটি। সেদিকে

তাকিয়ে ত্রিস্তানের চোখ পড়লো নিজেরই হাতের অন্য আঙুলে সবুজ পাথরের আংটির দিকে। সোনালি তাকে দিয়েছিল, অভিজ্ঞান হিসেবে।

হঠাৎ ত্রিস্তানের মাথা ঘুরে উঠলো। যেন সে তখুনিই অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখুনি তার এক নিমেষের মধ্যে মনে পড়ে গেল—বনে বনে সোনালির সঙ্গে তার দুঃখ ভাগ করে নেওয়া দিনগুলির সম্পূর্ণ ছবি! সোনালির পাশে বসে তার সেই পাখির ডাক শোনানো। মুহূর্তে ত্রিস্তান নিজের ভুল বুঝতে পারলো। এ কি করেছে সে? সোনালি ছাড়া অন্য নারীকে সে ছোঁবে কি করে? তার এক জীবনের সম্পূর্ণ ভালোবাসা যে সে আগেই দিয়ে দিয়েছে সোনালিকে। এখন আর তার কিছু অবশিষ্ট নেই।

ফুলশয্যার রাত্রে দুজনে শুয়ে আছে পাশাপাশি। ত্রিস্তান রুপালির সঙ্গে একবার হাতও ছোঁয়ায়নি, একটি কথাও বলেনি। এ কি ফুলশয্যা! আহা, সরল নির্দোষ রুপালি। নিঃশব্দে প্রতি মুহূর্ত কাটছে। খানিকটা পর রুপালি খুব মৃদুভাবে বললেন, আর্যপুত্র, আমি কি কোনো দোষ করেছি? আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

—না, না, না।

—তবে, আপনি আমার সঙ্গে একটাও কথা বলছেন না? আমি কি দোষ করেছি, বলুন? আমাকে কি আপনার পছন্দ হয়নি?

—না, রুপালি, আমাকে ভুল বুঝো না। আমার একটি শপথ আছে। একবার আমি যুদ্ধে বিষমভাবে আহত হয়েছিলাম। আমার বাঁচার কোনো আশা ছিল না। তখন আমি কুমারী মেরির কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, মা, আমাকে যদি বাঁচিয়ে দাও, আমি বিবাহের পর এক বছর ব্রহ্মচর্য পালন করবো। আমার স্ত্রীকে আলিঙ্গন, চুম্বনও করবো না। আমাকে এক বছর সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে দাও। আমায় ক্ষমা করো, রাজকন্যা।

—বেশ! এই বলে রাজকুমারী পাশ ফিরে শুলেন। ত্রিস্তানের সে রাত বিনিদ্র কাটলো। রুপালিরও।

নব দম্পতির দিন যে কত দুঃখে কাটছে কেউ জানে না। সকলে ভাবে, আহা ওদের কি সুন্দর মানিয়েছে! যেন এক জোড়া স্বর্গের হংস-হংসী। অথচ, প্রত্যেক দিন ওরা এক ঘরে, এক শয্যায় শোয়, শুয়ে দুজনেই কাঠ হয়ে পড়ে থাকে। সখীরা যখন হাসাহাসি করে ওঁর রাত্রের গল্প বলার জন্য—তখন রুপালি বুকের

চাপা কান্না গোপন করেন, বইতে পড়া সমস্ত গল্প ওদের বানিয়ে বলেন। সকলে ভাবে, ত্রিস্তানের মতো স্বামী পেয়েছে, রাজকুমারীর জীবন ধন্য।

একদিন রাজপুরীর সকলে শিকারে বেরিয়েছে। রূপালিও এসেছেন। ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সকলে। বনের মধ্যে এক জায়গায় বৃষ্টির জল জমেছে। রূপালির ঘোড়া সেই জলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ জল ছিটকে এসে ওর পোশাক ভিজিয়ে দিল। খল্ খল্ করে হেসে উঠলেন রূপালি। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এনে আবার সেই জলের ওপর দিয়ে গেলেন—এবার জল ছিটকে এসে পোশাকের নিচে ওঁর উরু পর্যন্ত ভিজিয়ে দিল। হা-হা করে অনেকক্ষণ হাসতে লাগলেন রাজকুমারী! কি রকম অস্বাভাবিক সেই হাসি। বারবার রাজকুমারী ফিরে আসতে লাগলেন সেই জলের ওপর! ঘোড়ার পায়ের ধাক্কায় জল ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিতে লাগলো রূপালির অর্ধেক শরীর। রাজকুমারী হাসতে লাগলেন উন্মাদের মতো। সকলেই অবাক! তখন যুবরাজ কাহারডিন নিজের ঘোড়া রূপালির পাশে এনে জিগ্যেস করলে, ও কি বোন, তুই এত হাসছিস কেন?

—কি মজার, কি মজার জিনিস দাদা!

—এতে কিসের মজা?

—আমি জলের সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। মহাবীর ত্রিস্তানও আজ পর্যন্ত যেখানে হাত ছোঁয়াতে সাহস পায়নি, এই সামান্য জলের কি সাহস, সে-ই আমার উরু পর্যন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে! মজার না দাদা? হা-হা-হা—হাসতে হাসতে রাজকুমারী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

কাহারডিন তখন অবাক হয়ে ওকে জিগ্যেস করলেন, তোর কিসের দুঃখ বল্?

রাজকুমারী চোখের জল মুছে বললেন, না, কিছু না। ও এমনি।

তখন কাহারডিন খুব জোরাজুরি করার পর রাজকুমারী খুলে বললেন সব কথা। এক বছরেরও বেশী হয়ে গেল—তাঁর অমন রূপবান, গুণবান স্বামী তাঁকে একদিনের জন্য ছুঁয়েও দেখেননি।

এই কথা শুনে উৎকট গম্ভীর মুখে কাহারডিন এলো ত্রিস্তানের পাশে। তাকে আড়ালে ডেকে বললে ত্রিস্তান, তুমি আমাদের পরিবারের সকলকে অপমান করেছো। তুমি রূপালিকে ঘৃণা করেও তাকে বিয়ে করেছো। এখন তাকে করছো চূড়ান্ত অবহেলা। এ অপমান আমি সহ্য করবো না। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। তাতে আমি মরবো জানি—তবু আমি এ অপমান সইবো না।

ত্রিস্তান ক্লিষ্টভাবে বললো, জানতুম এ রকমই হবে। আমারই দোষ। কিন্তু যুবরাজ, তুমি যদি আমার এ দুর্ভাগা জীবনের কথা শোনো, হয়তো তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।

ঘোড়া থেকে নেমে ওরা বসলো একটা গাছের নিচে। ত্রিস্তান একে একে বলে গেল তার সমস্ত জীবনের কথা। তার বাল্যকাল, অভিশপ্ত যৌবন, তার সর্বনাশা ভালোবাসা, বনবাস, তার উদাসীন ভ্রাম্যমাণ জীবন। তারপর বললো, রাজকুমার, সোনালি হয়তো আমাকে ভুলে গেছে! কিন্তু আমি ওকে ভুলতে পারি না যে! আমার নিদ্রায়-জাগরণে প্রতি মুহূর্তে সোনালি। মুহূর্তের ভুলে আমি তোমার নিষ্পাপ বোনকে বিয়ে করে, সারা জীবন পাপের ভাগী হয়েছি। মৃত্যু ছাড়া আমার আর মুক্তি নেই।

অবাক বিস্ময়ে কাহারডিন এ কাহিনী শুনলেন। যেন এক রূপকথা! সেই রূপকথার নায়ক তার সামনে বসে আছে। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাহারডিন বললে, ত্রিস্তান, একটিমাত্র উপায় আছে। চলো, তুমি আর আমি দুজনে লুকিয়ে কর্নওয়ালে যাই। গিয়ে দেখি, সত্যি রানী সোনালি তোমাকে ভুলে গেছে কিনা। যদি সত্যিই তিনি তোমাকে ভুলে গিয়ে সুখে থাকেন—তাহলে ফিরে এসে আমার বোনকে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকা তোমার উচিত নয়।

ত্রিস্তান চুপ করে রইলো। কাহারডিন আবার বললে, ত্রিস্তান, আমি সারা জীবন তোমার বন্ধু হতে চাই।

ত্রিস্তান বললো, সারাটা জীবন তো আমার একজন বন্ধু খুঁজতে খুঁজতেই কেটে গেল। আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন গুরু গর্ভেনাল। তারপর এই তোমাকে পেলাম। চলো, আমরা কর্নওয়ালে যাই।

তীর্থযাত্রার নাম করে ত্রিস্তান আর কাহারডিন একটা জাহাজ সাজিয়ে বেরিয়ে পড়লো। অনুকূল হাওয়ায় জাহাজ এসে পৌঁছুলো কর্নওয়ালের সীমান্তে। ত্রিস্তান বললো, এ রাজ্যে নামা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। চলো, লিডানের জমিদার দিনাসের কাছে যাই। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন।

একদিন ভোর রাত্রে ওরা এসে উপস্থিত হলো দিনাসের প্রাসাদে। দিনাস একটু গম্ভীরভাবে ওদের প্রাসাদে অভ্যর্থনা করলেন। যথোচিত আহার ও পোশাক দিলেন। তারপর তিনি থমথমে মুখে বললেন, ত্রিস্তান, তুমি আবার কেন এদেশে এসেছো? তোমার ও সোনালির মধ্যে যে সত্যিকারের তীব্র ভালোবাসা ছিল তাকে আমি সম্মান করতুম। কিন্তু, তুমি সে ভালোবাসার সম্মান রাখোনি।

আমি শুনতে পেয়েছি, তুমি বিয়ে করেছো। তোমার সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা নেই।

ত্রিস্তান দিনাসের পা জড়িয়ে ধরে বললো, আপনার তুলনা নেই! আমি বিয়ে করেছি ঠিকই, কিন্তু সে আমার মুহূর্তের ভুল। দিনাস, আমি একটা দিনের জন্যও আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করিনি, সোনালি ছাড়া এক মুহূর্তও আমি অন্য কারুকে মনে স্থান দিইনি। এই কাহারডিন আমার স্ত্রীর ভাই, ও সাক্ষী আছে। ওকে জিগ্যেস করে দেখুন। দিনাস, আপনি বলুন, সোনালি কেমন আছে? সে কি আমাকে ভুলে গেছে? আমি শুনেছি, সে আমাকে ভুলে সুখে আছে?

দিনাস বললেন, ত্রিস্তান, বাইরে থেকে কতটুকু দেখা যায়! আমি জানি, সে প্রত্যেকদিন তোমার জন্যে গোপনে কাঁদে। আমি চোখ দেখলে চিনতে পারি। কিন্তু বাইরে তাকে সুখের ভান করতে হয়। সে তো তোমারই জন্য। নইলে তোমাকে লোকে আবার বদনাম দেবে। তার দুঃখ অনেক বেশী। কিন্তু ত্রিস্তান, তুমি আবার কেন এসেছো? তোমাদের মিলন তো অসম্ভব। তুমি নিজেই তো তাকে তুলে দিয়ে গেছ রাজার হাতে। তোমার দাবী শেষ হয়ে গেছে। আবার তবে কেন এসেছো রাজার শান্তি বিঘ্ন করতে।

চোখের জলে দিনাসের পা ভিজিয়ে ত্রিস্তান বললো, একবার, শুধু একবার আমি ওর সঙ্গে দেখা করে যাবো। শুধু একবার দুটো মুখের কথা শুনে যাবো। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। আমি একটি বার দেখা করেই চলে যাবো।

ত্রিস্তান সেই সবুজ পাথরের আংটিটা দিনাসের হাতে পরিয়ে দিল। দিনাস চলে গেলেন সেদিনই বিকেলবেলা টিণ্টাজেল দুর্গে। রাজা আর রানী তখন পাশা খেলছিলেন। দিনাসকে দেখে রাজা বললেন, বসো দিনাস। খেলাটা শেষ হয়ে যাক্। তারপর আবার পাশার চাল দিতে লাগলেন। দিনাস রানীর সঙ্গে আলাদা কথা বলার কোনো সুযোগই পেলেন না। শুধু রানীকে একবার খেলার চাল দেখিয়ে দেবার জন্য হাতটা বাড়ালেন। হাতে সেই আংটি। আংটি দেখেই দারুণ চমকে উঠলেন সোনালি। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন দিনাসের দিকে। দিনাস চোখেই সম্মতি জানালেন যে, ত্রিস্তান এসেছে। তারপর রাজা মুহূর্তের জন্য একবার উঠে বাথরুমে যেতেই দিনাস জিগ্যেস করলেন, রানী, তুমি দেখা করবে ত্রিস্তানের সঙ্গে?

সোনালি বললেন, দিনাস, ত্রিস্তানের ডাক এলে আমি রাজপুরীর এক হাজার দেওয়াল ভেঙেও বেরিয়ে যাবো। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

রাজা আবার ফিরে এলেন, তারপর দিনাসকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন

সভাগৃহে। রানী কিভাবে দেখা করবেন, কখন—কিছুই শোনা হলো না।

দিনাস ফিরে এসে ত্রিস্তানকে সব বললেন। আর একটা খবরও দিলেন, দু'দিন পর রাজা আর রানী টিণ্টাজেল দুর্গ ছেড়ে পাহাড়ের মাথায় গ্রীষ্মাবাসে যাবেন। সে কথা শুনে, সেদিনই ত্রিস্তান গ্রীষ্মাবাসে যাবার পথের ধারে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলো। সঙ্গে কাহারডিন। দুজনেই সশস্ত্র।

বিরাট শোভাযাত্রা বেরুলো রাজা ও রানীর সঙ্গে। প্রথমে বাদকবৃন্দ। তারপর প্রহরীর দল। তারপর পাত্রমিত্রদের সঙ্গে রাজার বিশাল রথ। পরে ছোট ছোট রথে রাজপুরীর মেয়েরা। একটি সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাহারডিন বললো, ঐ তো রানী?

ত্রিস্তান হেসে বললো, না, ও তো রানীর দাসী!

—তবে, ঐ যে সাদা পোশাক পরা পরীর মতো, ঐ নিশ্চয়ই রানী? সত্যি, কি রূপ!

—না, না, ও তো রানীর সখী বিরজা!

তারপর একটি স্বর্ণমণ্ডিত রথে এলেন সোনালি। কি রূপের দ্যুতি তাঁর। এতদিনে একটুও ম্লান হয়নি। হুজুর, চাঁদের কি বয়স বাড়ে? না, চাঁদ কোনো বছর কম সুন্দর হয়ে যায়! রানী সোনালির রূপ পূর্ণচন্দ্রের মতো অমলিন জ্যোৎস্নাময়।

রানীর রথ যখন ঝোপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন মিষ্টি পাখির ডাক ভেসে উঠলো। যেন পর পর সুর মিলিয়ে দোয়েল, বুলবুলি, চাতক পাখি ডেকে উঠছে। মিষ্টি অথচ কি করুণ সেই সুর। রানী সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন, এ ডাক ত্রিস্তানের। এ ডাক বিরহের ডাক। পৃথিবীর একটি মাত্র পাখির পক্ষেই এমন ডাক সম্ভব।

রানী রথ একটু থামাতে বললেন। তারপর উচ্চস্বরে বললেন, বনের পাখি, তোমার গান শুনে আমার মন ভরে যাচ্ছে। আমি পাহাড় চূড়ায় গ্রীষ্মাবাসে যাচ্ছি। তুমি সেখানে এসে আমায় গান শোনাবে? বনের পাখি তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। এই দারুণ গ্রীষ্মে তোমার গান আমায় শান্তি দেবে। তুমি এসো ঠিক।

রথ আবার চলতে লাগলো। শোভাযাত্রা শেষ হয়ে গেলে ওরা দুজনে আবার ফিরে এলো দিনাসের প্রাসাদে।

ত্রিস্তান গোপনে গ্রীষ্মাবাসে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলো।

এদিকে ঘটল আরেক ঘটনা। রাজা মার্ক প্রায় বৃদ্ধ হয়েছেন বলেই সুযোগ

পেলে কয়েকজন নাইট রানীর পাশাপাশি এসে ঘুরঘুর করে যদি রানীর কিছু কৃপা পাওয়া যায়! রানী কারুকে গ্রাহ্য করেন না। সেদিন গ্রীষ্মাবাসে পৌঁছুবার পর, একজন নাইট একটু আড়াল পেয়ে রানীর কাছে এসে ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললো, সত্যি, আমাদের এমন সুন্দরী রানীর জন্যই রাজ্যের এত শ্রীবৃদ্ধি! রাজা মিথ্যাই রানীকে সন্দেহ করেছিলেন। এই তো, রানী কেমন সুখে আছেন এখানে! আর ত্রিস্তানও অন্য মেয়েকে বিয়ে করে সুখে আছে বিদেশে।

—মিথ্যে কথা! ত্রিস্তান বিয়ে করেনি! রানী বলে উঠলেন।

—বাঃ, রানী আপনি জানেন না? সকলেই তো জানে। ত্রিস্তান ব্রিটানির রাজকুমারী রুপালিকে বিয়ে করেছে।

রানী তখনই উঠে নিজের ঘরে চলে এলেন। শরীরের পোশাকের ভারও যেন অসহ্য লাগলো এমন জ্বালা। ছট্‌ফট্‌ করে কয়েক প্রস্থ পোশাক খুলে ফেললেন। আয়নার সামনে দাঁড়ালেন একবার। তার পর হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে ফেললেন। অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। তারপর ভাবলেন, আমি কেন কাঁদছি! আমি তো চেয়েই ছিলাম, ত্রিস্তান সুখী হোক! কিন্তু তাহলে সে আবার আমার কাছে এসেছে কেন? আমাকে নিয়ে খেলা করতে চায়? না, না, ত্রিস্তানের বিয়ে হয়নি! মিথ্যে কথা! হে ঈশ্বর, এ খবর শোনার আগেই আমার মৃত্যু হলো না কেন? এত দীর্ঘ জীবন আমার কি প্রয়োজন। মুখে যাই বলি, ত্রিস্তানের বিয়ে করা যে আমি সহ্য করতে পারবো না, ঈশ্বর, তুমি তা জানো। কিন্তু আমিও তো স্বামীর ঘর করছি। সে দোষ কি আমার? ত্রিস্তানেরই। ও আমাকে নিজে বিয়ে করতে পারতো — তার বদলে প্রভুভক্তির জন্যে সেই প্রথমবারই কেন রাজার হাতে তুলে দিল? কেন? ত্রিস্তান এমন বিশ্বাসঘাতক! ওঃ ভগবান!

রানী তখন ডাকলেন সখী বিরজাকে। বললেন, সখী তুই আমাকে বিষ দে। আমি আর পারি না, আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে!

বিরজা সব শুনে ঈষৎ হাস্যে বললো, রানী, একি ছলনা তোমার? তুমিও তো স্বামী পেয়েছো, রাজরানী হয়েছো, আর সেই হতভাগ্য একটি স্ত্রী পেতে পারে না?

দৃপ্ত ভঙ্গিতে সোনালি বললেন, আমাকে স্বার্থপর বলিস আর যাই বলিস, আমি পারবো না, পারবো না, ত্রিস্তানের পাশে অন্য কোনো মেয়েকে আমি সহ্য করতে পারবো না। তুই আমাকে বিষ দে।

বিরজা তখন বললেন, আচ্ছা, আগে দেখা যাক্‌ খবরটা সত্যি কিনা। ত্রিস্তান তো দিনাসের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। ওখানে পেরিনিসকে পাঠানো যাক্‌ না। বিরজা ডাকলো বিশ্বাসী অনুচর পেরিনিসকে।

রানী জ্বলন্ত চোখে তাকে বললেন, পেরিনিস, তুই গিয়ে নিজে শুনে আয় ত্রিস্তানের বিয়ের খবর সত্যি কিনা। যদি সত্যি হয় বলিস্‌, সে যেন এ রাজ্যের সীমানাতে আর না আসে। কোনোদিন আর আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা না করে। যদি করে, আমি নিজে ওকে প্রহরী দিয়ে ধরিয়ে দেবো। নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর মৃত্যু দেখবো!

পেরিনিসকে দেখেই ত্রিস্তান বুকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, বন্ধু, বলো বলো, রানী কি খবর পাঠিয়েছে, কোথায় সে আমার সঙ্গে দেখা করবে?

পেরিনিস বললো, ত্রিস্তান একথা কি সত্যি যে আপনি বিয়ে করেছেন? যদি সত্যি হয়, তবে রানী আর কোনোদিন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না!

—এ কি কথা বলছো পেরিনিস? রানী কি জানে না যে—তাকে ছাড়া আর কোনো নারীকে কোনোদিনই আমার পক্ষে ভালোবাসা অসম্ভব? আমরা দুজনে যে একসঙ্গে সেই তীব্র সুরা পান করেছিলাম! হ্যাঁ, একথা সত্যি, আমার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সে তো মুহূর্তের ভুলে! আমি আজও সোনালির প্রতি অবিশ্বাসী হইনি। আমি আজও তাকে ছাড়া অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করিনি। পেরিনিস, তুমি আবার যাও, গিয়ে রানীকে জিজ্ঞেস করে এসো, কখন আমি রানীর সঙ্গে দেখা করতে পারবো। একবার ও আমাকে দেখলেই সব বুঝবে! খবর নিয়ে তুমি আবার ফিরে এসো পেরিনিস। আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষায় থাকবো!

কিন্তু পেরিনিস আর ফিরে এলো না। রানী যে মুহূর্তে শুনলেন ত্রিস্তানের বিয়ের খবর সত্যি, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, তোমরা সব যাও। আমি কারুর মুখ দেখতে চাই না! আমি আর কোনোদিন আয়নাতেও নিজের মুখ দেখবো না!

ত্রিস্তান বৃথাই কদিন গোপনে ঘুরলো রানীর গ্রীষ্মাবাসের চারিদিকে। রানীর সঙ্গে দেখা হবার কোনো উপায় নেই। তখন ত্রিস্তান বেপরোয়া হয়ে গেল। সে ঠিক করলো দেখা করবেই। শুনতে পেল পরের দিন রানী যাবেন মা মেরীর মন্দিরে প্রার্থনা জানাতে। ত্রিস্তান ভিখারী সেজে মন্দিরের পথে দাঁড়িয়ে রইলো।

পথের লোক সত্যিকারের ভিখারী ভেবে ত্রিস্তানের হাতে ভিক্ষে দিয়ে

যাচ্ছে। ত্রিস্তান নুয়ে নুয়ে সবার কাছ থেকেই ভিক্ষে নিচ্ছে। তারপর এলো রানীর রথ—সঙ্গে বহু দাস-দাসী ও এক ডজন প্রহরী। ভিখারী ছুটে এসে রথের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, রানী, আমাকে একবার দয়া করো!

সোনালি সেই ভিখারীর কুৎসিত ছদ্মবেশ সত্ত্বেও, উন্নত দেহ ও মুখের রেখা দেখেই ত্রিস্তানকে চিনতে পারলেন! চিনতে পারলেন ত্রিস্তানের কণ্ঠস্বর। কিন্তু ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভিখারী রথের আরও সামনে এসে বললো, রানী, শুধু একবার দয়া করো!

রানী মুখ কুঞ্চিত করে বললেন, চালাও রথ।

ভিখারী তখন রথের চাকা ধরে বললো, রানী একবার আমার অবস্থা দেখো! আমি সত্যিই ভিখারী হয়েছি। আমাকে তুমি সামান্য দয়া করলে, তোমার কিছুই ক্ষতি হবে না—কিন্তু আমার সারা জীবনটা ভরে যাবে! রানী, মাত্র একবার, জীবনের শেষবার—

সোনালি প্রহরীদের বললেন, সরিয়ে দাও লোকটাকে। সঙ্গে সঙ্গে পনের কুড়িটা সবল হাত ভিখারীকে চেপে ধরলো। তারপর হিঁচড়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে লাগলো ওকে। ভিখারী সেখান থেকেই করুণ, আর্ত গলায় চেঁচাতে লাগলো, রানী, দয়া করো, দয়া করো, একবার—

রানী হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, দয়া চাইবার স্পর্ধা কতখানি। আবার হাসতে লাগলেন হা-হা করে। রানীর সেই হাসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত। সেই হাসির শব্দে মন্দিরের ঘণ্টাগুলোও যেন দুলে উঠে ঠুং ঠুং করে বাজতে লাগলো। হাসির শব্দে ভয় পেয়ে উড়ে গেল ডানা ঝট্‌-পটিয়ে এক ঝাঁক পায়রা। আশেপাশের লোকেরা সেই হাসি শুনে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে ভুলে গেল। ভিখারী মুখ তুলে কিছুক্ষণ দেখলো সেই হাসি, রানীর গর্বোদ্ধত মুখ—তারপর সে ধীর পদক্ষেপে পিছন ফিরে চলে গেল।

সেই রকম হাসতে হাসতেই রানী মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। কয়েক ধাপ ওঠার পরেই শরীর দুলে উঠলো তাঁর। শূন্যে কিছু যেন একটা আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে রানী সোনালি ঝুপ করে সেই মন্দিরের সিঁড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পিছন ফিরে সেই যে হাঁটতে লাগলো ত্রিস্তান, বহুক্ষণের মধ্যে আর থামলো না। কোথায় চলেছে, কোন দিকে চলেছে, কোনোই খেয়াল নেই। সে যেন

রয়েছে একটা ঘোরের মধ্যে, একটা নিশি-পাওয়া মানুষের মতো শুধু এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। কাহারডিন তার জন্য অপেক্ষা করছিল দিনাসের প্রাসাদে। তার কথা ত্রিস্তানের মনেও পড়লো না।

সারারাত ধরে হাঁটলো ত্রিস্তান। সর্বক্ষণ তার কানে ভাসছে সোনালির সেই তীব্র উপেক্ষার হা-হা হাসির শব্দ। সেই দৃশ্যের কথা ভেবেই তার শরীর শিউরে উঠতে লাগলো। তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে যেন ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে চলেছে সোনালির সেই হাসি।

ত্রিস্তানের অঙ্গে তখনও ভিখারীর ছদ্মবেশ, হাতের মুঠোয় তখনও সেই ভিক্ষালব্ধ পয়সা। পরদিন সকালে সে একটি অচেনা নগরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, একজন তীর্থযাত্রী স্নান সেরে বাড়ি ফেরার পথে ত্রিস্তানকে থামিয়ে নিজে থেকেই একটা পয়সা ভিক্ষে দিলেন। তখন ত্রিস্তানের সম্বিৎ ফিরে এলো। আত্মস্থ হয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। ভিক্ষারীর পোশাকে নিজেকে বেশ ভালোই লাগলো তার। একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সে বেশ পটু ভঙ্গিতে পথচারীদের কাছ থেকে করুণ সুরে ভিক্ষে চাইতে লাগলো। বালকের মতো অল্পক্ষণের মধ্যেই মেতে উঠলো এই খেলায়। কোনো রূপসী নাগরিকা হয়তো তাকে অগ্রাহ্য করে চলে যাচ্ছে ভিক্ষে না দিয়ে, ত্রিস্তান ঠিক তার পিছনে পিছনে বহুদূর ছুটে কাতর সুরে কেঁদে কেঁদে আদায় করে নিচ্ছে ভিক্ষে?

ছিল সে রাজার কুমার, স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে নিজের রাজ্য। সে বিখ্যাত বীর, কালো বর্ম পরে সাদা ঘোড়ায় চেপে যাবার কথা তার, থাকার কথা রাজ-প্রাসাদে। অতবড় বীর সে, ইচ্ছে করলে যে-কোনো রাজ্যে গিয়ে এখনও সেনাপতির পদ পেতে পারে। সে রূপালির স্বামী, সে রাজ্যে তার কত সম্মান —কিন্তু ত্রিস্তানের কিছুই ভালো লাগে না। সে অনেক যুদ্ধ করেছে, কিন্তু এখন এই দীন ভিক্ষারী সেজে থাকতেই তার ভালো লাগছে। দেখতে দেখতে তার অঞ্জলি ভরে গেল ভিক্ষের পয়সায়।

তারপর ত্রিস্তান একা একা ঘুরতে লাগলো সেই অচেনা শহরে। এখানে সে আগে কখনও আসেনি। বেশ পরিষ্কার, প্রশস্ত এই শহরের রাস্তা নাগরিকরা বেশ ধনবান মনে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে সে একটা বড় উদ্যানের কাছে এসে পৌঁছলো। সেখানে বিরাট উৎসব হচ্ছে। বড়দিনের মেলা। বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে নাগরদোলা, সেখান থেকে ভেসে আসছে কচি শিশুদের কণ্ঠে আনন্দলহরী। এক জায়গায় তীরন্দাজরা লক্ষ্যভেদের পরীক্ষা দিচ্ছে, একটা সদ্য মারা হরিণ দূরে ঝোলানো

—কে তার চক্ষু বিদ্ধ করতে পারে। শন্ শন্ করে ছুটে যাচ্ছে তীরন্দাজদের তীর। আর একদিকে একটা বিশাল হাতীর ওপর একদল মেয়ে পুরুষ হল্লা করছে। ভাল্লুকের পোশাক পরে দুটো লোক দেখাচ্ছে কুস্তীর খেলা। আশে-পাশে কয়েকটা সরাবের দোকান, তার একটার সামনে ফুলের মতো ঘাগ্‌রা উড়িয়ে ক্ল্যারিওনেটের তালে তালে নাচছে একটি বেদেনী। ত্রিস্তান ঘুরে ঘুরে দেখছে।

এক জায়গায় দেখতে পেল গোল করা বড় ভিড়। একজন বাজীকর সেখানে পুতুলনাচের খেলা দেখাচ্ছে। বাজীকরের পোশাক অদ্ভুত, একটা সবুজ রঙের আলখাল্লা পরেছে, মাথায় পালকের টুপি। হাতে একটা ডমরু নিয়ে ডিং ডিং করে বাজিয়ে সে চেঁচাচ্ছে, এবার আরম্ভ হবে বড় খেলা, প্রেমের খেলা, আরম্ভ হলো, আরম্ভ হলো প্রেমের খেলা!

তারপর সে খেলা আরম্ভ করলো। তার সামনে নানারকম পুতুল—খেলা শুরু করার সময় সে হেঁকে উঠলো, এ খেলার নাম 'ত্রিস্তান আর সোনালির খেলা'—একেবারে তাজ্জব কাণ্ড। কিন্তু সত্যি ঘটনা! দেখে যান বাবু মশায়রা—

খেলার নাম শুনে বিষম চমকে উঠলো ত্রিস্তান। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা ভিখারী একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে দেখে এক সুন্দরী রমণী নাক কুঁচকোলেন।

বাজীকর একটি পুতুলের সুতোয় টান দিয়ে বললেন, এর নাম ত্রিস্তান—এর মতো সুন্দর, এর মতো বীরপুরুষ আর দুনিয়ায় দুটি নেই। ছেলেবেলায় ওর বাপ-মা মারা যায় · এই দেখুন বাবু-বিবিরা, ত্রিস্তান এখন রাজা মার্ককে প্রণাম করছে।—এইবার ত্রিস্তান যাচ্ছে মোরহল্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। লড়ে যা ব্যাটা, লড়ে যা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, বহুৎ আচ্ছা, এই দেখুন ত্রিস্তান যুদ্ধে জিতে গেল। সে ছাড়া আর কে জিতবে! এবার সে আয়ার্ল্যাণ্ডে যাবে ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করতে। সেটা খুব ভারী লড়াই। হ্যাঁ, এইবার ··

এক এক করে বাজীকর দেখিয়ে গেল ত্রিস্তানের জীবনের সব ঘটনা। ড্রাগন হত্যা, সোনালির সঙ্গে দেখা, রাজা মার্কের হয়ে ত্রিস্তানের সঙ্গে সোনালির হাতে হাত দিয়ে বিয়ে, ফিরে এসে রানী সোনালির কাছে তার গোপন অভিসার, ধরা পড়ার সব ঘটনা, বনে পালিয়ে যাওয়া ··

দর্শকরা দেখছে আর ঘন ঘন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে। ভিখারীবেশী ত্রিস্তান দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। প্রথমটায় বেশ মজা পেয়ে তার হাসি আসছিল, কিন্তু পরের দিকে নিজের জীবনের সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখে—তার বুকের মধ্যে বহু

দীর্ঘশ্বাস জমাট হয়ে গেল।

রাজা মার্কের হাতে রানী সোনালিকে ফিরিয়ে দিয়ে ত্রিস্তান বঞ্চিত হতভাগ্যের মতো চলে গেল নিরুদ্দেশে—এই পর্যন্ত দেখিয়ে খেলা শেষ করলো বাজীকর। দর্শকরা ত্রিস্তানের দুঃখে সরবে সমবেদনা জানাতে লাগলো। টপাটপ পয়সা পড়লো বাজীকরের সামনে।

ক্রমে দর্শকদের ভিড় সরে গেল, বাজীকর যখন পয়সা কুড়োচ্ছে, ত্রিস্তান এগিয়ে এলো তার সামনে। তার হাতের সমস্ত ভিক্ষের পয়সা সে ঢেলে দিল বাজীকরের হাতে। হতচকিত বাজীকর মুখ তুলে তাকাতে, ত্রিস্তান তাকে মৃদুস্বরে জিগ্যেস করলে, বাজীকর, তুমি এর পরের ঘটনা জানো ?

বাজীকর বললো, এর পর আর কি আছে ? রানীকে ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেল ত্রিস্তান, তারপর সে বোধহয় সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, কিংবা মনের দুঃখে মরেই গেছে হয়তো ! কেউ আর তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তুমি জানো নাকি ?

-একটু একটু জানি। আমি তো নানা দেশে ঘুরে বেড়াই, কিছু কিছু শুনেছি।

—কি শুনলে ? কোথায় আছে সে ?

—বলবো পরে। কিন্তু তুমি বল তো, এ গল্প কি এখানেই শেষ হলে মানায় ? আর একটু থাকা উচিত নয় ?

—তা বলা বড় মুশকিল ! জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে গেলে, তারপরই বলা যায় সেটা গল্পে মানায় কি মানায় না ! কিংবা, জীবনের সব ঘটনাই গল্প হতে পারে। কিন্তু, বানানো গল্পের মতো জীবন হয় না।

—কিন্তু বাজীকর, তোমার কি মনে হয় না, রানীর সঙ্গে ত্রিস্তানের আরেকবার দেখা হওয়া উচিত ? শেষবার ?

সবুজ আলখাল্লা আর পালকের টুপি পরা দীর্ঘদেহ বাজীকর মুখে এক মুখ দাড়িতে তার চেহারাটা ভয়ঙ্কর, কিন্তু বড় মমতাভরা গলায় সে বললো, আহা, আমি চাই ঐ হতভাগ্যের সঙ্গে রানীর আবার দেখা হোক কিন্তু তা কি আর সম্ভব ? ত্রিস্তানের কথা বলতে গিয়ে আমার কান্না পায়। বড় দুঃখী ও লোকটা।

ত্রিস্তান মাটির দিকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সে বললো, বাজীকর, আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দেবে ? আমি তোমার খেলায় সাহায্য করবো।

বাজীকরের সঙ্গেই থেকে গেল ত্রিস্তান। ওর সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায়। বাজীকর যখন নানান খেলার সঙ্গে ত্রিস্তান আর সোনালির খেলা দেখায়—তখন,

ও নিজেই পুতুলগুলো এগিয়ে দিয়ে দিয়ে, বাজীকরকে সাহায্য করে। বনের মধ্যে যেখানে ত্রিস্তান আর সোনালি কুঁড়েঘর বেঁধে আছে—সেই দৃশ্যটায় ত্রিস্তান পাখির ডাকের অনুকরণে শিস দিয়ে ওঠে। যে গল্প দেখে দর্শকরা চোখের জল ফেলে, সেই গল্পের নায়ক যে ভৃত্যবেশে এখানেই বসে আছে, তা কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে না।

ত্রিস্তানের মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। বাজীকর লোকটা অদ্ভুত ধরনের। রাত্রিবেলা এক তাঁবুতে দুজনে শুয়ে শুয়ে অনেক গল্প করে। বাজীকর তাকে শোনায় বহু অজানা দেশের কথা, সে বলে হিন্দুস্থান নামে নাকি একটা আজব দেশ আছে—যেখানে মানুষ ইচ্ছেমতো রূপ বদলাতে পারে—একটা লোকই দিনের বেলায় মানুষ আর রাত্তিরবেলায় বাঘ হয়ে যায়। সেখানে গাছও কথা বলে। সাধুরা মাটি থেকে এক হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে বসে তপস্যা করে। সেখানকার রাজারা প্রত্যেকেই তিনশো-চারশোজন রানীকে বিয়ে করে—প্রত্যেক রাতেই রাজার সঙ্গে থাকে একজন নতুন রানী।

বাজীকর নিজেও অনেক মন্ত্র-তন্ত্র জড়ি-বুটি জানতো। মানুষের চোখের সামনে আঙুল নেড়ে তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, তাকে দিয়ে হুকুম মতো যা ইচ্ছে করানোতে সে ছিল ওস্তাদ। তার কাছে একরকম ওষুধ ছিল—সে ওষুধ গায় মাখলে মানুষের গায়ের চামড়ার রং এক মাসের জন্য বদলে যায়। ত্রিস্তান সেই ওষুধ খানিকটা চেয়ে নিয়েছিল ওর কাছ থেকে।

বাজীকরের একমাত্র দোষ ছিল, মাঝে মাঝে মদ খেয়ে সে অত্যধিক মাতাল হয়ে পড়তো। সে সময়টা সে হয়ে যেত অন্য মানুষ। তখন যত রকম কুৎসিত গালাগাল, জিনিসপত্র ভাঙা, যে-কোনো লোককে ধরে মারা ছিল তার স্বভাব। বাজীকরের এই অবস্থাটা এক-এক সময় ত্রিস্তানের অসহ্য লাগতো।

বেশ শান্ত হয়েছিল ত্রিস্তান। হঠাৎ একদিন যেন বন্যার মতো সোনালির কথা তার মনে ফিরে এলো। তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো সোনালির জন্য। কানে ভেসে উঠলো, সোনালির সেই উপহাসের হা-হা হাসি। এক রাত্রে তাঁবুর মধ্যে একা শুয়ে থাকতে থাকতে ত্রিস্তানের আবার মনে পড়লো—মন্দিরে যাবার পথে সে সোনালির রথের চাকা ধরে দাঁড়িয়েছিল, খুব কাছ থেকে দেখেছিল তাকে—অথচ একবার ছুঁতে পারেনি, একবার বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেনি। তার বুকটা এক মুহূর্তে শূন্য হয়ে গেল। তার হাত আর বুক, এর মাঝখানে একটা বিশাল শূন্যতা—এখানে সোনালির নরম শরীর থাকার কথা ছিল। ত্রিস্তান ভাবে—তার বেঁচে থেকে আর কি লাভ! সোনালির

ঘৃণা দেখবার জন্যও তাকে বেঁচে থাকতে হলো !

কিন্তু তবু ত্রিস্তান জানে, সোনালিকে ছাড়া তার মরারও উপায় নেই। সে জানে, সোনালি তাকে যতই অবহেলা, অপমান করুক, তবু সোনালির কাছে তাকে বার বার ফিরে যেতে হবে।

একদিন ত্রিস্তান বাজীকরকে কিছু না বলে আবার বেরিয়ে পড়লো এক বস্ত্রে। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি পর সে এসে পেঁছিলো টিন্টাজেলে। ত্রিস্তান বাজীকরের সেই ওষুধ মেখে নিল সারা গায়ে মুখে। তামাটে রঙের শরীর হয়ে গেল ত্রিস্তানের ! ত্রিস্তান মাথার চুল সব কামিয়ে ফেললো, সারা গায়ে এঁকে নিল অদ্ভুত সব উল্কি। তারপর বন্দরের ঘাটে সে যখন খালি গায়ে একা বসে রইলো তাকে দেখে মনে হয় রাস্তার পাগল। ন্যাড়া মাথা, বিকৃত রং শরীরের, বীভৎস চেহারা ত্রিস্তানের।

নগর থেকে লোক আনাগোনা করছে বন্দরে। কেউ কেউ আসছে রাজসভা থেকে। লোকেরই মুখে রাজার গুণগান ! কেউ কেউ আবার বলছে, কিন্তু ভাই, রানীর মুখখানা বড় বিষণ্ন ! কিছুদিন থেকেই দেখছি, রানী কারুর সঙ্গে কথা বলছেন না, একটুও হাসছেন না। কি ব্যাপার রে ভাই, রানীর কি অসুখ হয়েছে নাকি ?

রানী ! রানীর কথা শুনেই ত্রিস্তান উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তখুনি তার ইচ্ছে হলো রানীর সঙ্গে দেখা করতে—সেই দিনের বেলাতেই। তাতে যদি সে ধরা পড়ে, তার মৃত্যু হয়, হোক ! তবু রানী জানবে—ত্রিস্তান তার সঙ্গে দেখা করতে এসেই প্রাণ দিয়েছিল।

ত্রিস্তান একটা ওক গাছের ডাল ভেঙে নিল। তারপর সেটা মাথার ওপর দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বিকৃত গলায় হা-রে-রে-রে করে পাগলের মতো ছুটতে লাগলো রাস্তা দিয়ে। রাস্তার ছেলেরা তাকে দেখে মজা পেয়ে এই পাগলা, এই পাগলা, বলে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। বয়স্করা কৌতুকে দেখতে লাগলো সেই বদ্ধ উন্মাদকে।

উন্মাদ এসে দাঁড়ালো রাজপুরীর সিংহদ্বারে। সান্ত্রীরা ওকে দেখেই প্রথমে ওর ন্যাড়া মাথায় কয়েকটি চাঁটি মেরে হাতের সুখ করে নিল। তারপর বললে - -কি রে পাগলা, এখানে কি চাস ?

পাগলা গম্ভীর হয়ে বললো, খবরদার আমার গায়ে হাত তুলো না বলছি। আমি রাজার আত্মীয় ! আমি স্বর্গে দেবতাদের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। এখন রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি।

—ওরে বাবা, নেমন্তন্ন খেতে এসেছিল এই রাজবেশে! তার চেয়ে একেবারে দেবতাদের পোশাকই পরে থাক্ না! এই বলে প্রহরীরা চেষ্টা করলো টানাটানি করে ওরা পোশাক খুলে উলঙ্গ করে দেবার। উন্মাদ তখন হাস্যকর ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে মাথার ওপর বন্ বন্ করে লাঠিটা ঘোরাতে লাগলো।

চেঁচামেচি শুনে রাজা খবর নিতে পাঠালেন। তারপর, পাগলের কথা শুনে বললেন, ওকে ডাকো, একটু মজা করা যাক্। রানীও অনেকদিন হাসেননি!

পাগল ওঁদের সামনে গিয়ে আভূমি প্রণাম করলো, তারপর কণ্ঠস্বর বিকৃত করে বললো, মহারাজকে দেখেই আমার মনটা কেমন হু-হু করে। কতদিন আপনাকে দেখিনি।

রাজা হাসতে হাসতে বললেন, তা কি উদ্দেশ্যে তোমার এখানে আগমন।

—রানী সোনালির জন্য! মহারাজ, আমার সঙ্গে এক অপূর্ব সুন্দরী রমনীকে এনেছি। তার নাম, হীরামণি। আঃ, কি সুন্দর সে, মহারাজ কি কি বলবো! আপনি তাকে নিয়ে সোনালিকে আমায় দিয়ে দিন না?

রাজা আবার হেসে বললেন, তোমার সাধ তো কম নয়! রানীকে নিয়ে তুমি রাখবে কোথায়? তোমার কুঁড়েঘরে?

—কি বলছেন মহারাজ? আকাশে স্বর্গ আর মেঘের মাঝখানে আমার একটা স্ফটিকের ঘর আছে। অসংখ্য গোলাপফুলে তার চারদিক ঘেরা। সে ঘর কখনও অন্ধকার হয় না! মহারাজ, রানীকে আমি সেখানে রাখবো।

সভার সব লোকেরা অট্টহাসি করে উঠলো। রাজা বললেন, লোকটার কথার জোর আছে বটে! উন্মাদ তখন একেবারে ওঁদের পায়ের কাছে এসে বসে, এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানী সোনালির দিকে। রাজা আবার জিগ্যেস করলেন, পাগল, আমি না হয় রানীকে দিয়ে দিলুম, কিন্তু তোমার অমন রূপ রানীর পছন্দ হবে কি?

—সে কি মহারাজ? রানীর জন্য আমি সারাজীবন কত অসাধ্য সাধন করেছি! রানীর জন্যই আজ আমি এরকম পাগল হয়েছি, তা কি রানী জানেন না?

হাসিতে আবার ফেটে পড়লো সবাই। রাজা হাসির দমকে ফুলতে ফুলতে বললেন, তবে তো তুমি যে সে লোক নও! তোমার নাম কি?

উন্মাদ গুম্ গুম্ করে নিজের বুকে কিল মেরে বললো, আমার নাম ত্রিস্তান! জীবনে মরণে রানীকেই আমি ভালোবাসি।

অন্য সকলের হাস্যরোলের মধ্যেও রানী সোনালি ও নাম শুনে কেঁপে

উঠলেন। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি রাজাকে বললেন, মহারাজ, ভালো লাগছে না, একে বিদায় করে দিন।

উন্মাদ তখন রানীর পা ছুঁয়ে বললো, রানী, আমাকে চিনতে পারছেন না? সেই যে মোরহল্টের সঙ্গে যুদ্ধে আমি আহত হয়ে মুমূর্ষু হবার পর ভাসতে ভাসতে আপনার দেশে গিয়েছিলাম, আমার হাতে ছিল শুধু বীণা। তখন আপনি আর আপনার মা আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। আপনার মনে পড়ে না?

রানী ঘৃণায় পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, এই সভায় এমন কেউ নেই—যে এই জঘন্য লোকটাকে দূর করে দিতে পারে?

সভাসদরা তখুনি ছুটে এলো। উন্মাদ তখন লাঠি ঘুরিয়ে বললো, খবরদার, খবরদার, আমি বীর ত্রিস্তান। সাবধান! আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এমন সাহস কার? এই বলেই সে মাটিতে ডিগবাজি খেতে লাগলো। তার অঙ্গভঙ্গি দেখে সভাসদরা ওকে মারার বদলে হেসেই কুটিকুটি। রানী তখন রাজার পোশাক চেপে ধরে বললেন, মহারাজ, আপনি ওকে চলে যেতে বলুন।

রাজা তবু হাসতে লাগলেন। পাগল আবার বললো, রানী, আমাকে চিনতে পারছেন না? সেই যে আমি ড্রাগনটাকে মারলুম? ওর জিভটা কেটে লুকিয়ে রেখেছিলুম মোজার মধ্যে। তারপর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তখন একটা বীর ছিলাম বটে! আপনিই তো সেবার আমাকে বাঁচালেন। মনে পড়ে না?

রানী ক্রুদ্ধভাবে বললেন, এই লোকটা ঐ সব বীর পুরুষের নাম উচ্চারণ করে তাদের অপমান করছে। কোথা থেকে ঐ সব শুনে এসে মাতলামি শুরু করেছে এখানে! একটা মাতালের মাতলামি দেখে আমার মোটেই আনন্দ হয় না।

উন্মাদ তখন হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললো, হ্যাঁ, রানী আমি মাতাল। সেই যে সেই এক গ্রীষ্মের বিকেল—সমুদ্রের বুকে—তুমি আর আমি এক সঙ্গে এক পাত্র থেকে মায়াবী আরক পান করেছিলাম—সেই থেকে আমি মাতাল। সারাজীবনের জন্য মাতাল। তোমার নেশা হয়তো কেটে গেছে—কিন্তু আমার নেশা মৃত্যুর আগে কাটবে না!

পাগল আবার এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো—যে সভার সকলের না হেসে উপায় নেই। রাজাও হাসতে লাগলেন। রানী একাই সভা ছেড়ে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। রাজা তাকে বসালেন হাত ধরে।

রাজা বললেন, আমার সভায় বিদূষক নেই। তোমাকে আমার সভাসদ বানাতে হবে দেখছি। রানীকে ভালোবাসা ছাড়া তোমার আর কি কি গুণ

আছে, হে ?

পাগল সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে সোৎসাহে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহারাজ, আমার মধ্যে আরও অনেক গুণ আছে। আমি ডিগবাজি খেতে পারি, আকাশে লাফ দিতে পারি, বীণা বাজাতে পারি, যুদ্ধ করতেও পারি। দেখবেন মহারাজ, দেখবেন ?

রাজা বললেন, থাক্, থাক্, আজ থাক্। পরে দেখবো। তুমি এখানেই থেকে যাও বরং।

সভাভঙ্গ করে রাজা উঠে গেলেন রানীকে নিয়ে। তারপর একটা পাগল কোথায় থাকে না থাকে কে তার খোঁজ রাখে। সে রাজপুরীর সিঁড়ির নিচে, আস্তাবলে পড়ে রইলো। প্রহরীরা তাকে খোঁচাখুঁচি করে অনেন্দ পায়।

নিজের ঘরে ফিরে হু-হু করে কাঁদতে বসলো রানী। আয়ত চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ হয়ে গেল। হাতের সোনার কাঁকন দিয়ে নিজের কপালে আঘাত করতে করতে বললেন, আমি ক্রীতদাসী ! রানী নই ! আমার চেয়ে দুর্ভাগিনী কেউ নেই এ পৃথিবীতে !

বিরজাকে ডেকে বললেন, বিরজা, তুই আমাকে একটু বিষ যদি দিতে পারিস আমি তোকে যথাসর্বস্ব দিয়ে যাবো। এ আমার কি অসহ্য জীবন ! আজ আমি যা শুনলাম—সে কথা শোনার জন্যও আমাকে বেঁচে থাকতে হলো ! যে-কথা ত্রিস্তান আমি আর-তুই এই তিন জন ছাড়া কেউই জানে না—আমার সেই প্রিয়তম গোপন কথা —একটা জাদুকর কিংবা মায়াবী কিংবা ভাঁড় এসে সবার সামনে বলছে ! জানি না ত্রিস্তান বেঁচে আছে কিনা ! আমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি। সে অপমানই সহ্য করে গেছে। সে জানে না —আমার অনুতাপ। কিন্তু কোথা থেকে এই আপদ এসে জুটলো ! ত্রিস্তানের নাম উচ্চারণ করে আমার বুক জ্বালিয়ে দিল ! ওঃ আর পারি না—

বিরজা বললো, তুমি একটা সামান্য পাগলকে দেখে এমন বিচলিত হচ্ছো কেন ?

—ওর দিকে তাকালেই আমার ভয় করে। আমাদের গোপন কথা ও কি করে····

—রানী, হয়তো ও-ই ত্রিস্তান।

—অসম্ভব ! তুই দেখে আয় কি বিকট চেহারা ওর ! ওটা কি মানুষ না জন্তু ? তোর কি মাথা খারাপ বিরজা !—সেই ত্রিস্তান, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ, কন্দর্পকান্তি—তার সঙ্গে তুই ওর তুলনা করছিস ! তুইও দূর হয়ে যা আমাদের চোখের সামনে থেকে।

—হবে, ও হয়তো ত্রিস্তানের অনুচর। তার কাছ থেকে কোনো খবর এনেছে।

—তা হলে তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন এখানে? যা দেখে আয়। ডেকে নিয়ে আয়। যা।

সিঁড়ির নিচে বসেছিল উন্মাদ। দূর থেকে বিরজাকে দেখেই আকুলভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বিরজা, আমায় চিনতে পারো না!

বিরজা ভয়ে পিছিয়ে এসে বললো, একি? তুই আমার নাম জানলি কি করে! সরে যা, অত কাছে আসিস না!

—বিরজা, তুমিও আমাকে ভুলে গেলে! একদিন নিজের লজ্জা বিসর্জন দিয়ে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে আমাকে আর সোনালিকে। আর আজ—

—কে তুই? কি করে জানলি এ কথা?

বহুদিন থেকে জানি। বিরজা, আমাকে দয়া করো, একবার আমাকে রানীর কাছে নিয়ে যাও। মনে নেই, তোমার সেই লুকোনো কলসী থেকে মায়াবী আরক পান করেছিলাম একদিন। সেদিন তুমি বলেছিলে ভালোবাসা মানেই মৃত্যু। আমার আর সোনালির ভালোবাসা আর মৃত্যু একসঙ্গে জড়ানো। বিরজা আমাকে দয়া করো।

বিরজা ভয়ে কাঁপতে লাগলো! একি দারুণ কথা এই উন্মাদের মুখে! একথা তো ত্রিস্তান ছাড়া আর কারুর পক্ষে কিছুতেই জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এই বীভৎস লোকটা কি করে ত্রিস্তান হয়। যদি ত্রিস্তান হয়ও, তাহলে তো টের পেলে প্রহরীরা যে-কোনো মুহূর্তে ওকে খুন করবে।

বিরজা দ্বিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগলো। তারপর আর কিছু ঠিক করতে না পেরে—ফিরে এলো রানীর ঘরের দিকে। পাগলও ছুটে এলো তার পিছনে পিছনে। তারপর দরজার কাছে রানীকে দাঁড়ানো দেখে বুক ফাটা আওয়াজে 'সোনালি' বলে চেঁচিয়ে এগিয়ে গেল দু'হাত বাড়িয়ে।

ভয়ে, ঘৃণায়, কুঁকড়ে সোনালি পিছিয়ে গেলেন দেয়ালের দিকে।

উন্মাদ তখন থমকে দাঁড়ালো। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, সোনালির ঘৃণাও আমাকে দেখতে হলো শেষ পর্যন্ত। কোনোদিন ভাবিনি, সে আমাকে দেখে ভয় পেয়ে সরে যাবে। অথচ, সে বলেছিল আমার ডাকে সে কোনোদিন সাড়া দিতে ভুলবে না! সোনালি, ভালোবাসা এত সহজে মরে যায়? নদীতে যখন জল থাকে—সেই জল দুকূল ছাপিয়ে যায়—তখনই তা নদী। আর সব জল শুকিয়ে গিয়ে যখন শুকনো নদীটা পড়ে থাকে—তখনও সেটা নদীর

আকৃতি। কিন্তু তখন আর সেটা নদী নয়। সোনালি, ভালোবাসাহীন জীবন কি জীবন ?

সোনালি এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে বললেন, পাগল, তুমি যেই হও, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিতে এসেছো ? কেন তুমি আমাকে অপমান করছো ? তুমি যখন এত খবর জানো তখন তুমি নিশ্চয়ই ত্রিস্তানের খবরও জানো। বলো, সে কেমন আছে ?

পাগল ধীর স্বরে বললো, রানী, ত্রিস্তান জীবন্মৃত। সে বেঁচে আছেও বলতে পারো, অথবা মরে গেছে তাও ভাবতে পারো।

—কোথায় ত্রিস্তান ? সে কোথায় ?

—সোনালি, তুমি তাকে চিনতে পারলে না ?

—না, না, না, তুমি ত্রিস্তান নও ! তুমি নও ! তোমার প্রমাণ কোথায় ? কোথায় সেই সবুজ আংটি ? অথবা এ বাড়ির কুকুর হুডিন, তাকে ডাকি ? সে ত্রিস্তান ছাড়া আর কেউ সামনে গেলেই কামড়াতে আসে—সে তোমায় চিনতে পারবে ?

উম্মাদ তখন বিষাদে শান্ত হয়ে বললো, না রানী, কোনো প্রমাণ থাক ! হৃদয় যখন হৃদয়কে টানে না তখন আর প্রমাণে কি হবে ? তুমি নিজে আমায় চিনতে পারলে না—আর সেই কুকুরের চেনা—তুমি স্বীকার করতে চাও ! সোনালি, ভালোবাসা কি শুধু রূপে ? আজ আমার বাইরের রূপ দেখে—তোমার ঘৃণা ? আমি কি শুধু রূপের জন্য তোমায় ভালোবেসেছিলুম ? তবে, তোমার বাবা যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—আমি কেন তখুনি বিয়ে করিনি ? আমি তো তখুনি তোমায় নিয়ে অন্য দেশে পালিয়ে যেতে পারতুম। সোনালি, ভালোবাসা চামড়ার নিচে থাকে। ওপরে নয়। সেই ভালোবাসার জন্যই আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করতে পারিনি।

রানী তখন উম্মাদিনীর মতন নিজের মাথার সোনালি চুল ছিঁড়তে লাগলেন। এক টানে খুলে ফেললেন নিজের পোশাক। তাঁর সাদা পায়রার মতো দুটি বুক গভীর নিঃশ্বাসে দুলতে লাগলো। চোখে জল, কিন্তু বিকৃতভাবে হেসে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, তবে নাও, গ্রহণ করো আমাকে। যদি তুমি ত্রিস্তান হও, আমার এই শরীরটা পিষে দাও তোমার বুকে। যদি তুমি ত্রিস্তান হও, তবে বুঝতে পারবে, তাকে না পেয়ে আমার বুকে কি আগুন জ্বলছে ! আমাকে নিয়ে যাও যেখানে ত্রিস্তান একদিন আমাকে নিয়ে যাবে বলেছিলো, সেই দেশে—যেখানে আছে শ্বেতমর্মরের দুর্গ, যার এক হাজার ঘরের জানালা-দরজায় আলো

জংগলে—যেখানে অন্তহীন পাখির গান, যেখান থেকে আর কেউ কখনো ফেরে না। আমাকে নিয়ে যাও—ধরো আমাকে, যদি সত্যিই তুমি ত্রিস্তান হও। কিন্তু সাবধান, যদি তুমি ত্রিস্তান না হও—সাবধান, সাবধান, সে ছাড়া আর কেউ সত্যিকারের আমাকে পায়নি। এসো, তুমি যদি ত্রিস্তান হও, এসো—

উন্মাদ শান্ত স্বরে বললো, যদি নয়, আমার নাম ধরে ডাকো—

রানী সেখানে দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। উন্মাদ নিজের জায়গাতেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সে নিচু হয়ে রানীকে ধরতে গেল না। তার মুখ অদ্ভুত উদাসীন। একটু পরেই সোনালির আবার জ্ঞান হ'লো। লাল, অস্থির চোখ মেলে সেই উন্মাদকে দেখেই বিষম চমকে উঠলেন। সম্পূর্ণ অসংবদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, মায়াবী! জাদুকর! শয়তান! আর একটু হলেই আমাকে ভুলিয়েছিল! কে কোথায় আছ? বাঁচাও! বাঁচাও! প্রহরী! প্রহরী! এ আমাকে খুন করতে এসেছে—এ ত্রিস্তানকে খুন করেছে - আমাকেও মারবে. বাঁচাও, বাঁচাও!

মুহূর্তে ছুটে এলো প্রহরীরা। সোনালি উন্মাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, একে নিয়ে যাও। মেরে ফেলো, যা ইচ্ছে করো, দূর করে দাও আমার চোখের সামনে থেকে। দূর করে দাও!

প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে ফেললো উন্মাদকে। সে একটুও প্রতিবাদ করলো না। ওরা তখুনি টানতে টানতে ওকে নিয়ে এলো দুর্গের বাইরে। প্রচুর লাথি-ঘুঁষি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল সমুদ্রের পাড়ে।

ত্রিস্তান আবার ফিরে চলেছে ব্রিটানিতে। ধীর মন্থর তার পদক্ষেপ। যেন সে জানে না, কেন সে আবার ফিরে যাচ্ছে কাহারডিনের রাজ্যে, রূপালির রাজ্যে। যেন সে জানে না, কেনই বা সে গিয়েছিল সোনালির কাছে।

বন পেরুলেই দুর্গ। বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় একটি সুদর্শন তরুণ অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা হলো তার। যুবকটির বয়স আঠারো-উনিশ। সশস্ত্র। যুবকটি বললো, সেও ব্রিটানিতে যাচ্ছে। বীর ত্রিস্তানের খোঁজ করতে।

ত্রিস্তান মৃদু হেসে জিগ্যেস করলো, বালক, ত্রিস্তানকে তোমার কি দরকার?

—তার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন!

ত্রিস্তান বললো, তুমি আমাকেই সে প্রয়োজনের কথা বলতে পারো। আমিই ত্রিস্তান।

যুবকটি সন্দেহের চোখে তাকালো। এমন ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ, অদ্ভুত চেহারা, এই নাকি বিখ্যাত ত্রিস্তান? সে বললো, যাও, তা কখনো হয়! ত্রিস্তান তো অভিজাত রাজপুরুষ!

ত্রিস্তান বললো, আমার কেন এ চেহারা—সে অনেক গল্প। কিন্তু আমিই যে ত্রিস্তান—তাতে সন্দেহ নেই। আমার মাথা এখনো সম্পূর্ণ খারাপ হয়নি। বলো, কি তোমার প্রয়োজন?

যুবকটি কর্কশ কণ্ঠে তখন বললো, যদি তুমি ত্রিস্তান হও, তবে যুদ্ধের জন্য তৈরী হও! তোমার সঙ্গে আমার হিসেব মেটাতে হবে!

—কিসের হিসেব?

—আমার বাবার নাম মর্গান। তিনি লিওনেস রাজ্য জয় করেছিলেন। তারপর লিওনেসের ত্রিস্তান তাঁকে খুন করে। আমি এসেছি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে।

ত্রিস্তান হেসে বললো, প্রতিশোধ? এই আমি হাত তুলছি, আমায় মারো!

মর্গানের ছেলে ঘৃণায় মুখ কুঁচকে বললে, আমরা ক্ষত্রিয়, বিনা যুদ্ধে কারুকে হত্যা করি না। এসো যুদ্ধ করো!

ত্রিস্তান বিরক্তির সঙ্গে বললো, না, না, না, আমি আর যুদ্ধ করতে চাই না! ঢের যুদ্ধ করেছি। ঢের মানুষ মেরেছি। আর না, এবার আমি নিজে মরতে চাই। তোমার বাবাকে আমি মেরেছিলাম—আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে। তুমি এসেছো আমাকে মেরে তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে! আবার, আমার যদি কোনো সন্তান থাকে—সে যাবে তোমাকে মারতে। এই কি চলবে চিরকাল? এই পর পর প্রতিশোধ? কোনোদিন থামবে না? তোমাকে আমি বলছি, আমার কোনো সন্তান নেই। তুমি আমাকে মেরে রেখে যাও। এখানেই শেষ হোক—এই প্রতিশোধের পালাবদলের!

যুবক বললো, তুমি কেন আমাকে অপমান করছো? বিনা যুদ্ধে আমি মারবো না! তোমার অস্ত্র নেই, এই নাও তলোয়ার। তৈরী হও!

ত্রিস্তান ম্লান হেসে বললো, ঐখানেই তো তোমার বিপদ! যুদ্ধে আমার মরণ নেই। যুদ্ধে আমি হারতে জানি না। বিশ্বাস করো, আমি অহংকার করছি না, আমি আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে হারিনি, সেই আমার দোষ! তুমি আমাকে এমনি মারো!

যুবকটি ক্রুদ্ধভাবে একটি তলোয়ার তুলে দিল ত্রিস্তানের হাতে। নিজে আর একটি তলোয়ার নিয়ে দূরে সরে তৈরি হয়ে দাঁড়ালো! ত্রিস্তান তলোয়ার

হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কি যেন এক গুরুভার উদাসীনতা ভর করেছে তাকে। যুবকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। এ যেন তারই বালক বয়সের প্রতিমূর্তি। একে মেরে কি হবে!

যুবকটি উত্তেজিত হয়ে বার বার লড়াইয়ের জন্য ত্রিস্তানকে আহ্বান করতে লাগলো। তারপর আর থাকতে না পেরে নিজের তলোয়ারটা ছুঁড়ে মারলো ত্রিস্তানের দিকে। তলোয়ারটা গভীরভাবে বিদ্ধ হয়ে গেল ত্রিস্তানের দক্ষিণ বাহুতে। বিদ্ধ হয়ে সেখানেই ঝুলে রইলো। তখন চোখ জ্বলে উঠলো ত্রিস্তানের। তীব্র স্বরে বললো, এই বুঝি এখানকার যুদ্ধের নিয়ম? এসো খোকা, তোমার যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি!

বাহু থেকে নিজেই টান মেরে বার করে আনলো তলোয়ারটা। আবার সেটা ছুঁড়ে দিল ছেলেটির দিকে। রক্তে ত্রিস্তানের হাত ভেসে যাচ্ছে। বাঁ হাতে তলোয়ার ধরে ত্রিস্তান এগিয়ে গেল ছেলেটির কাছে।

অল্প একটুক্ষণ যুদ্ধ চললো। তার মধ্যেই ত্রিস্তান নিরস্ত্র করলো যুবকটিকে। ক্রোধে যন্ত্রণায় সে তাকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র তুললো। কিন্তু মারতে গিয়েও মারলো না, ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে। তার পর বললো, না থাক্। বালক, তোমার বয়েস কম—তোমার সামনে দীর্ঘজীবন পড়ে আছে উপভোগের, আনন্দের। আমার আর মরলেই বা কি ক্ষতি! ত্রিস্তান নিজের তলোয়ারও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

যুবকটি চেঁচিয়ে উঠলো, না, আমাকে অপমান করে যেও না। আমাকে মেরে রেখে যাও!

ত্রিস্তান বললো, নাঃ! আমি আর অস্ত্র হাতে নেবো না। আমি পিছন ফিরে চলে যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছে হলে--পিছন থেকে আমাকে খুন করতে পারো।

এই বলে ত্রিস্তান আবার হাঁটতে আরম্ভ করলো। তখন যুবকটি অনুতপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, ত্রিস্তান, আমি আগেই একটা মহা অন্যায় করেছি! আমার তলোয়ারে বিষ মাখানো ছিল! মৃত্যু তোমার হবেই!

ত্রিস্তান একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে পিছনে তাকিয়ে বললো, মৃত্যু আর কি এমন বেশী কথা! মৃত্যু এখন আমার প্রাপ্য।

ত্রিস্তান যখন দুর্গে এসে পেঁছুলো—তার সর্বাঙ্গ বিষে জরজর। কাহারডিন এবং সকলেই ত্রিস্তানের জন্য বিষম উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। কোথায় ত্রিস্তানের ফিরে আসার জন্য উৎসব করবে, তার বদলে হাহাকার পড়ে গেল। ত্রিস্তানের চিকিৎসার জন্য প্রাণপণে আয়োজন করতে লাগলো। রাজকুমারী রুপালি এসে

সেবা করার জন্য বসলেন স্বামীর পাশে। রূপালি স্বামী সম্ভোগের সুখ পাননি, স্বামীকে সেবা করার সুখটুকু অন্তত পেতে চাইলেন। কি অদ্ভুত ধরনের স্বামী তাঁর! এমন রূপবান, গুণবান স্বামী পেয়েও তিনি সবচেয়ে দুর্ভাগিনী। রূপালি কিছুই জানেন না সোনালির কথা।

সব চিকিৎসা ব্যর্থ হলো। এক একজন কবিরাজ, বৈদ্য এসে এক একরকম চিকিৎসা করেন। কত জড়ি-বুটি, শিকড়, মন্ত্র—কিছুই কাজে লাগলো না। ক্রমশ বিষ ছড়িয়ে যেতে লাগলো ত্রিস্তানের সমস্ত শরীরে। বিছানার সঙ্গে একেবারে লেগে রইলো ত্রিস্তানের কঙ্কালসার দেহ। শরীরের সমস্ত হাড়গুলো গোনা যায়! এই নিয়ে তিনবার নিশ্চিত মৃত্যু এলো তার কাছে। লোকে বলে, মৃত্যু কখনো তৃতীয়বার ফিরে যায় না।

শরীর দুর্বল হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও দুর্বল হতে লাগলো। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে সে ভাবে—সোনালির সঙ্গে আর একবার দেখা না করে সে মরবে কি করে? এ জীবন যে সোনালির সঙ্গে বাঁধা। সে যতই ঘৃণা করুক, অপমান করুক—সোনালিকে না জানিয়ে এ জীবনে সে ছেড়ে যেতে পারে না।

একদিন রাজকুমার কাহারডিন এসে ত্রিস্তানের শয্যার পাশে বসে অশ্রুপাত করছেন, তখন ত্রিস্তান বললো, তার সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে। এবং সে চোখের ইশারায় রূপালিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করলো।

নারীর কৌতূহল। ত্রিস্তানের এই অবস্থাতেও কি তার গোপন কথা! রূপালি তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গোপনে ওদের কথা শুনতে লাগলেন।

ত্রিস্তান কাহারডিনকে বললো বন্ধু তুমি জানো—আমার এ রোগ আর সারবে না। আমার এ বিষের চিকিৎসা রানী সোনালি ছাড়া আর কেউ জানে না। এ বিষ ছাড়াও আমার শরীরে আর এক রকম বিষ আছে, সোনালিকে না দেখলে সে বিষের জ্বালা যাবে না। তুমি একবার সোনালির কাছে আমাকে নিয়ে চল!

—অসম্ভব ত্রিস্তান! তোমার শরীরের এই অবস্থায় তোমাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না। অসম্ভব!

—তবে তুমি সোনালিকে আমার কাছে এনে দাও।

—তুমি পাগল হয়েছো ত্রিস্তান? সোনালির সঙ্গে আমি দেখা করবো কি করে? আর দেখা করলেও তিনি আমার কথা শুনে আসবেন কেন?

ত্রিস্তান তখন সেই সবুজ পাথরের আংটিটা বার করে দিল কাহারডিনকে।

বললো, তুমি বণিকের ছদ্মবেশে কোনোরকমে রাজসভায় গিয়ে যদি রানীকে এই আংটি দেখাও সে চিনতে পারবে। তা হলে, তোমার কথায় নিশ্চিত আসবে সে। হ্যাঁ আসবেই। সে বলেছিল, আমার ডাক শুনলে রাজবাড়ির হাজারটা দেওয়াল ভেঙেও সে বেরিয়ে আসবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে আটকাতে পারবে না। তুমি যাও, বন্ধু! আজই যাও!

কাহারডিন নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী হলো। ত্রিস্তান তাঁকে আবার ডেকে বললো, যদি অনুকূল বাতাস পাও, তোমার যেতে আসতে অন্তত পনেরো দিন লাগবে। ততদিন আমি বাঁচবো কিনা জানি না। আমার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু সোনালিকে একবার দেখবার জন্য আমাকে বাঁচতেই হবে। তুমি আমাকে এই দুর্গের চূড়ার সবচেয়ে উঁচু ঘরে শুইয়ে দাও! সেখান থেকে আমি সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকবো। প্রতীক্ষায় থাকবো তোমার জাহাজের। আর শোনো, যখন তুমি ফিরে আসবে—তোমার জাহাজে উড়বে রাজপতাকা। আর, জাহাজে দু'রঙের পাল নিয়ে যাও। যদি সোনালি আসে, সাদা পাল উড়িয়ে দিও। যদি সে না আসে—উড়িয়ে দিও কালো পাল। সে আসবেই। মনে রেখো সাদা পাল আর কালো পাল। দূর থেকে তোমার জাহাজের সাদা পাল দেখতে পেলে আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবো। আমি কতবার মরতে চেয়েছি। এখন আমার বাঁচতে ইচ্ছে হয়। খুব বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে। শুধু সোনালির জন্য। সোনালিকে ছেড়ে আমি মরতে পারি না। কাহারডিন, ভাই আমাকে বাঁচাও! আমি মরতে চাই না! আমি কাঙালের মতন বেঁচে থাকতে চাই! আমি আরও বেঁচে থাকতে চাই সোনালির জন্য! তুমি আজই যাও।

কাহারডিন সেই দিনই যাত্রা করলো। আর পাশের ঘর থেকে সব শুনলেন রাজকুমারী রুপালি। এই সেই রহস্য? তাঁর স্বামী অন্য নারীকে ভালোবাসে সারা জীবন! তাকে না দেখলে বাঁচবে না! আমি কেউ নই? আমি, আমি রাজকুমারী অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। কেঁদে কেঁদে তাঁর শরীর অবশ হয়ে গেল। তাঁর সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী সেই সর্বনাশিনী। ত্রিস্তান সেই রাক্ষসীর জন্যই সারা জীবন তাঁকে অপমান করলো?

কান্না শেষ হবার পর রুপালির শরীর জ্বলতে লাগলো ক্রোধে। তিনি ছটফট করে ঘুরতে লাগলেন সারা দুর্গে। কোথাও তিনি এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারেন না, বসতে পারেন না। বাতাসের স্পর্শেও যেন তাঁর গায়ে ছ্যাঁকা লাগছে। স্বামীর অবহেলায় এতদিন তিনি ছিলেন বিষণ্ণ, আজ স্বামীর মুখে অন্য নারীর

নাম শুনে এক মুহূর্তে তাঁর সারা শরীর অস্থির।

দুর্গের এ কোণ থেকে ও কোণ ঘুরছেন রূপালি। এক সময় তাঁর চোখ পড়লো, দুর্গের দরজার কাছে দাঁড়ানো শৃঙ্খলিত রিওলের দিকে। ত্রিস্তান ওর জীবন ভিক্ষা দেবার পর, রাজকুমার কাহারডিন দুর্গের সিংহদ্বারে ওকে শিকলে হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। রিওলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপালি ভাবলেন, এর চেয়ে তাঁর যদি ঐ পশুর মতো কুৎসিত রিওলেরও সঙ্গে বিয়ে হতো, তাও বোধহয় ছিল ভালো। তবু তো ও একটা পুরুষ। এবং ও রূপালিকেই পাবার জন্য যুদ্ধে নেমেছিল। আর, বীর ত্রিস্তান, যে তাঁর উদ্ধারকারী, সে তাঁকে একবার ছুঁয়েও দেখলো না! রূপালি একা একা কাঁদতে লাগলেন।

রূপালি ত্রিস্তানকে সত্যিই ভালোবাসতেন অন্তর দিয়ে। পূজারিণী যেমন মন্দিরের দেবতাকে ভালোবাসে। যদিও তাঁর ভালোবাসা এক দিনের জন্যও চরিতার্থ হয়নি। আজ যেন সেই দেবতার মূর্তির মধ্যে খড়-কাদা-মাটি দেখতে পেলেন। মৃত্যুকালেও স্বামী চেয়ে আছেন অন্য নারীর পথের আশায়! পাশে নিজের বিবাহিতা স্ত্রী অথচ গ্রাহ্য নেই! রূপালি ভাবলেন, তিনি দারুণ প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু কি সেই প্রতিশোধ?

মেয়েদের রাগ আর মেয়েদের ভালোবাসা—কোনটা বেশী প্রবল তা বলা মুশকিল। কোমল, রূপশ্রীময়ী রূপালি এত অপমান সত্ত্বেও ত্রিস্তানকে স্বার্থহীনভাবে ভালোবাসতেন। আর এখন প্রতিশোধের চিন্তায় জ্বলতে লাগলেন।

এদিকে ত্রিস্তান জানলার সামনে বসে থাকে দিনরাত। দিনের পর দিন যায়, ক্রমে পনেরো দিন পার হয়ে গেল। জাহাজের দেখা নেই। ত্রিস্তানের আর বসে থাকারও ক্ষমতা নেই। বিছানায় মড়ার মতো পড়ে থাকে। সেখান থেকে সমুদ্র ভালো দেখা যায় না। বারবার রূপালিকে ডেকে বলে, দেখো তো, রাজকুমারের জাহাজ আসছে কি না! তবে কি সে আসবে না!

একদিন দূরে সত্যিই দেখা গেল জাহাজ। উপরে পতপত করছে পতাকা। ত্রিস্তানের তখন চোখে দেখারও সাধ্য নেই। চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারে না। জানলার কাছ থেকে সরে এসে রূপালি বললেন, জাহাজ আসছে, রাজকুমারের জাহাজ। ত্রিস্তান, তোমার জন্য দাদা ওষুধ আনছেন, নিয়ে আসছেন এক মায়াবিনীকে!

জাহাজ? ত্রিস্তান অসহায় চোখে তাকালেন রাজকুমারীর দিকে। তারপর,

করুণভাবে ভিক্ষে চাওয়ার মতো বললো, রাজকুমারী, দয়া করে বলো. সে জাহাজে কি রঙের পাল ? সাদা নিশ্চয়ই !

রাজকুমারীর ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগলো, তিনি কথা বলতে পারলেন না। ত্রিস্তান নিদারুণ অনুনয়ের স্বরে বললো, রুপালি একবার দেখো, কি রঙের পাল ? আমার দেখার সাধ্য নেই যে !

জানালার ধারে সরে গিয়ে রাজকুমারী একবার তাকালেন সেই সাদা পালের জাহাজের দিকে। তারপর ক্ষিপ্তের মতো তীব্রকণ্ঠে বললেন, কালো, কালো ! ভয়ঙ্কর, কুৎসিত, বীভৎস রঙের কালো !

–কালো ? না না তা হয় না. রুপালি তুমি আর একবার দেখো !

–আমি বলছি কালো ! ঝড়ের মেঘের মতো কালো ' সর্বনাশের মতো কালো পাল তুলে আসছে জাহাজ !

রুপালি, তোমার দয়ার প্রাণ। তুমি সত্যি কথা বলো। আমি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমি অন্ধ হয়ে গেছি ! কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। যদি তুমি মিথ্যে কথা বলো, আর এক মুহূর্তও আমার বাঁচার সামর্থ্য নেই। তুমি বিধবা হবে। আর একবার দেখে বলো, জাহাজ কোন রঙের পাল উড়িয়ে আসছে ?

রুপালি কঠিন মুখে বললেন, কালো !

— কালো ? হঠাৎ ত্রিস্তানের চোখ ঘূর্ণিত হতে লাগলো। বুকের খাঁচাটা প্রবলভাবে ওঠা-নামা করতে লাগলো নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টায়।

তা দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন রুপালি, না, না, না, আমি দেখেছি, সাদা ! মেঘ কেটে গেছে, আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সাদা রঙের পাল। জাহাজ এসে বন্দরে লেগেছে !

ত্রিস্তান ক্ষীণভাবে বললো, তাহলে সোনালি এসেছে ?

—হ্যাঁ. সে এসেছে। আমি নিজে তাকে নিয়ে আসছি। রুপালি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কত দূরে যাবেন ! যদি এর মধ্যেই ত্রিস্তান মরে যায়- একা ঘরে. অসহায় ? দরজার পাশে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, রুপালি আবার ঘরে এসে ঢুকলেন।

শব্দ শুনে ত্রিস্তান বললো, কে ? সোনালি ?

ধরা গলায় রুপালি বললেন, হ্যাঁ, ত্রিস্তান আমি এসেছি।

–সোনালি ! আমি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

রুপালি আবার বললেন, ভয় নেই ত্রিস্তান, আমি এসেছি !

—সোনালি, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। তুমি আমার বুকের কাছে এসো। তুমি মুছে নাও আমার শরীরের বিষ। সোনালি, আমার বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে! এসো!

রুপালি এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রিস্তানের বুকে। এই প্রথম তাঁর স্বামীস্পর্শ।

কিন্তু মুহূর্তে মৃগীরোগীর মতো, এক ঝট্‌কায় তাকে দূরে ঠেলে দিল ত্রিস্তান! হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, চোর! পাপিষ্ঠা! এ সোনালি নয়! সোনালির স্পর্শ আমি চিনি। তার স্পর্শ আমার সারা শরীরে লেগে আছে। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার একটি আঙুলের স্পর্শে আমি চিনতে পারবো!

একটু দম নিয়ে ত্রিস্তান আবার বললো, রুপালি, কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ? তোমার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু জীবনের শেষ সময়টুকুতে আমায় তুমি দয়া করে শান্তি দাও! তুমি সত্যি করে বলো, সোনালি এসেছে কিনা!

মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন রুপালি। সেখান থেকে ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন জানালার পাশে। সেখান থেকে শান্ত স্বরে বললেন, ত্রিস্তান, সে আসবে না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার দাদার জাহাজে শোকের চিহ্ন। শুধু কালো রং। কালো পতাকা, কালো পাল!

—কালো! ত্রিস্তান জোরে নিঃশ্বাস ফেললো একবার। তারপর যেন মন্ত্রবলে শক্তি পেয়ে উঠে বসলো বিছানার ওপর সোজা হয়ে। তীক্ষ্ন কণ্ঠে তিনবার ডাকলো—সোনালি—সোনালি—সোনালি। সেই ডাক যেন ছিন্নভিন্ন করে দিল বাতাস। সেই করুণ ডাক যেন কালো মেঘ ফুঁড়ে চলে গেল স্বর্গের দিকে। ত্রিস্তান প্রাণপণে চেষ্টা করলো পাখির মতো শিস দিয়ে উঠতে। গলা ভেঙে গেল, পারলো না। ধপ্‌ করে ত্রিস্তান পড়ে গেল বিছানায়।

রাজকুমারের জাহাজ যখন লাগলো—তখন সমস্ত দুর্গে কান্নার রোল। জাহাজ থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে নেমে এলো এক নারী। তার রুক্ষ সোনালি চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, ছুটে চললো দুর্গের দিকে। পথের লোকেরা অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগলো, কে এই দেবী-মূর্তির চেহারায় উন্মাদিনী নারী? সেই নারী তখন যাকে সামনে পাচ্ছে, জিজ্ঞেস করছে, ত্রিস্তান কোথায়? ত্রিস্তান কোথায়? এই রকম প্রশ্ন করতে করতে উঠে এলো দুর্গের উচ্চতম ঘরে। সেখানে ত্রিস্তানের বুকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে রুপালি। রানী সোনালি সেখানে এসে শান্তভাবে বললেন, বোন, তুমি একটু সরে যাও। আমাকে একবার কাঁদতে দাও!

বিশ্বাস করো, ওর চেয়ে আপনজন—আমার এ বিশ্বসংসারে কেউ ছিল না!

সোনালি উঠে এলেন ত্রিস্তানের খাটে। ত্রিস্তানকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে ওর মরা ওষ্ঠে চুম্বন করতে করতে বললেন, ত্রিস্তান, আমি রাজবাড়ির দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে এসেছি। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো সেই দেশে। আমি একা থাকবো না!

সেই ভাবেই সোনালির মৃত্যু হলো। ত্রিস্তানকে আলিঙ্গন করে।

রাজা মার্কের কানে যখন ওদের দুজনেরই মৃত্যু-সংবাদ পেঁছুলো, তিনি নিজে এসে দুটি বহুমূল্য শবাধারে ওদের দুজনের দেহ সাজিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের দেশে। তারপর একটি নির্জন গীর্জার দু'পাশে ওদের দুজনকে কবর দিলেন। সেই দিন থেকে তিনি সত্যিকারের বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেল। রাজা মার্কের এতদিনেও সন্তান হয়নি, ত্রিস্তানকে হারিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্তান হলেন।

কয়েক মাস বাদে ত্রিস্তানের কবর থেকে একটা অদ্ভুত লতানে গাছ বেরিয়ে আসে। তীব্র গন্ধময় তার ফুল। সেই গাছটা গির্জার ছাদ পেরিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওপাশের সোনালির কবরে। তিন তিনবার কবরের রক্ষকরা সেই গাছ কেটে দিল। তিনবারই আবার গজিয়ে উঠলো সেই গাছ। রক্ষকরা তখন গিয়ে সেই অলৌকিক ঘটনা রাজাকে জানাতে, রাজা নিজে এসে সেই গাছ দেখলেন। তারপর ওদের নিষেধ করলেন আর সেই গাছ কাটতে। তখন ক্রমশ সেই গাছটা দিনে দিনে লক্ লক্ করে বেড়ে উঠে গির্জার ছাদ পেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়লো সোনালির কবরে। সেখানে ওর ফুল ফুটে উঠলো অজস্র।

প্রভুগণ, যুগ যুগ ধরে কবিরা এই গান শুনিয়েছে! ত্রিস্তান আর সোনালির ভালোবাসা আর দুঃখের গান। আমি সামান্য কবি—একদা পূর্ববঙ্গবাসী, অধুনা ভ্রাম্যমাণ গঙ্গোপাধ্যায় বংশীয় সুনীল আমার নাম। যদিও ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, কিন্তু জ্ঞানের অভিমানের বদলে ভালোবাসার শক্তিতেই আমার বেশী বিশ্বাস! তাই ভালোবাসার এই অমর গাথা আমি শোনাতে চেয়েছি। আমার বাক্‌শক্তি সীমিত আমার ভাষাজ্ঞান সীমিত, আমি জানি না শব্দের ঝংকার, জানি না বর্ণনার ছটা! আপনারা গুণীজন, আপনারা বহুদর্শী, রসজ্ঞ সহৃদয়—আপনাদের সভায় ভরসা করে এ গান শোনালাম। এ গান শুনলে, যে দুর্বল সে আবার শক্তি ফিরে পায়। ভালোবাসায় যার অবিশ্বাস এসেছে, সে আবার ভালোবাসায় বেঁচে ওঠে। যার জীবনে কখনো ভালোবাসা জাগেনি, এ গান শুনলে সেই পাথরের বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে ঝরনা। এই ভালোবাসার

গান শুনলে মানুষ মরতে ভয় পায় না। ভালোবাসা ছাড়া জীবন হয় না, যেমন দুঃখ ছাড়া ভালোবাসা হয় না! ভালোবাসার জাত নেই, গোত্র নেই, ধর্ম নেই।

ত্রিস্তান আর সোনালি যদি আবার জন্মায়, জানি ওরা পরস্পরকে আবার ঠিক এই রকম ভালোবাসতে চাইবে—এক জীবনের শত সহস্র দুঃখের কথা জেনেও। কি জানি, হয়তো ওরা আবার জন্মেছে, সব বিপদ তুচ্ছ করেও আবার ভালোবেসেছে! আপনারা ওদের আশীর্বাদ করুন!

আমার আছে জল

হুমায়ূন আহমেদ



উইড়া যায়রে পক্ষী তার পইড়া থাকে ছায়া।

লোকগীতি

হুমায়ূন আহমেদ

রসায়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা১০০০

জনাব ভোলানাথ দাস
সুপ্রিম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
১০ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

জনাব,
'আমাব আছে জল' বইটি আমাব লেখা প্রথম প্রেমেব উপন্যাস। বইটি আপনি আপনাব সংকলনে ব্যবহাব কবতে পাবেন।
বিনীত

হুমায়ূন আহমেদ
(হুমায়ূন আহমেদ) ২০।১২।৯৬

রেল স্টেশনের এত সুন্দর নাম আছে নাকি ? "সোহাগী"। এটা আবার কেমন নাম ? দিলু বললো—আপা, কি সুন্দর নাম দেখেছ ?

নিশাত কিছু বললো না। তার ঠাণ্ডা লেগেছে। সারারাত জানালার পাশে বসে ছিলো। খোলা জানালায় খুব হাওয়া এসেছে। এখন মাথা ভারভার। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো নাক দিয়ে জল ঝরতে শুরু করবে। দিলু বললো—আপা, স্টেশনের নামটা পড়ে দেখ না। প্লীজ।

পড়েছি। ভাল নাম।

দিলুর মন খারাপ হয়ে গেলো। সে আশা করেছিলো নিশাত আপাও তার মত অবাক হয়ে যাবে। চোখ কপালে তুলে বলবে—ও মা, কেমন নাম ! কিন্তু সে আজকাল কিছুতেই অবাক হয় না। কথাবার্তা বলে স্কুলের জিওগ্রাফী আপার মত। নিশাত বললো—দিলু, দেখ তো বাবু কোথায় ? দুধ খাবে বোধহয়।

দিলু বাবুকে কোথাও দেখতে পেলো না। এমন দুষ্টু হয়েছে। ওয়েটিং রুমে ঘাপটি মেরে বসে আছে হয়তো। কাছে গেলেই ছুট দেবে। ধরতে গেলেই আবার ছুটে যাবে।

ওয়েটিং রুমের সামনে একগাদা জিনিসপত্রের সামনে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বিরক্ত মুখ। তিনি দিলুকে দেখেই বললেন -একেকজন একেক দিকে চলে গেছে। ব্যাপারটা কি ? তোর মা কোথায় ?

জানি না তো।

তোর মাকে খুঁজে বের কর।

আমি পারব না বাবা, আমি বাবুকে খুঁজছি।

বাবুকে খুঁজলে তোর মাকে খোঁজা যাবে না—এরকম কথা কোথাও লেখা আছে ?

সবাই আজ এরকম করে কথা বলছে কেন ? কোথাও বেড়াতে গেলে সবার খুব হাসিখুশি থাকা উচিত। কিন্তু এখানে সবাই কেমন রেগে কথা বলছে। রাগটা তার উপরই। ট্রেনে মা তিনবার বললেন—দিলু পা নাচাচ্ছ কেন ? পা নাচানো একটা অসভ্যতা। চুপ করে বস। পা নাচানোর মধ্যে আবার সভ্যতা-অসভ্যতা কি ? যত আজগুবি কথা।

দিলু।

বল।

তোর মাকে খুঁজে বের কর। আমার পাইপের তামাক রেখেছে কোথায় সে?

আমি কি করে জানব? আমি রাখলে আমি জানতাম। আমি তো রাখিনি।

দিলুর বাবা ওসমান সাহেব রাগী চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। ওসমান সাহেবের বয়স আটান্ন। কিন্তু দেখায় আরো বেশি। শরীর হঠাৎ ভারী হয়ে গেছে। মাথার সমস্ত চুল পাকা। মেজাজের পরিবর্তনও হয়েছে হঠাৎ করেই। এখন আর কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারেন না। তিনি দিলুর উপর ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন। দিলুর বয়স এই মার্চে চৌদ্দ হবে। নাকি পনেরো? মেয়েদের এই বয়সটা অন্য রকম। এই বয়সে চেনা মেয়েগুলিকেও অচেনা লাগে। মনে হয় অন্য বাড়ির মেয়ে। এদের উপর কিছুতেই রাগ করা যায় না।

দিলু পরেছে একটা ধবধবে সাদা স্কার্ট। পায়ের মোজা ও জুতা দুই-ই লাল। মাথায় দুটি লম্বা বেণী। শীতের সকালের রোদে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে বড় অচেনা লাগছে। এর উপর রাগ করা যায় না। ওসমান সাহেব বাক্স-পেটরা হাতড়াতে লাগলেন। পাইপ ধরানোর ইচ্ছা হচ্ছে। অনিয়ম করা যায়। ছুটি হচ্ছে অনিয়মের জন্যে।

দিলু ওয়েটিং রুমে কাউকে দেখল না। তবে ওয়েটিং রুমের বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। কেউ আছে নিশ্চয়ই। মা বোধহয় বাবুকে বাথরুম করাচ্ছেন। দিলু ডাকলো—বাথরুমে কে? জল পড়ার শব্দ থেমে গেলো। দিলু আবার বললো—বাবু তুমি? কোন সাড়া নেই। তার মানে মা। মা একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাথরুম থেকে কথা বলবেন না।

দিলু যদি বলে—মা, গায়ে মাখার সাবানটা আছে? মা জবাব দেবেন না। বাথরুম থেকে কথা বলা নাকি অসভ্যতা। এর মধ্যে অসভ্যতার কি আছে?

খুট করে দরজা খুললো। দিলু দেখলো ভেজা মুখে জামিল ভাই বের হয়ে আসছেন।

কি রে দিলু ইমার্জেন্সি নাকি? যা ঢুকে পড়।

ছিঃ কি অসভ্যতা! জামিল ভাইয়ের একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। মেয়েদের কেউ বাথরুমে যাবার কথা ওভাবে বলে নাকি? সে যে বড় হচ্ছে এটা কি জামিল ভাইয়ের চোখে পড়ে না। এখন শাড়ি পরলে অনেকেই তাকে 'আপনি' করে বলে। জামিল ভাই বোধহয় তাকে কখনো শাড়ি পরা দেখেনি।

জামিল ভাই, বাবুকে দেখেছেন?

না।

মা'কে দেখেছেন?

না। কেন?

আপা খুঁজছে বাবুকে। বাবা খুঁজছে মা'কে।

ওরা মনে হয় স্টেশনের বাইরে হাঁটতে গেছে। চল যাই খুঁজে নিয়ে আসি। তোকে তো দারুণ লাগছেরে দিলু। ট্রেনে কি এই ড্রেসেই ছিলি নাকি?

হুঁ।

মাই গড! তখন তো চোখেই পড়েনি।

জামিল দেখলো দিলু খুব লজ্জা পাচ্ছে। এর কারণ সে ঠিক বুঝতে পারলো না। মেয়েটি কি বড় হয়ে যাচ্ছে নাকি?

'দেখতে দারুণ লাগছে' এই কথায় কানটান লাল করার মানেটা কি? জামিল তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো।

দিলু, তুই যেন কোন্ ক্লাসে এবার?

ক্লাস নাইনে। ইস আপনি যেন জানেন না!

কোন্ গ্রুপ, সায়েন্স না আর্টস?

সায়েন্স।

বাপরে বাপ, সায়েন্স! ইলেকটিভ অংকে গোল্লা খাবি তো।

কেন, গোল্লা খাব কেন?

মেয়েরা অংক-মানসাংক এসব জানে নাকি?

জামিল পাঞ্জাবির পকেট থেকে চিরুনি বের করে বাথরুমের আয়নায় চুল আঁচড়াতে গেলো। দরজা পর্যন্ত বন্ধ করলো না। কি বাজে অভ্যাস। দিলু শুনলো চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জামিল ভাই গুনগুন করে গান গাচ্ছে—আজি এ বসন্তে, এত ফুল ফোটে, এত পাখি গায়।

এই শীতে বসন্তের গান? দিলু বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখলো। সুরেরও কোন ঠিকঠিকানা নেই। বাথরুমে ঢুকলেই গান গাইতে হবে এমন কোন কথা আছে?

চল দিলু, দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা।

ওসমান সাহেব একটা কালো ট্রাঙ্কের উপর বসে আছেন। তাঁর মুখে বিরক্তির ভাব এখন আর নেই। পাইপের তামাক পাওয়া গেছে। পাইপ তৈরি করা হয়েছে। বাতাসের জন্যে আগুন ধরাতে পারছেন না। জামিলদের বেরুতে দেখে হাসিমুখে বললেন—জামিল, আমাকে এখানে বসিয়ে একেকজন একেক দিকে কেটে পড়েছে, ব্যাপারটা কি বল তো?

সম্ভবত ছুটির দিনে আপনাকে কেউ ভয়-টয় পায় না। আপনাকে নিরীহ মনে করে।

ওসমান সাহেব শব্দ করে হাসলেন। এত শব্দে তিনি কখনো হাসেন না। দিলুও হাসলো। কাউকে হাসতে দেখলেই দিলুর হাসি পায়। ওসমান সাহেব বললেন—কি রকম মিসম্যানেজমেণ্ট হয়েছে দেখলে? স্টেশনে জীপ নিয়ে থাকার কথা। জীপ তো নেই-ই, একজন মানুষ পর্যন্ত নেই।

এসে পড়বে।

কিছু মুখে দেওয়া দরকার। এত বেলা হয়েছে, সবার ক্ষিধে পেয়েছে।

বেলা কিন্তু চাচা বেশি হয়নি, মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। সকাল হয়েছে মাত্র।

তাই নাকি!

ওসমান সাহেব বেশ অবাক হলেন। জামিল বললো, আমি দেখি চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

ঐখানে একটা চায়ের দোকান আছে।

ঐ চা কি মুখে দেয়া যাবে?

চেষ্টা করতে দোষ কি। লেট আস ট্রাই।

ওসমান সাহেব আবার শব্দ করে হাসলেন। তাঁর মেজাজ সম্ভবত ভাল হতে শুরু করেছে। দিলুও হাসলো। এখন বেশ পিকনিক পিকনিক্‌ লাগছে।

নিশাত একটা কাঠের বেঞ্চিতে লাল চাদর গায়ে দিয়ে বসে ছিলো। রোদ পড়েছে তার মুখে। শীতের বাতাসে তার কপালে ছোট ছোট কিছু চুল নাচছে। সে বসে আছে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে। তার ফর্সা গালে লাল চাদরের আভা পড়েছে। দিলু ফিসফিস করে বললো—আপা কত সুন্দর, দেখেছেন?

হ্যাঁ, দেখলাম।

আপাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাই?

ডাক। ডাকলেই হয়।

দিলু ডাকলো—আপা, এই আপা। নিশাত ওদের দুজনকে দেখলো। কিছু বললো না। মুখ ঘুরিয়ে নিলো। মুখ ঘুরিয়ে নেবার ভঙ্গিটি—রাগী ভঙ্গি। সে এমন রেগে আছে কেন?

আপা, আমাদের সঙ্গে যাবে? আমরা স্টেশনের বাইরে হাঁটতে যাচ্ছি।

না। বাবু কোথায়?

বাবু মা'র সঙ্গে। ওদেরই খুঁজতে যাচ্ছি। তুমিও চলো।

না, আমি যাব না।

চল না আপা।

এক কথা বারবার বলতে ভাল লাগে না। তোরা যা।

দিলু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। আপা মাঝে মাঝে এমন কড়া করে কথা বলে। এত সুন্দর একটি মেয়ে এরকম করে কথা বলবে কেন? দিলু হাঁটতে শুরু করলো।

জামিল ভাই, এগুলো কি গাছ?

জানি না কি গাছ।

কৃষ্ণচূড়া নাকি?

না, কৃষ্ণচূড়া না। কৃষ্ণচূড়ার পাতা তেঁতুল গাছের পাতার মত। এগুলি খুব সম্ভব জারুল। কচুরিপানার মত ফুল হয় এদের। নীল রঙের। খুব সুন্দর।

এই স্টেশনের নামটা কত সুন্দর দেখেছেন?

নামটার একটা গল্প আছে, জান?

কি গল্প?

এখানে এক রাজা ছিলেন। রাজার একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ের নাম সোহাগী। রাজ্যে পানির খুব কষ্ট। রাজা ঠিক করলেন এমন এক পুকুর কাটবেন যে, রাজ্যে পানির কষ্ট থাকবে না। তিনি সত্যি প্রকাণ্ড এক পুকুর কাটালেন। কিন্তু আশ্চর্য, একফোঁটা পানি নেই। সে বছর খুব খরা। রাজ্যের লোক হাহাকার করছে। রাজা শুকনো মুখে পুকুর পাড়ে বসে আছেন, তখন শুনলেন কে যেন বলছে—রাজন, তোমার কন্যাকে পানিতে নামিয়ে দাও, জল আসবে। রাজা সোহাগীকে নামিয়ে দিলেন এবং বললেন—কোন ভয় নেই মা, জল আসতে শুরু করলেই তোমাকে টেনে তুলে ফেলবো।

মেয়ে পুকুরে নামামাত্রই চারদিক থেকে হু-হু করে জল আসতে লাগলো। রাজা আর তাকে টেনে তুলতে পারলেন না। পুকুরটির নাম হলো সোহাগী পুকুর। জায়গাটার নাম হলো সোহাগী।

যান, এটা সত্যি না। বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।

বানাব কেন? সোহাগী পুকুর সত্যি সত্যি আছে। জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। আর তুমি যদি ভরা পূর্ণিমার রাতে পুকুর পাড়ে বসে থাক তাহলে সোহাগীর কান্নাও শুনবে। ঐ মেয়েটি ভরা পূর্ণিমায় কাঁদে।

কেন?

পূর্ণিমার রাতে সে পুকুরে নেমেছিলো তাই। প্রতি পূর্ণিমাতেই সে আসে।

দিলু অন্যদিকে মুখ ফেরালো। তার চোখ ভিজে আসছে। তার খুব অল্পতেই কান্না পায়।

নিশাত দেখলো—ওরা লোহার গেট পার হয়ে স্টেশনের ওপাশের কাঁচা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জামিল ভাই গল্প করছেন হাত নেড়ে নেড়ে। কি গল্প কে জানে। মুগ্ধ হয়ে শুনছে দিলু। দিলুকে আজ অন্যদিনের চেয়েও একটু বড় লাগছে। এত বড় মেয়ের স্কার্ট পরা ঠিক না। চোখে লাগে। মাকে বলতে হবে।

লোকজন বিশেষ নেই চারদিকে। শুধু একজন বুড়ো খুব মন দিয়ে নিশাতকে দেখছে। এই প্রচণ্ড শীতেও তার গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। নিশাত প্রথমে ভেবেছিলো ভিক্ষা চায় বুঝি। কিন্তু না, এ ভিক্ষুক নয়। ভিক্ষুকদের এতটা কৌতূহল থাকে না। তারা সরাসরি ভিক্ষা চায়। না পেলে চলে যায় অন্য কোথাও।

নিশাতের নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে। দুটি প্যারাসিটামল খেয়ে নেয়া দরকার। নিশাত উঠে দাঁড়ালো। বুড়োটি বললো—কই যাইবেন গো মা? আশ্চর্য, কত সহজেই 'মা' ডাকলো। প্রশ্ন করাতেও কোন সংকোচ নেই। যেন কতদিনের চেনা।

আমরা যাব নীলগঞ্জ।

ডাকবাংলায়?

জি।

নিশাত চলতে শুরু করলো। তার পিছনে পিছনে গেঞ্জি গায়ে বুড়োটি আসছে। আরো কিছু জানতে চায় হয়তো। গ্রামের মানুষদের খুব কৌতূহল। ওরা প্রশ্ন করতে ভালবাসে।

জামিল একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালো। দিলু বললো—এখানে চা খাবেন? যা ময়লা। জামিল বললো—গ্রামে ঝকঝকে তকতকে রেস্টুরেন্ট কোথায়? এটা মন্দ কি।

বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে চা বানাচ্ছিলো। তার সামনে কাঠের একটা লম্বা বেঞ্চে রোদে পিঠ মেলে দুজন লোক বসে চা খাচ্ছে। তাদের একজন বললো, আপনেরা যাইবেন কোনখানে?

নীলগঞ্জ।

ওরে ব্যাস মেলা দূরে। যাইবেন ক্যামনে?

জীপ আসার কথা।

রাস্তা তো ঠিক নাই। জীপগাড়ি আওনের পথ নাই।

তাই নাকি?

জি। এইজন কি আপনের মাইয়া?

না, আমার বোন।

দিলু দেখলো দুটি লোকই গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে। তার বড় অস্বস্তি লাগতে লাগলো। জামিল ভাই এই বেঞ্চে বসেই চা খাবেন নাকি? লোক দুটির কৌতূহলের সীমা নেই। একজন বললো—সাব আপনের নাম?

আমার নাম জামিল।

আপনে করেন কি?

মাস্টারি করি ভাই। দেখি, একটু বসার জায়গা দেন।

দিলু অবাক হয়ে দেখলো ওরা সবাই বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসলো। আগের মতই তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে। এতটুকু সংকোচ নেই। জামিল বললো—দেখি, দু'কাপ চা দাও তো। দিলু খাবি তো?

খাব।

লোক দু'জনের একজন বললো—বজলু, সাবরে আর মাইয়াডারে কুকি বিসকুট দে। খালি পেডে চা খাওন ঠিক না। ছেলেটি দুটি লম্বা বিসকিট হাতে করে এগিয়ে দিলো। দিলু নিলো না, কিন্তু জামিল নিলো এবং চায়ে ভিজিয়ে বাচ্চাদের মতো খেতে লাগলো। কি যে সব কাণ্ড জামিল ভাইয়ের। দেখতে বড় মজা লাগে।

রেহানা বাবুকে নিয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো সাব্বির। সাব্বির তাঁর দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে। সাব্বিরের এখানে আসার কথা ছিলো না। হঠাৎ করেই এসেছে। এই হঠাৎ করে আসার অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা রেহানা তা বুঝতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সাব্বির ছেলেটি হয় খুব চাপা কিংবা অতিরিক্ত চালাক। তার হাবভাবে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

রেহানার ধারণা ছিলো ট্রেনে সাব্বির নিশাতের আশেপাশে বসতে চেষ্টা করবে। এবং গল্পটল্প করবে। সে তেমন কিছু করেনি। বসেছে কোণার দিকে। কিছুক্ষণ অত্যন্ত মন দিয়ে একটা কমিক পড়েছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের

একজন মানুষ মুগ্ধ হয়ে কমিক পড়ছে, ব্যাপারটা তার ভালো লাগেনি। কমিক শেষ হওয়া মাত্র সে জানালায় হেলান দিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করেছে কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশাতের দিকে তার কোনরকম আগ্রহ বোঝা যায়নি। তবে এও হতে পারে যে, সে চেষ্টা করে তার আগ্রহ গোপন রাখছে। নিশাতকে ভালরকম জানতে চায়।

আজ ভোরে তিনি দেখলেন সাব্বির ক্যামেরা হাতে একা একা যাচ্ছে। বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেও এগুলেন। অল্প কিছু কথাবার্তা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—দেশে কতদিন থাকবে?

বেশি দিন না। খৃসমাসের ছুটির পর যাব। জানুয়ারির তিন-চার তারিখের মধ্যে পৌঁছতে হবে।

তাহলে তো খুব অল্প দিন।

জি।

রেহানা ইতস্তত করে বলেই ফেললেন—বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরবে নাকি? অনেকে তো তাই করে।

এখনো কিছু ঠিক করিনি। আমার মা অবশ্যি মেয়ে-টেয়ে দেখছেন। বিয়ে করতেও পারি।

রেহানা কিছু বললেন না। দেখলেন সাব্বির ক্রমাগত ছবি তুলছে। গাছের ছবি। নদীর ছবি। নৌকার ছবি। কুয়াশায় সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। ভাল ছবি আসার কথা নয়। তবু ছবি তুলছে। রেহানা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন—এই ছেলেটি অত যে ছবি তুলছে, একবারও বলেনি আসুন মামী, আপনার একটা ছবি তুলে দেই। এই বয়সে ছবি তোলার তাঁর কোন শখ নেই। তবু একটা সাধারণ ভদ্রতা। সাব্বির বললো—আপনার নাতি খুব শান্ত। খুব চুপচাপ।

খুব শান্ত না। বিরক্ত করে। নতুন জায়গা দেখে চুপ করে আছে। অপরিচিত মানুষের সামনে সে ভেজা বেড়াল।

ওর বয়স কত?

পাঁচ বছরে পড়লো।

রেহানা আশা করেছিলেন সাব্বির এবার বাবুর সম্পর্কে কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বললো না। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একটা বকের ছবি ফোকাসে আনতে চেষ্টা করলো। টেলিস্কোপিক লেন্স থাকা সত্ত্বেও ছবিটি স্পষ্ট হচ্ছে না। বেশ কুয়াশা। মোটামুটি স্পষ্ট হলে ছবিটি ভালো হতো। বকের

ধ্যানী ছবিটি হালকা সবুজের ব্যাকগ্রাউন্ডে ভালো আসছে। রোদ আরেকটু চড়ে গেলে ছবি ভালো হবে না।

সাব্বির, চল যাই। তোমার মামা বোধ হয় রেগে যাচ্ছেন।

চলুন।

বাবুকে কোলে নিয়ে হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। একবার বললেন—বাবু, আমার হাত ধরে হেঁটে হেঁটে চলো। বাবু শক্ত করে তাঁর গলা চেপে ধরলো। তার মানে সে কিছুতেই নামবে না। রেহানা আশা করছিলেন সাব্বির বলবে—আমার কোলে দিন। আমি নিয়ে যাব। কিন্তু সাব্বির সে সব কিছুই বললো না। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলো। মেয়েদের সঙ্গে এত দ্রুত হাঁটা যায় না। এই সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানও কি ওর নেই? রেহানা মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেন।

স্টেশনের কাছে এসে তিনি দিলু এবং জামিলকে দেখলেন। নোংরা একটি বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। তাদেরকে ঘিরে চার-পাঁচ জন গ্রামের মানুষ বসে আছে মাটিতে। দিলু স্কার্ট পরে থাকায় তার ফর্সা পা অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটি তার ভালো লাগলো না। গ্রামের মানুষগুলি বোধ করি বসে আছে ফর্সা পা দেখার জন্য। তিনি একবার ভাবলেন দিলুকে ডাকবেন। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। দিলুর জামা-কাপড় কি কি এনেছেন তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন। মনে পড়লো না। জামা-কাপড় সব গুছিয়েছে নিশাত, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

দিলু তাদের দেখেই ডাকলো -মা, কোথায় ছিলে তোমরা? তারপর ছুটে এলো তাদের দিকে।

আমরা ভাবলাম তোমরা বোধ হয় হারিয়েই গেছো।

হারিয়ে যাবো কেন? নে, বাবুকে কোলে নে।

দিলু বাবুকে কোলে নিয়েই বললো -সাব্বির ভাই, আমাদের একটা ছবি তুলে দিন তো। এই বাবু, উনার দিকে তাকিয়ে হাস তো লক্ষ্মী ছেলের মতো। সাব্বির ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে লাগলো। এবং ছবি তুললো বেশ কয়েকটি। রেহানার মনে হলো এই একটি ব্যাপারে ছেলেটির আগ্রহ আছে। ছবি তোলার তার কোন ক্লান্তি নেই।

ওসমান সাহেব ভেবে রেখেছিলেন রেহানার উপর খুব রাগ করবেন। সেটা সম্ভব হলো না। সাব্বির রয়েছে। তার সামনে কোন সিন ক্রিয়েট করার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও বিরক্ত স্বরে বললেন—তোমরা ছিলে কোথায়?

কাছেই। তোমার জীপ তো এখনো আসেনি। এত তাড়া কিসের ?

জীপ আসবে না। নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে।

গরুর গাড়ি ?

দু'টা গরুর গাড়ি, একটা মহিষের গাড়ি। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। পেঁছিতে পেঁছিতে সন্ধ্যা হবে।

রেহানা অবাক হয়ে বললেন—তিনটা গাড়ি কেন ?

পাগল-ছাগলের কাণ্ড। যতগুলি পেয়েছে, নিয়ে এসেছে।

তোমার পুলিশের লোকজন কেউ আসেনি ?

না।

ওসমান সাহেবের মনে হলো রেহানা মুখ টিপে হাসছে। কেউ নিতে আসেনি ব্যাপারটা দুঃখজনক। এ নিয়ে হাসবে কেন রেহানা বললেন—তোমার খবর বোধ হয় পায়নি। পেলে আসত।

ওয়ারলেস ম্যাসেজ দিয়েছি। পাবে না মানে ?

তোমাদের নীলগঞ্জ থানায় হয়তো ওয়ারলেস নেই।

প্রতিটি থানায় ওয়ারলেস সেট আছে। কি বলছ এসব ?

দিলু বললো—বাবা, আমি কিন্তু মহিষের গাড়িতে করে যাব। ওসমান সাহেব একটা ধমক দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বের হয়েছেন, ছুটির সময়টায় কোন রাগারাগি করবেন না।

কিন্তু মেজাজ ঠিক রাখা যাচ্ছে না। কেন কেউ নিতে আসবে না ? থানাওয়ালাদের এত বড় স্পর্ধা থাকা ঠিক নয়।

গাড়িতে গুছিয়ে বসতে বসতে ন'টা বেজে গেলো। প্রথম কথা হয়েছিলো একটিতে যাবে শুধু মালপত্র। অন্য দুটির একটিতে জামিল ও সাব্বির এবং আরেকটিতে দিলুরা। কিন্তু নিশাত বললো, আমি মা, বাবুকে নিয়ে একটি গাড়িতে একা যেতে চাই।

কেন ?

কোন কেন-টেন নেই। এম্নি যেতে চাই।

সব সময় তুই একটা ঝামেলা করতে চেষ্টা করিস।

ঝামেলা করতে চেষ্টা করি না। কমাতে চেষ্টা করি। আমি মা একা যেতে চাই।'

নিশাত শেষ পর্যন্ত অবশ্য একা একা গাড়িতে উঠেনি। রেহানা উঠেছেন তার সঙ্গে। প্রথম গাড়িটিতে বাবা, দিলু ও বাবু। মহিষের গাড়িটিতে জামিল ও সাব্বির।

গাড়ি চলা শুরু করামাত্রই সাব্বির মাথার নিচে একটা হ্যান্ড ব্যাগ দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। জামিল বললো—কি, ঘুমুচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ। রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

এই ঝাঁকুনিতে ঘুম হবে?

হবে। আমার অভ্যাস আছে।

ঘুমুবার আগে একটা সিগারেট খাবেন?

জি না, আমি সিগারেট খাই না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাব্বির ঘুমিয়ে পড়লো। জামিল একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা বোধ করলো। এত সহজে কেউ অমন ঘুমিয়ে পড়তে পারে? একা বসে থাকা ক্লান্তিকর ব্যাপার। নেমে গিয়ে প্রথম গাড়িটিতে উঠা যেতে পারে। সেখানে সিগারেট খাওয়া যাবে না এই একটা ঝামেলা। তাছাড়া সঙ্গী হিসেবে ওসমান সাহেব বেশ বোরিং হবেন বলেই তার ধারণা। লোকটির রসবোধ নেই। অফিসের বাইরে যে আরো কিছু থাকতে পারে তা খুব সম্ভব তিনি জানেন না।

এই পর্যায়ে জামিলের মনে হলো এখানে আসা কি সত্যি দরকার ছিলো? মানুষ বেড়াতে যায় ফুর্তি করবার জন্যে। এখানেও কি সে রকম কিছু হবে? সম্ভাবনা খুব কম। জামিল গাড়োয়ানের পাশে এসে বসলো। রাস্তায় ধুলো উড়ছে। গরুর গাড়ি খুব ধীরে চলে বলে যে ধারণা আছে সেটা ঠিক নয়। বেশ দ্রুতই চলছে। গান শুনতে শুনতে যেতে পারলে হতো। কিন্তু ক্যাসেট প্লেয়ারটি নিশাতদের সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবে নাকি?

নিশাতের নাক ভার হয়ে আছে। মাথায় একটা ভোঁতা যন্ত্রণা। সে বললো—মা, তোমার কাছে প্যারাসিটামল আছে?

আছে। তোর জ্বর নাকি?

না সর্দি। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রেহানা তার গায়ে হাত দিলেন—গা তো বেশ গরম। শুয়ে থাক।

শুয়ে থাকতে হবে না। তুমি দুটি ট্যাবলেট দাও।

পানি তো নাই। পানির বোতল পেছনের গাড়িতে।

পানি লাগবে না। তুমি দাও।

রেহানা দুটি ট্যাবলেট দিলেন। নিশাত একটুও মুখ বিকৃত করলো না। ট্যাবলেট দুটি গিলে ফেললো।

শুয়ে থাক।

আমার শুয়ে থাকার যখন প্রয়োজন হবে আমি শুয়ে থাকব। তোমার বলতে হবে না।

তুই এত রেগে আছিস কেন?

নিশাত মায়ের চোখে চোখ রেখে শীতল গলায় বললো—সাব্বির সাহেব আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে কেন? ঠিক করে বল তো মা।

বেড়াতে যাচ্ছে, আবার কেন? ও বাংলাদেশের অনেক ছবি তুলে নিতে চায়। আমরা গ্রামের দিকে যাচ্ছি শুনে সে-ও আগ্রহ করে যেতে চাইলো।

না, সে কোন আগ্রহ দেখায়নি। তুমি ঝুলাঝুলি করছিলে।

যদি করেই থাকি তাতে অসুবিধা কি? আমাদের আত্মীয়, এতদিন পর দেশে এসেছে। ঘুরেফিরে দেখতে চায়।

আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয় মা।

আসল ব্যাপারটা কি শুনি?

তুমি চাচ্ছ ঐ ছেলেটি যাতে আমাকে পছন্দ করে ফেলে। এবং পুরানো দুঃখ-কষ্ট ভুলে আমি তাকে বিয়ে করে ফেলি।

যদি চেয়েই থাকি সেটা কি খুব অন্যায়?

হ্যাঁ অন্যায়। তুমি যা ভাবছ সেটা ঠিক নয়।

আমি কি ভাবছি?

তুমি ভাবছ আমার স্বামী নেই। একটা বাচ্চা আছে, কাজেই আমার একটি অবলম্বন দরকার। এটা মা ঠিক না। আমি তোমাদের বিরক্ত করব না, আমি নিজের দায়িত্ব নিজে নেব। অনেকবার তো তোমাদের বলেছি।

নিশাত দেখলো জামিল এগিয়ে আসছে। সে চুপ করে গেলো।

ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোমাদের কাছে?

জি না, দিলুর কাছে।

জামিল এগিয়ে গেলো। সামনের গাড়িটি অনেক দূরে চলে গেছে। নিশাত দেখলো জামিল দৌড়াতে শুরু করেছে। এই দৃশ্যটি তার কেন জানি ভালো লাগলো। রেহানা বললেন—জামিলকে বলে দে পানির বোতলটা দিয়ে যাক।

কেন?

অষুধ খেয়ে তোর মুখ তেতো হয়ে আছে না?

মা, আমার জন্যে তোমাকে এত ভাবতে হবে না।

দিলু ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছিলো। ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, তিনি দিলুর কথা বেশ মন দিয়ে শুনছেন এবং তাঁর ভালোই লাগছে।

সোহাগী নাম কেমন করে হয়েছে শুনবে বাবা?

বল শুনি।

আমার দিকে তাকাও বলছি। অন্যদিকে তাকিয়ে আছ কেন?

ওসমান সাহেব মেয়ের দিকে তাকালেন। দিলু হাত নেড়ে নেড়ে গল্পটা বললো। ওসমান সাহেব বললেন—এই জাতীয় মীথ প্রায় সব পুকুর সম্পর্কেই থাকে। এটা ঠিক নয়। একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় মাটি কাটলেই পানি আসবে। শীতের সময় যদি নাও আসে বর্ষার সময় বৃষ্টির পানিতে ভরে যাবে। দিলুর মন খারাপ হলো। গল্পটা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ওসমান সাহেব বললেন—রাজার মেয়ের নাম সোহাগী—এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন?

রাজাদের মেয়ের এমন সাধারণ নাম থাকে না। ওদের গালভরা নাম থাকে। ফুলকুমারী, রূপকুমারী, নূরজাহান, নূরমহল।

দিলুর বেশ মন খারাপ হলো। সে মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকালো এবং অবাক হয়ে দেখলো জামিল ভাই আসছেন।

ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোর কাছে?

হ্যাঁ।

ওটা নিতে এসেছি।

জামিল গরুর গাড়ির পেছনে পা ঝুলিয়ে বসলো।

দিলু, ভালো দেখে কয়টা ক্যাসেট দে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত?

না হিন্দী-ফিন্দী।

দিলু ক্যাসেট বাছতে বাছতে বললো—বাবা কিন্তু সোহাগী পুকুরের গল্পটা বিশ্বাস করেননি। বাবা বলছেন, মাটি কিছু দূর খুঁড়লেই পানি আসবে।

এটা ঠিক নয়। ঢাকা আর্ট কলেজে একটা বিরাট পুকুর আছে। খুব গভীর। বর্ষাকালে পর্যন্ত সেখানে এক ফোঁটা পানি থাকে না।

সত্যি?

হ্যাঁ। এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় কেউ যদি সেই পুকুরে নামে তাহলে খিলখিল হাসির শব্দ শোনে।

ওসমান সাহেব পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন—জামিল, সত্যি নাকি ?

পুকুরে পানি নেই বর্ষাকালেও এটা সত্যি, আমি নিজে দেখেছি। তবে হাসির কথাটা জানি না, ওটা বানানোও হতে পারে।

দিলু বললো—আমাকে ঐ পুকুরটা দেখাবেন ?

একদিন গিয়ে দেখে এলেই হয়। তোদের বাসার কাছেই তো।

জামিল ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে নেমে গেলো। দিলু বললো—জামিল ভাই অনেক কিছু জানে। ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না।

জামিল ভাই আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিলো, সেটা দারুণ মজার, তোমাকে জিজ্ঞেস করব ?

কর।

আচ্ছা মনে কর তোমার কাছে দশ সের পানি দেয়া হলো। এখন তুমি কি পারবে এই দশ সের পানি একবারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে। বালতি-টালতি কিছু ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু হাত দিয়ে নেবে এবং একবারে নেবে।

ওসমান সাহেব ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। দিলু মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললো—খুব সহজ বাবা। চেষ্টা করলেই পারবে। একটু হিণ্টস্ দেব ?

না হিণ্টস দিতে হবে না।

ওসমান সাহেব সত্যিই গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

জামিল নিজের গাড়িতে ফিরে এসে দেখে সাব্বির উঠে বসেছে। ক্যামেরা নিয়ে কি যেন করছে।

কি, ঘুম হয়ে গেলো ?

হ্যাঁ।

কি করছেন ?

একটা ব্লু ফিল্টার লাগাচ্ছি।

ব্লু ফিল্টার দিয়ে কি হয় ?

দিনের বেলা ছবি তুললে মনে হয় জ্যোৎস্না রাত্রিতে ছবি তোলা হয়েছে।

আপনি নিজে তো একজন ইন্‌জিনিয়ার ?

জি।

আপনাকে দেখে মনে হয় ছবি তোলাই আপনার একমাত্র কাজ।

এটা আমার একটা হবি।

খুব বড় ধরনের হবি মনে হচ্ছে ?

সাব্বির শান্ত স্বরে বললো—আমি কিন্তু খুব নামকরা ফটোগ্রাফার। আমার নিজের তোলা ছবি নিয়ে আমেরিকান এক পাবলিশার একটি বই বের করেছে, নাম হচ্ছে—অন দি টপ অব দি ওয়ার্ল্ড।

আপনার কাছে কপি আছে ?

আছে, দিচ্ছি।

সাব্বির আহমেদ তিনশ' পৃষ্ঠার একটি বই বের করলো তার স্যুটকেস থেকে। জামিলের বিস্ময়ের সীমা রইলো না।

এই বইটির কথা কি দিলুরা জানে ?

না। নিজের কথা বলতে ভাল লাগে না।

সাব্বির ছবি তুলতে শুরু করলো। ক্যামেরার শাটার পড়ছে। কোন কিছু যে সে দেখছে মন দিয়ে তা মনে হচ্ছে না।

একটি গ্রাম্য বধূ লম্বা ঘোমটা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শাটার পড়তে লাগলো খটাখট।

ছাগলের গলার দড়ি ধরে একটি আট-ন' বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। খটাখট শাটার পড়তে শুরু করলো। জামিল বললো—এই ছবিটা আপনার ভাল হবে না। জোছনা রাতে কেউ ছাগল চড়াতে বের হয় না। আপনি বরং ব্লু-ফিল্টার বদলে নিন।

সাব্বির হালকা গলায় বললো—উল্টোটাও হতে পারে। ছবি দেখে মনে হতে পারে, রাতের রহস্যময়তায় মুগ্ধ হয়ে একটি শিশু তার পোষা প্রাণীটি নিয়ে বের হয়েছে। দুজনের চোখেই বিস্ময় ও ভয়, তাদের ঘিরে আছে জোছনা।

আপনি কি ফটোগ্রাফার না কবি ?

আমি একজন ইন্‌জিনিয়ার।

জামিল বইটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললো—আপনার এই বইটিতে তো মানুষের কোন ছবি নেই। শুধুই জড়বস্তুর ছবি। মানুষের ছবি বেশি তোলেন না ?

আমার অন্য একটি বইতে মানুষের ছবি আছে। সবই অবশ্য 'নুড' ছবি।

বইটি আছে ?

আছে।

আমেরিকায় আপনি কতদিন ধরে আছেন ?

প্রায় এগারো বছর।

দেশে ফিরবেন না ?

না।

কেন ?

থাকবার জন্যে ঐ জায়গাটি ভালো। বিশাল দেশ, ঘুরে বেড়ানোর চমৎকার সুযোগ। এরকম পাওয়া যায় না। তা ছাড়া…।

তা ছাড়া কি ?

সাব্বির কথা শেষ করলো না। মাঠের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললো—এগুলি সর্ষে ফুল না ? হলুদ রঙের কি চমৎকার ভেরিয়েশন।

তারা নীলগঞ্জে ডাকবাংলোয় এসে পেঁছিলো বিকেল চারটায়, তখন আলো নরম হয়ে এসেছে। শীতের উত্তরী হাওয়া বইছে।

ডাকবাংলোটি চমৎকার। ফিসারিজের বাংলো। হাফ বিল্ডিং। উপরের ছাদ টালীর, মন্দিরের গম্বুজের মত উঁচু হয়ে গেছে। বাড়ি যত বড় তার চেয়েও বড় তার বারান্দা। সেখানে কালো একটি গোল টেবিলের চারপাশে গোটাপাঁচেক ইজিচেয়ার। দেখলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। বাড়িটির চারপাশে রেণ্টি (রেইন ট্রি) গাছ। বিকেল বেলাতেই বাড়িটিকে অন্ধকার করে ফেলেছে। পেছনে বেশ বড়সড় একটা পুকুর। কাকের চোখের মতো কালো জল।

রেহানা অবাক হয়ে বললেন—এই জঙ্গলে এত চমৎকার বাড়ি গভর্নমেণ্ট কেন বানিয়েছে ? ওসমান সাহেব নিজেও হকচকিয়ে গেছেন। এদিকে তাঁর প্রথম আসা। খোঁজখবর এসেছে জামিলের কাছ থেকে।

জামিল, এই ডাকবাংলো তৈরি হয় কবে ?

এটা সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার শিকার বাড়ি। পরে সরকার নিয়ে নেয়। এখন ফিসারিজ ডিপার্টমেণ্টের হাতে দেয়া হয়েছে। আগে আরো সুন্দর ছিলো।

এরচে' সুন্দর আর কি হবে ?

একটা কাঁচঘর ছিলো। গোটা ঘরটাই কাঁচের তৈরি। লোকজন কাঁচটাচ সব নিয়ে গেছে। অনেক ঝাড় লণ্ঠন ছিলো। বড় বড় অফিসার একেকজন এসেছেন, একেকটা করে নিয়ে গেছেন। পেছনের পুকুরের ঘাটে মার্বেল পাথরের একটি দেবশিশু ছিলো, ঢাকা মিউজিয়াম নিয়ে গেছে।

তুমি এতো কিছু জান কিভাবে ?

আমি তো এখানে প্রায়ই আসি।

দিলু বললো—বাবা আমি একা একটা ঘরে থাকব। ওসমান সাহেব উত্তর দিলেন না। জামিল বললো—তা পারবি না দিলু—সব পুরানো ডাকবাংলোয় ভূত থাকে।

আপনাকে বলেছে!

সন্ধ্যা হলেই টের পাবি। সন্ধ্যা নামুক। তখন দেখা যাবে।

বাবুর্চি আছে দুজন। তারা রান্নাবান্না সেরে ফেলেছে। খাবার ঘরে খাবার দিতে শুরু করেছে। খাবার ঘরটা তুলনামূলকভাবে অন্ধকার। একটা হ্যাজাক বাতি জ্বালানো হয়েছে। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেছে। শুধু নিশাত নেই। রেহানা খোঁজ নিতে গেলেন। নিশাত শুয়ে ছিলো। সে ক্লান্ত গলায় বললো--আমি কিছু খাব না।

কেন খাবি না?

খেতে ইচ্ছে করছে না, তাই খাব না।

সারাদিন তো কিছুই মুখে তুলিসনি। কিছু মুখে দে।

আমি গোসল না করে কিছু মুখে দেব না। আমার গা ঘিনঘিন করছে।

জ্বর গায়ে গোসল করবি কি!

প্লীজ মা, আমার ব্যাপারে নাক গলিও না। বাবুকে খাওয়াও। তোমরা খাওয়া-দাওয়া কর।

রেহানা মুখ কালো করে বের হয়ে এলেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করলো নিশাত। ঠাণ্ডা পানি। গায়ে জ্বর থাকার জন্যে পানি বরফ-শীতল মনে হচ্ছে। তবু ভালো লাগছে। ঝকঝকে বাথরুম। পিতলের বালতিতে পরিষ্কার জল। মোড়ক খোলা নতুন সাবান।

নিশাত যখন বেরিয়ে এলো তখন সত্যি সত্যি অন্ধকার নেমে এসেছে। নিশাত একটি ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিলো। উঁকি দিলো মায়ের ঘরে। বাবু অবেলায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। আজ সারাদিন বাবুর সঙ্গে তার কোন কথাবার্তা হয়নি। বাবু কি ক্রমেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? রাতে সে এখন তার সঙ্গে ঘুমায় না। ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে—দাদীর কাছে যাব। রেহানাকে সে দাদী বলে। কেন বলে কে জানে!

নিশাত বললো—ও কি কিছু খেয়েছে?

ভাত মুখে দেয়নি। দুধ খেয়েছে।

নিশাত নিচু হয়ে ছেলের কপালে চুমু খেলো। রেহানা বললেন—কিছু খাবি মা?

না। চা খাব এক কাপ।

বস তুই এখানে। আমি চায়ের কথা বলে আসি। মশারি খাটানোর কথাও বলতে হবে। খুব মশা এদিকে।

দরজায় কার যেন ছায়া পড়েছে। নিশাত মুখ তুলে দেখলো জামিল ভাই।

নিশাত, তোমার নাকি জ্বর?

ব্যস্ত হবার মত কিছু না।

ব্যস্ত হইনি নিশাত, খোঁজ নিচ্ছি। খোঁজ নেয়াটা অপরাধ নয় নিশ্চয়ই।

আমি ভাল আছি।

জামিল ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করলো। চলে যেতে চাইলো। নিশাত বললো—আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে জামিল ভাই।

বল।

আপনি বারান্দায় বসুন, আমি আসছি।

ঝগড়া করবে মনে হচ্ছে।

নিশাত জবাব দিলো না। বাবুর গালে একটা মশা বসেছিলো। হাত দিয়ে সেটিকে উড়িয়ে দিলো। ছেলেটিকে বড় রোগা রোগা লাগছে। এ ক'দিন ওর দিকে একটুও নজর দেয়া হয়নি। নিশাতের মনে হলো সে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। বাবু এখন আর মা'র জন্যে খুব ব্যস্ত নয়। শিশুরা অবহেলা খুব সহজেই টের পায়। নিশাত বাবুর চুলে হাত রাখলো। পাতলা লালচে ধরনের চুল। বাবার মত। কবিরের চুলও এ রকম ছিল। তবে বাবুর মতো পাতলা ছিল না। কবিরের চেহারার সঙ্গে বাবুর খুব বেশি মিল নেই। কবিরের নাক ছিল খাড়া, বাবুর তা নয়। সে হয়েছে মা'র মত। নিশাত নিচু হয়ে বাবুর ঠোঁটে চুমু খেলো। কেমন দুধ দুধ গন্ধ। নিশাত আবার নিচু হলো। বাবু ঘুমের মধ্যেই তাকে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলো।

বারান্দা অন্ধকার। এখানে কোন বাতি দিয়ে যায়নি। জামিল বসে ছিলো একা। নিশাত এসে ঢুকতেই সে সোজা হয়ে বসলো—হালকা গলায় বললো—ভেতরে বসলেই হতো, এখানে বড় হাওয়া।

থাকুক হাওয়া। বারান্দাই ভালো।

আলো দিতে বলব?

জামিল একটা সিগারেট ধরালো। সহজভাবে বললো—বল কি বলবে?

আপনি আমাদের এই বাংলোয় কেন নিয়ে এসেছেন?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কি মিন করছ।

আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন। এখন ভান করছেন বুঝতে পারছেন না।

দেখো নিশাত আমি ভান করি না। ঐ একটা জিনিস আমি কখনো করি না।

তাহলে বলুন এত ডাকবাংলো থাকতে আপনি এখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন কেন?

নিশাত, কবির এবং আমি অনেক রাত এই ডাকবাংলোয় কাটিয়েছি। এই ডাকবাংলোর উপর ওর একটা দুর্বলতা ছিলো। আমি জানি বিয়ের পরও অনেকবার তোমাকে নিয়ে এখানে আসতে চেয়েছে। আসা হয়ে ওঠেনি। আমি তাই ভেবেছিলাম এখানে এলে তোমার ভালই লাগবে।

আমি ওর সঙ্গেই এখানে আসতে চেয়েছিলাম, আর কারো সঙ্গে নয়।

ভেবে নাও ও তোমার সঙ্গেই আছে।

সব কিছু কি ভেবে নেয়া যায়। জীবন এত সহজ মনে করেন?

জীবন সহজও নয় জটিলও নয়। জীবন জীবনের মতো। আমরাই একে জটিল করি—সহজ করি। তুমি একে ক্রমেই জটিল করছো।

নিশাত চুপ করে গেলো। জামিল হালকা সুরে বললো—দুঃখ শুধু কি তোমার একার? আমাদের সবারই দুঃখ আছে।

আপনার আবার কিসের দুঃখ? দুঃখের আপনি কি জানেন?

নিশাত উঠে দাঁড়ালো। বাবু জেগে উঠে কাঁদছে। কে একজন এসে বাবান্দায় একটি হ্যারিকেন রেখে গেলো। হ্যারিকেনের আলোয় সব কেমন অদ্ভুত লাগছে।

জামিল সাহেব, আপনি যেভাবে বসে আছেন বসে থাকুন। একটা ছবি তুলব। নড়বেন না, শাটার স্পীড খুব কম।

অনেকখানি সময় নিয়ে সাব্বির ছবি তুললো।

পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়ার ধাঁধাটি ওসমান সাহেবের মাথায় ঘুরতে শুরু করেছে দুপুর থেকে। ওসমান সাহেব নিজের ওপরই বিরক্ত হচ্ছিলেন। ধাঁধার মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এই বয়সে কেউ এমন চিন্তিত হয়ে পড়ে না। কিন্তু তিনি হচ্ছেন। এটা কি বয়সজনিত স্থবিরতা?

তিনি কেমন যেন চ্যালেঞ্জ বোধ করছেন। এর মধ্যে চ্যালেঞ্জ বোধ করার কি আছে? ধাঁধার উত্তর জানতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

তিনি পাইপ হাতে বারান্দায় এসে বসলেন। তাঁর গায়ে ভারী একটা ওভারকোট। গলায় মাফলার। তবু তাঁর শীত করতে লাগলো। বয়স! বয়স বাড়ছে। এখন একদিন একটা মাইল্ড স্ট্রোক হবে। তার লক্ষণও টের পাওয়া যাচ্ছে। ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। ঘুম কমে গেছে। খিদে কমে গেছে। চিন্তাও পরিষ্কার করতে পারছেন না। পারলে এই সহজ ধাঁধার জবাব বের করতে পারতেন। কিংবা কে জানে এটা হয়তো সহজ নয়। হয়তো বেশ জটিল।

বারান্দায় রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন। ওসমান সাহেব রেহানার ডান দিকের খালি চেয়ারটিতে বসলেন। রেহানা বললেন—নিশাতের বেশ জ্বর।

তাই নাকি?

একশ' দুই-টুই হবে।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছো?

না।

তাহলে বুঝলে কিভাবে একশ' দুই?

অনুমান করে বলছি।

অনুমান করে আমাকে কিছু বলবে না।

তুমি এ রকম করছ কেন?

কি রকম করছি?

এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন?

মেজাজ কোথায় দেখালাম?

থানার ওসি ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করলে কেন?

খারাপ ব্যবহার তো করিনি। আমি বিরক্ত হয়েছি। এই বিরক্তির ব্যাপারটি তাকে জানিয়েছি। সে জানে আজ ভোরে আমি আসব, কিন্তু সে স্টেশনে আসেনি। আমি ডাকবাংলোয় পেঁছানোর পর সে এসেছে। আমাকে সে কি ভেবেছে?

তুমি কোন সরকারী ট্যুরে আসনি। তুমি ছুটি কাটাতে এসেছো। কেন সে আসবে?

সে আসবে। তার পুরো দলবল নিয়ে আসবে। কারণ আমি পুলিশের আই. জি।

রেহানা একবার ভাবলেন বলবেন না। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন। এবং বললেন বেশ তীক্ষ্ন কণ্ঠেই,—তুমি এখন আর আই. জি নও। রিটায়ারমেন্ট নিয়েছো। রিটায়ারমেন্টের আগের পাওনা ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি পুলিশের আই. জি. এটা এখন যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পার ততই ভালো।

ওসমান সাহেবের পাইপ নিভে গেছে। নিভে যাওয়া পাইপ হাতে তিনি মূর্তির মতো দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। রেহানা শীতল স্বরে বললেন—এখন আর তোমাকে দেখামাত্র পুলিশের অফিসাররা ছুটোছুটি করবে না। এটা মানসিকভাবে একসেপ্ট করার চেষ্টা কর। তোমার জন্যেও ভাল। আমাদের সবার জন্যেও ভালো। ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। দূরের রেইন্ট্রি গাছগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। রেহানার মনে হলো এই কথাগুলি হয়তো না বললেও চলতো। তিনি গলার স্বর স্বাভাবিক করতে করতে বললেন—চা খাবে?

না।

শীতের মধ্যে ভাল লাগবে।

আমাকে এক ঢোক হুইস্কি দিতে বল।

হুইস্কি এখানে কোথায় পাবে?

আছে, আলিম নিয়ে এসেছে। আলিমকে বল।

আলিম ওসমান সাহেবের বাসায় গত বিশ বছর ধরে আছে। তার বয়স ওসমান সাহেবের চেয়েও বেশি। কিন্তু গৃহভৃত্যদের কোন পেনসনের ব্যবস্থা নেই কাজেই তাকে একদিন আগেই রান্নার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নীলগঞ্জে আসতে হয়েছে। আজ প্রচণ্ড দাঁতব্যথা থাকা সত্ত্বেও সারাদিন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। রেহানা বললেন—আলিম শুয়ে আছে। ওর শরীর ভাল না। তাছাড়া এখানে এসব করতে পারবে না।

কেন, এখানে অসুবিধা কি?

অসুবিধা আছে। ঘরে তুমি যা কর, তাই বলে বাইরে এসেও করবে?

রেহানা, এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি। রিলাক্স করতে এসেছি।

তুমি একা আসনি। তোমার সঙ্গে বাইরের মানুষ আছে।

বাইরের মানুষ এখানে কেউ না। জামিল ঘরের ছেলে, সে আমার অভ্যাস জানে আর সাব্বির এগারো বছর ধরে বাইরে আছে।

আমি তোমাকে এখানে মদ খেতে দেব না।

রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে উঠে গেলেন। যাবার সময় হ্যারিকেন হাতে

করে তুলে নিয়ে গেলেন। ওসমান সাহেব অন্ধকার বারান্দায় একা একা বসে রইলেন। এখানে মশা আছে। বন্য মশা। মানুষ কামড়িয়ে অভ্যেস নেই বোধ হয়। কামড়াচ্ছে না। শুধু বিরক্ত করছে। ওসমান সাহেব আবার ধাঁধা নিয়ে ভাবতে বসলেন। পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হবে। শুধু হাতে নিতে হবে এবং একবারে নিতে হবে। কোন মানে হয় ?

বাবা, তুমি অন্ধকারে বসে কি করছ ?

দিলু ঢুকলো। ওসমান সাহেব মিষ্টি একটা গন্ধ পেলেন। দিলু পাউডার মেখেছে কিংবা গায়ে সেণ্ট-টেণ্ট দিয়েছে। গন্ধটা হালকা এবং চেনা। পরিচিত· কোন ফুলের গন্ধ। কি ফুল ওসমান সাহেব সেটা মনে করতে পারলেন না। অনেকদিন সচেতনভাবে কোন ফুলের গন্ধ নেয়া হয়নি। দিলু তার পাশের চেয়ারে বসলো এবং আবার বললো—অন্ধকারে একা একা বসে কি করছ ?

তোর সমস্যা নিয়ে ভাবছি।

আমার ? আমার আবার কি সমস্যা ?

দিলু বেশ অবাক হলো। ওসমান সাহেব নরম গলায় বললেন—ঐ যে পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেবার ব্যাপারটা।

ও আল্লা, তুমি এটা নিয়ে এখনো ভাবছ ?

হ্যাঁ, ভাবছি।

বলে দেব ?

না, বলিস না। নিজেই বের করব।

আরেকটা সহজ ধাঁধা ধরব ? জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি। দারুণ মজার।

না, আর না। যেটা দিয়েছিস সেটাই আগে সল্‌ভ করি।

দিলু হাসলো খিলখিল করে।

হাসছিস কেন ?

বলা যাবে না।

যা আলিমকে একটু আসতে বল।

আমি পারব না বাবা।

পারবি নে কেন ?

কি অন্ধকার দেখছো না ? ভয় ভয় লাগে। বাবা !

কি ?

একটা ভূতের গল্প শুনবে। সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে

শুনেছি। উনার নিজের লাইফের ঘটনা।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। পাইপ ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। খুব হাওয়া। দেশলাইয়ের কাঠি নিভে নিভে যাচ্ছে।

বাবা বলব ?

বল।

দিলু তার বাবার কাছে ঘেঁষে এলো। একটা হাত রাখলো বাবার হাতে। গলার স্বর নিচু করে গল্প শুরু করলো।

বুঝলে বাবা, তখন শ্রাবণ মাস। জামিল ভাই গিয়েছেন তার বন্ধুর বাড়ি। গ্রামের দোতলা বাড়ি। জামিল ভাইকে যে ঘরটায় থাকতে দেয়া হয়েছে তার জানালাগুলো খুব ছোট ছোট। বাবা শুনছো তো ?

শুনছি।

তাহলে হুঁ বলবে একটু পর পর। না বললে মনে হবে গল্প শুনছো না।

ঠিক আছে বলব। তারপর কি হলো ?

মাঝরাতে হঠাৎ খুব ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। ঘরে হ্যারিকেন ছিলো, হ্যারিকেনটা গেলো নিভে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না।

তারপর ?

তারপর হলো কি শুন। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। জামিল ভাই বললেন—কে ? একজন মেয়েমানুষের গলা শোনা গেলো—দয়া করে দরজা খুলুন।

তারপর কি হলো ?

জামিল ভাই দরজা খুলতেই ঘরে একটা মেয়ে ঢুকলো সতেরো-আঠারো বছর বয়স। বাইরে এত ঝড়-বৃষ্টি কিন্তু মেয়েটি খটখটে শুকনো।

ওসমান সাহেব বললেন—ঘুটঘুটে অন্ধকারে জামিল কি করে দেখলো মেয়েটি শুকনো এবং বুঝলই বা কি করে ওর বয়স সতেরো-আঠারো ?

দিলু থমকে গেলো। এটা সে ভাবেনি। ওসমান সাহেব হাসিমুখে বললেন—গল্পটার মধ্যে একটা ফাঁকি আছে। তাই না দিলু ? দিলু জবাব দিলো না। তার একটু মন খারাপ হয়ে গেলো। ওসমান সাহেব বললেন— গল্পটা শেষ কর।

না, থাক !

থাকবে কেন ? বাকিটা শুনি।

তোমাকে শুনতে হবে না।

দিলুর গলার স্বর ভারী। যেন সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। সে উঠে দাঁড়ালো।

কোথায় যাচ্ছিস ?

জামিল ভাইকে কথাটা জিজ্ঞেস করে আসি।

পরে জিজ্ঞেস করলেও হবে।

না আমি এখন জিজ্ঞেস করব। কেন সে আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবে ?

গল্প তো গল্প। গল্প কখনো সত্যি হয় ?

জামিল ভাই বলেছিলো এটা সত্যি গল্প।

দিলু প্রথমে গেলো খাবার ঘরে। সেখানে একজন অপরিচিত রোগা লোক হ্যাজাক লাইট ঠিক করতে চেষ্টা করছে। একএকবার দপ করে আগুন জ্বলে উঠে, লোকটি "খাইছেরে" বলে এক লাফে পেছনে সরে। ব্যাপারটা দিলুর কাছে খুব মজার লাগলো। দিলু হাসিমুখে বললো—আপনার কি নাম ?

আমার নাম বাদলা।

বাদলা আবার নাম হয় ?

বাপ-মায় দিছে কি করমু কন ?

তারা বোধ হয় নাম দিয়েছিলো বাদল।

দিলুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাজাকটা ঠিক হয়ে গেলো—বাদলা দাঁত বের করে বললো—আফা আপনের খুব ভয়। দিলু বললো—আপনি কি জামিল ভাইকে দেখেছেন ? ঐ যে লম্বা। গায়ে পাঞ্জাবি আর ক্রীম কালারের চাদর।

জি দেখছি।

কোথায় দেখেছেন ?

এই সাব আরেকজন কোট পরা সাব বইসা আছে পুকুর ঘাটে। গফ করতাছে।

আপনি যান তো জামিল ভাইকে ডেকে নিয়ে আসুন। বলবেন—দিলু আপনাকে ডাকছে। আমার নাম দিলু। দিলশাদ থেকে দিলু।

লোকটি চলে গেলো। দিলু মুখ গম্ভীর করে বসে রইলো। রাত বেশি হয়নি। মাত্র আটটা কিন্তু মনে হচ্ছে গভীর রাত। ঝিঁঝি ডাকছে চারদিকে। বাবুর কান্না শোনা যাচ্ছে। সে সারাদিন ঘুমিয়েছে। কাজেই সারারাত সে জেগে থাকবে। একটু পরে পরে কাঁদবে। মা-কে কোলে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে হবে। দিলু শুনলো মা তাকে গল্প বলার চেষ্টা করছেন। তুলা রাশি কন্যার গল্প। এই গল্পটি ছোটবেলায় সে-ও শুনেছে। এক রাজকন্যার ওজন মাত্র এক ছটাক। কিন্তু এক রাতে হঠাৎ তার ওজন বেড়ে গেলো।

কি ব্যাপার দিলু ! জরুরী তলব কেন ?

জামিল ভাই, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বললেন কেন? কেউ আমাকে মিথ্যে বললে আমার খুব খারাপ লাগে।

কোন্‌টা মিথ্যে বলেছি বলেন তো? মিথ্যে আমি তেমন বলি না।

ঐ যে একটা সত্যি ভূতের গল্প বললেন—ওটা আসলে মিথ্যে ভূতের গল্প।

কোন্‌ গল্পটি?

ঐ যে, বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছেন। ঝড়-বৃষ্টির সময়। ষোলো-সতেরো বছরের একটা মেয়ে ঘরে ঢুকলো।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মিথ্যে হবে কেন? ওটা সত্যি গল্প।

না, সত্যি না। এই অন্ধকারে আপনি কি করে বুঝলেন ওর বয়স ষোলো-সতেরো। ওর কাপড় ভেজা না।

জামিল গম্ভীর গলায় বললো—ঐ রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিলো। ঝড়ের সময় ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। বিদ্যুতের আলো শহরের ইলেকট্রিকের আলোর চেয়েও কড়া।

দিলু তাকিয়ে রইলো চোখ বড় করে। জামিল বললো—তবে মেয়েটির বয়সের ব্যাপারটা আমার কল্পনা। আমি নিজে তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম, কাজেই সব মেয়ের বয়সই মনে হতো ষোলো-সতেরো।

দিলু কিছু বললো না।

কি, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে। জামিল ভাই।

বল।

আরেকটা সত্যি গল্প বলেন।

আরেক দিন বলব!

জামিল ভাই, আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

না, রাগ করব কেন?

দিলু হঠাৎ উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেলো। জামিল হাসলো। দিলু নিশাতের মতো হয়নি। সে হয়তো এখন কিছুক্ষণ কাঁদবে।

রাতের খাবার দেয়া হলো ন'টার দিকে। দেখা গেলো কারোরই খাওয়ার দিকে মন নেই। শুধু সাব্বির, খাবার দেয়া হয়েছে শোনামাত্র, এসে বসেছে এবং খেতে শুরু করেছে। রেহানা বাবুকে কিছু-একটা মুখে দেয়াবার জন্যে আবার ঘরে এসে

সাব্বিরের একা একা খাওয়ার দৃশ্যটি দেখলেন। সাব্বির ঘনঘন পানি খাচ্ছে। রেহানা বললেন—খুব ঝাল হয়ে গেছে নাকি?

একটু হয়েছে, অসুবিধা নেই।

এরা বেশ ঝাল দেয়। আলিম রান্না করলে এটা হতো না। আলিম অসুখ হয়ে পড়ে আছে।

কি অসুখ?

দাঁতে ব্যথা।

সাব্বির গম্ভীর মুখে খেয়ে যাচ্ছে। রেহানা লক্ষ্য করলেন সে একবারও বললো না—অন্যরা কেউ খেতে আসছে না কেন? এটা একটা সাধারণ ভদ্রতা। দশ-এগারো বছর বিদেশে থাকলেই কেউ অভদ্র হয়ে যায় না। বরং আরো ভদ্র হয়। সেটাই স্বাভাবিক। রেহানা বললেন—এতকিছু রান্না হয়েছে কিন্তু কেউ খেতে চাচ্ছে না। সব নষ্ট হবে।

দিলু ঘরে ঢুকলো। সে এসেছে নিশাতের জন্যে এক গ্লাস পানি নিতে। রেহানা দেখলেন, পানি ঢালতে গিয়ে সে অনেকখানি পানি টেবিলে ফেললো। মেয়েটা কাজকর্মে এত আনাড়ি হয়েছে। পানি গড়িয়ে যাচ্ছে সাব্বিরের দিকে। তাকে অল্প সরে বসতে হলো। দিলু বললো—সাব্বির ভাই আপনি এত পেটুক কেন, সবাইকে ফেলে খেতে বসেছেন।

রেহানার কপালে ভাঁজ পড়লো। মেয়েটা এমন রুচিহীন কথাবার্তা বলে। লজ্জায় পড়তে হয়।

দিলু চলে যেতেই সাব্বির বললো—আপনার এই মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ। ওর মধ্যে এক ধরনের সরলতা আছে।

রেহানা কিছু বললেন না। মনে মনে সাব্বিরের কথাটার অন্য কোন অর্থ হয় কিনা বুঝতে চেষ্টা করলেন। এই মেয়েটিকে তার পছন্দ—এর মানে কি এই নয় যে, বড় মেয়েটিকে পছন্দ নয়। বড় মেয়েটির মধ্যে সরলতা নেই। প্রথমদিকে সাব্বিরকে যতটা ভালো লেগেছিলো এখন আর ততটা ভালো লাগছে না। ছেলেটি অভদ্র, অমিশুক। অবশ্যি সে অত্যন্ত সুপুরুষ। চেহারায় অন্য ধরনের কাঠিন্য আছে যা সহজেই চোখে পড়ে।

কবির এরকম ছিলো না। কবিরের মধ্যে একটা হালকা ফুর্তির ভাব ছিলো যা কোন বয়স্ক মানুষকে ঠিক মানায় না। এটা ভাবতে ভাবতে রেহানা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি ঠিক এই মুহূর্তে কবিরকে অপছন্দ করার চেষ্টা করছেন। এটা অন্যায়। কবিরকে অপছন্দ করার উপায় নেই। সে এ বাড়ির সবাইকে মন্ত্র-

মুগ্ধ করে রেখেছিলো। ওসমান সাহেব, যিনি পৃথিবীর কোন কথাই প্রায় বিশ্বাস করেন না তিনি পর্যন্ত কবিরের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন। একবার কবির এসে বললো—খবর শুনেছেন নাকি? মালয়েশিয়ায় একটা মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছে।

কি ধরা পড়েছে?

মৎস্যকন্যা। মারমেইড। মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল পত্রিকায় বিরাট ছবি ছাপা হয়েছে। হুলস্থুল কাণ্ড!

বল কি!

অন্য কেউ এ কথা বললে ওসমান সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। কবিরের বেলায় সে রকম কিছুই হলো না। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো তিনিও বিশ্বাসও করছেন না আবার ঠিক অবিশ্বাসও করছেন না। রাতে শোবার সময় গম্ভীর মুখে স্ত্রীকে বললেন—দুনিয়ায় কত অদ্ভুত জিনিসই না হয়। রেহানা বললেন—জামাইয়ের কথার কি কোন ঠিক আছে? তুমি এটা বিশ্বাস করে আছ? ওসমান সাহেব রেগে বললেন—কোন্ কথাটা এ পর্যন্ত সে মিথ্যে বলেছে শুনি? ওসমান সাহেব কবিরের কোন বদনাম সহ্য করতে পারতেন না। এখনো পারেন না। যে লোক জীবনে কোনদিন নামাজ-রোজা করেছে বলে রেহানার মনে পড়ে না সেই লোকও দেখা যায় একুশে আগস্টে একটা জায়নামাজ টেনে বের করেন। এবং গভীর রাত পর্যন্ত টুপী মাথায় বসে থাকেন। অপরিচিত এই পোশাকে তাঁকে অদ্ভুত দেখায়। একুশে আগস্ট কবিরের মৃত্যুদিন।

পানি আনতে এতক্ষণ লাগলো?

দিলু পানি আনতে দেরি করেনি। গিয়েছে, নিয়ে এসেছে নিশাত আজ অকারণে রাগ করছে। দিলু বললো—নাও, পানি নাও।

লাগবে না, যা। তৃষ্ণা মরে গেছে।

এটা কেমন কথা। তৃষ্ণা কখনো মরে যায়? তৃষ্ণা থাকেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। দিলু নরম স্বরে বললো—আপা খেয়ে নাও, প্লিজ। তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। নিশাত পানির গ্লাস হাতে নিলো।

তুমি রাতেও কিছু খাবে না?

না।

কেন?

দেখছিস না আমার শরীর ভালো না।

মাথা টিপে দেব?

না, লাগবে না। তুই এখন যা।

অন্ধকারে একা বসে থাকবে কেন? আমিও থাকি তোমার সঙ্গে।

দিলু খাটের উপর পা উঠিয়ে বসলো। অন্ধকারে পা নামিয়ে বসতে তার ভাল লাগে না। সব সময় মনে হয় কেউ-একজন খাটের নিচ থেকে চুপি চুপি এসে পা চেপে ধরবে।

আপা, একটা ভূতের গল্প শুনবে?

নিশাত জবাব দিলো না।

সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের নিজের জীবনে ঘটেছিলো।

নিশাত তবুও চুপ করে রইলো।

এ গল্প শুনলে তুমি আর একা একা অন্ধকারে বসে থাকতে পারবে না। এবং রাতে ঘুমও আসবে না।

এত ভয়ের গল্প শুনতে চাই নে। থাক। মাথা ধরার মধ্যে গল্প শুনতে ভাল লাগে না।

আপা, তোমার মাথার চুল টেনে দেই?

দে। আস্তে আস্তে টানবি।

দিলু নিশাতের কপালে হাত দিয়েই চমকালো। বেশ জ্বর গায়ে। এতটা জ্বর তা বোঝা যায়নি।

আপা, তোমার গা তো খুব গরম।

হুঁ।

জানালা বন্ধ করে দেই, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

না থাক। জানালা বন্ধ থাকলে আমার কেমন যেন লাগে। মনে হয় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

মশারি ফেলা নেই। মাঝে মাঝে মশা কামড়াচ্ছে। দিলু হালকা স্বরে বললো, জানো আপা, আমি কখনো মশা মারি না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কারণ যেসব মশা মানুষকে কামড়ায় তারা সব স্ত্রী মশা। পুরুষ মশারা কামড়ায় না। আমি নিজে মেয়ে হয়ে একটা মেয়ে মশাকে কি করে মারি, বলো?

পুরুষ মশারা কামড়ায় না—এ কথাটা তোকে বলেছে কে?

জামিল ভাই বলেছেন।

নিশাত বিছানায় উঠে বসলো। নিচু স্বরে বললো—জামিল ভাইয়ের সঙ্গে তোর এত মাখামাখি কেন? দিলু অবাক হয়ে বললো—এই কথা কেন বলছো?

সব সময় তোর মুখে জামিল ভাই, জামিল ভাই। এটা ভাল নয়।

ভাল নয় কেন ?

তোর বয়স কম। এই বয়সে মেয়েরা খুব সহজে নানান রকম দুঃখ-কষ্ট পায়।

নিশাত চুপ করে রইলো। দিলু বললো—পরিষ্কার করে বল আপা। নিশাত কঠিন স্বরে বললো—তোর মত বয়েসী মেয়েরা খুব সহজে মুগ্ধ হয়। দুঃখ-কষ্ট আসে সে জন্যেই।

তোমার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

আমার মনে হয় তুই ঠিকই বুঝতে পারছিস। আমার যখন তোর মত বয়স ছিলো তখন তো আমি সবই বুঝতাম। তুই জামিল ভাইয়ের সঙ্গে বেশি মিশবি না।

কেন, সে কি খারাপ লোক ?

না, সে খারাপ লোক না। ভাল মানুষ। বেশ ভাল মানুষ। সে জন্যেই ভয়। এক সময় তুই তাকে ভালবাসতে শুরু করবি। তোর জন্যে সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে।

দিলু দীর্ঘ সময় কোন কথাবার্তা বললো না। নিশাতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু নিশাতের মনে হলো দিলু কাঁদছে।

তুই কাঁদছিস নাকি ?

দিলু কোন উত্তর দিলো না। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো।

চলে যাচ্ছিস ?

দিলু সে কথারও কোন জবাব দিলো না। নিশাতের মনে হলো দিলুকে এসব কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু এখন আর মনে করে কি লাভ ? যা বলা হয়ে গেছে তা আর ফেরানোর উপায় নেই।

হ্যারিকেন হাতে রেহানা ঢুকলেন। তার কোলে ঘুমন্ত বাবু। তিনি বাবুকে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেলেন। নিশাত বললো—ওকে তোমার কাছে রাখ মা। আমি আজ এ ঘরে একা শোব।

কেন, একা শুবি কেন ?

সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।

তোর শরীর ভাল নেই, একজন কেউ তোর সাথে থাকা দরকার। আমি থাকি কিংবা দিলু থাকুক।

কাউকে থাকতে হবে না।

রেহানা একটি কঠিন কথা বলতে গিয়েও বললেন না। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন—রাতে কি খাবি?

কিছু খাব না।

খাবি না কেন? তোর রাগটা আসলে কার উপর? ঠিক করে বল তো?

কারো উপর আমার কোন রাগ-টাগ নেই। শরীর ভাল নেই, তাই খাব না।

ঠিক আছে।

রেহানা চলে যাচ্ছিলেন, নিশাত বললো—দিলুকে একটু পাঠিও তো মা।

দিলু আসবে না। তুই ওকে কি বলেছিস জানি না। দিলু কাঁদছে।

কাঁদার মত আমি কিছু বলিনি।

রেহানা শীতল স্বরে বললেন—তোর কথাবার্তা শুনে আমারই কাঁদতে ইচ্ছে হয় আর ও তো বাচ্চা মেয়ে।

ও বাচ্চা মেয়ে নয়। এই বয়সে মেয়েরা বাচ্চা থাকে না।

সবাই তোর মত নয়। কেউ কেউ বাচ্চা থাকে।

এ কথার মানে কি, মা?

মানে-টানে কিছু নেই। তুই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ নিশাত। যার দুঃখে আজ এরকম করছিস তার সঙ্গে তোর আচার-ব্যবহার কেমন ছিলো?

তার মানে?

ক'টা দিন তুই কবিরের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছিস?

মানুষ সব সময় হাসিমুখে থাকতে পারে না।

তা পারে না। কিন্তু তুই ভালমত ভেবে দেখ তো কবিরের সঙ্গে তোর ব্যবহারটা কেমন ছিলো।

তুমি যাও তো মা।

রেহানা চলে এলেন। নিশাত অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে দরজার ছিটকিনি লাগালো। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দীর্ঘ সময়। বাবু ঘুম ভেঙে কাঁদতে শুরু করেছে—মা'র কাছে যাব। মা'র কাছে যাব। রেহানা তাকে সামলাবার চেষ্টা করছেন। নিশাত শুনলো মা বলছেন—কেন যে মরতে এখানে এলাম।

নিশাতের চোখ জ্বালা করছে। আজকাল তার চোখে জল আসে না। চোখ জ্বালা করে। মা একটু আগে যা বলে গেলেন সেটা কি ঠিক? মা কি ইঙ্গিত করতে চেষ্টা করছেন না যে, সে এখন যা করছে তা করার তার কোন অধিকার নেই। মা একটা মোটা দাগের ইঙ্গিত করেছেন। স্থূল ধরনের কথা বলেছেন।

সবার স্বভাব এক রকম নয়। সব মেয়েরাই তাদের স্বামীকে নিয়ে আহ্লাদ

করে না। কেউ কেউ গম্ভীর স্বভাবের থাকে। সহজে উচ্ছ্বসিত হয় না। তাছাড়া কবিরের মধ্যে কি সত্যি সত্যি উচ্ছ্বসিত হবার মত কিছু ছিলো?

সে ভালো ছেলে এতে সন্দেহ নেই। আমুদে ছেলে। হৈচৈ করতো। প্রচুর মিথ্যে কথা বলতো। টিভি'র প্রতিটি বাংলা সিনেমা গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতো এবং শেষ হওয়ামাত্র বলতো —শালা, সময়টাই মাটি। আগে জানলে কে বসে থাকতো? কবির এমন একটি ছেলে যে পৃথিবীর যে-কোন মেয়েকে বিয়ে করেই সুখী হতো। এই সব ছেলেদের সুখী হবার ক্ষমতা অসাধারণ। এরা হয় সুখী স্বামী, সুখী বাবা এবং বুড়ো বয়সে একজন সুখী দাদা। সূক্ষ্ম রুচির মানুষ এত সহজে সুখী হয় না। সংসারে সুখী হবার মত উপকরণ ছড়ানো নেই।

বাবু খুব কাঁদছে। নিশাত দরজা খুলে বের হলো। হ্যাজাক লাইটটি বারান্দায় এনে রাখা হয়েছে। জামিল বাবুকে কোলে নিয়ে বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটছে।

জামিল ভাই, ওকে আমার কাছে দিন।

জামিল ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করলো। বাবুর ঘুমিয়ে পড়ার একটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মায়ের কথা শুনে জেগে উঠতে পারে। নিশাত অপেক্ষা করতে লাগলো।

আচ্ছা, কবির বেঁচে থাকলে কি এরকম করতো? ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতো? এটি কখনো জানা হবে না। কিন্তু সবাই বলবে— বেঁচে থাকলে কত আদর করেই না ছেলে মানুষ করতো। মৃত মানুষদের সম্পর্কে সব সময় ভালো ভালো কথা ভাবতে হয়। মৃত মানুষেরা অনেক সুবিধা ভোগ করেন। সবার বয়স বাড়ে কিন্তু মৃত মানুষদের বয়স কখনো বাড়ে না। নিশাত এক সময় বুড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু কবিরের বয়স সাতাশ বছরেই থেমে থাকবে। তার কোনদিন চুলে পাক ধরবে না। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হবে না। কোন মানে হয় না।

নিশাত, বাবু ঘুমিয়ে পড়ছে। কোথায় রাখবে?

মা'র কাছে দিয়ে আসুন।

জামিন হাঁটছে কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। হাঁটার ভঙ্গিটাও কেমন চেনা চেনা। কবির কি এমন করেই হাঁটতো? এখন তার অনেক কিছুই মনে পড়ে না। স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। একদিন হয়তো কিছুই মনে থাকবে না।

নিশাত, ওকে শুইয়ে দিয়ে এসেছি।

থ্যাংকস।

তোমার জ্বর কেমন?

আমার জ্বরের খবর মনে হচ্ছে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

জামিল তাকালো তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে। মৃদুস্বরে বললো—বেড়াতে এসে অসুখে পড়াটা খুব খারাপ।

আমি বেড়াতে-টেড়াতে আসিনি। সবাই এসেছে, বাধ্য হয়ে আমিও এসেছি।

জামিল হালকা স্বরে বললো, অবস্থা এরকম হবে জানলে আমি তোমাদের সঙ্গে জুটতাম না।

জুটেছেন কেন, আপনাকে তো কেউ সাধাসাধি করেনি। নাকি করেছে?

না, করেনি। আমি নিজ থেকেই এসেছি।

কেন এসেছেন?

নিশাত, তোমার শরীর ভাল না। যাও তুমি শুয়ে থাক।

না, আপনি আমাকে বলুন আপনি কেন এসেছেন? ইউ গট টু টেল মি দ্যাট!

জামিল একটা সিগারেট ধরালো। সে লক্ষ্য করলো—নিশাত অল্প অল্প কাঁপছে।

জামিল ভাই, আমি আপনাকে আগেও পছন্দ করিনি, এখনো করি না। আমার মনে হয় আপনি সেটা জানেন না।

নিশাত, যাও ঘুমতে যাও।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে উঠে এলেন—এই নিশাত কি হয়েছে?

কিছু হয়নি বাবা।

জামিলকে কি বলছিলি?

কিছু বলছিলাম না।

নিশাত ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেলো। ওসমান সাহেব বললেন—জামিল, ও চেঁচামেচি করছিলো কেন?

জানি না চাচা। আপনি এখনো বারান্দায় বসে আছেন কেন? ঠাণ্ডা লাগবে তো।

ঠাণ্ডা অলরেডি লেগে গেছে। কিন্তু অন্ধকারে বসে থাকতে ভালই লাগছে। জামিল, তুমি একটা কাজ কর তো, দেখ, আলিমকে কোথাও পাও কিনা। আর শোন, এই হ্যাজাকটা এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা কর। আলো চোখে লাগছে। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

হয়েছে।

সাব্বির কোথায়? ওকে এখানে আসার পর একবারও দেখিনি।

উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আলিম ওসমান সাহেবের সামনে তাঁর প্রিয় গ্লাসটি রাখলো। লম্বা গ্লাস। জার্মান ক্রিস্টালের অপূর্ব গ্লাস। এই গ্লাস ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি তৃপ্তি পান না। ওসমান সাহেব স্পষ্ট একটা সুখের নিঃশ্বাস ফেললেন। আলিম মনে করে এনেছে। আলিম দ্বিতীয়বারে একটা বড় বাটিতে একগাদা বরফ নিয়ে এলো।

আরে তুই বরফ পেলি কোথায়?

আসার সময় নেত্রকোণা থেকে বিশ সের বরফ কিনলাম।

বলিস কি! গলে নাই?

কাঠের গুঁড়া দিছি চাইর দিকে। তবু গলছে। এখন আছে অল্প।

আলিম খুব সাবধানে হোয়াইট হর্সের বোতল খুলে হুইস্কি ঢাললো। ওসমান সাহেবের পেগ সাধারণ পেগের চেয়ে একটু বড়। আলিম মাপটা জানে। তবু অন্ধকারে কিছু বেশি পড়লো। অন্য সময় হলে ধমকে দিতেন। আজ কিছুই বললেন না। বরফের ব্যাপারটা তাঁকে অভিভূত করেছে।

তোর দাঁতের ব্যথার কি অবস্থা?

ব্যথা আছে।

রেহানার কাছ থেকে নিয়ে তিনটা এ্যাসপিরিন খা, ব্যথা কমে যাবে।

আলিম কথা বললো না। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন—তোর এখানে থাকার দরকার নেই। যা, শুয়ে পড়।

স্যার আপনে ঘরে বসেন, বাইরে ঠাণ্ডা।

বাইরেই ভালো। শোন আলিম, দু'টা পানির বোতল আর কিছু বরফ দিয়ে যাস।

আচ্ছা।

আলিম চলে যেতেই বিদ্যুতের মতো ওসমান সাহেব দিলুর ধাঁধার রহস্য ভেদ করলেন। অত্যন্ত সহজ উত্তর। বরফ। দশ সের পানিকে প্রথমে জমিয়ে বফর করতে হবে। তারপর সেই বরফের টুকরোটি হাতে করে যেখানে যাবার সেখানে যেতে হবে।

ওসমান সাহেব গভীর আনন্দ বোধ করলেন। নীলগঞ্জ ডাকবাংলোটি তাঁর কাছে হঠাৎ করে বড় প্রিয় হয়ে গেলো। যেন তিনি জীবনের সবচেয়ে বড়

পাওয়াটি এই ডাকবাংলোয় পেয়ে গেলেন। যেন তাঁর আর কিছু পাওয়ার নেই। জীবনের সমস্ত সাধ পূর্ণ হয়েছে।

বাবা!

দিলু একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে উঠে এসেছে, শীতে কাঁপছে অল্প অল্প।

কি রে দিলু?

তুমি এখানে বসে কি করছ?

কিছু করছি না। বসে আছি।

আমার ঘুম আসে না বাবা। তোমার সঙ্গে একটু বসি?

বোস।

হুইস্কি খাচ্ছ, না? মা জানলে খুব রাগ করবে।

ওসমান সাহেব একটি হাত মেয়ের পিঠের ওপর রাখলেন। দিলু হালকা স্বরে বললো—বাবা, চা চামুচ দিয়ে এক চামুচ খেয়ে দেখি? আমার খুব খেতে ইচ্ছে করে।

ওসমান সাহেব একবার ভাবলেন বললেন—যা একটা চামুচ নিয়ে আয়। বলতে পারলেন না।

দিলু বললো—তোমার শীত করছে না?

করছে। তোর মা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

হ্যাঁ। সবাই ঘুমুচ্ছে। শুধু আমরা দুজন জেগে আছি।

জায়গাটা কেমন লাগছে?

ভাল।

পুকুরটা দেখেছিস?

হুঁ।

বিরাট পুকুর তাই না?

হুঁ। এ রকম একটা বাড়ি আমাদের থাকলে খুব ভাল হতো—তাই না বাবা? পেছনে বিরাট একটা পুকুর থাকবে। সামনে থাকবে প্রকাণ্ড সব রেন্টি গাছ।

এগুলো রেন্টি গাছ নাকি?

হুঁ।

কে বলেছে?

জামিল ভাই বলেছেন।

দিলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো তারপর খুব হালকা গলায় বললো—

আপা আমার সঙ্গে আজ খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।

আমরা সবাই কখনো না কখনো খারাপ ব্যবহার করি।

কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি তো কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি না। করি? তুমি বল?

ঘুমুতে যা দিলু।

দিলু উঠে গেলো। ওসমান সাহেবের হঠাৎ মনে পড়লো, আরে তাই তো, ধাঁধার উত্তরটা তিনি জানেন এটা দিলুকে বলা হলো না। উঠে গিয়ে ডাকবেন নাকি? কিন্তু তাঁর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। গাছে জোনাকি পোকা জ্বলছে-নিভছে। শীতল উত্তরী হাওয়া। ওসমান সাহেব চতুর্থ পেগটি ঢাললেন। অনেক বেশি পড়ে গেলো, অন্ধকারে অনুমান ঠিক হয় না।

দিলু ঘুমিয়েছে নিশাতের সঙ্গে। প্রকাণ্ড একটা খাট। খাটের নিচে আলো কমিয়ে হ্যারিকেনটা রাখা। ঘরময় আবছা অন্ধকার। পায়ের দিকের জানালার একটা কাঁচ ভাঙ্গা। সেই ভাঙ্গা গলে শীতের হাওয়া আসছে। দুটি কম্বল আছে গায়ে তবু শীত মানছে না। দিলু নিশাতের দিকে আরো একটু সরে এলো। নিশাত শীতল স্বরে বললো—গায়ের উপর এসে পড়ছো কেন, দিলু? সরে শোও। এত ঘেঁষাঘেঁষি আমার ভালো লাগে না। দিলু অনেকখানি সরে গেলো। পাশের ঘরে বাবু কাঁদছে। বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছে। বোঝা যাচ্ছে না। দিলু বললো—আপা, বাবু কাঁদছে।

কাঁদছে কাঁদুক।

ওকে এখানে নিয়ে এসো না। অনেক জায়গা তো।

ভ্যানভ্যান করিস না। চুপ করে থাক।

দিলুর চোখ ভিজে উঠলো। এমন বাজে করে কথা বলে কেন আপা? কি করেছে সে? কিছুই তো করেনি। শুধু বলেছে, বাবু কাঁদছে। এটা বলা কি দোষের? দিলু কম্বলের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ফেললো। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। বাবুর কান্নার শব্দও সেখানে যাচ্ছে না। অন্ধকার দিলুর ভাল লাগে না। অন্ধকারে তার মৃত্যুর কথা মনে হয়। দাদীজান মারা যাবার সময় থেকেই তার এরকম হয়েছে। দাদীজান মারা গিয়েছিলেন রাত ন'টায়। সবাই যখন কান্নাকাটি করছে তখন হঠাৎ কারেন্ট চলে গেলো। কি ভয়াবহ অবস্থা। সবাই কান্না থামিয়ে মোমবাতি মোমবাতি বলে চেঁচামেচি শুরু করলো। দিলু বসে ছিলো সোফায়। হঠাৎ তার মনে হলো দাদীজান যেন

উঠে আসছেন তার দিকে। কি অবস্থা। ভাগ্যিস বাবা তখন লাইটার জ্বালিয়ে দিলুর পাশে এসে বসলেন।

নিশাত মৃদুস্বরে ডাকলো—দিলু ঘুমিয়ে পড়েছিস? দিলু জবাব দিলো না। নিশাত কম্বলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলুকে কাছে টানলো। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। এত অভিমানী হয়েছে কেন? নিশাতের ইচ্ছা হলো দিলুকে ডেকে তুলে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে। সে আবার ডাকলো —এই দিলু, এই পাগলি। দিলুর ঘুম ভাঙলো না। নিশাত ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। আর ঠিক তখনই জামিলের হাসির শব্দ শোনা গেলো। কি আশ্চর্য, অবিকল কবিরের মত ঘর কাঁপিয়ে হাসি। জামিল ভাই তো এরকম কখনো হাসেন না। তাঁর সব কিছুই মাপা। এবং কোন কিছুর সঙ্গেই কবিরের কোন মিল নেই। তবু আজ এরকম মিল পাওয়া গেলো কেন? নাকি সব মানুষের মধ্যেই অদৃশ্য কোন মিল আছে?

রাত বাড়ছে। বাবু কাঁদছে না। চারদিকে সুনসান নীরবতা। নিশাত হাত বাড়িয়ে দিলুকে কাছে টানলো। দিলু ঘুমের মধ্যেই কাঁদছে। কোন মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে হয়তো। কতদিন হয়ে গেলো নিশাত কোন মিষ্টি স্বপ্ন দেখে না!

নিশাত খুব ভোরে জেগে উঠলো।

তখনো অন্ধকার কাটেনি। পুবের আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। ঘন কুয়াশা চারদিকে। নিশাত দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। মাথার যন্ত্রণা আর নেই। শরীর ঝরঝরে লাগছে। প্রচণ্ড ক্ষিধে। এত ভোরে নিশ্চয়ই আর কেউ জাগেনি।

নিশাত টুথব্রাশ হাতে বারান্দায় হাঁটতে লাগলো। এত সুন্দর বাড়ি। রাতে ঠিক বোঝা যায়নি। নিশাত হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পেছনের দিকে চলে এলো। প্রকাণ্ড পুকুরটি চোখে পড়লো তখন। কুয়াশার জন্যে পুকুরটি পুরোপুরি দেখা যায় না। মনে হয় বিশাল সমুদ্র। পানি দেখলেই ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। নিশাত এগিয়ে গেলো।

এই ভোরেও পাতলা একটা উইন্ডব্রেকার পরে বাঁধানো ঘাটে সাব্বির বসে আছে। তার পাশেই স্ট্যান্ড-ক্যামেরা বসানো। নিশাত বললো—এত ভোরে ক্যামেরায় কার ছবি তুলছেন?

কুয়াশার ছবি। আপনার জ্বর সেরে গেছে ?

হ্যাঁ।

নিশাত সিঁড়ি বেয়ে শেষ পর্যন্ত নেমে গেলো। হাত বাড়িয়ে পানিতে আঙ্গুল ডুবালো। তার ধারণা ছিলো পানি বরফ-শীতল হবে। কিন্তু তেমন ঠাণ্ডা নয়।

আপনি যেমন বসে আছেন ঠিক তেমনিভাবে বসে থাকুন, আমি আপনার একটা ছবি তুলবো।

অনুমতি প্রার্থনা নয়। যেন আদেশ। নিশাত বললো—মুখে টুথব্রাশ ঝুলতে থাকবে ?

হ্যাঁ। থাকুক। আপনি হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করছেন। এটাই আমাব ছবির থীম।

সাব্বির ক্যামেরা হাতে কয়েক ধাপ নেমে এলো। নিশাতের কি রাগ করা উচিত না, বলা উচিত, এভাবে আমি ছবি তুলি না। কিন্তু নিশাত রাগ করতে পারছে না। কেন পারছে না সে-ও এক রহস্য। সাব্বির বললো—আজ ঘুম ভাঙার পর থেকেই মনে হচ্ছিলো ছবির জন্যে একটা ভাল কম্পোজিশন পাবো।

আপনি ছবি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না ?

ভাবতে পাবি হয়তো কিন্তু ছবির কথা ভাবতেই ভালো লাগে।

নিশাত হাসতে হাসতে বললো—আপনার মাথার মধ্যে শুধু কম্পোজিশন ঘুরে তাই না ? সাব্বির তার জবাব দিলো না। ক্রমাগত ছবি তুলতে লাগলো। পানিতে হাত ডুবিয়ে বসে রইলো নিশাত। সে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলো—সাব্বির অন্য ফটোগ্রাফারদের মতো নয়। অন্য ফটোগ্রাফাররা বলতো—একটু বাঁ দিকে ফিরুন, একটু হাসুন। মাথাটা একটু উপরে তুলুন। শাড়ির আঁচল টেনে দিন। সাব্বির কিছুই বলছে না। শুধু ছবি তুলছে। নিশাত হাসতে হাসতে বললো—এত ছবি তুলছেন একটা তো ভালো হবেই।

সব সময় হয় না। ছত্রিশটি ছবির মধ্যে যার একটি ছবি ভালো হয় সে একজন বড় ফটোগ্রাফার।

আপনি একজন বড় ফটোগ্রাফার ?

হ্যাঁ।

নিশাত লক্ষ্য করলো সে 'হ্যাঁ' বলেছে খুব জোরের সঙ্গে। যেন সে মনেপ্রাণে কথাটা বিশ্বাস করে। সাব্বির বললো—যে ছবিটি দিয়ে আমি প্রথম নাম করি তার কথা শুনতে চান ?

বলুন।

ছবিটির নাম সরলতা। ইনোসেন্স।

সাব্বির সহজভাবেই নিশাতের পাশে বসলো। যেন দীর্ঘদিনের পরিচিত কেউ পাশাপাশি বসেছে।

আমি তখন থাকি নর্থ ডাকোটায়। একবার রুজভেল্ট ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে গিয়েছি। একা একা গভীর বনে ঢুকে পড়লাম। সেখানে দেখলাম ছোট্ট একটা জলা জায়গা। চারদিকে বড় বড় সব উইলি গাছ। উইলি গাছের ছায়া পড়েছে পানিতে। অপূর্ব পরিবেশ। এবং সেই অপূর্ব পরিবেশে অল্প বয়েসী একটি মেয়ে লাগুবক্ষ হাতে নিয়ে বসে আছে। ওর বন্ধুটি বোধ হয় কাছেই কোথাও গেছে। আমি মেয়েটিকে বললাম—তোমার কয়েকটি ছবি তুলতে চাই। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আমি বললাম—তুমি কি ঘুমিয়ে পড়বার মতো একটা ভঙ্গি করতে পার? সে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। অসংখ্য ছবি তুললাম, কিন্তু মনে হলো কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ছবিটি অসম্পূর্ণ। ঠিক তখনই একটা বুনো প্রজাপতি এসে বসলো লাগুবক্ষে. তৈরি হয়ে গেলো ছবি। বিখ্যাত ছবি।

বুনো প্রজাপতি আবার কি? সব প্রজাপতিই তো বুনো। পোশা প্রজাপতি আবার আছে নাকি?

ঐ প্রজাপতিটির পাখায় কোন রঙ ছিলো না। কালো কালো দাগ। কাজেই বুনো প্রজাপতি বলছি। আপনি কি ঐ ছবিটি দেখতে চান?

আছে আপনার কাছে?

হ্যাঁ। বসুন আপনি, আমি নিয়ে আসছি।

সাব্বির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো।

সাব্বিরকে নিশাত কি আগে ভালো করে লক্ষ্য করেনি নাকি? বেশ লাগছে একে। মনে হচ্ছে এর মধ্যে ভান নেই। শুধু কথাবার্তা নয়, চোখের দৃষ্টিও বেশ স্বচ্ছ। মেয়েদের মত বড় বড় চোখ। না, কথাটা ঠিক হলো না। সব মেয়েদের চোখ বড় বড় নয়। বরং বলা উচিত মেয়েলী চোখ। পুরুষ মানুষকে এত বড় বড় চোখে মানায় না। না, এটাও ঠিক হলো না। সাব্বির সাহেবকে তো ভালই মানিয়েছে। নিশাত বেশ আগ্রহ নিয়ে ছবির বইটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। যেন এই আগ্রহ থাকাটা ঠিক নয়। এটা অন্যায়।

এত চমৎকার একটা ফটোগ্রাফির বই নিয়ে সাব্বির ফিরবে নিশাত আশা

করেনি। সে দু'বার বললো—এ বইয়ের সব ছবি আপনার তোলা ?

হ্যাঁ। ব্যাক কভারে ফটোগ্রাফারের ছবি আছে। দেখুন না।

আপনি তো বিখ্যাত ব্যক্তি।

হ্যাঁ। আমি মোটামুটি বিখ্যাত। ঐ দেশে অনেকেই আমাকে চেনে।

নিশাত পাতা উল্টাতে লাগলো। অপূর্ব সব ছবি। মন খারাপ করিয়ে দেবার মত ছবি।

তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় ঐ ছবিটি আছে। দেখুন। ঐ ছবিটি দিয়ে আমি ফটোগ্রাফির জগতে প্রথম এণ্ট্রি পাই।

নিশাত তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা খুলে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না।

ছবিটা ভাল লেগেছে ?

হ্যাঁ। কিন্তু মেয়েটির গায়ে কোন কাপড় ছিলো না—এই কথা আপনি আগে বলেননি। ও কি এইভাবে বনে বসে ছিলো ?

হ্যাঁ।

এবং আপনি ছবি তুলতে চাইতেই রাজি হয়ে গেলো ? কোন আপত্তি করলো না ?

না, কোন আপত্তি করেনি।

ঐ মেয়েটিব কি নাম ?

নাম জানি না। ছবির জন্যে মেয়েটির নামের কোন প্রয়োজন নেই।

আমার মেয়েটির নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সাব্বির হেসে উঠলো। রোদ উঠে গেছে। কুয়াশা মিলিয়ে যাচ্ছে। কেমন চমৎকার লাগছে চারদিক। নিশাত নরম গলায় বললো—এই বইটি আমার কাছে থাকুক ?

থাকুক।

নিশাত উঠে দাঁড়ালো। নিচুস্বরে বললো—যাই। সাব্বির বললো—আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলুন।

দয়া করে রাগ করবেন না বা মন খারাপ করবেন না।

এমন কি কথা যে আমি রাগ করব ?

সাব্বির অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বললো—আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। শুধু ভাল লেগেছে বললে কম বলা হয়। আমার আরো কিছু বলা উচিত। কিন্তু আমি গুছিয়ে কিছু বলতে পারি না। আপনি যদি অনুমতি দেন

তাহলে আমার ভাল লাগার ব্যাপারটা আপনার মা'কে বলতে পারি।

নিশাত ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো, কিন্তু কিছু বললো না। ঘাটের ধাপ ভেঙে উপরে উঠে এলো।

আপা, তুমি এখানে—আর আমি সারা বাড়ি খুঁজছি।

কেন?

দিলু হাত নেড়ে নেড়ে বললো—আমরা সবাই মিলে শিকারে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছিস?

শিকারে। বালিহাঁস মারবো আমরা। এসো, তাড়াতাড়ি নাশতা খেয়ে নাও। রোদ বেশি কড়া হলে হাঁস পাব না।

বাবু কোথায় রে?

জানি না কোথায়। তোমার জ্বর নেই তো?

নাহ্।

তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন আপা?

সুন্দর—সেই জন্যে সুন্দর লাগছে।

নিশাত হাসলো। আজকের দিনটি চমৎকারভাবে শুরু হয়েছে।

কুয়াশা নেই। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। আকাশ, চৈত্রের আকাশের মত ঘন নীল। আহ্ চমৎকার একটি দিন!

শিকারে যাবার প্রোগ্রাম হঠাৎ করেই হয়েছে। নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেব সকালবেলা একটি দোনলা বন্দুক আর একগাদা ছর্‌রা গুলি নিয়ে উপস্থিত—

—স্যার, শিকারে যাবেন নাকি? বড়গাঙের চরে বালিহাঁস পড়েছে। কায়দামত একটা গুলি করতে পারলে বিশ-পঁচিশটা পাখি পড়বে।

বলেন কি?

স্যার, একটা স্পীডবোটের ব্যবস্থা করেছি।

ওসমান সাহেব বহুদিন পর উৎসাহিত বোধ করেন। শিকার করা অনেকদিন হয় না। শেষ শিকারে গিয়েছিলেন প্রায় পাঁচ বছর আগে।

ওসি সাহেব, তাহলে তো তাড়াতাড়ি রওনা হতে হয়।

জি স্যার।

চা-টা খেয়েই রওনা দেব, কি বলেন ওসি সাহেব?

ঠিক আছে স্যার।

ওসমান সাহেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন পর রক্তে যৌবনের উত্তেজনা অনুভব করেন। থানার ওসি'র মত একজন অধস্তন অফিসারকেও হঠাৎ করে বন্ধুস্থানীয় মনে হয়।

ওসি সাহেব।

জি স্যার।

দিনটাও আজ শিকারের জন্যে ভালো। কুয়াশা নেই, কিছু নেই।

না স্যার, কুয়াশা থাকলেই ভালো। পরিষ্কার দিন শিকারের জন্যে না। একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার স্যার।

প্রথমে ঠিক হয়েছিলো সবাই যাবে। পাখি শিকার হোক না হোক নৌকা ভ্রমণ হবে। কিন্তু সাব্বির যেতে রাজি হলো না। তার নাকি শিকারে তেমন উৎসাহ নেই। রেহানাও থেকে গেলেন। কারণ বাবুর গা গরম হয়েছে। সকালে একবার বমি করেছে। রেহানা ধরেই নিয়েছিলেন নিশাত বাবুকে রেখে যাবে না। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, নিশাত দিলুর মতই উৎসাহ নিয়ে সাজ করছে। অনেকদিন পর তার চোখ ঝলমল করছে।

স্পীডবোটটি আহামরি কিছু নয়। দেশী নৌকায় বারো হর্স পাওয়ারের একটা মেশিন বসানো, বসবার জায়গা নেই। চারদিক ভেজা। এটা বোধ হয় মাছ আনা-নেয়া করে। মাছের বোটকা গন্ধ। তবু দিলুর ভীষণ ভালো লাগছে। সে বসেছে জামিলের পাশে। বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে ক্রমাগত গল্প করছে। ওসমান সাহেব হাসি মুখে বললেন —মেয়েটা তো বড্ড বকবক করতে পারে। সবাই হেসে উঠলো। দিলু মোটেও অপ্রস্তুত হলো না. প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার এক বান্ধবীর গল্প করতে শুরু করলো। তার নাম লীনা কিন্তু সবাই তাকে ডাকে বক লীনা। কারণ সে বকের মতো মাথা নিচু করে হাঁটে। দিলু মাথা নিচু করে ব্যাপারটা দেখালো। ওসমান সাহেব বললেন —আয় মা, তুই আমার পাশে বসে গল্প কর। কিন্তু দিলু নড়লো না। সে জামিলের পাশেই বসে রইলো।

বড় গাঙের চর পর্যন্ত স্পীডবোট নিয়ে যাবার উপায় নেই। পানি কম। তাছাড়া ভটভট শব্দ হচ্ছে। শব্দে পাখি উড়ে যাবে। ওসি সাহেব বললেন— এখান থেকে যেতে হবে পায়ে হেঁটে। অসুবিধা হবে না তো স্যার ?

না, অসুবিধা কি ?

খানিকটা পানি ভেঙে যেতে হবে।

বেশি পানি ?

জি না স্যার। খুব বেশি হলে হাঁটুপানি। জুতো খুলে ফেলেন।

ওসমান সাহেব জুতা খুলে ফেললেন। দিলুও জুতা খুললো। ওসি সাহেব অবাক হয়ে বললেন—তুমিও যাবে নাকি খুকি ?

জি।

কষ্ট হবে। একটু পরেই রোদ উঠবে কড়া।

উঠুক।

ওসমান সাহেব বললেন—শখ করে এসেছে, চলুক। নিশাত, তুই যাবি নাকি ?

আমি হাঁটু পানি ভেঙে যাব ? পাগল হয়েছ বাবা ?

দিলু বললো—চলো না আপা। আমি তো যাচ্ছি। তোমার ভালই লাগবে।

এখানে বসে থাকতেই আমার ভাল লাগছে।

ওসমান সাহেব বললেন—একা একা বসে থাকবি, খারাপ লাগবে না ?

একা একা থাকব না। জামিল ভাই থাকবেন। কি জামিল ভাই, আমাকে একা ফেলে নিশ্চয়ই আপনি পাখি শিকারে যাবেন না ? নাকি আপনিও যেতে চান ?

না, আমি আছি।

রোদের তাপ বাড়ছে। মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছে মাঠ থেকে। এ অঞ্চল বেশ নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একটা মাছ ধরার নৌকা শুধু যাচ্ছে। নৌকায় বসে থাকা লোকজন তাদের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু খুব-একটা অবাক হচ্ছে না। স্পীডবোট নিয়ে শহরের লোকজন হয়তো প্রায়ই এদিকে শিকারে আসে।

নিশাত হাত বাড়িয়ে হাসি মুখে বললো—জামিল ভাই, এই কি সেই বিখ্যাত কাশফুল ?

হুঁ। তবে এখনো ফুল ফুটেনি। সময় হয়নি।

কই, তেমন কিছু তো লাগছে না।

বাতাসে যখন ঢেউয়ের মতো উঠানামা করে তখন ভালো লাগে। তুমি কি বোটেই বসে থাকবে, না নামবে ?

চলুন নামি। হিল পরে হাঁটা যাবে তো ?

হিল পরে এসেছো ?

হ্যাঁ, দেখছেন না কত লম্বা লাগছে আমাকে।

জামিল ঠিক বুঝতে পারছে না। নিশাতকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে। সাজগোজের মধ্যেও যথেষ্ট যত্নের ছাপ। ঠোঁটে কড়া করে লিপস্টিক দিয়েছে।

নিশাত বললো - গ্রাম-নদী এইসব কিন্তু আমার কাছে তেমন এক্সাইটিং মনে হয় না।

একেকজনের দেখার ক্ষমতা একেক রকম। সাব্বির সাহেব যা দেখে মুগ্ধ হবেন তুমি হয়তো তা দেখে মুগ্ধ হবে না। তাছাড়া ।

সাব্বির ভাইকে আপনার কেমন লাগে ?

চমৎকার। ভদ্রলোক অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে দারুণ ইমপ্রেস করেছেন। এই একটি লোক দেখলাম যার মধ্যে ভান নেই।

নিশাত ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললো এত তাড়াতাড়ি একটা ডিসিশনে আসা ঠিক না। আপনি মানুষ সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে চলে আসেন। নিশাত খুব সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগলো।

জামিল বললো —জুতো পরে তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। জুতো খুলে ফেলো।

খালি পায়ে হাঁটব ?

হ্যাঁ। খারাপ লাগবে না। শুকনো পথঘাট।

নিশাত হিল খুলে ফেললো —খালি পায়ে হাঁটতে তার ভালই লাগলো। খুশি খুশি গলায় বললো—ফ্লাস্কটা নিয়ে এলে ভাল হতো। কোথাও বসে চা খাওয়া যেতো। শাড়ি পরা আট-ন বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে কোত্থেকে হঠাৎ এসে উদয় হয়েছে। চোখ বড় বড় করে দেখছে। নিশাত বললো—এ্যাই, তোমার নাম কি ? মেয়েটি জবাব দিলো না।

বাড়ি কোথায় তোমার ?

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে যেদিকে দেখালো সেদিকে কোন ঘরবাড়ি নেই।

জামিল ভাই, মেয়েটি কি হারিয়ে গেছে নাকি ?

না, ওরা হারাবে না। গ্রামের মেয়ে, সমস্ত অঞ্চল এদের খুব ভাল করে চেনা। নিশাত, কোনদিকে যেতে চাও ?

চলুন, ঐ গাছটার নিচে বসি। কি গাছ ওটা ? বিরাট বড় তো।

শিমুল গাছ।

শিমুল গাছে এত বড় বড় কাঁটা থাকে নাকি ?

থাকে।

জামিল সিগারেট ধরালো। নিশাত হ্যান্ডব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে

চোখে দিলো। হাল্কা স্বরে বললো—একটা হাসির গল্প বলুন তো। দিলুকে রোজ কি-সব গল্প বলেন। দেখি এবার আমি একটা শুনি।

দিলুকে হাসির গল্প বলি না। দিলুকে বলি ভূতের গল্প। ভূতের গল্প শুনতে চাইলে বলতে পারি।

নিশাত খিলখিল করে হেসে ফেললো। তার হাসি দেখে ছোট্ট মেয়েটাও হাসতে শুরু করলো। জামিল নিজেও হাসলো।

না জামিল ভাই, বলুন একটা হাসির গল্প। দেখি আপনি আমাকে হাসাতে পারেন কিনা।

হাসাতে পারলে কি দেবে?

আপনি আগে বলুন, তারপর দেখা যাবে।

টেলিফোনের খুঁটি বসানো হচ্ছে। সারাদিন ধরে কাজ চলছে। সন্ধ্যাবেলা ইন্‌জিনিয়ার সাহেব কাজ দেখতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন -তোমরা ক'টা খুঁটি পুঁতলে? ওরা বললো—স্যার বারোটা। ইন্‌জিনিয়ার সাহেব বললেন—মন্দ না, বারোটা খারাপ না। তারপর গেলেন অন্য একটা দলের কাছে—তোমরা ক'টা পুঁতলে? ওরা বললো, স্যার একটা। ইন্‌জিনিয়ার রেগে আগুন -এত কম! ঐ দল তো বারটা পুঁতলো। দলের সর্দার বললো আমাদের কাজ আর ওদের কাজ? ওদের খুঁটির সবটাই মাটির উপর আর আমাদেরটা দেখুন। মাটির উপর আছে চার আঙুল। সবটাই ঢুকিয়ে দিয়েছি।

নিশাত গল্প শুনে হাসলো না গম্ভীর হয়ে বললো—এই গল্পটা জামিল ভাই আপনি আমাকে ইচ্ছে করে বললেন।

ইচ্ছে করে বলব কেন?

গল্পটা বাবুর আব্বার।

হ্যাঁ, আমি কবিরের কাছ থেকে শুনেছি। এটা একটা চমৎকার গল্প, তাই তোমাকে বললাম। অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। সব কিছুতেই তুমি এত উদ্দেশ্য খোঁজ কেন?

নিশাত উঠে দাঁড়ালো—চলুন, বোটে ফিরে যাই। ফেরার পথে কেউ কোন কথা বললো না। ছোট মেয়েটি আবার পেছনে পেছনে আসছে। খুব কৌতূহল মেয়েটির। ছোট্ট শাড়িটা পরেছেও খুব গুছিয়ে। শাড়ির রঙ গাঢ় সবুজ। তার মধ্যে লাল পাড়। জামিল বললো—নিশাত, তুমি কি লক্ষ্য করেছো বেশির ভাগ গ্রামের মেয়ের শাড়ির রঙ সবুজ।

না, আমি লক্ষ্য করিনি। গ্রামই দেখিনি। গ্রামের মেয়ে দেখবো কোথায়?

গ্রামের মেয়েরা যে সবুজ শাড়ি পরে এটাও কিন্তু প্রথম নোটিস করে কবির। তার ধারণা, এরা সবুজ দেখতে দেখতে সবুজ রঙের প্রতি একটা উইকনেস জন্মিয়ে ফেলে। আমার ধারণা কিন্তু তা নয়।

আপনার কি ধারণা ?

আমার ধারণা, সবুজ রঙের কাপড় ময়লা হয় কম, সে জন্যই এরা সবুজ কাপড় পরে।

আপনার ধারণাটাই প্রাকটিক্যাল। কিন্তু হঠাৎ আপনি রঙের প্রসঙ্গ আনলেন কেন ?

জামিল কিছু বললো না। স্পীডবোটে উঠে বসলো। স্পীডবোটের ড্রাইভার রোদের মধ্যে পা মেলে দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। নিশাত ফ্লাক্স খুললো--চা দেব জামিল ভাই ?

দাও।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু ? কেক আছে। নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কে জানে।

নিশাত এক পিস কেক বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিলো। সে নিলো না। পিছিয়ে গেলো অনেকখানি। জামিল বললো -এ ভিখিরী নয়, কারো কাছ থেকে কিছু নেয়া এর অভ্যেস নেই।

আপনি চট করে সবকিছু বুঝে যান কিভাবে ?

জামিল হাসলো। ঠিক তখনি পর পর দুটি গুলির শব্দ হলো। ওরা পাখি পেয়েছে কিনা কে জানে। স্পীডবোটের ড্রাইভার চোখ কচলে উঠে বসলো। শিকারিরা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। নিশাত অবাক হয়ে দেখলো তার মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, এত পাখি ! তারা ডাকছে কর্কশ গলায়। শুনতে ভালো লাগে না।

ওরা কোথায় যাবে ?

নিরাপদ কোন জায়গায় যাবে। তারপর সেখানেও শিকারিরা যাবে। সেখান থেকেও এদের উড়ে যেতে হবে।

নিশাত তাকিয়ে রইলো। জামিল বললো—সমস্ত জীব-জন্তু ও পশু-পাখির জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে যায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে গিয়ে। মানুষের জন্যেও এটা সত্যি। আমরাও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজি।

মাস্টারি করতে করতে বক্তৃতা দেয়া আপনার অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই না ?

হ্যাঁ।

এবং আপনি মনে করেন, জগৎ-সংসারের সমস্ত রহস্য আপনি বুঝে

ফেলেছেন ?

না, তা বুঝিনি। তবে বুঝতে চেষ্টা করি। তোমার মতো চোখ বন্ধ করে থাকি না।

জামিল একটা সিগারেট ধরালো। নিজেই হাত বাড়িয়ে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললো। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো সে বড়সড় একটা বক্তৃতা দেবে কিন্তু জামিল তেমন কিছুই করলো না। সিগারেট টানতে টানতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। স্পীডবোটের ড্রাইভার নেমে গিয়ে ছোট মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। এতক্ষণ যে মেয়ে একটি কথাও বলেনি, তার মুখে এখন খই ফুটছে।

তোর নাম কি ?

ফুলি।

তোর বাপের নাম কি ?

কসির শেখ।

কোন্ গ্রাম ?

আতরা, মিয়াবাড়ি।

ভাই-ভইন কয়জন ?

ছয়জন।

নিশাত খুব মন দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছে। এই মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করে ছিলো কেন ?

জামিল ভাই।

বল।

এই মেয়েটি এতক্ষণ কোন কথাবার্তা বলেনি কিন্তু দেখুন ঐ লোকটির সঙ্গে কেমন জমিয়ে গল্প করছে।

জামিল কোন উত্তর দিলো না।

জামিল ভাই, আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন ?

না, রাগ করিনি। রাগ করতে হলে একটা অধিকার থাকতে হয়। তোমার ওপর আমার সে রকম কোন অধিকার নেই।

দিলুর উপর আছে ?

হ্যাঁ, আছে। ওর সঙ্গে আমি কিন্তু প্রায়ই রাগ করি।

আপনারা কি নিয়ে এত কথা বলেন ?

যা মনে আসে তাই বলি। ওর সঙ্গে তো আর হিসেব করে কথা বলতে হয় না।

নিশাত গম্ভীর ভঙ্গিতে বললো—আমার কিন্তু মনে হয় ওর সঙ্গেই আপনার সবচে সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।

কেন ?

এই বয়সে মন অন্যরকম থাকে। আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি ?

পারছি।

আপনি কি এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান ?

চাই। নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করা ঠিক নয়।

তার মানে ?

দিলুর মত যখন তোমার বয়স ছিলো তখন তুমি আমার প্রতি অন্যরকম ধারণা পোষণ করতে।

এসব আপনি কি বলছেন ?

স্কুল ছুটির পর ক'দিন এসেছ আমাদের বাড়িতে মনে আছে ?

কেন আপনি এখন এইসব পুরানো কথা তুলছেন ?

জামিল চুপ করে গেলো।

দেখা গেলো শিকারিরা ফিরে আসছে। ওসি সাহেবের হাতে কয়েকটা হাঁস। ওদের জবাই করা গলা দিয়ে তখনো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। দিলু ওসমান সাহেবের শরীরে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে। জামিল বললো—কি হয়েছে দিলু ?

পায়ে কাঁটা ফুটেছে।

শিকার কেমন লাগলো ?

ভালো না।

ওসমান সাহেব উল্লাস বোধ করছিলেন। তার চোখে-মুখে ক্লান্তির কোন চিহ্নই নেই। ওসি সাহেব বললেন—স্যার, কাল আবার যাবো নাকি ?

চলেন যাই। নতুন কোন স্পটে চলেন।

স্যার, যেতে হবে কিন্তু আরো সকালে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি শেষ রাতে উঠতে পারেন।

উঠবো। শেষ রাতেই উঠবো। নো প্রবলেম।

ওসমান সাহেব নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবের ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন বোধ করেন।

ওসি সাহেব, রাতে খান আমাদের সঙ্গে।

জি-না স্যার। জি-না।

দিলু বসে নিশাতের পাশে। গাছের গুঁড়িতে বসে থাকা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে—এই, নাম কি তোমার?

ফুলি।

বাহ্ কি সুন্দর নাম! ফুল থেকে ফুলি।

ছোট্ট মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেললো। দিলু বললো—সাব্বির ভাই থাকলে এই মেয়েটির ছবি তুলতে বলতাম। কি সুন্দর মেয়ে, দেখেছ আপা? নিশাত জবাব দিলো না। দিলু বললো—গ্রামের মেয়েরা কি সুন্দর হয়। বড় মায়া লাগে।

ওসমান সাহেব হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছেন। তাঁর ভাগ্য ভালো বরফের জোগাড় হয়েছে। ওসি সাহেব জীপ পাঠিয়ে বরফ আনিয়েছেন। শুধু বরফ নয় তিনি এক কেস বিয়ার এনেছেন। ওসমান সাহেব বিয়ার খান না। তবু খুশি হলেন। প্রথম দিনে এই ওসির উপর এতটা বিরক্ত হওয়া ঠিক হয়নি।

ওসমান সাহেব সত্যিকার অর্থেই ছুটির আনন্দ ভোগ করলেন। আলিম এসে পেঁয়াজ, মরিচ ও ভিনিগার মাখানো এক প্লেট চিনাবাদাম রেখে গেছে। হুইস্কির সঙ্গে এই প্রিপারেশনটি অপূর্ব।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে তাঁর মনে হলো বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। গভীর আনন্দে তাঁর শরীর কাঁপছে। হুইস্কি নিয়ে তো প্রায়ই বসেন, এ রকম কখনো হয় না। আজ হচ্ছে কেন? ইচ্ছে হচ্ছে হেসে হেসে সবার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে। চাঁদ উঠেছে কিনা কে জানে। যদি চাঁদ উঠে তাহলে ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে একটু হেঁটে আসলে হয়তো ভালো লাগবে।

বারান্দার কাছে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। অপরিচিত কেউ। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু তিনি পরিষ্কার বুঝলেন লোকটির গায়ে ইউনিফর্ম।

খট শব্দে স্যালুট হলো—স্যার আমি। ওসি সাহেব পাঠিয়েছেন।

কি ব্যাপার?

কিছু না স্যার। পাহারার জন্যে। ফিক্সড সেন্ট্রি।

পাহারা লাগবে না, তুমি চলে যাও।

সে ইতস্তত করতে লাগলো। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন—যাও যাও, পাহারার কোন দরকার নেই। আমি কি মিনিস্টার?

এই বলেই তিনি প্রচুর হাসতে লাগলেন। খালি পেটে দু'পেগ পড়ার জন্যেই বোধহয় তাঁর কিঞ্চিৎ নেশা হয়েছে।

আলিমের দাঁতের ব্যথা কমেনি। আজ সারাদিনে আরো বেড়েছে। ডান দিকের গাল ফুলে গেছে অনেকখানি।

আলিম, গোটা চারেক প্যারাসিটামল খাও।

স্যার খাইছি।

লবণ-পানি দিয়ে কুলকুচি কর।

করেছি স্যার।

গরম সেঁক দাও। সেঁকটা খুব উপকারী।

স্যার আর কিছু লাগবো?

না, লাগবে না। খানা তৈরি হতে দেরি হবে নাকি?

জি স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আজ রাতে রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে সাব্বির। ওয়াইল্ড ডাক রোস্টের সে নাকি একটি চমৎকার প্রিপারেশন জানে। দুপুর বেলাতেই সে বালিহাঁসগুলির চামড়া তুলে টক দৈ-এ ডুবিয়ে রেখেছে। টক দৈ-এ আট ঘণ্টা ডুবানো থাকতে হবে, এক মিনিটও এদিক-ওদিক হতে পারবে না।

আট ঘণ্টা পার হয়েছে রাত আটটায়। এখন হাঁসগুলোকে স্টীম করা হচ্ছে। কেটলিতে পানি ফুটানো হচ্ছে। কেটলির নল দিয়ে যে বাষ্প বেরিয়ে আসছে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে স্টীম করবার জন্যে। কায়দাটা ভালোই। দিলু সমস্ত ব্যাপারটা দেখছে মুগ্ধ হয়ে। সে রান্নাঘরে একটা চেয়ার নিয়ে চেয়ারের উপর পা তুলে আরাম করে বসে আছে। এবং সারাক্ষণই কথা বলছে।

সাব্বির ভাই, স্টীম দিচ্ছেন কেন?

স্টীম দেয়ার জন্যে মাংস নরম হবে।

টক দৈ-এ ডুবিয়ে রাখলেন কেন?

রেসিপিতে বলা হয়েছে তাই। টক দৈ না পেলে ভিনিগারেও ডুবিয়ে রাখা যেতো। টক দৈ ভিনিগারের চেয়ে ভালো।

এরপর কি করবেন?

পেটের ভেতর রসুন ভরে আগুনে ঝলসাবো। ব্যাস।

এই রান্না কার কাছ থেকে শিখলেন?

আমার এক মেক্সিকান বান্ধবী ছিলো—ও রাঁধতো। ও অনেক রকম রান্না

জানতো।

দিলু একটু লজ্জা পেলো। কেউ এভাবে বান্ধবীর কথা বলে নাকি? কিন্তু সাব্বির ভাই এমন সহজভাবে বলছেন যেন বান্ধবী থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

উনার নাম কি সাব্বির ভাই?

ওর নাম মারিয়া।

মারিয়া? কি বিশ্রী নাম।

বিশ্রী কোথায়? মেরী থেকে মারিয়া।

উনি দেখতে কেমন?

আমার কাছে তো ভালোই লাগতো। খুব লম্বা। বড় বড় কালো চোখ। খুব শব্দ করে হাসতো।

উনার ছবি আছে?

আছে। দেখতে চাও?

হুঁ।

আচ্ছা দেখাব।

সাব্বির ভাই, আমার কয়েকটা সুন্দর ছবি তুলে দেবেন তো?

দেব।

কবে দেবেন?

যখন চাও। কাল ভোরেই দিতে পারি। এক কাজ করো—তোমার লাল শাড়ি আছে?

না, লাল স্কার্ট আছে।

ঠিক আছে, ঐ লাল স্কার্ট পরে পুকুরে সাঁতার দেবে। আমি ছবি তুলব। সবুজ পানির ব্যাকগ্রাউণ্ডে লাল স্কার্ট চমৎকার আসবে। তবে আমার ফিল্ম হাই স্পীড এ এস. এ. ফাইভ হানড্রেড। আরেকটু কম হলে ভালো হতো।

আমি তো সাঁতার জানি নে।

ইস, সাঁতার দেয়া ছবি ভালো আসতো। জলকন্যার এফেক্ট পাওয়া যেতো।

রাত-দিন আপনি শুধু ছবির কথা ভাবেন। তাই না?

হুঁ, ভাবি।

দিলু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। দেখলো সাব্বির কিভাবে হাঁসের গায়ে স্টীম লাগাচ্ছে। দেখে মনে হয় লোকটা এ কাজ দীর্ঘদিন ধরে করছে। দিলু বললো—মারিয়া বুঝি খুব ভালো মহিলা ছিলেন?

হ্যাঁ। বাঙালী মেয়েদের মতো।

বাঙালী মেয়েরা বুঝি ভালো ?

হ্যাঁ। বাঙালী মেয়েরা খুব সেণ্টিমেণ্টাল। সেণ্টিমেণ্টাল না হলে মেয়েদের মানায় না।

আচ্ছা সাব্বির ভাই, আমি সেণ্টিমেণ্টাল ?

হ্যাঁ।

কিভাবে বুঝলেন ?

জামিল সাহেবের সঙ্গে বসে তুমি গল্প করছিলে, আমি শুনছিলাম।

কথা শুনেই বুঝে গেলেন ?

দিলু, কথা শুনে অনেক কিছুই বোঝা যায়। আমি বুঝতে পারি। দিলু ভয়ে ভয়ে বললো—আর কি বুঝেছেন ?

বুঝলাম যে, তুমি জামিল সাহেবের প্রেমে পড়েছো। এডোলেসেন্স লাভ। চমৎকার জিনিস।

দিলুর কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো। মিনিট পাঁচেক কোন কথাবার্তা না বলে সে চুপচাপ বসে রইলো। সাব্বির হাসিমুখে বললো—কি দিলু, ঠিক বলিনি ?

দিলু কোন জবাব দিলো না।

রেহানা রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন চোখমুখ লাল করে দিলু চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে আছে। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন—তুই এখানে কি করছিস ?

দেখছি।

বাবুকে একটু সামলাবার চেষ্টা করলেও তো পারিস। আমি কতক্ষণ দেখব ?

দিলু নিঃশব্দে উঠে চলে গেলো। রেহানা বললেন—সাব্বির, তোমার রান্নার কতদূর ?

হয়ে এসেছে। এখন শুধু আগুনে ঝলসাবো।

খাওয়া যাবে তো ?

আপনাদের ভাল লাগবে। ভাল না লাগলে এতটা কষ্ট শুধু শুধু করতাম না।

রেহানা বললেন—আমাকে কিছু করতে হবে ?

না, আপনি বিশ্রাম করুন।

রেহানা চলে গেলেন। পুরুষ মানুষ রান্নাঘরে হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এটা তাঁর দেখতে ভালো লাগে না। অসহ্য লাগে। রেহানা বারান্দায় থমকে দাঁড়ালেন। নিচু গলায় বললেন—আজও বসেছ ?

হ্যাঁ, বসলাম।

বোতল ক'টা এনেছ ?

বেশি না, দুটো মাত্র। রেহানা, একটু বস আমার পাশে।

না।

কেন এরকম করছ ? বেশিদিন তো আর বাঁচবো না। শেষ ক'টা দিন আরাম করতে দাও।

বেশিদিন বাঁচবে না—এই তথ্যটা আবার কবে জোগাড় করলে ?

এক পামিস্ট আমার হাত দেখে বলেছে আমি বাঁচব মাত্র ষাট বছর। ভাল পামিস্ট। যা বলে তাই ঠিক হয়। একটু বস রেহানা।

রেহানা বসলেন। ওসমান সাহেব হৃষ্ট গলায় বললেন—একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি, দেখি বলতে পার কিনা।

ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে হবে না। বসে থাক চুপচাপ।

দারুণ ধাঁধা, দিলুর কাছ থেকে শিখেছি এবং নিজে নিজেই উত্তর বের করেছি। আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখছি, তুমি পারবে না। কি, বলব ?

ওসমান সাহেব দিলুর পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়ার ধাঁধাটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন।

কাঁচঘরের পাশের ফাঁকা জায়গায় হাঁস ঝলসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাতাসের জন্যে আগুন তেমন জ্বলছে না। বাঁশের চাটাই দিয়ে হাওয়া আটকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। জামিল তদারক করছে মোড়ায় বসে। দিলু বারান্দা থেকে তাদের দেখলো। একবার ভাবলো কাছে যাবে। কিন্তু গেলো না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো। জামিল ডাকলো—এই দিলু, এদিকে আয়। দিলু এগিয়ে গেলো।

আমাদের ফটোগ্রাফার সাহেব কি হাঁসকে বাতাস দিয়ে শেষ করেছেন ? দিলু জবাব দিলো না।

কি ব্যাপার এত গম্ভীর কেন ?

মাথা ধরেছে।

আগুনের পাশে বস। মাথা ধরা সেরে যাবে। চেয়ারটা টেনে আন। দিলু বসলো।

গল্প শুনাব নাকি বল ? মারাত্মক একটা ভূতের গল্প জানি। বলব ?

না।

না কেন ? তোর কি হয়েছে ?

দিলু মৃদুস্বরে বললো—জামিল ভাই, আপনি আমাকে তুই করে বলবেন না।

কেন? বলব না কেন?

আমার খারাপ লাগে।

আপনি করে বলব। তাই চাস?

দিলু জবাব দিলো না।

তোর কি হয়েছে?

তুই করে বললে আমি জবাব দেবো না।

আপনার কি হয়েছে?

দিলু গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালো। জামিল তাকে হাত ধরে টেনে বসালো।

দিলু, তোমার কি হয়েছে?

কিছু হয়নি?

না কিছু-একটা হয়েছে। আমাকে বল।

আমার খুব মন খারাপ লাগছে। মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দূর বোকা মেয়ে।

জামিল শব্দ করে হাসলো। একটা হাত রাখলো দিলুর পিঠে। নিশাত দূরে থেকে দৃশ্যটি দেখলো। একবার ভাবলো—দিলুকে সে ডাকবে। কিন্তু ডাকলো না। আগুনের পাশে বসে থাকা মানুষ দুটিকে সুন্দর লাগছে। বাবু জেগে উঠে কাঁদছে। রেহানা এসে বললেন—বাবুকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দে না নিশাত।

আমি পারব না।

দাঁড়িয়ে তো আছিস।

দাঁড়িয়ে আছি না মা। দেখছি।

কি দেখছিস?

দিলুকে দেখছি। দিলু কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে দেখেছো মা?

রেহানা তাকালেন। তিনি দিলুর বড় হয়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখলেন না। দিলু চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে। এটা একটা অভদ্রতা, দিলুকে বলতে হবে। তিনি বাবুর কাছে গেলেন। নিশাত চড়া গলায় বললো—দিলু তুই একটু আয়।

দিলু শান্ত স্বরে বললো—না। জামিল বললো—যাও না, শুনে আস কি জন্যে ডাকছে।

না, আমি যাব না।

জামিল কৌতূহলী হয়ে তাকালো। তার মনে হলো দিলু কেমন যেন দলে যেতে শুরু করেছে। দিলু মৃদুস্বরে বললো—

জামিল ভাই।

কি।

চলুন, আমরা আজ সারারাত এরকম আগুনের পাশে বসে গল্প করি।

কি নিয়ে গল্প করবে?

আগে বলুন আপনি রাজি আছেন কিনা?

না। দারুণ ঘুম পাচ্ছে। তার উপর সারারাত এরকম ঠাণ্ডায় বসে থাকলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।

দিলু উঠে দাঁড়ালো। জামিল বললো—কোথায় যাও? দিলু তার জবাব দিলো না।

রোস্ট ডাক জিনিসটি যে খেতে এতটা ভাল হবে রেহানা কল্পনাও করতে পারেননি। তাঁর আফসোস হতে লাগলো তিনি পাশে বসে রান্নার পুরো ব্যাপারটা কেন দেখলেন না। সাব্বির বললো—আমি খুব গুছিয়ে লিখে রেখে যাব, আপনার যখন ইচ্ছা রান্না করতে পারবেন।

বালি হাঁস ছাড়া সাধারণ হাঁস দিয়ে রান্না হবে?

জানি না। হওয়া তো উচিত। আমি অবশ্যি কখনো ট্রাই করিনি।

জামিল বললো, আমার মনে হয় না সাধারণ হাঁস দিয়ে এটা হবে। সাধারণ হাঁসগুলোর গায়ে প্রচুর চর্বি থাকে। বালি হাঁসের গায়ে চর্বি থাকে না।

নিশাত হাসিমুখে বললো—আপনি বুঝি পৃথিবীর সব জিনিস জানেন?

না, আমি খুব কমই জানি, মাঝে মাঝে লজিক খাটিয়ে দু'একটা কথা বলতে গিয়ে সবাইকে বিরক্ত করি।

ওসমান সাহেব বললেন—দিলুকে দেখছি না যে। দিলু কোথায়?

ও খাবে না। ওর মাথা ধরেছে।

চেখে দেখুক। ডেকে নিয়ে আয় তো নিশাত।

অনেক বলেছি বাবা।

জামিল বললো—আমি নিয়ে আসছি।

দিলু কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলো। জামিলকে ঢুকতে দেখে উঠে বসলো। ঘর অন্ধকার। আলো চোখে লাগে বলে হ্যারিকেন ডিম করে রাখা

হয়েছে। জামিল বললো—দিলু আমাদের সঙ্গে এসে বস! জিনিসটা বেশ ভাল হয়েছে। তোমার ভাল লাগবে। দিলু জবাব দিলো না।

তুমি হয়তো লক্ষ্য করনি। আমি তুমি করে বলছি। এসো দিলু। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা অনেক রাত পর্যন্ত আগুনের পাশে বসে গল্প করব।

আমার মাথা ধরেছে জামিল ভাই।

এমন মজার গল্প বলব যে মাথা ধরা সেরে যাবে। এসো!

দিলু উঠে এলো। গল্প খুব জমে উঠলো খাবার টেবিলে। ওসমান সাহেব পর্যন্ত একটা হাসির গল্প বলে ফেললেন। নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্প। সবারই জানা তবু সবাই হাসলো। কিছু কিছু সময় আসে যখন সব কিছুই ভালো লাগে।

সাব্বির বললো নিউইয়র্কে এক হোটেলে তার অভিজ্ঞতার গল্প—তার বিছানার সঙ্গে একটি যন্ত্র ফিট করা। সেখানে লেখা—গা ম্যাসাজ করতে হলে এখানে দুটি কোয়ার্টার ফেলুন। বেচারা সরল মনে দুটি কোয়ার্টার ফেললো। তারপর বিছানায় শোয়ামাত্র বিছানা কাঁপতে শুরু করলো। সে কী কাঁপুনি! বসে থাকা যায় না, ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। মিনিট দশেক পর কাঁপুনি থামলো। কিন্তু যন্ত্রটির বোধহয় কিছু-একটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো. কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হলো কাঁপুনি। থামে, আবার শুরু হয়। আবার থামে, আবার শুরু হয়।

গল্প শুনে হাসতে হাসতে রেহানা বিষম খেলেন এবং মনে মনে স্বীকার করলেন ছেলেটি রসিক। প্রচুর রসজ্ঞান না থাকলে গল্পটি এত সুন্দরভাবে বলা সম্ভব নয়। ওসমান সাহেব বললেন—সবাই একটা না একটা গল্প বলেছে। নিশাত চুপ করে আছে কেন?

বাবা আমি শুনছি।

শুধু শুনলে হবে না। বলতেও হবে।

নিশাত মৃদুস্বরে বললো—একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করলাম আমি। জামিল ভাই হঠাৎ করে দিলুকে তুমি তুমি করে বলছেন।

জামিল শান্ত স্বরে বললো—দিলু বড় হচ্ছে, এখন আর ওকে তুই বলা ঠিক নয়।

বড় কোথায়, ওর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স।

দিলু শীতল কণ্ঠে বললো—নভেম্বরে আমার পনেরো হয়েছে আপা। তোমার

কিছু মনে থাকে না।

পনেরো হলেই যদি তুমি বলতে হয় তাহলে তো আমাদেরকেও তুমি বলতে হয়।

দিলু কিছু বললো না। ওসমান সাহেব বললেন—দিলু মা'র মনটা মনে হয় খারাপ। নিশাত বললো—ওর মন ভালোই আছে। লোকজন ওকে তুমি করে বলা শুরু করেছে। মন খারাপ হবে কেন?

আমার মন ভালোই আছে।

সাব্বির বললো—মন ভালো থাকলে আমাদের একটা হাসির গল্প শুনাতে হবে। দিলু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করলো—পরীক্ষায় গরু সম্পর্কে রচনা এসেছে। সবাই লিখছে। একটি ছেলে বললো—স্যার জহির নকল করছে। স্কুলের মাঠে একটা গরু বাঁধা আছে। জহির জানালা দিয়ে গরুটা দেখছে আর লিখছে। ওসমান সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মদ্যপানজনিত কারণে তিনি ঈষৎ তরল অবস্থায় আছেন। ছোট ছোট হাসির ব্যাপারগুলো তাঁর কাছে অসাধারণ মনে হলো।

আরেকটা বল তো মা দিলু।

ইতিহাসের স্যার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা বল তো, শেরশাহ কোথায় মারা গেছেন? ছাত্র বললো—ইতিহাস বইতে স্যার। পনেরো পাতায়।

রেহানার মনে হলো তার এই মেয়েটি একটু অন্যরকম হয়েছে। কারো সঙ্গেই ঠিক মেলে না। একটু যেন আলাদা। নিশাত বললো, দুটি গল্পই জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা, তাই না?

হ্যাঁ। তাতে কোন অসুবিধা আছে?

দিলু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে যেন সে সত্যি জবাবটি শুনতে চায়। সাব্বির বললো—এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হতো না। কেউ কি কষ্ট করে চা বানাবে?

নিশাত উঠে দাঁড়ালো—আমি বানাবো। দিলু, তুই আয় তো আমার সঙ্গে, একা একা ভয় লাগে।

কেটলিতে চায়ের পানি ফুটছে। নিশাত এবং দিলু বসে আছে চুপচাপ। দিলুর মুখ থমথম করছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদবে। নিশাত বললো—তুই চা খাবি নাকি দিলু?

না।

আয় আমরা বরং কফি খাই। ইন্‌স্‌টেন্ট কফির পটটা কোথায় দেখেছিস?

আপা, আমি কফি খাব না। তুমি কি বলবে বল।

আমি আবার কি বলব?

কিছু-একটা বলবার জন্যেই আমাকে রান্নাঘরে এনেছ। এখন বল কি বলবে।

দিলু, তুই কি রাগ করেছিস?

দিলু চুপ করে রইলো। নিশাত বললো, চল দুজনে দু'কাপ চা নিয়ে পুকুর ঘাটে বসি। যা, গরম চাদর একটা গায়ে জড়িয়ে আয়।

তুমি কি ওখানে নিয়ে আমাকে কিছু বলতে চাও?

আয় না গিয়ে বসি, তারপর বলা যাবে। যা চাদর-টাদর কিছু-একটা গায়ে দিয়ে আয়।

দিলু উঠে গেলো। লাল রঙের একটা শাল বের করে গায়ে দিলো। কাঁচ-ঘরের পাশে জামিল সিগারেট টানছে। সে উঁচু গলায় বললো—কোথায় যাচ্ছিস রে?

দিলু জবাব দিলো না। জামিল ভাই তুই বললে সে আর জবাব দেবে না। জামিল বললো—দিলু কোথায় যাচ্ছ?

পুকুর ঘাটে।

একা একা? একটু সাবধানে থাকবে।

কেন?

ভূত আছে।

আপনার মাথা আছে।

জামিল শব্দ করে হাসলো—তুমি চাইলে আমি সাহস দেবার জন্যে সঙ্গে থাকতে পারি।

সাহস দিতে হবে না।

পুকুর ঘাটটি বড় বেশি নির্জন। মাঝে মাঝে হাওয়া আসে, গাছের পাতায় সরসর শব্দ হয়। ক্রমাগত ঝিঁ ঝিঁ ডাকে আবার কোন-এক বিচিত্র কারণে হঠাৎ ঝিঁঝির ডাক বন্ধ হয়ে চারদিকে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। নিশাত বললো—একটু যেন ভয় ভয় লাগেরে।

ফিরে যাবে?

নাহ্‌, বস।

তারা বসলো। নিশাত ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললো। দিলু বললো—

আপা, তুমি কি বলতে চাও বল। নিশাত চাপা স্বরে বললো—আমার যখন তোর মতো বয়স তখন জামিল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। জামিল ভাইরা তখন আমাদের পাশের বাসায় থাকতেন। মগবাজারে।

আপা, আমি জানি।

না, সবটা তুই জানিস না। তারপর কি হলো শোন। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সটা তো খুব খারাপ। সেই বয়সে কাউকে ভালো লাগলে সেটা যে কত তীব্র হয় তা তুই বুঝতে পারছিস কিছুটা। পারছিস না?

দিলু তাকিয়ে রইলো, কিছু বললো না। নিশাত বললো—অল্প বয়সের ভাল লাগার অনেক রকম ব্যাপার আছে। যখন কলেজে উঠলাম তখন লক্ষ্য করলাম জামিল ভাইকে আর ভালো লাগছে না। এরকম হয়। বি.এ. পড়বার সময় বিয়ে হয়ে গেলো। যার সঙ্গে বিয়ে হলো সে জামিল ভাইয়ের ছেলেবেলার বন্ধু।

এসব তো আপা আমি জানি।

সবটা জানিস না। শোন মন দিয়ে। তোর দুলাভাই এক জন চমৎকার মানুষ ছিলেন। পৃথিবীর যে কোন মেয়ে তাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারতো। কিন্তু আমি হইনি। আমার সারাক্ষণই জামিল ভাইয়ের কথা মনে হতো।

নিশাত চোখ মুছলো। দিলু বললো—আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন আপা?

জানি না কেন।

আমার এসব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

নিশাত চুপ করে রইলো। কাছেই কোথাও সরসর শব্দ হচ্ছে। দিলু বললো—চলো আপা ঘরে যাই।

আরেকটু বস। তোকে একটা মজার গল্প বলি। ক্লাস টেনে উঠলাম যেবার সেবার আমি আর জামিল ভাই মিলে ঠিক করলাম পালিয়ে যাব।

কোথায় পালিয়ে যাবে?

সে সব কিছু ঠিক হয়নি। ঐ বয়সে ভেবে-চিন্তে তো কিছু কখনো করা হয় না। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে পারলে এত ঝামেলা হয়?

নিশাত হাসতে চেষ্টা করলো।

গল্প-উপন্যাসের মতো সত্যি সত্যি একদিন স্কুলে যাবার নাম করে চলে গেলাম কমলাপুর রেল স্টেশন।

তোমরা যাওনি নিশ্চয়ই?

না জামিল ভাই আসেননি।

ভালোই করেছ, যাওনি।

না, ভালো করিনি। এখনো তার জন্যে মনে একটা কষ্ট আছে আমার।

দিলু ছোট্ট করে বললো—তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও?

নিশাত জবাব দিলো না। দিলু দ্বিতীয়বার বললো—তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে চাই।

দিলুর মনে হলো নিশাত কাঁদছে। গলার স্বর যেন ভাঙা ভাঙা। নিশাত খুব শক্ত মেয়ে। সে কি সত্যি সত্যি কাঁদবে? বিশ্বাস হয় না। দিলু মৃদুস্বরে বললো—জামিল ভাইকে কিছু বলেছ?

না।

বল তাকে। তিনি তোমার জন্যেই আসেন।

নিশাত দিলুকে বুঝতে চেষ্টা করলো। শান্ত ভাবলেশহীন মুখ। উজ্জ্বল চোখ। বড় মায়াবতী চেহারা দিলুর।

নিশাতের মনে হলো আজ ঠিক এই মুহূর্তে দিলুর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে।

লেবু ফুল ফুটেছে কোথাও, মিষ্টি গন্ধ আসছে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। নিশাত কাঁদতে শুরু করলো। দিলু বসে রইলো চুপচাপ। নিশাত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো—বেঁচে থাকা বড় কষ্ট।

আপা, চল যাই। শীত লাগছে।

আরেকটু বস! প্লীজ।

তারা দুজন বসে রইলো প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। এক সময় হাতে টর্চ নিয়ে তাদের খুঁজতে এলো জামিল—

পানিতে ডুবে গেছো কিনা তাই দেখতে এলাম। মনে হচ্ছে ঠিকমতই আছ। কাজেই ডিসটার্ব না করে চলে যাচ্ছি। শুধু একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবে- এ বাড়িতে ভূত আছে। ঠাট্টা না, সত্যি।

নিশাত কিছু বললো না। দিলু বললো—জামিল ভাই, আপনি বসুন এখানে। আপা কি যেন বলবেন আপনাকে। টর্চটা দিন। আমি চলে যাই।

যেতে পারবে একা?

পারব।

দিলু যেতে যেতে থমকে পিছনে ফিরে তাকালো। অন্ধকারে জামিল ভাইয়ের জ্বলন্ত সিগারেট উঠানামা করছে। এর বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে

না। কত কাছাকাছি বসে তারা দুজন। নিশাত আপা যদি আজ বলে—জামিল ভাই, চলুন আজ সারারাত আমরা গল্প করি তাহলে জামিল ভাই কি বলবেন?

রাত অনেক হয়েছে। ওসমান সাহেবের ঝিমুনি ধরে গেছে। তিনি উঠবো উঠবো করছিলেন কিন্তু আবার ঠিক উঠতেও চাচ্ছিলেন না।

দিলু একসময় এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

ঘুমোসনি মা?

না বাবা।

কোথায় ছিলি?

পুকুর ঘাটে বসে ছিলাম আপার সঙ্গে। বাবা, আমি তোমার পাশে একটু বসি?

ওসমান সাহেব হাত বাড়িয়ে পাশের চেয়ারটি টানতে গেলেন। দিলু বললো—বাবা, আমি তোমার সঙ্গে বসবো। আমাকে একটু জায়গা দাও। ওসমান সাহেব সরে জায়গা করে দিলেন। নরম স্বরে বললেন, দিলু তোর কি হয়েছে?

বাবা, আমার বড় কষ্ট।

কিসের কষ্ট?

জানি না বাবা।

ওসমান সাহেব মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর মনে হলো দিলু কাঁদছে। কিন্তু দিলু কাঁদছিলো না।

ওসমান সাহেব ভরাট গলায় বললেন—যাও মা ঘুমুতে যাও। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, শরীর খারাপ করবে।

রেহানা বাবুকে ঘুম পাড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলেন। দিলুকে দেখে বললেন—তোর কি শরীর খারাপ? তোকে এমন লাগছে কেন?

শরীর ভালই আছে।

নিশাত কোথায়?

পুকুর ঘাটে।

রেহানা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন—এত রাতে একা একা সেখানে কি করছে?

একা একা না মা। জামিল ভাই আছেন।

রেহানা উঠে বসলেন। তাঁর ধারণা ছিলো জামিলকে নিশাত সহ্য করতে

পারে না। তিনি কিছু-একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও জিজ্ঞেস করলেন না। দিলু বললো—মা আমি তোমার পাশে একটু শুয়ে থাকি ?

দিলু মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। ফিসফিস করে বললো—নিশাত আপার সঙ্গে জামিল ভাইয়ের বিয়ে হলে ভালই হবে মা।

কি বলছিস বিড়বিড় করে। পরিষ্কার করে বল।

কিছু বলছি না মা।

দিলু আরো শক্ত করে মা'কে জড়িয়ে ধরলো। চারদিকে আবছা অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে। শীতের হিমেল হাওয়া। বাবু ঘুমের মধ্যেই কেঁদে উঠলো। একটা টিকটিকি ডাকলো—টিক টিক টিক।

দিলু ভাসছিলো মাঝপুকুরে।

তার পরনে লাল একটা স্কার্ট। মাথার কালো চুল চারদিকে ছড়ানো। দীঘির সবুজ জলের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি অসাধারণ কম্পোজিশন। একজন ফটোগ্রাফার এরকম একটি দৃশ্যের জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করে।

সাব্বির দীর্ঘ সময় দিলুর ভেসে থাকা শরীরটির দিকে তাকিয়ে রইলো। ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। স্কার্টের রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। সাব্বির ছবি তুলতে গিয়েও তুলতে পারলো না। পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলো -তোমরা কে কোথায় আছ এই মেয়েটিকে বাঁচাও।

দমকা একটা হাওয়া এল তখন। সে হাওয়ায় দিলু ভেসে আসতে লাগলো ঘাটের দিকে। যেন সে বলছে—"ছবি তুলুন সাব্বির ভাই।"

উনিশ-বিশ

সমরেশ মজুমদার



আয়নার সামনে আর ভেতরে যে দু'জন তারা কি একটুও আলাদা নয়? ওই চোখ চোখের টান, কিংবা কপালের কোণে আধভাঙ্গা চুল এবং সব মিলিয়ে উপচে পড়া এক আলো যা কিনা সমস্ত শরীরকে জড়িয়ে রেখেছে লাবণ্য হয়ে, এসবই কি একজনের? এই আঠারো উনিশ বছর বয়সটার? সুর্মা অপাঙ্গে আয়নাকে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এগোল। আয়নার কাছে সে-ও এগিয়ে আসছে। নাকের কাছে নাক, চোখের হাসিতে ছোঁয়াছুঁয়ি, সুর্মা বুক উজাড় করে শ্বাস ফেলল আর তখনই ঝাপসা হয়ে গেল আয়নার মুখের চিবুক ঠোঁট। জলজ বাতাস সাদা করে দিল কাচটাকে। সুর্মা হেসে উঠে সরে এল। সরে আসতেই চোখে পড়ল দরজায় স্বপ্না দাঁড়িয়ে।

'ওমা, কি করছিস? আয়নাকে চুমু খাচ্ছিস?' স্বপ্না অবাক গলায় শুধালো।

'চুমু? চোখে কি পড়েছে দেখছিলাম।' সুর্মা চটপট কথা সাজালো।

'চোখে তার কাজল ছাড়া আর কি পড়বে! চোখ খোলা রাখলে দেখতে পেতিস তোকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই পাড়ায় হয়ে গেল।' স্বপ্না ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। স্বপ্নার হাসি মাড়িকে দেখায়। এ পাড়ায় ওই সুর্মার বন্ধু। একসঙ্গে সেই ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ ক্লাসে এসেছে। ওরা অবশ্য নিজেরা বলে সেকেণ্ড ইয়ার। স্কুলের গন্ধটাকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। স্বপ্নার চেহারা একটু ক্ষয়াটে ফর্সা। কিন্তু খুব বুদ্ধিমতী, ইংরেজিতে বেশ ভাল।

'কি হয়েছে রে?' সুর্মা জিজ্ঞাসা করল। আজ সকালেই ওরা ফিরেছে রাঁচি থেকে। সামারের প্রায় পঁচিশ দিন ওখানে খুব হই হই করে কাটিয়ে এল ওরা। সুর্মার বাবা স্বপ্নেন্দু মাস ছয়েক আগে রাঁচিতে বদলি হয়েছেন। তিনি একাই কোয়াটার্সে থাকেন, সুর্মাদের নিয়ে যাননি পড়াশুনায় বিঘ্ন হবে বলে। এবার সুর্মা মা আর বোনের সঙ্গে ঘুরে এল রাঁচি থেকে। ওখান থেকে তিনখানা চিঠি দিয়েছে সে স্বপ্নাকে, উত্তরও পেয়েছে। কিন্তু তাতে তো পাড়ার কোন উল্লেখযোগ্য খবর ছিল না।

'অতীন পাগল হয়ে গিয়েছিল।' স্বপ্না আস্তে আস্তে বলল।

'সেকি! কবে? কি করে পাগল হল! যাঃ, সত্যি বলছিস?' একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করে বসল সুর্মা। ওর কথাটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

'তোরা চলে যাওয়ার দিন ছয়েক পরেই। এই তো গতকাল হাসপাতাল

থেকে বাড়িতে ফিরেছে। পাড়ার সবাই জানে একথা।' স্বপ্নার মুখ গম্ভীর।

'তুই আমাকে লিখিসনি তো চিঠিতে?'

'লিখলে তোর ভাল লাগত না।'

'কেন?'

'ও তোর জন্যেই পাগল হয়েছিল।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র সুর্মার শরীর অবশ হয়ে গেল। প্রথমে সে কথাটার কোন মানে খুঁজে পেল না। অতীন তার জন্যে কেন পাগল হবে? সে কখনো অতীনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। অতীনরা আগে ওদের পাশের বাড়িতে থাকতো। এখন পাড়ার মোড়ে মিষ্টির দোকানের ওপরে উঠে গেছে। কলেজে পড়ে অতীন, পড়াশুনায় খুব একটা ভাল নয়। জ্ঞান হবার পর থেকেই ওকে দেখে আসছে সুর্মা। ছেলেবেলায় নাকি এই বাড়িতেই সারাদিন পড়ে থাকতো। ছিপছিপে লম্বা, বয়সের তুলনায় বেশ লম্বা, ইদানিং লালচে লোমে মুখ ঢাকা, চোখ দুটো খুব সুন্দর। সুর্মার সঙ্গে এককালে খুব মারপিট হতো, সেই কোন-কালের ছেলেবেলায়। তার জন্যে এখন পাগল হওয়ার কোন মানে হয় না। বড় হয়ে যাওয়ার পর অতীন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়িতে মাঝে মধ্যে আসে, সুর্মার মায়ের সঙ্গে কথা বলে, সামনে পড়লে সুর্মাকে দু-একটা প্রশ্ন করে এবং চলে যায়। এমনকি যেদিন রাত্রে ওরা রাঁচিতে গেল সেদিনও তো এসেছিল। সেই বিকেলে স্বপ্নেন্দু চা খাচ্ছিলেন আর সুর্মা কোন্ কোন্ গল্পের বই সঙ্গে নেবে তাই ভাবছিল। দরজায় শব্দ হতেই কাজল বললেন, 'যাতো, দ্যাখ কে এল?'

সুর্মা দরজা খুলতেই দেখল পাজামা পাঞ্জাবি পরে অতীন দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি, এর মধ্যেই রেডি?'

'বাঃ, এখনই রেডি হব কেন? ট্রেন তো সেই রাত্তিরে।'

'বাচ্চা মেয়েরা সকাল থেকে তৈরি হয় যাওয়ার জন্যে।'

সুর্মা একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মায়ের গলা শোনা গেল, 'কে এল রে?'

সুর্মা কিছু বলার আগেই অতীন চেঁচালো, 'আমি মাসীমা।'

অতীনের পিছুপিছু ঘরে ঢুকতেই সুর্মা শুনতে পেল স্বপ্নেন্দু বললেন, 'এই যে অতীন, কেমন আছ?'

'ভাল। আপনি?'

'ওই আর কি! ওখানে একা থাকতে কি আর ভাল লাগে! এবার ওরা

যাচ্ছে, কদিন বেশ হৈচই করা যাবে।'

সুর্মার মা এসে দাঁড়ালেন, 'হ্যাঁরে অতীন, আমাদের পাড়ার মোড়ে রাত্রে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে না?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'উনি চিন্তা করছেন ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না।'

'ও, এই ব্যাপার। কটায় বের হবেন আপনারা? আমি ট্যাক্সি ডেকে দেব।'

স্বপেন্দু যেন এইটেই চাইছিলেন, 'বাঃ, খুব ভাল। আটটায় বেরিয়ে পড়ব।'

সুর্মার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দ্যাখ, পারবি তো?'

অতীন হাসল, 'বাঃ, আমি কি আর ছোট আছি।' তারপরে সুর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই কিন্তু মাসীমার কাছ ছাড়া হবি না, হারিয়ে যেতে পারিস।'

স্বপেন্দু বললেন, 'না না' মেয়ে আমার লোড হয়ে গেছে. ওখানে আমি একটা খুব ভাল ছেলে দেখে রেখেছি। এবার গিয়ে লাগিয়ে দেব বিয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে সুর্মা চেঁচিয়ে উঠল নাকিসুরে, 'বাবা তুমি না। ওমা দ্যাখো বাবা কি বলছে।'

সুর্মার মা হাসলেন, 'সে তো ভালই হয়। পছন্দমত অল্পবয়সী ছেলে যদি পাওয়া যায় তো দায় চুকিয়ে ফেলাই ভাল। সব মেয়েকেই তো একদিন না একদিন বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতেই হবে, কি বলিস অতীন?'

এখন মনে পড়ছে তখন অতীন কোন উত্তর দেয়নি। শুধু সুর্মার মুখের দিকে তাকিয়েছে। তার খানিক বাদেই দু-একটা কথা বলে সে চলে গেল। অন্তত সেদিন ওর কোন পরিবর্তন চোখে পড়েনি। তবে হ্যাঁ রাত আটটায় ট্যাক্সি নিয়ে অতীন আসেনি। স্বপেন্দুকেই ট্যাক্সি ডেকে আনতে হয়েছিল। স্বপেন্দু রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'ইরেসপনসিবল। করাব না তো আগ বাড়িয়ে বলল কেন? কোলকাতার ছেলেদের মধ্যে কোন ডিসিপ্লিন নেই!'

সুর্মার মা অস্বস্তি নিয়ে বলেছিলেন, 'অতীনটা তো এরকম নয়! ওকে সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি! কিছু হল কিনা কে জানে!'

স্বপেন্দু বলেছিলেন, 'কিছুই হয়নি। কোথাও আড্ডা মারছে। এখনকার ছেলেদের তুমি চেন না। শোন, ওকে অত ঘনঘন বাড়িতে আসতে দিও না।'

সুর্মা বন্ধুর দিকে তাকাল। এইতো সেদিনের ঘটনা এগুলো। এই ঘটনার জন্যে কোন মানুষ পাগল হয় নাকি? সে এগিয়ে এসে স্বপ্নার হাত ধরল, 'কি হয়েছে আমায় খুলে বল।'

স্বপ্না ইতস্তত করল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। তারপর

বলল, 'এখানে নয়। মাসীমা এলে শুনে ফেলবে। তার চেয়ে তোদের ছাদে চল।'

সুর্মাদের এই ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদটায় বিকেলে যেন হাট বসে যায়। সব ফ্ল্যাটের মেয়ে বাচ্চা সেজেগুজে চলে আসে এখানে। এক এক দলের পৃথক আড্ডা বসে। আশেপাশের নিচু ছাদগুলোকে পরিষ্কার দেখা যায়। সুর্মা ইদানিং ছাদে উঠত না। আজে বাজে কিছু ছেলে অন্য ছাদ থেকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে এইদিকে। ছেলেদের এইরকম অসভ্যতা ভীষণ খারাপ লাগে ওর। বুড়ো বুড়ো লোকগুলো পর্যন্ত ওর দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকায় যে গা জ্বলে যায়।

ছাদের ঠিক মাঝখানে ওরা বসল। এখন রোদ্দুর নেই কিন্তু ছায়াতে আলো মাখানো। আকাশটা আজ কাচের মত ঝকমকে।

সেদিন থেকে চোখ সরিয়ে সুর্মা বলল, 'এবার বল্ কি হয়েছিল?'

স্বপ্না বলল, 'তোরা রাঁচি চলে যাওয়ার তিনদিন পর ঘটনাটা ঘটল। রবিবার দিন দুপুরবেলায় আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে অতীন চিৎকার করতে লাগল তোর নাম করে। মুখচোখ লাল হয়ে গেছিল, কী বীভৎস দেখাচ্ছিল ওকে।'

সুর্মা অবাক হয়ে গেল, 'আমার নাম ধরে? কী বলছিল?'

হেসে ফেলল স্বপ্না, 'আই লাভ ইউ সুর্মা, আই লাভ ইউ সুর্মা।'

'যাঃ।' সুর্মার দুই গাল বিকেলের আকাশ।

'হ্যাঁরে আমরা তো সবাই অবাক। পাড়ার ছেলেরা ধরাধরি করে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। শুনলাম খুব ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে ও, দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে, সারাক্ষণ গালাগালি করছে আর মাঝে মাঝে ওই কথা বলছে। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল ওর মা।' একটু থেমে স্বপ্না বলল, 'যাই বলিস ওর মাকে আমার একদম পছন্দ হয় না।' সুর্মা অবশ হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে কথা বলল, 'কেন?'

'কেমন যেন স্বার্থপর স্বার্থপর। নিজের ছেলের দোষ দিল না উল্টে তোর বাবার নামে সাত পাঁচ বলে বেড়িয়েছে।'

'আমার বাবার নামে?' সেকি! কি বলেছে?

'তোরা অ্যাদ্দিন মেশামিশি করার পর এখন তোর বাবা রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে তোর বিয়ে দিচ্ছে। এইসব। আমি তো শুনে একদম বিশ্বাস করিনি। তোর বিয়ে হলে আমি জানতে পারতাম না, বল?' স্বপ্না তাকাল।

হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারছিল না সুর্মা। রাঁচিতে যাওয়ার দিন বাবা

স্রেফ রসিকতা করে যে কথাটা বলেছিল তাই শুনে অতীন পাগল হয়ে গেল ? এরকম কখনো হয় ?

হঠাৎ স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা সত্যি বলবি ?'

'বল।'

'তোর সঙ্গে অতীনের, মানে, লাভটাভ হয়েছিল বলিসনি কেন ?'

'যাঃ।' তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠল সুর্মা, 'তোকে ছুঁয়ে বলছি স্বপ্না, আমার সঙ্গে ওর কিছুই হয়নি। ওকে তো ছেলেবেলা থেকে আমি দেখছি, কিন্তু কখনো মনের মধ্যে অন্য কিছু চিন্তা আসেনি। ইদানিং তো আমার সঙ্গে কথাও বলতো না অতীন, খুব মুখোমুখি না পড়লে আমিও বলতাম না। ওযে এইসব যা তা ভাবছে তাও আমাকে কখনো বলেনি। আমার এমন লজ্জা করছে এখন, পাড়ার সবাই কি ভাবছে বল্।' সুর্মার সত্যিই লজ্জা করছিল। পাগল হয়ে রাস্তায় তার নাম ধরে চেঁচামেচি করেছে ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিল।

স্বপ্না বলল, 'ছেড়ে দে এসব কথা। এখন তো অতীন ভাল হয়ে গিয়েছে। আজ সকালেই দেখলাম খুব গম্ভীর মুখে হেঁটে যাচ্ছে। তুই যখন এসবের সঙ্গে জড়িত নস, তখন তুই ভাববি কেন ?' স্বপ্না বোঝাল।

সন্ধ্যে ঘন হতে ওরা নেমে এল ছাদ থেকে। কদিন বাদেই একটা পরীক্ষা। স্বপ্না আর বেশীক্ষণ থাকল না। দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল সুর্মা। ওর খুব ইচ্ছে করছিল মায়ের কাছে এইসব কথা খুলে বলে। অতীনের সঙ্গে তার যে কোন সম্পর্ক নেই, বা ওইসব ভাবার মত মন তার তৈরী হয়নি, একথা তো আর কেউ না জানুক মা জানেন। কিন্তু কথাটা বলতে যে তার খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল। সে অপেক্ষা করছিল, মা যদি কারো কাছে ঘটনাটা শোনে, তাহলে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করবে তখনই বলা সহজ।

আজকাল বাবা বেশীর ভাগ সময় রাঁচিতে থাকেন। বাবার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে! আমরা তো দুই বোন। ছোট এত ছোট যে আমার বন্ধু হতে পারে না। মায়ের কাছে আমি অনেক কথা বলি কিন্তু সব কথা বলতে পারি না। পারলে তো স্বপ্নার কথাটা বলতে পারতাম। কাল রাত্তিরে মায়ের পাশে শুয়েও যখন ঘুম আসছিল না তখনও বলতে পারিনি। একথা ঠিক বাবাকেও কথাটা বলতে পারতাম না। কিন্তু কিছুদিন থেকে বাবাকে আমার খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আমি সেই বড় হয়ে উঠলাম অমনি মনে হল বাবার অনেক কিছু আমার ভাল লাগে। আজকাল বাবা যখন আমার সঙ্গে রসিকতা করেন তার মধ্যে একটা বয়স্ক মত কাজ করে। এই সেদিন সন্ধ্যেবেলায়

আমরা গাড়িতে বেরিয়ে রাঁচিতে ফিরছিলাম, বাবা বললেন, 'দ্যাখ সুমি', আকাশটাকে দ্যাখ! যেন কলজে ফেটে রক্ত ঝরছে।'

আমার খুব ভাল লাগল। আমি বুঝলাম খুব কষ্টের রঙ মাঝে মাঝে লাল। সূর্যের জন্যে আকাশের যে কষ্ট সেটা যে দেখছে তার মধ্যেও ছড়িয়ে গেল। বাবা এভাবে আমাকে ভাবতে সাহায্য করে। কিন্তু মা আমার আটপৌরে, এমনিতে খুব ভাল যতটা ভাল একজন মা হতে পারে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে কথা বললে মনের বয়স বাড়ে না। আর এই সময়টায় বাবা রাঁচিতে চলে গেলেন বদলি হয়ে। কদিন রাঁচিতে আমি খুব সুন্দর কাটিয়েছি।

জীবনে এরকম রাত ওই প্রথম, যে রাতে আমার চোখে ঘুম আসেনি। অতীনটা এমন কাণ্ড করল কেন? আমি তো ওর সঙ্গে কখনও তেমন ব্যবহার করিনি। আমার ক্লাসের অনেক মেয়ের লাভার আছে। ব্যাপারটায় শুধু একটা ছ্যাবলামি বলে আমার মনে হল। আমাদের এই বয়সে ওসব মানায়? বাবা বলেন সব কিছুর একটা নিয়ম প্রকৃতি বেঁধে দিয়েছে। ভোরের ছায়ার সঙ্গে বিকেলের কেমন একটা মিল আছে কিন্তু তাই বলে কি ওদুটো এক! ভোরের ছায়ায় একটা শিরশিরে আনন্দ মেশানো থাকে আর বিকেলের ছায়ায় তিরতিরে দুঃখ। কিংবা ফলের মত। অকালে কারবাইড দিয়ে পাকালে আসল স্বাদ কি মেলে? আমাদের এখন পড়াশুনার সময়। ক্লাশের পড়া ছাড়া পৃথিবীতে এত বই আছে যা না পড়লে মানুষ হিসাবে জন্মানোর কোনো মানে হয় না। একথাটাও বাবার কাছ থেকে শেখা। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ হল মানুষ রিলে রেসের মত সভ্যতাকে বয়ে নিয়ে যায়, আর পশু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমার তাই ওসব মোটেই পছন্দ হয় না।

কিন্তু অতীনটা এমন কাণ্ড করল কেন? ওকি আমার কথা ভাবতো? আমাকে, যাকে বলে ভালবাসা, তাই বাসতো? আমি তো কখনও সেরকম বুঝতে পারিনি। কাউকে ভালবাসার কথা আমার মনেই আসেনি। অতীন এত কাছের ছেলে যে ওর সম্পর্কে এসব চিন্তা আমার মাথায় আসেনি! কোন রক্তমাংসের পুরুষকে যদি আমি ভালবাসি তো তিনি হলেন আমার বাবা। তারপরেই দুজন, আগে পরে। একজন রবীন্দ্রনাথ অন্যজন জীবনানন্দ দাশ। এই দুজন মনের আকাশে একটার পর একটা তারা জেলে দিয়ে যান আর বাবা সেই আকাশটাকে গড়ে দিয়েছিলেন। আমি যদি কাউকে ভালবাসি তাহলে তাকে হতে হবে ওই তিনজনের সমান মনের মানুষ। অতীন তো সেরকম নয়। ও তো খুবই বলেছিল, একটু চোয়াড়ে। বইপত্র খুব পড়ে বলে জানি না। দুদিন সাদামাটা,

সিরিজ না কি ছাই ওরকম বই হাতে দেখেছিলাম। মাকে বলে মোহন দারুণ বই, ধরলে ছাড়া যায় না। তখন বাবা এখানে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, 'নাবালক মানসিকতার মানুষের খাদ্য ওগুলো।'

কিন্তু সেই অতীন রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করবে আই লাভ ইউ সুর্মা ? কোন কারণ ছাড়াই ? একি সেই খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে ? যেই শুনলো বাঁচিতে গিয়ে আমার বিয়ে দেওয়া হবে অমনি সব ওলট পালট হয়ে গেল ? সেইজন্যেই কি কথা দিয়েও ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল না ? আর ওই চিন্তায় পাগল হয়ে গেল ? ওকি গোপনে আমাকে এতখানি ভালবাসতো। পাগল ! এরকম একতরফা ভালবাসার কি মূল্য ? কিন্তু বুঝতে পারছিলাম অতীনের জন্যে মনে কেমন একটা মায়া মিশছে। আহা বেচারা। একে কি করুণা বলে ? জানি না। তবে ওকে সামনে পেলে আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে সহজ করতাম। তার পরেই মনে হল, এসবের কি দরকার। এই ঘটনাকে খামোকা এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন ! আমি যেমন আছি তেমন থাকব। আমার তো ওর ওপর কোন দুর্বলতা নেই। তাছাড়া অতীন তো আবার সুস্থ হয়ে গিয়েছে। ভাল থাক এই যথেষ্ট।

সুর্মাদের এই বাড়িটা কোলকাতার আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত সংসার থেকে পৃথক নয়। স্বপেন্দুর ভাল চাকরির কল্যাণে এখানে কখনও অভাব ঢোকেনি বটে কিন্তু সবকিছুই একটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুর্মার মায়ের ওপরই এখন সংসারের পুরো দায়িত্ব। স্বপেন্দু মাসে একবার আসেন হয়তো। ছোটবোন উর্মিকে সামলাতেই মায়ের সময় কেটে যায়। সুর্মা যেমন শান্ত, উর্মি ঠিক তার বিপরীত। বড় মেয়ে সম্পর্কে সুর্মার মায়ের কোন দুশ্চিন্তা নেই। সারাদিন বই মুখে নিয়ে ব্যস্ত আছে। প্রথম প্রথম বড়দের বই পড়া নিয়ে রাগারাগি করতেন সুর্মার মা। এই বয়সে এত পাকা বই পড়বে কেন ? সেই ক্লাস এইটে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ করেছে বাবার প্রশ্রয়ে। প্রথম প্রথম স্বামীর ওপর খুব রাগ হতো। মেয়েকে এত লাই দেওয়া ঠিক হচ্ছে না মনে হতো। কিন্তু এখন ধারণা পাল্টাচ্ছেন। সুর্মা যে আর পাঁচটা ফাজিল মেয়ের মত নয় উপলব্ধি করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এটা খুব বড় রকমের শান্তি।

আজ রবিবার। দুপুরে খেয়েদেয়ে মায়ের পাশে শুয়ে পড়েছিল সুর্মা। উর্মিকে জোর করে ঘুম পাড়াতে হয়েছিল কিন্তু সুর্মা কখন নিজেই ঘুমিয়ে কাদা। কদিন থেকে মেয়েটা বলছিল চোখ ব্যথা করে। ভাবছিলেন এবার একজন চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। দিনরাত বই মুখ করে বসে থাকলে চোখের আর কি দোষ।

বিকেলে মেয়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। দুই মেয়ে তখনও ঘুমিয়ে। ঠেলা দিয়ে সুর্মাকে তুললেন তিনি, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে ওঠ।'

আলস্যে শরীর বেঁকালো সুর্মা, 'উম্‌ম। আর একটু ঘুমুই।'

'না, আর আলসেমি করতে হবে না। উঠে পড়।'

বাধ্য হয়ে সুর্মা উঠল। উঠে বারান্দায় মোড়ায় বসে মেঘ দেখতে লাগল। হাতের কাজ সারতে তাড়া দিলেন সুর্মার মা, 'এই তুই এখনও বসে আছিস। যা চুল বাঁধ, জামা ছাড়।'

সুর্মা বলল, 'দ্যাখো মা, মেঘগুলো কি ভীষণ রাগী।'

সুর্মার মায়ের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'তোর চোখ নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। কালই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে দেখছি। নইলে মেঘের রাগ দেখতে পাস।'

সুর্মা বলল, 'চোখ থাকলে সব দেখা যায়। দুই চোখের মধ্যে আর একটা চোখ।'

সুর্মার মা বললেন, 'দরকার নেই আমার তৃতীয় নয়নের। তুমি আর তোমার বাবা সেই নয়নেই দেখো। এখন দয়া করে ওঠ।'

চুলটুল বেঁধে হঠাৎ খুব সাজতে ইচ্ছে করল সুর্মার। এরকম মেঘের বিকেলে মন ভীষণ ভাল হয়ে যায় ওর। রাঁচি থেকে কেনা জিনিসের প্যাণ্ট আর সার্টটা পরে ফেলল ও। সচরাচর প্যাণ্ট পরে না সুর্মা। স্বপ্নেন্দু রাঁচিতে কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাইরে বেড়াতে গেলে এটা পরবি। আজকাল তো সব মেয়েই প্যাণ্ট পরে। তা পাহাড়ে ওঠ নামা করতে সুবিধে হবে বেশ। প্যাণ্ট পরলে তোকে বেশ স্মার্ট দেখাবে।

মজা লেগেছিল সুর্মার। ক'দিনের আড়ষ্টতা ঘুচেছিল। নিজেকে ঠিক ছেলে-ছেলে লাগে প্যাণ্ট পরলে। শুধু হিপের ওপর লাগানো কোম্পানীর ধাতব লেবেলটি খুলে ফেলেছিল প্যাণ্ট থেকে। অন্যের বিজ্ঞাপন অকারণে শরীরে বইবে কেন? সুর্মার মা-ও প্যাণ্ট দেখে মজা পেয়েছিলেন। ভাবখানা এরকম, আর তো পরতে পারবে না, এইবেলা পরে নিক।

তা সার্ট প্যাণ্ট পরে চুল আঁচড়ে ঘরে আসতেই উর্মি বলল, 'এই দিদি তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'কেন?'

'এত সেজেছিস, তোকে দেখে সবাই হাঁ হয়ে যাবে।'

'মারব এক থাপ্পড়।' কপট রাগে হাত তুলল সুর্মা! সঙ্গে সঙ্গে উর্মি

চেঁচালো, 'মা দ্যাখো, দিদি আমাকে মারছে।'

উর্মির মুখের দিকে তাকিয়ে সুর্মা হেসে ফেলল, 'তুই বড় হলে বিরাট ক্রিমিনাল হবি। এখন থেকে যা মিথ্যে বলিস!'

পড়ার টেবিলে এসে সুর্মার মনে পড়ল আজ স্বপ্না আসেনি। অথচ স্বপ্নাকে পই পই করে সে বলে দিয়েছিল ডায়েরিটা ফেরত দিতে। আগামী কালই একটা টেস্ট আছে। সেটার জন্যে ডায়েরিটা দরকার. সমস্ত ক্লাশ-নোট রয়েছে ওটাতে।

সুর্মা চেঁচিয়ে বলল, 'মা, উর্মিকে স্বপ্নাদের বাড়িতে পাঠাবে?'

সুর্মার মা বললেন, 'কেন?'

'আমার ডায়েরিটা ফেরত আনতে। ও দিয়ে যায়নি।'

ওপাশ থেকে উর্মি চেঁচালো, 'আমি যেতে পারব না। ওদের একতলায় বিরাট কুকুর এসেছে। ভয় লাগে।'

'সুর্মা বলল ফের মিথ্যে কথা!'

উর্মি মাথা ঝাঁকালো, 'মিথ্যে তো মিথ্যে। তোর দরকার তুই যা না।'

সুর্মা অনুযোগ করল, 'শুনলে মা, ও কি ভাবে কথা বলছে!'

সুর্মার মা ঘরে এলেন, থাক ওর গিয়ে দরকার নেই, বৃষ্টি আসছে। সুযোগ পেলেই ভিজে এসে জ্বর বাধাবে। তার চেয়ে তুই যা. সন্ধ্যের আগেই ঘুরে আয়।'

সুর্মার বাড়ি থেকে বের হতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। এখনও শরীর থেকে আলসেমিটা যায়নি। আর একটু ঘুমোতে পারলে বেশ হতো। তাছাড়া এই সার্ট প্যান্ট পরে পাড়ার চেনা লোকদের সামনে হাঁটতে একদম ইচ্ছে করছিল না। কেউ যদি কিছু বলে সেটা খুব লজ্জার হবে। আবার এগুলোকে ছাড়তেও আলস্যি লাগছিল। এছাড়া আর একটা লজ্জা লুকিয়ে আছে। সবাই তো এখন তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। কেউ কি বিশ্বাস করবে অতীনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক কখনও ছিল না। ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর অতীনের ওপর।

কিন্তু তারপরেই ও মত বদলালো। সে যত ঘরের মধ্যে বসে থাকবে ততো তো লোকে সন্দেহটাকে সত্যি ভাববে। তাছাড়া তাকে কলেজে যেতে হবেই যখন তখন লজ্জা করে কি লাভ! বরং সবাইকে দেখিয়ে দেওয়াই ভাল এসব সে গ্রাহ্য করে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে মুখের ওপর বলে দেবে ওসব নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সুর্মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল, 'মা, আমি স্বপ্নাদের বাড়িতে যাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি আসিস। আর হ্যাঁ, বৃষ্টি আসতে পারে, তুই ছাতাটা নিয়ে যা।' সুর্মার মা ছাতা খুঁজতে লাগলেন।

সুর্মা বাধা দিল, 'দূর, এখান থেকে এটুকু, ছাতা নেব না।'

বলে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে তর তর করে নেমে এল। বড় রাস্তা দিয়ে মিনিট তিনেক গেলেই স্বপ্নাদের বাড়ি। দোতলার ফ্ল্যাটে ওরা থাকে। মেঘের জন্যেই আকাশ বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রাস্তার লোকজন কম। এক আধজন ছাড়া চেনা লোক চোখে পড়ছিল না। চারধারে একটা পালানো-পালানো ভাব দেখে মজা লাগছিল ওর। এখন অন্তত কোলকাতার এই পাড়ার কেউ কারো দিকে নজর দিচ্ছে না।

স্বপ্নাদের একতলার দরজায় বিকেল বেলায় কিছু মেয়ে ভিড় করে থাকে। ওরা বোধহয় পেছন দিকের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। মিছিল দেখতে বা বাজনা শুনতে যেমন ওখানে ছুটে আসে তেমনি মেঘ গলতে দেখাও বুঝি একটা কাজ ওদের। সুর্মা কোনদিকে না তাকিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই একঠা বিস্মিত কণ্ঠ কানে এল, কেউ কাউকে সচেতন করিয়ে দিচ্ছে, 'এই!' আর একটি মেয়ে শব্দ করে হেসে উঠল। কিন্তু সুর্মা কিছুই পরোয়া করে না এমন ভাব দেখিয়ে উঠে এল।

স্বপ্নাই দরজা খুলল। ওকে দেখে ও একেবারে হতভম্ব, 'ওমা তুই প্যান্ট পরেছিস! ইস, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। রাঁচিতে গিয়ে বানিয়েছিস না।'

সুর্মা ভেতরে ঢুকে এমন ভঙ্গিতে হাসল যেন প্যান্টটা কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়ই নয়। কিন্তু ও স্বপ্নার চোখের লোভ পড়তে পারল। স্বপ্না এখন চাইবে দ্রুত একটা ভাল প্যান্ট হোক। সুর্মা বলল, 'তুই গেলি না যে বড়! ডায়েরিটা দে।'

ওরা কিছুক্ষণ গল্প করার পর স্বপ্নার মা এলেন, 'বাবা কিনে দিল বুঝি।'

সুর্মা বুঝতে পারেনি, 'কি মাসিমা?'

'ওই পোশাক!'

'হ্যাঁ। রাঁচিতে গিয়ে বললেন এটা পরলে পাহাড়ে ওঠার সুবিধে হয়।'

'তা কলকাতাতেও বুঝি পাহাড় বয়ে নিয়ে এসেছিস। কি যে সব রুচি হচ্ছে।' স্বপ্নার মা উদাস মুখে তাকালেন।

সুর্মার খুব লজ্জা করছিল। ঠিক এইরকম আঘাত দিয়ে স্বপ্নার মা কখনো কথা বলেন না। ও বলল, 'স্বপ্না, আমি চলি।'

স্বপ্না ঘাড় কাত করল। ওই মুহূর্তে ওকে কেমন দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছিল। দরজার কাছে পৌঁছাতেই স্বপ্নার মা বললেন, 'হ্যাঁরে অতীন আজ তোমাদের

বাড়িতে গিয়েছিল ?'

সুর্মার মুখে রক্ত জমল। সে কোনরকমে ঘাড় নাড়ল, 'না তো।'

'কি যে করিস তোরা ! স্বপ্না অবশ্য বলছিল তুই ইনভলভ্ড নস। কিন্তু পাড়ার লোকে সেকথা বিশ্বাস করবে কেন ? এক হাতে তো আর তালি বাজে না। তা একটু সাবধানে যাস, পাগলটা নাকি প্রায়ই ঘোরাফেরা করে। আমার তো বাবা পাগল দেখলেই বুক হিম হয়ে যায়।' স্বপ্নার মায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র সুর্মা দরজা ডিঙিয়ে গেল। উঃ মানুষ কি দ্রুত পাল্টে যায়। সে ঠিক করল আর কখনও স্বপ্নাদের বাড়িতে আসবে না। চোখে জল এসে গিয়েছিল সুর্মার। দ্রুত মুছে নিয়ে নিজেকে শক্ত করল। না, কে কি বলল তাই নিয়ে কষ্ট পাওয়ার কোন মানে হয় না।

দরজায় সেই মেয়েরা তখনও দাঁড়িয়ে। তাদের একটুও পাত্তা না দিয়ে সুর্মা রাস্তায় নামল। ডায়েরিটা বাঁ হাতে নিয়ে ফুটপাত দিয়ে একটু এগোতেই চমকে উঠল। সুর্মার সমস্ত শরীরে কাঁপন এল। ও কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মুহূর্তেই অসাড়তা কেটে গেলে সে অন্য ফুটপাতের দিকে তাকাল। না, কোন-ভাবেই পাশ কাটানোর উপায় নেই। পরক্ষণেই মনে হল আশপাশের বাড়ির লোক জানলা দিয়ে তাকে দেখছে কিনা ! স্বপ্নাদের বাড়ির সদর দরজা এখান থেকে দেখা যায় না এটুকু বাঁচোয়া। সে ঠিক করল পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

অতীনের এক হাতে কিট্‌স ব্যাগ, অন্য হাত মুঠো করা, মাথা নিচু করে আসছিল। মুখোমুখি হতেই যেন দুচোখ জ্বলে উঠল ওর, 'আরে তুই ? কবে এলি ?

উত্তর দেবে কি দেবে না বুঝতেই ঠোঁট থেকে শব্দ বের হল, 'আজ।' তারপরেই পা বাড়াল সুর্মা।

'দাঁড়া, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'না, কোন কথা নেই।'

'আছে কি না আছে সে আমি বুঝব। রাঁচিতে পাত্র জুটল না ?'

'আমার পথ ছাড়ো।'

হঠাৎ অতীনের গলার স্বর পাল্টে গেল, 'তুই এমন কেন রে ?'

সুর্মার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। ওর মনে হচ্ছিল অতীন বোধহয় এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। ওর কথাগুলো কেমন যেন নিঃশ্বাস জড়ানো।

'আমি যাই।'

'যাবিই তো। আমার জন্যে তুই থাকবি কেন ? অতীনের কণ্ঠস্বর ক্রমশ

উঁচু পর্দায় উঠল। সুর্মা দেখল ওর চোখের আলো নিভে গেছে। কেমন ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে ভাব সেখানে। যদি এখনই আচমকা চিৎকার করে ওঠে, যদি পাগল হয়ে যায় ফের। সে যদি দৌড়ে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে কি অতীনও পেছনে দৌড়াবে ? ঠিক সেই সময় রাস্তার ওপাশের বাড়িটার জানলা খুলে গেল। একটা বউ হাঁ করে তাদের দেখতে লাগল সেখানে দাঁড়িয়ে।

অতীন বলল, 'যাক আমি চলে যাচ্ছি আজকে।'

'কোথায় ?'

'দার্জিলিং-এ। ওখানে আমার এক নেপালি বন্ধু চাকরি দেবে বলেছে। আর তোকে কখনও বিরক্ত করব না আমি। শুধু যাওয়ার আগে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'বাড়িতে চল্।'

'না ওসব কথা বাড়িতে বসে বলা যায় না।'

'কি কথা ?'

'আমি কেন পাগল হয়েছিলাম।'

'আমি তার কি জানি !'

'তোর জন্যে। শুধু তোর জন্যে। আমার বেশী সময় নেই, তুই আমার কথা শুনবি কি না বল !' কথা শেষ করতে না করতেই হাত তুলে একটা ট্যাক্সিকে থামাল অতীন। তারপর দরজা খুলে ডাকল, 'উঠে পড়, যেতে যেতে কথা বলব।'

'আমি কোথায় যাব ?'

'স্টেশনে। আমাকে তুলে দিয়ে ফিরে আসবি। নইলে তোকে আর কোনদিন আমার বলা হবে না। আয় তোর পায়ে পড়ি, আয়।' ভিক্ষে চাওয়ার গলায় বলল অতীন।

'বাড়িতে রাগ করবে। আমি যেতে পারব না।'

'আধঘণ্টার জন্যে, কেউ টের পাবে না ! আয় সুর্মি !'

সুর্মা মুখ তুলতেই দেখতে পেল দূরে পাঁচ ছয়জন ছেলে আসছে ! ওরা যদি এই দৃশ্য দেখে তাহলে আর দেখতে হবে না। ওর হঠাৎ মনে হল যদি আধঘণ্টা ওর সঙ্গে থেকে ও শান্ত হয় তাহলে একটা ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়। সে তো কোন বিরাট অন্যায় করছে না। আর এই সময়ে টুপটুপ করে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। যারা রাস্তায় ছিল তারা ছুটোছুটি করে মাথায় ছাদ খুঁজতে লাগল। প্রায় চিৎকার করে উঠল অতীন। 'আয় ভিজে যাবি !'

বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যেই কিংবা দায় এড়ানোর ভঙ্গিতে সুর্মা ট্যাক্সিতে উঠল। অতীন দরজা বন্ধ করে বলল, 'শেয়ালদা স্টেশনে!'

ট্যাক্সিতে উঠেই সুর্মার মনে হল, একি করল সে! কেন সে আচমকা উঠে পড়ল। এখন যদি পাড়ার কেউ দেখে তাহলে হাজার বললেও বিশ্বাস করবে না। মায়ের কানে গেলে তো আর আস্ত রাখবে না। সে আসতে চায়নি একি কাউকে বোঝানো যাবে। গাড়িটা ততক্ষণে ট্রাম লাইনের ধার ঘেঁসে ছুটছে। সুর্মা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে জানলা ঘেঁসে বসল। বাইরে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। সাদা দেখাচ্ছে চারধার। ট্যাক্সির ছাদে চটর পটর শব্দ হচ্ছে।

একটু বাদে সুর্মা মুখ ঘোরালো। ওপাশের জানালার গায়ে প্রায় নেতিয়ে শুয়ে আছে অতীন। এই কদিনেই কি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে, মুখে দাড়ি থাকা সত্ত্বেও শীর্ণভাবটা চোখে পড়ছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছে। ওদের বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে শিয়ালদায় পেঁছাতে মিনিট দশেক লাগে। এই সময়ের মধ্যে অতীন কি বলবে বলে নিতে পাবে। কিন্তু ওর তো কোন ব্যস্ততা দেখতে পাচ্ছি না ট্যাক্সিতে ওঠার পর। সুর্মা জিজ্ঞেস করল, 'কি বলবি বলছিলি?'

অতীন ঘোলাচোখে তাকাল। ওর চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। তারপর সুর্মাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল দুহাতে মুখ ঢেকে। কান্নার বেগটা এমন ঢেউ-এর মত আসছে যে মনে হচ্ছিল মোচার খোলার মত ভাসছে ও। সুর্মা এত নার্ভাস হয়ে পড়ল যে কি করবে বুঝতে পারছিল না। ওর প্রথমে মনে হল অতীন কি আবার পাগল হয়ে গেল? পাগলরা কি এমন আকস্মিক কাঁদে! কিন্তু এরকম কান্না খুব গভীর দুঃখ না পেলে বুক থেকে উঠে আসে না। এই সময় ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যা হুয়া?'

অতীনের পক্ষে জবাব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বিব্রত মুখে সুর্মা বলল, 'কিছু না। লোকটা কি বুঝল কে জানে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল। অতীন-এর অবস্থা এমন যে সুর্মার ভয় হল ও বোধ হয় ট্যাক্সি থেকে নামতেই পারবে না। ক্রমশ ছেলেটার ওপর ভীষণ মায়া হল সুর্মার। শৈশব থেকে ওকে কখনই এমন করে কাঁদতে দেখেনি। একবার দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙেছিল অতীন, তখন বছর সাতেক বয়স বোধ হয়, তখনও তো এমন করে কাঁদতে দেখেনি সুর্মা। সে একটু সরে বসে অতীনের বাজুতে হাত রাখল, 'এই কাঁদছিস কেন?'

অতীন জবাব দিল না। ও যেন একটা কান্নার নেশায় আচ্ছন্ন সুর্মা আবার

ডাকল, 'এই অতীন, প্লিজ কাঁদিস না। আমাকে কি বলবি বলেছিলি বল্।'

একটু একটু করে নিজেকে সামলালো অতীন কিন্তু ততক্ষণে স্টেশন এসে গিয়েছে। চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসল যখন তখন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালো। সুমা দেখল অতীন পকেট থেকে এক গোছা টাকা বের করে ভাড়া মেটালো। অতটাকা সুমা একসঙ্গে কখনও হাতে নেয়নি। ওদের বাড়িতে ছোটদের হাতে টাকা দেওয়ার নিয়ম নেই। অতীনের কাছে অতটাকা এল কি করে?

দরজা খুলে অতীন ওকে ইঙ্গিতে নামতে বলে স্টেশনের ওপরের ঘড়ির দিকে তাকাল। ওর গলার স্বরে তখনও কাঁপুনি, ভিজে ভিজে, এখনও আধঘণ্টা আছে, তুই আমার সঙ্গে প্লাটফর্মে চল।'

সুমা বলল, 'না। আমি বাড়ি যাব।'

'এই বৃষ্টি না থামলে যাবি কি করে? মিনিট পনের অপেক্ষা করে না হয় চলে যাস।' অতীনের গায়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। বাধ্য হয়ে সুমা ট্যাক্সি থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে স্টেশনের ভেতরে ঢুকে পড়ল। চারধারে মানুষরা বৃষ্টির জন্যে আটকে থাকায় গমগম শব্দ হচ্ছে। ওদের ভিজে যাওয়া চেহারার দিকে অনেকেই তাকিয়েছিল। সুমা আড়ষ্ট হল। এই ভিড়ের মাঝে পাড়ার কেউ নেই তো! থাকলে আর মুখ দেখাতে হবে না! হঠাৎ ওর খেয়াল হল পকেটে একটা পয়সাও নেই। ফিরে যাওয়ার সময় বাসে টিকিট কাটতে হবে! এতদূরে সে কখনও একা আসেনি। কিন্তু চেনা বাস তো এ পাড়াতে আসে। অতীনের কাছে চাইবে নাকি! না চেয়ে কোন উপায় অবশ্য নেই। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল একা দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রের আলোগুলো জ্বলছে এবং অতীন নেই! নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল ওর। চারপাশে তাকিয়ে অতীনকে দেখতে পেল না। এইভাবে তাকে ফেলে কি অতীন চলে যাবে? তাহলে নিয়ে এল কেন? সুমা কি করবে বুঝতে পারছিল না। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন দূরে অতীনকে দেখতে পেয়ে প্রায় দৌড়ে গেল ও, 'কোথায় গিয়েছিলি না বলে?'

অতীনের যেন কোন বোধশক্তি নেই এমন ভঙ্গিতে বলল, 'চল'।

কিন্তু আমার কাছে বাড়িফেরার পয়সা নেই।'

'দিয়ে দেবো।'

প্লাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে ট্রেনটা ভিজছে। বৃষ্টির জন্যে কি না কে জানে যাত্রীরা এখনও অল্প। একটা বেঞ্চিতে ব্যাগ রেখে অতীন বসল। সুমা সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেনটাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি চলে যাচ্ছিস?'

মাথা নাড়ল অতীন। 'হ্যাঁ।'

'চাকরি করবি ?'

'হুঁ।'

'যদি না পাস ?'

'পাবই। সুনীল আমাকে কথা দিয়েছে।'

'বাড়িতে জানে ?'

'না।'

'তাহলে টাকা পেলি কোথায় ?'

'পেয়েছি।'

'সত্যি বলতো কেন যাচ্ছিস ?'

'তুই কি বুঝিস না ? আমি যে তোকে ভালবাসি তুই জানিস না ?'

'কিন্তু আমি তো তোকে—। বিশ্বাস কর—। এরকম পাগলামি।'

'ও। এখন তো তুই আমাকে পাগল বলবি। জানি আমি তোর যোগ্য নই। আমার চেয়ে অনেক ভাল ছেলে পাবি। ও ভগবান!'

'অতীন। এরকম করে বলিস না। তোর সঙ্গে আমার কোনদিন কিছু হয়নি।'

'কে বললে কিছু হয়নি ? আমি তো তোকে ভালবেসে এসেছি প্রতিদিন তোর কথা ছাড়া অন্য চিন্তা করতাম না। আমি জানি তুই আমার চেয়ে অনেক মূল্যবান। কিন্তু আমি যে তোকে ভালবাসি, কি করব বল ?'

'না, ওখানে আমি আর যাব না! তোকে আমি পাব না এটা আমি ওখানে বসে ভাবতে পারি না। সুর্মি, তুই আমাকে একটু ভালবাস।'

সুর্মা কি বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ অতীন ওর দুটো হাত আঁকড়ে ধরল, 'তুই আমার সংগে চল সুর্মি। আমি চাকরি করব, বিয়ে করে আমরা খুব সুখে থাকব। আমি বেঁচে যাব সুর্মি'।

সুর্মা দুত মাথা নেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'না, সে হয় না, না!' ওরা এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি দুএকজন করে মানুষ জমছিল কাছাকাছি। সুর্মা চিৎকার করে উঠতেই একজন এগিয়ে এল, 'কি হয়েছে ?'

সুর্মা ততক্ষণে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। লোকটি আবার কড়া গলায় বলল, 'কি ব্যাপার তখন থেকে দেখছি একটা গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে।'

সুর্মা কি বলবে বুঝতে পারছিল না। ওর সমস্ত শরীর হিম। অতীন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছুই হয়নি। আপনার কি দরকার ?'

লোকটি শক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল, 'আপনাদের আমার সংগে আসতে

হবে।'

'কেন কোথায় ? অতীনের গলা কাঁপছিল না।

লোকটা পকেট থেকে কার্ড বের করে দেখাল। এই সময় আর একটি মোটা মতন বয়স্ক লোক কাছে এলেন, 'কি হয়েছে শ্যাম ?'

'এদের মধ্যে একটা গোলমাল আছে স্যার !' লোকটি জানাল।

আশেপাশে তখন বেশ ভীড় জমে গেছে। সুর্মার মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। এরা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। ওদের যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। পাড়ার লোক দূরের কথা, মা বাবাকেই মুখ দেখাতে পারবে না সে। মোটা লোকটি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি নাম ?'

'আমি অতীন সেন আর ও সুর্মা'।

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'শিলিগুড়িতে।'

'কেন ?'

'মাসিমার বাড়িতে।'

'এখানে কোথায় থাকো ?'

'বাহান্নর এ বাই টু চক্রবেড়িয়া।'

'ও কে হয় তোমার ?'

একটুও ইতস্তত না করে অতীন বলল, 'আমার বোন।'

'কিরকম বোন ?'

'নিজের ?'

'লোকটা সুর্মার দিকে ঘুরে বলল, 'ও সত্যি কথা বলছে ?'

সুর্মা সম্মোহিতের মত মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'মাসীমার বাড়িতে একা একা যাচ্ছ কেন ?'

'মাসতুতো বোনের বিয়ে তাই। বাবা মা দুদিন পরে আসবেন।' অতীন জবাব দিল। প্রথম লোকটা এবার জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তখন তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন ? প্রশ্নটা সুর্মাকে উদ্দেশ্য করে।

'ও একা যেতে চাইছিল না তাই !' অতীন বলে উঠল।

মোটা লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'একা কেন ? তুমি তো আছ ?'

অতীন বেমালুম বলল, আমাদের তো রিজার্ভেশন নেই। তাই আমি ওকে বললাম তুই জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠতে পারবি না যা ভিড় ! বরং লেডিজ

কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে বস। সঙ্গে সঙ্গে ও চিৎকার করতে লাগল একা একা সারা রাত্রি যেতে পারবে না।'

সুর্মা এরকম অবাক কখনও হয়নি। অতীন এত চমৎকার মিথ্যে অনায়াসে বলতে পারে! ওর মনে হচ্ছিল এই মিথ্যেটা লোকগুলো বিশ্বাস করুক তাহলে আর হাঙ্গামা হবে না। এখন কোনরকমে বাড়ি ফিরে যেতে পারলেই সে বাঁচে। মোটা লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাই নাকি?'

সুর্মা নীরবে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

এই সময় ট্রেনটা হুইস্‌ল দিয়ে উঠল। অতীন ব্যস্ত চোখে সেদিকে তাকাতে মোটা লোকটা সঙ্গীকে বলল, 'না হে মনে হচ্ছে ডালমে কোই কালা নেহি, তুমি এক কাজ করো, থিয়েটারের টি টিকে আমার নাম করে বলো ওদের এক সঙ্গে জায়গা করে দিতে! এইসময় ট্রেনটা ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছিল! যাত্রীরা যে যার কামরায় ওঠার জন্যে ব্যস্ত। প্রথম লোকটি ওদের তাড়া দিল, 'চল, এক্ষুনি গাড়ি ছাড়ল' প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে এল লোকটা থিয়েটারের কাছে। দরজায় দাঁড়ানো টি, টিকে উদ্দেশ্য করে বলল 'স্যার আপনাকে এদের দুটো জায়গা দিতে বলেছেন।' টি, টি ঘাড় কাৎ করতেই অতীন লাফিয়ে উঠে পড়ল। লোকটি প্লাটফর্মে দাঁড়ানো সুর্মাকে তাড়া দিল, 'ওঠ, ওঠ, এক্ষুনি ছেড়ে দেবে গাড়ি।'

সুর্মা চিৎকার করে বলতে গেল আমি যাব না, আমার যাওয়ার কোন কথা নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে ট্রেনটা দুলে উঠল। লোকটা তাকে যেন সাহায্য করার জন্যেই পেছন থেকে ঠেলে দিল আর অতীন তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে তুলল গাড়িতে। স্থির হয়ে দাঁড়াবার মুহূর্তে সুর্মা বুঝল প্লাটফর্মের আলো ছাড়িয়ে ঘন অন্ধকারে ট্রেনটা ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ তার মনে হল সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিছুই চোখে পড়ছে না। তারপর অনুভব করল অতীনের হাতে তার হাত। সে ক্রমশ অতীনের মুখ দেখতে পেল। কি শান্ত এবং আনন্দিত। চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সুর্মা বাইরে মুখ ফেরাল। কোলকাতার বাড়িঘরের আলো দূরে দূরে ছিটকে যাচ্ছে। আর তক্ষুনি বাবা, মা এবং উর্মির মুখ একসঙ্গে মনে পড়তেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। অতীন চাপা গলায় অনুনয় করছিল 'কাঁদিস না, লোকে সন্দেহ করবে।'

টি, টি, ভেতরে চলে গিয়েছিল। করিডোরে কেউ নেই। সুর্মা পাগলের মত কাঁদছিল। তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কাঁদতে কাঁদতে ও হাঁটু গেড়ে নিচে বসে পড়ল।

আমি কি করব বুঝতে পারছি না। আমার এত আনন্দ হচ্ছে, জীবনে এরকম কখনও হয়নি। ভগবান সুমিকে পাইয়ে দিলেন কি অদ্ভুতভাবে। অন্তত আজকের রাতটার জন্যে তো বটেই। এবং আজকের রাত হলে আমি চিরজীবন ওকে ছাড়ব না। অথচ আজ সকালেও আমি চিন্তা করিনি ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটবে! ওদের বাড়িতে তো যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠছিল না। ওর সঙ্গে দেখা হবে তাও ভাবিনি। কিন্তু ভগবান সেটা করিয়ে দিলেন এবং এই যে ও এখন ট্রেনের মেঝেতে বসে কাঁদছে সেটাও তাঁরই ইচ্ছায়। সত্যিকথা বলতে কি আজকের আগে আমি ভগবানকে পছন্দই করতাম না!

দরজাটা নড়ছে। হাওয়া ঢুকছে হু হু করে। বৃষ্টি কমে এসেছে। আমি ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, বেশ ঘরের মত হয়ে গেল। সুমি এখনও কাঁদছে। অন্য সময় হলে এবং জায়গাটা নিরিবিলি হলে ওকে কাঁদতে দিতাম। শুনেছি খুব কাঁদলে মন হালকা হয়ে যায়। কিন্তু এখন, যে কেউ এসে পড়লে বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম, 'সুমি', এই সুমি প্লিজ কাঁদিস না।'

সুমি আমার দিকে তাকাল। দুটো চোখ ফুলে উঠেছে, গাল জলে মাখামাখি। অদ্ভুত করুণ গলায় বলল, 'তুই আমার একি সর্বনাশ করলি? আমি এখন মুখ দেখাবো কি করে?'

কথাটা শুনে আমার মন কেঁপে উঠল। আমি ওর সর্বনাশ করলাম? যাকে আমি নিজের চেয়েও ভালবাসি; তার সর্বনাশ করা যায়? তবু বললাম, 'উপায় ছিল না, আমি তো তোকে নিয়ে যেতে চাইনি, পুলিশরাই তো জোর করে তোকে তুলে দিল।'

সুমি উঠে দাঁড়াল। এবং এতক্ষণে আমার খেয়াল হল ওর পোশাক ছেলেদের মত। সার্টপ্যান্ট পরতে এর আগে আমি কখনও দেখিনি। আমার অস্বস্তি হলেও বুঝতে পারলাম এই পোশাকে ওকে চমৎকার মানিয়েছে, বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে। দাঁতে ঠোঁট চেপে সুমি আমাকে দেখল, তারপর বলল, 'তুই মিথ্যেবাদী!'

'তার মানে? এই কথা মিথ্যে?' আমি অবাক গলায় বললাম।

'তুই ওই লোকগুলোর কাছে কিরকম মিথ্যে বললি! ছি ছি!'

'ও, তখন মিথ্যে না বললে এতক্ষণ থানায় পচতিস তা জানিস? বেশ, আমি তো তোর মুখ বন্ধ করে রাখিনি, তুই কেন পুলিশকে বললি না সব কথা! তাহলে তো এখন আফশোষ করতে হোত না?'

সুমি কথাটা শোনামাত্র মুখ নামাল। ওর ঠোঁট কাঁপছে। আমার ভয় হচ্ছিল ও যেন ফের না কেঁদে ফেলে। ও যে আমাকে মিথ্যেবাদী বলল তার জন্যে রাগ হল না আমার। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তুই এক কাজ কর, এর পরে ট্রেন দক্ষিণেশ্বরে থামবে, সেখানে নেমে চৌত্রিশ নম্বর বাসে চেপে বাড়ি ফিরে যা।' কথাটা বলার জন্যে বললাম, আমি কিছুতেই চাইছিলাম না ও ফিরে যাক।

সুমির চোখ যেন চট করে প্রাণ ফিরে পেল। ও সোজা হয়ে বলল, 'দক্ষিণেশ্বর! এখন ফেরা যাবে?'

'যাবে। দোহাই ততক্ষণ চুপ করে থাক। আমি মুখ ফিরিয়ে নিজেকে গালাগাল দিতে লাগলাম মনে মনে। কি দরকার ছিল রাস্তাটা বলে দেবার। সত্যি যদি ও চলে যায়? আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। শরীর টলতে লাগল। সেই মাসখানেক আগে যেমন হয়েছিল।

আমি জানি আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। পাগল হবার পর কি করেছিলাম সেকথা আমার মনে নেই। পরে শুনেছি বন্ধুদের কাছে। কিন্তু পাগল হয়েছিলাম বলেই বোধহয় কেউ চট করে আমার সামনে ও বিষয়ে আলোচনা করত না। সুমিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার বুকে সেদিন অদ্ভুত চাপ বোধ করেছিলাম। সুমিকে রাঁচিতে নিয়ে যাচ্ছে বিয়ে দেবার জন্যে? ওইদিন প্রথম বুঝতে পারলাম ওকে আমি কতখানি ভালবাসি। ইদানিং তো ওর সঙ্গে তেমন কথা হতো না। ওদের বাড়িতে সেই ছেলেবেলা থেকে যাচ্ছি, এক সময় কত খেলেছি, কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর দেখতাম ও কেমন গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। পড়াশুনায় খুব ভাল, তারপর নানান রকম বই পড়ে সারাদিন। আমার আবার বইপত্তর একদম ভাল লাগে না। ওরা যেদিন রাঁচিতে গেল সেদিন আমি কেমন ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছিলাম। সারাক্ষণ মনে হয়েছিল সুমিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। একবার ভেবেছিলাম ওদের বাড়িতে গিয়ে সুমিকে ডেকে সেকথা বলি। বাড়ির কাছে দুবার গিয়েও ফিরে এসেছি। সুমি যদি ওর বাবাকে ওই কথা বলে দেয়। ভদ্রলোক আমাকে ঠিক পছন্দ করেন না। অবশ্য মুখে কখনও সেকথা বোঝাননি। কিন্তু আমি জানি মেয়ের স্বামী হিসেবে তিনি আমাকে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। সুমির স্বামী হবে কোন অধ্যাপক অথবা বেশ সম্পন্ন মানুষ। আমার তো সেরকম যোগ্যতা কখনও হবার নয়। আমার ট্যাক্সি ডেকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কিছুতেই তা পারলাম না। আমারই ডেকে দেওয়া ট্যাক্সিতে সুমিকে বিয়ে

দিতে নিয়ে যাবে ওরা ? অসম্ভব ! দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম সুমি ওর মা-বাবার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠল তারপর আমার সামনে দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। আর আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হচ্ছিল আচমকা আমার খুব জ্বর হয়েছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পাড়ার একটা রকে চুপচাপ বসে রইলাম। সমস্ত আকাশ জুড়ে তখন সুমির মুখ ছাড়া কিছু নেই। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার পায়ের তলায় মাটি নেই, আমি শূন্যে ভাসছি।

সেই সময়টা থেকেই নাকি আমার পাগলামি শুরু হয়েছিল। আমি নাকি তারপর রাস্তায়, বাড়িতে সর্বক্ষণ চিৎকার করতাম ওর নাম ধরে।

পাড়ার লোকজন এই নিয়ে হাসাহাসি করত। আমি অবশ্য টের পেতাম না, কারণ কোন বোধ আমার কাজ করত না। তারপর হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে একসময় সেই মাটিটা পায়ের তলায় ফিরে এল। ডাক্তার বলেছে সাময়িক ডিসব্যালেন্স। কিন্তু তারপর থেকে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করত না। সুবিধা ছিল এই যে আমাকে কেউ ঘাঁটাতো না! হয়তো ভয় পেত, আবার যদি পাগল হয়ে যাই!

এখন আমার ঠিক সেই রকম হল। চোখের সামনেটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতরে অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে, পা টলছে। আমি দুহাত বাড়িয়ে দেওয়াল ধরতে চাইলাম। আমার কাঁধ থেকে ভারী ব্যাগটা পড়ে গেল, কিন্তু ওটাকে তোলার কথা মনে এল না। সুমির চিৎকার কানে এল, 'এই কি হয়েছে তোর ? অমন করছিস কেন ?'

কিন্তু ততক্ষণে আমার হাঁটুটা ভেঙে গেছে, আমি ট্রেনের মেঝেটায় শুয়ে পড়েছি। সুমি আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বারংবার ডাকছে কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারছি না। এই সময় অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পেলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার 'চেতনা আছে, কিন্তু আমি প্রকাশ করতে পারছি না।' আমি শূন্যে ভাসছিলাম না, এবার আমার পায়ের তলায় মাটিটা নড়েনি। একটা গলা কানে এল, 'কি হয়েছে ?'

সুমির নার্ভাস গলা শুনতে পেলাম, 'হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেছে।' এই সময় সুমিকে খুব আপন মনে হল, আন্তরিকতার সুর গলায় স্পষ্ট। একটা আঙুল আমার নাকের সামনে এল, 'না, নিঃশ্বাস পড়ছে। এরকম প্রায়ই হয় ?'

সুমি বলল, 'না!'

আর একটা গলা বলল, 'অম্বলে এরকম করে। উইন্ড চাপ দিলে সেন্স

থাকে না।'

প্রথম গলা বলল, 'একটু ধরুন তো ভাই, ওকে বাথে শুইয়ে দিই। আপনি মাথায় জল বুলিয়ে হাওয়া করুন, যদি সেন্স না আসে তাহলে বর্ধমানে কিছু করা যাবে।'

সুমি বলল, ওখানে তো ডাক্তার নেই।

'নামিয়ে দিতে পারি যদি চান। তবে মনে হয় জল দিলে সেন্স আসবে।'

ওরা আমাকে ধরাধরি করে একটা বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিল। লোকটা, সম্ভবত টি. টি. বলল, 'আপনাদের লাগেজ কোথায়?'

সুমির গলা শুনলাম, 'এই ব্যাগটাই শুধু। জল কোথায় পাব?'

'ওই তো ওখানে। বাইরে বেসিন থেকে নিয়ে আসুন।'

আর একজন বলল, 'এই মগটা নিয়ে যাও ভাই।' কণ্ঠটি মহিলার।

একটু পরে সুমির নরম ভিজে হাত কপালে অনুভব করলাম। আঃ, কি আরাম। সুমি খুব যত্ন করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে জল দিয়ে। ও আমার পেছনে রয়েছে। ট্রেনটা ছুটছে হু হু করে। এক সময় সুমি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই অতীন, এখন কেমন লাগছে?'

আমি ঠোঁট খুলেই বন্ধ করলাম। না, উত্তর দেব না। যে দক্ষিণেশ্বরে নেমে যাবে তার সঙ্গে কোন কথা বলব না। ওপাশের মহিলাটি বললেন, 'এখন কথা বলো না ভাই সেন্স আসতে দাও।' আর একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মৃগী নেই তো?'

সুমি উত্তর দিল, 'না।'

আমি কপাল, গাল, গলায় সুমিকে অনুভব করছিলাম। আঃ এখন এই অবস্থায় যদি মরেও যাই তাহলে এক ফোঁটা দুঃখ হবে না। সুমি আমাকে এমন করে ভালবাসুক। এমন সময় ট্রেনটার গতি কমে আসছিল। এতক্ষণ আমি মড়ার মত পড়েছিলাম। ট্রেনটা যখন থামব থামব করছিল তখন টি. টি-র গলা পাওয়া গেল, কি, কেমন আছে, সেন্স আসেনি? তাহলে এখানে—'

আমি আর দেরী করলাম না। মাথা নেড়ে আঃ আঃ বলে উঠলাম। তাতেও শান্ত না হয়ে বললাম, মা, মাগো! সঙ্গে সঙ্গে টি. টি. বলল, 'বাঃ, এই তো সেন্স এসে গিয়েছে। এই যে ভাই, কেমন আছ?'

আমি লক্ষ্য করলাম লোকটা সুমিকে আপনি বললেও আমাকে তুমি বলল, আমি খুব ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। আমার চোখের পাতা কাঁপছিল। কোনক্রমে যেন ঘাড় নাড়লাম, ভাল। টি. টি. জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছিল?

কি খেয়েছিলে ?

'নিমকি !' কোনরকমে বললাম !

ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, নিমকি খেয়েই আমার অম্বল হয়েছে। যা তা তেলে ওসব ভাজা হয়, এই আলোচনা চলল। টি. টি বলল, 'এখন যেতে পারবে তো ?' আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

টি টি. বলল, 'যাক, আর কোন চিন্তা নেই। ওকে একটু ঘুমুতে দিন।' যখন আর কেউ ধারে কাছে নেই, সুর্মি'র একটা হাত আমার কাঁধের ওপর তখন ওর চাপা গলা শুনতে পেলাম, 'আমি নামব !'

এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। চোখ খুললাম। সুর্মি উঠবার জন্যে সোজা হয়ে বসেছে। ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আমাকে ফেলে চলে যাবি ?' সুর্মি আমার চোখের দিকে তাকাল একটু যেন কেঁপে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে ওর চোখ জলে ভরে গেল। আমি দেখলাম ও চোখ বন্ধ করে একটু একটু করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে মাথাটা বেঁকিয়ে দিল। এক ফোঁটা জল টপ করে গাল বেয়ে নেমে আমার কনুইতে পড়তেই ট্রেনটা দুলে উঠে চলা শুরু করল। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাশের গঙ্গার ওপর ট্রেনটা যখন গমগম করতে করতে উঠে এল তখন সেই জলের ফোঁটাকে আমি অনুভূতিতে পাচ্ছিলাম না। আমি স্থির জানি সেটা কনুই বেয়ে গড়িয়ে পড়েনি।

আমি চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। কাঠের বেঞ্চিতে শুতে বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। আমার ব্যাগটাকে মাথার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিন্তু সেটা নিজে থেকে টেনে আনি কি করে। এখন উঠে বসলে সুর্মি নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে। ভাববে এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার ব্যাপারটাই ভাঁওতা। একেই অনেক মিথ্যে কথা অন্যলোকের সঙ্গে বলে ওর মনে অবিশ্বাস এনে দিয়েছি। এখন এমনিভাবে কিছুক্ষণ পড়ে থাকা যাক।

ট্রেনের দুলুনিতে চোখ বন্ধ করা থাকলে ঘুম এসে যায়। আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি শুয়ে আছি আর আমার মাথার পাশে বসে সুর্মি কাঁদছে। যদিও ওর এখনকার কান্নার কোন শব্দ নেই কিন্তু আমি সেটা টের পাচ্ছি। আচ্ছা, ও দক্ষিণেশ্বরে নেমে গেল না কেন ? আমি তো উঠিনি, বাধাও দিতাম না। লোকজন, যারা আমার দিকে তাকিয়েছিল উদ্বেগ নিয়ে তারা তো জ্ঞান হয়েছে জেনে নিজের নিজের কথায় ফিরে গিয়েছিল। সেইসময় টুক করে উঠে পায়ে পায়ে দরজার কাছে গিয়ে নেমে পড়লেই হোত। স্টেশন থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে এসব কথা বলে মায়ের

কাছ থেকে টাকা দিয়ে ভাড়া মেটাতে পারত। আমি কোন কারণ বুঝতে পারছি না। আমি সত্যি কাতর গলায় বলেছিলাম, 'আমাকে ফেলে চলে যাবি,' কিন্তু সেটা শুনে ও যেন পোড়া কলাগাছ হয়ে গেল। তবে কি সুর্মিও আমাকে ভালবাসে! আমার খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এখন উঠে কথা বললে—।

সুনীল প্রধানের সঙ্গে ভাগ্যিস বন্ধুত্ব ছিল নইলে আজ আমি ট্রেনেও উঠতাম না আর সুর্মিও আমার মাথার পাশে বসত না। সুনীল আমার সঙ্গে একবছর পড়েছিল। কার্সিয়াং-এর ছেলে, খুব হাসিখুসী, নেপালীরা শুধু বেঁটেই হয় না তা ওকে দেখে জেনেছিলাম। সুনীলের বাবার বেশ টাকা পয়সা আছে নইলে ও ওইরকম পোশাক আর ঠাটে হোস্টেলে থাকতে পারত না। সুনীলের সঙ্গে প্রথম বন্ধুত্ব হয়েছিল দিলীপের। দিলীপ আর আমি ছেলেবেলার বন্ধু। আমি পাগল হয়ে যাওয়ার পর, ওই শুধু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর আমি যখন আর কোলকাতায় থাকতে চাইছিলাম না, একটা চাকরি নিয়ে কোথায় যাবার পরিকল্পনা আঁটছিলাম তখন দিলীপই আমাকে সুনীলের কথা মনে করিয়ে দিল। কার্সিয়াং-এ সুনীলদের যা প্রতিপত্তি ওখানে গেলে আমার চাকরির অভাব হবে না। সুনীলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল দিলীপ। বেশ ভাব হয়েছিল আমাদের। এবছর ওর বাবা ওকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দার্জিলিং-এ নিয়ে গেছে। ওখানকার কলেজে পড়ে ওর বাবার ব্যবসায় সাহায্য করবে। সুনীলকে চিঠি দিয়েছি আমি সব কথা জানিয়ে। সব কথা মানে, আমি যাচ্ছি, একটা চাকরি চাই। সুর্মির জন্য কোলকাতা ছেড়ে যাচ্ছিলাম, সেকথা লিখিনি। আমার কোলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার খবর মাত্র দুজন জানে। দিলীপ আর সুনীল। দিলীপ কাউকে বলবে না বলে কথা দিয়েছে। এমন কি আজ সকালেও স্টেশনে এসে টিকিট কিনে দিয়ে গেছে আমার জন্যে। আর সুনীলের খোঁজ কোলকাতার কেউ পাবে না। এখন সুর্মি সঙ্গে থাকায় খুব হইচই হবে নিশ্চয়ই। সুর্মির বাবা পুলিশে খবর দেবেন কি? হয়তো দেবেন কিন্তু পুলিশ খুঁজে পাবে কি করে? সুর্মি যে আমার সঙ্গে দার্জিলিং যাচ্ছে কেউ ভাবতে পারে না।

সুনীল যদি চেষ্টা করে তাহলে দিন সাতেক হোটেলে থেকে যে কোন একটা চাকরিতে ঢুকে পড়তে পারব। আমার পকেটে এখন বারোশ টাকা আছে। এত টাকা আমি কখনও দেখিনি। বারোশ টাকায় দুজন মানুষের কতদিন যাবে?

নিশ্চয়ই তার মধ্যে আমার রোজগার শুরু হয়ে যাবে। আজই সোওয়া এক ভরি হার বিক্রি করে আমি তের'শ টাকা পেয়েছি। উফ্, বিক্রি করতে গিয়ে কি ঝামেলায় না পড়া গিয়েছিল। সোনার দোকানের লোকটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওটা চুরি করা নয়। আমরা বেশ নার্ভাস ছিলাম তাই লোকটা আমাদের ঠকিয়ে দিল। তা তের'শ টাকা কম কিসে। দিলীপকে একশ টাকা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু দিলীপ নেয়নি। বলেছিল, 'তোর এখন খুব দরকার হবে টাকার, তুই রাখ।' দিলীপের কথাই ফলে গেল। সুমি' সঙ্গে থাকলে টাকার তো দরকার হবেই। বাড়িতে অবশ্য এখনই খুব হইচই হবে না। আমি পাগল হয়ে যাওয়ার পর দাদারা খুব লজ্জিত এবং বিরক্ত হয়েছিল আমার জন্যে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আমি গম্ভীর হয়ে থাকলেও সেটা বুঝতে পারতাম। অতএব আমার চলে আসাতে ওদের কিছু ক্ষতি হবে না। মা তো জন্মঅবধি দেখছি সব ব্যাপারেই নির্লিপ্ত, তবে সেটা থাকবে কোন বিয়ের নেমন্তন্ন' না আসা অবধি। ততদিন মা নিশ্চয়ই তার হারের খোঁজ করবে না।

ট্রেনটা এখন হু হু করে ছুটছে। আমার বেশ ঘুমঘুম পাচ্ছে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে সারারাত আমার হুঁশ থাকে না। সুমি'কে একা বসিয়ে রেখে সেটা উচিত হবে না। তাছাড়া আজ দুপুরের পর খাওয়া হয়নি। নিমকির কথাটা মিথ্যে হলেও এখন সত্যি সত্যি খিদে পাচ্ছে। সুমি' কি খেয়েছে জানি না, তবে আজ রাত্রে খাবে না নিশ্চয়ই। জোর করে ঘুম তাড়াবার জন্যে, উঠে বসব ভাবছি ঠিক সেই সময় সুমি' জিজ্ঞাসা করল, 'অতীন, এই অতীন!'

আমি খুব ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। সুমি' একটু ঝুঁকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখ স্পষ্ট হতেই বলল, 'এখন কেমন লাগছে? কষ্ট হচ্ছে?' আঃ, এর চেয়ে আনন্দ আমার আর কি হতে পারে। বুক জুড়িয়ে গেল। আমি সামান্য মাথা নেড়ে উঠে বসতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুমি' বাধা দিল, 'না না ওঠার দরকার নেই। তুই শুয়ে থাক।'

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, 'না, আমি ঠিক হয়ে গেছি। তুই চোখ মোছ সুমি' এখনও জলের দাগ লেগে আছে।'

অতীন উঠে বসলে ওকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। যদিও বলল ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে হল কথাটা সত্যি নয়। ও অবশ্য একটু আগে জলের মত মিথ্যে কথা বলেছে আর আমি অবাক হয়েছি। কিন্তু এখন তো মিথ্যে বলার দরকার ছিল না। প্রায় দুঘণ্টা হল আমরা ট্রেনে উঠেছি। যাত্রীরা নিজের বাঙ্কে বিছানা করে রাত্রের খাওয়া শুরু করেছে। আমাদের সঙ্গে ওসব কিছুই

'নেই বলে সবার চোখে পড়েছি। এই সময় টি, টি, কাছে এসে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে ভাই ?'

অতীন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। লোকটি বলল 'আমি মালদায় নেমে যাব। তবে তোমাদের ভয় নেই, আমি ওখান থেকে যে টি, টি, উঠবে তাকে বলে যাব, মানে এই ব্যর্থ দুটোর জন্যে বুঝলে ?'

অতীন আবার ঘাড় নাড়ল। এবং সেই সময় ট্রেনটার স্পিড কমে আসতে টি, টি, বলল, 'বর্ধমান আসছে।' বলে চলে গেল।

অতীন উঠে দাঁড়াল। আমি এটা একদম চাইছিলাম না। ওর চোখের রঙ এখনও লালচে। সেটা তো মিথ্যে নয়। আর একটু শুয়ে থাকতে পারত। কিন্তু ও ততক্ষণে এগিয়ে গেছে বেসিনের দিকে। জলে মুখ ধুয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল মুখে জল চকচক করছে। এগিয়ে এসে বলল, 'ব্যাগটা দে তো, তোয়ালে বের করব।'

পেছন থেকে ব্যাগটা বের করে এগিয়ে দিতে গিয়ে নিজেই সেটাকে খুললাম। তোয়ালেটা একদম ওপরেই ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলাম। মুখ মুছে পরিষ্কার হয়ে আমায় ফেরত দিতে আমি ওটাকে স্বস্থানে রেখেছিলাম। অতীন বলল, 'এর পরে কোথায় থামবে জানি না, তাই রাতের খাবার বর্ধমান থেকেই কিনে নেব। কি খাবি ?'

আমার খিদে লাগছে না, খাব না। সত্যি আমার ওসব বোধ ছিল না।

'বোকার মত কথা বলিস না। অতটা রাত সামনে, না খেলে শরীর খারাপ করবে। আমার ওপর রাগ করে নিজের শরীরটাকে কষ্ট দেবার কোন মানে হয় না।'

'আমি কারও ওপর রাগ করিনি।'

'করেছিস।'

কি বলব আমি। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ভাগ্য ছাড়া আমি কার ওপর রাগ করতে পারি। এইসময় ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই যাত্রীরা দরজার দিকে ছুটল। অতীনও আর দাঁড়াল না। আমি বেঞ্চের ওপর পা তুলে ঠেস দিয়ে বসলাম। প্যাসেজের পাশের ডবল বার্থটা আমাদের দেওয়া হয়েছে। ফলে গায়ের ওপর দিয়ে লোক যাচ্ছে ঘনঘন। এই কদিন আগে বাবার সঙ্গে রাঁচীতে গিয়েছিলাম ফার্স্টক্লাশের কুপে। অফিস থেকে বাবা খরচ পান। একটা ঘরে আমরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। কি আরামেই সেই যাওয়া। তারপরেই মনে পড়ল আমার ক্লাশটেস্ট। সেই পরীক্ষা আমি দিতে পারব না। আমার জন্যে হয়তো

কোন ভাল জিনিস আর কখনো অপেক্ষা করবে না। এই সময় কানে এল মাইকে ঘোষণা করছে ডাউন হাওড়া লোকাল দু'নম্বর প্লাটফর্ম থেকে এখনই ছাড়বে। মনের মধ্যে আনচান করে উঠল, ওই ট্রেনে গিয়ে উঠলে আজকের রাত্রেই নিশ্চয়ই কোলকাতা পেঁছে যেতে পারি। উঠে দাঁড়ালাম তড়াক করে। আর তখনি অতীন বিরাট ঠোঙা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'ধর। আমি হাত ধুয়ে আসি।'

ঠোঙাটা নিয়ে আমি ধীরে ধীরে বসলাম! জানালা দিয়ে দেখলাম ওপাশে দাঁড়ানো একটা খালি ট্রেন বিপরীত দিকে চলতে শুরু করল। শক্ত চোখে ট্রেনটার চলে যাওয়া দেখলাম। আমি কাঁদলাম না। কি হবে কেঁদে। আমার ভাগ্যে কি হবে আমি জেনে গেছি।

হাত ধুয়ে এসে অতীন বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। তুই হাত ধুবি না?'

একটুও ইচ্ছে করছিল না। খাওয়ার কোনো বাসনাই নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম উল্টোদিকের বেঞ্চিতে বসে সেই মহিলা এবং অন্যান্যরা আমাদের দেখেছেন অতএব আমি উঠলাম। বেসিনে হাত ধুয়ে এসে ঠোঙা খুললাম। গরম পুরি তরকারী আর জিলিপি এনেছে অতীন। বেশীর ভাগ ওকে দিয়ে নিজের জন্যে সামান্য রাখলাম। খাওয়া শেষ হলে হাত ধোওয়ার পর অতীন বলল যাঃ, জল খাবো কি করে? এই জল তো খাওয়া যাবে না!'

মহিলাটি বললেন, 'তোমরা আমাদের জল নিতে পারো।' বলে একটা জলের বোতল এগিয়ে দিলেন। অতীন একটুও দ্বিধা না করে তা থেকে কয়েক ঢোক খেয়ে ঢেঁকুর তুলল। আমি সামান্য খেয়ে বোতলটা এগিয়ে দিতে মহিলা বললেন, 'তোমরা একদম খালি হাত হয়ে এসেছ, কি ব্যাপার?'

অতীন বলল, 'একটা বাস্কেটে ওসব ছিল। তাড়াহুড়োতে ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় ফেলে এসেছি।'

'ওমা! পুলিশকে খবর দিয়েছ?'

'দিলে তো আর পাওয়া যেত না এখনই। সুমি', তুই এখনই শুয়ে পড়বি?'

আমি বুঝলাম ও কথা ঘোরাচ্ছে। অতীন এখনও কি সুন্দর মিথ্যে কথা বলল। ও যে এ ব্যাপারে এত পোক্ত তা আমি জানতাম না। বললাম, 'তুই শুয়ে পড়।'

'আমি ওপরে শুচ্ছি, তুই নীচে শো।' ব্যাগটা ওপরের বাঙ্কে রেখে অতীন

তা থেকে একটা চাদর বের করে নিচের বেঞ্চিতে পেতে দিয়ে বলল, 'এই ব্যাগে মাথা রেখে শুয়ে পড়।'

'আমি অবাক গলায় বললাম, 'তুই ?'

ও হাসল, 'আমার দরকার হবে না। আমার আরাম আমি পেয়ে গেছি।'

বুঝলাম না কথাটা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় ?'

চাপা গলায় ও উত্তর দিল, 'এই তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে। এখন আমার চেয়ে সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। বালিশের চাদরের তাই দরকার হবে না।'

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি শুয়েছিলাম। ট্রেন হু হু করে ছুটছে। ওপরে ওঠার আগে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে অতীন। ও যে আমার কোন কষ্ট না হয় তার জন্যে সজাগ রয়েছে। ও যা বলছে তা কি ঠিক ? ওকি সত্যি আমাকে এরকম ভালবাসে ? হঠাৎ আমার বুকের ভেতর কাঁপুনি এল। পাগল হয়ে অতীন রাস্তায় চিৎকার করেছিল, আই লাভ ইউ সুর্মা। পাগলরা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলে না।

চোখ বন্ধ করতেই বাবার মুখটা ভেসে উঠল। বাবা এখন কি করছেন ? মা ? উর্মি ? এখন রাত কত আমি জানি না ! নিশ্চয় স্বপ্নাদের বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হয়ে গেছে। বাবা এতক্ষণে পাগলের মত চারধারে খুঁজছেন আমাকে। মা কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কি করতে পারেন ! বাবার মুখ মনে পড়তেই চাপা কান্নাটা ছিটকে এল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইলাম। দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরানো বলে কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের দুজনকে যদি কেউ ট্যাক্সিতে দেখে থাকে তাহলে বাবা নিশ্চয়ই অতীনের বাড়িতে যাবেন। বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবেন না আমি অতীনের সঙ্গে এভাবে কোথাও চলে যাব ! আমার এতদিনের শিক্ষা রুচির সঙ্গে মিলিয়ে এটা কখনও হতে পারে না। আমি জানি আজ রাত্রে ওরা কেউ ঘুমুতে পারবেন না। হয়তো পুলিশে খবর দেবেন বাবা। কিন্তু অতীন যে দার্জিলিং যাচ্ছে সেটা তো কেউ জানতে পারবে না। আমি যেভাবে চলে এসেছি খালি হাতে তাতে আমার পক্ষে বেশি দূর যাওয়া তো সম্ভব নয়। আমি যেন দেখতে পেলাম বাবা বলছেন, সুর্মি আমাকে না বলে চলে গেল ! কি দুঃখ ছিল ওর যে আমাকে একবার বললও না।

আমি বাবাগো বলে ডুকরে উঠতে গিয়ে কোনরকমে নিজেকে একটু সামলালাম। ঠিক করলাম যেখানে যাচ্ছি সেখানে পেঁছেই বাবাকে একটা চিঠি লিখব। সব কথা স্পষ্ট করে লিখে বলব, 'বাবা তুমি এসো' কথাটা ভাবতে বুকের ভেতরটা

একটু সহজ হল। আমি স্থির হলাম।

হঠাৎ হাতের ওপর স্পর্শ পেতে চমকে সোজা হলাম। ট্রেনের ভেতর এখন ঘুমের রাজত্ব। কোথাও মানুষের শব্দ নেই। একটানা গাড়ির চাকার ধাতব আওয়াজ ছাড়া কিছু নেই। আমার পায়ের কাছে অতীন বসে আছে। কখন নেমে এসেছে জানি না, চোখাচোখি হতেই বলল, 'সুর্মি', প্লিজ, প্লিজ, কাঁদিস না। তুই বিশ্বাস কর তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। তোকে আমি—।' ও আমার হাত আঁকড়ে ধরল, 'তুই আমার ওপর একটু আস্থা রাখ, দেখবি তোকে কখনও কষ্ট দেব না। সুর্মি আমাকে একটু ভালবাসা দে আমি আর কিছু চাই না।'

কেন জানি না, এখন এই রাত্রে যে আমি একটু আগে বাবার জন্য কাঁদছিলাম সেই আমার মনে ক্রমশ একটা মায়ার আকাশ তৈরি হয়ে গেল। আমার এই বয়স পর্যন্ত কোন পুরুষের মুখে এমন আকুতি শুনতে পাইনি। অতীন ভিক্ষে চাওয়ার মত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কোনরকমে বললাম, 'ঠিক আছে। আমি আর কাঁদব না, যা তুই শুয়ে পড়।'

সুর্মার মা স্বপ্নাদের বাড়ি থেকে নেমে এসে কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। একটু আগে স্বপ্নেন্দু ফিরেছেন। ওঁর আজ রাঁচিতে যাওয়া হয়নি। অফিসের কাজ শেষ হয়নি এখনও। একটু আগে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি এসে সুর্মাকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বৃষ্টি ধরতেও যখন এল না তখন সুর্মার মা নিজে এসে খোঁজ নিয়েছিলেন স্বপ্নাদের বাড়িতে। সুর্মা নাকি সেই বিকেল বেলায় ডায়েরী নিয়ে বেরিয়ে গেছে, বেশীক্ষণ বসেওনি।

বাড়ি গিয়ে দেখলেন সুর্মা আসেনি। বৃষ্টিতে পথে আটকে থাকলে এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল। স্বপ্নেন্দু বললেন, 'ও তো এরকম কখনও করে না। দিনকাল ভাল নয়, অ্যাক্সিডেন্ট হল কিনা কে জানে।'

সুর্মার মা বললেন, 'পাড়ার মধ্যেই ছিল, সেরকম কিছু হলে জানতাম না ?'

নটা বেজে গেলে অস্থির হয়ে স্বপ্নেন্দু বের হলেন। দুবার পাড়াটা পাক দিয়ে ইয়ং বুলেটস-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকটি ছেলে বারান্দায় বসে আড্ডা মারছে। এদের তিনি খুবই অপছন্দ করেন। তবু মনে হল এরা দেখে থাকতে পারে সুর্মাকে। ওদের মধ্যে একটি পরিচিত মুখকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা এখানে কতক্ষণ ধরে আছ ?'

'কেন বলুন তো !'

'আমার মেয়ে সুর্মাকে তো চেন ! ও বাড়ি ফেরেনি তাই—।'

স্বপ্নেন্দুর কথাটা শেষ করতে অস্বস্তি হচ্ছিল। এখনই কথাটা হাওয়ায়

ভেসে বেড়াবে।

'না তো ওকে দেখিনি। কোথায় গিয়েছিল ?' ছেলেরা উৎসুক হল।

'ওর বন্ধু স্বপ্নার বাড়িতে। তা সেখান থেকে বিকেলেই বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় যে গেল। ওর মা কান্নাকাটি করছে। আচ্ছা ভাই চলি!' স্বপ্নেন্দু পা বাড়াতেই ছেলেটা বলল, 'আমরা তো বৃষ্টির পর এসেছি। ঠিক আছে আমরা দেখছি।'

স্বপ্নেন্দু বড় রাস্তা অবধি এসে আবার ফিরে গেলেন। মনে হল বাড়িতে ফিরে নিশ্চয়ই মেয়েকে দেখতে পাবেন। দরজায় স্ত্রী দাঁড়িয়ে, ওঁকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'পেলে ?'

'বাড়িতে আসেনি ?'

'না।'

'তাহলে— ?' স্বপ্নেন্দুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আর তখনই সুর্মার মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, কি হল মেয়েটার! তুমি খোঁজ নাও, আমার ভয় করছে।'

পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন বেরিয়ে এল। মুহূর্তেই সমস্ত পাড়াময় খবরটা চাউর হয়ে গেল। সুর্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না, বিকেলে বেরিয়ে বাড়ি ফেরেনি। এক একজন এক একরকম পরামর্শ দিতে লাগল। পুলিশে খবর দেওয়ার আগে একবার ওর মামীর বাড়িটা দেখে আসা দরকার। কোন অভিমান করে মেয়ে যদি সেখানে গিয়ে বসে থাকে। অবশ্য সে রকম মেয়ে সুর্মা নয়, তবু স্বপ্নেন্দু কোন চান্স নিতে চাইলেন না। বাড়ি থেকে বের হতেই ইয়ং বুলেটস-এর ছেলেগুলোকে দেখতে পেলেন তিনি। ওরা বোধহয় তাঁর কাছেই আসছিল। পরিচিত ছেলেটি বলল, 'কাকাবাবু, একটা হদিশ পেয়েছি।'

বুকের মধ্যে ঢেউ উঠল যেন ছলাৎ করে। স্বপ্নেন্দু তাকালেন।

'বৃষ্টির জন্যে পাড়ার ফুচকাওয়ালা পালিয়ে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি তখন ও দেখতে পেয়েছে সুর্মা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অতীনের সঙ্গে কথা বলছিল।'

'অতীনের সঙ্গে!' স্বপ্নেন্দু অবাক হলেন।

'হ্যাঁ।' আপনি অতীনের কেসটা জানেন তো ?

'না।'

অতীন আপনারা রাঁচি চলে যাওয়ার পর পাগল হয়ে গিয়েছিল! রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করত সুর্মার নাম ধরে।

'সেকি! কেন ?'

ছেলেগুলো উত্তর না দিয়ে নিজেদের মধ্যে হেসে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

'না না, এ তোমরা ঠিক বলছ না!' স্বপ্নেন্দুর পায়ের তলার মাটি যেন টলছিল। সুর্মা এই বয়সে অতীনের মত ছেলেকে কখনই প্রশ্রয় দেবে না। এরা সত্যি কথা বলছে না।

ছেলেটি বলল, 'সুর্মার দোষ আছে কিনা জানি না কিন্তু অতীনের ঘটনাটা সত্যি। আমাদের মনে হয় একবার অতীনের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলে সুর্মা কোথায় আছে জানা যাবে। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।'

স্বপ্নেন্দু কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। সুর্মার সঙ্গে অতীনের কোন যোগ থাকতে পারে না। হয়তো পথে দেখা হয়েছে, দু'একটা কথা বলেছে আর তখন ফুচকাওয়ালা দেখে থাকতে পারে। তার মানেই সুর্মা আর অতীন কোথাও গিয়েছে এ তিনি মানতে পারেন না। ফুচকাওয়ালা অবশ্য সুর্মাকে অনেকদিন থেকেই চেনে কিন্তু তার কথাটাই ছেলেটিকে বললেন, তুমি একা গিয়ে অতীনকে ডেকে আনো। দলবেঁধে যেয়ো না, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

ছেলেটি একটু বাদেই একা ফিরে এল। এসে বলল, 'অতীন বাড়িতে নেই কাকাবাবু। আজ বিকেলে কোথায় চলে গেছে।'

স্বপ্নেন্দু চিন্তিত হলেন, 'অতীন বাড়িতে নেই!' তাহলে—! আর অপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। সোজা চলে এলেন অতীনের বাড়িতে। এদের সবাইকে তিনি চেনেন। একসময় পাশের বাড়িতে থাকতেন এঁরা।

অতীনের মা, প্রৌঢ়া এবং সাদাসিধে মহিলা, বললেন, 'সে বাড়িতে নেই।'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'শুনলাম। আমার মেয়েকেও পাচ্ছি না। খবর পেলাম আজ বিকেলে ওদের দেখা হয়েছিল। অতীন কোথায় গিয়েছে?'

'বলে যায়নি।'

'কখন ফিরে আসবে বলেছে?'

'না। একটা ব্যাগে জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে।'

'কি আশ্চর্য! আপনার ছেলে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলেন না?'

'আজকাল আমাদের সঙ্গে কথা বলত না ও। আপনার মেয়ের জন্যেই তো এই দশা!'

'আমার মেয়ে? কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি! আপনার মেয়ের জন্যেই আমার ছেলে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওইটুকু ছেলের মনে দুঃখ দিলে ভগবান সইবেন না।' অতীনের মা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। স্বপ্নেন্দু বিরক্ত হলেন, আপনি কিছু না জেনে কথা বলছেন। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। ইদানিং

কথাও বলত না ওরা। অতীন যদি মনে কিছু ভাবে তার জন্যে কেউ দায়ী নয়। কিন্তু আপনি মা হয়ে ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না 'সে কোথায় যাচ্ছে! কোথায় যেতে পারে সে ?'

'আমি জানি না। ইদানীং কেউ ওকে পছন্দ করত না। কাল রাত্রে বলছিল কোথায় গেলে চাকরি পাবে! হয়তো দুর্গাপুরে গিয়েছে।' অতীনের মা জানালেন।

'দুর্গাপুরে কে আছেন ?'

'ওর কাকা।'

'ওখানে কখনও অতীন এর আগে গিয়েছে ?'

'না।'

স্বপ্নেন্দু কি করবে বুঝতে পারছিলেন না। এইসময় ইয়ং বুলেটস-এর একটি ছেলে বলে উঠল, 'মাসীমা, অতীন যাওয়ার সময় কি কি জিনিস নিয়ে গেছে ?'

'তোয়ালে সোয়েটার বের করে নিল আলমারি থেকে।'

'সোয়েটার ? এখন সোয়েটার নেবে কেন ? দুর্গাপুরে তো প্রচণ্ড গরম! ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। কাকাবাবু, আপনি থানায় খবর দিন। ছেলেটি বলল।

সেই রাত্রেই থানায় এলেন স্বপ্নেন্দু। এসে অবাক হলেন। ও'র কলেজ জীবনের সহপাঠী প্রণব এখন ওই থানায় পোস্টেড। এত বছর বাদেও চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি। স্বপ্নেন্দু সব খুলে বলার পর প্রণব ডায়েরীতে লিখে নিল। তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোমার মেয়েকে ছোকরাই লোপ করেছে।'

'কিন্তু কি করে করবে ? ওরা তো সমবয়সী বলা যায়! পাড়া থেকে ধরে নিয়ে গেলে সে একা পারবে কেন ? আর পাড়ার লোক জানবে না ?' স্বপ্নেন্দু প্রতিবাদ করল। প্রণব হাসলো, 'কিছু মনে কোরোনা, তুমি কি করে নিশ্চিন্ত হচ্ছো যে তোমার মেয়ে ছোকরার প্রেমে পড়েনি ?'

'আমি আমার মেয়েকে চিনি।'

'তোমার মেয়ে কোন লাগেজ নেয়নি সঙ্গে ?'

'কিছু না। সত্যি কথা কি ও বাড়ি থেকে বের হতেই চায়নি।'

'এই জায়গাটায় আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। প্ল্যান করে গেলেও সঙ্গে জামাকাপড় নিতো। ছেলেটার কোন বন্ধুবান্ধব আছে ?' প্রণব জিজ্ঞাসা করল।

'আমি জানি না। তুমি যে করেই হোক মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনো ভাই।' স্বপ্নেন্দু সহপাঠীর হাত জড়িয়ে ধরল। প্রণব বলল, 'একটু শক্ত হও। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন চল তো ছেলেটার সম্পর্কে খোঁজ নিই!'

পুলিশের গাড়ি করে স্বপ্নেন্দু পাড়ায় ফিরে এল। রাত দশটা বেজে গেছে তবু রকে রকে ভিড়। শুধু মেয়ে নয় সঙ্গে একটি ছেলেও উধাও, এই রসময় বার্তা সবাইকে বেশ তপ্ত করেছিল। অতীনের পাগল হওয়ার পেছনে সুর্মার সক্রিয় হাত ছিল তা এতদিনে প্রমাণিত হল পাড়ার লোকের কাছে। প্রণব স্বপ্নেন্দুকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে অতীনের বাড়িতে চলে গেল। স্বপ্নেন্দুর নিজের বাড়িতে ঢুকতে ভয় করছিল। সুর্মার মা এখন কি অবস্থায় আছে কে জানে! সামনের বাড়ির এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন সামনে, বললেন, 'আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

স্বপ্নেন্দু ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আজকালকার ছেলেমেয়ে, এদের জোর করে বাধা দিলে এইরকম হয়!'

স্বপ্নেন্দু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। তিনি কি করে এদের বোঝাবেন যে সুর্মা তেমন মেয়ে নয়। বাধা দেওয়ার কোন কথাই ওঠেনি। এই মুহূর্তে তাঁর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল মেয়ের ওপর। এতদিন ধরে তিলে তিলে মনের মত করে যাকে গড়েছেন সব ভালবাসা, রুচি দিয়ে, সে এইভাবে শাস্তি দিল?'

একটু বাদেই প্রণব ফিরে এল গাড়ি নিয়ে। নেমে জিজ্ঞাসা করল 'দিলীপ কে? কোথায় থাকে জানো?'

ইয়ং বুলেটস-এর একটি ছেলে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দিলীপ গাঙ্গুরামের পাশের বাড়িতে থাকে। অতীনের বন্ধু।'

দিলীপ বাড়িতেই ছিল। পুলিশ দেখে মুখ শুকিয়ে গেছে ছেলেটার। বড়জোর বছর সতের বয়স হবে। ওর বাড়ির লোক হতভম্ব। প্রণব তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম তো দিলীপ। অতীনের বন্ধু?'

দিলীপ কিছু বলল না। বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল।

'অতীন কোথায় গিয়েছে?'

'জানি না।'

'সঙ্গে কে গিয়েছে?'

'আমি কিছুই জানি না।'

'জানো না! তোমার সঙ্গে ওর কবে দেখা হয়েছিল?'

একটু ইতস্তত করে দিলীপ বলল, 'গতকাল।'

'কি কথা হয়েছিল ?'

'তেমন কিছু না। ও হাসপাতাল থেকে এসে খুব কম কথা বলত।'

'কোথায় চাকরি করতে যাবে বলেনি ?'

'না। বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।'

'সুর্মাকে চেন ?'

'চিনি। কিন্তু কখনও কথা বলিনি।'

'সুর্মার কথা অতীন তোমাকে বলত ?'

'এখন বলত না।'

প্রণব খানিক ভাবল তারপর বলল, 'হুম। তুমি আমার সঙ্গে চল।'

'কোথায় ?'

'থানায়। কারণ তুমি সত্যি কথা বলছ না।' প্রণব ওর হাত ধরল।

'বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।' প্রায় কঁকিয়ে উঠল দিলীপ।

স্বপ্নেন্দু এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার বললেন, 'ভাই, তুমি যা জানো বলে দাও, খামোকা দেরি করলে মেয়ের বিপদ হতে পারে!'

'আমি কিছু জানি না।' দিলীপ শরীর বেঁকাচ্ছিল।

প্রণব একজন কনস্টেবল ডাকতেই দিলীপ বলে ফেললো 'ও দার্জিলিং-এ গিয়েছে। আজকের ট্রেনে।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'দার্জিলিং!'

প্রণব কড়া গলায় ধমকালো, 'এতক্ষণ মিথ্যে কথা বলছিলে কেন ?'

'অতীন আমাকে শপথ করিয়েছিল যেন কাউকে না বলি। বিশ্বাস করুন এর বেশী কিছু জানি না!' প্রায় কেঁদে ফেলল দিলীপ।

'দার্জিলিং-এ কারো কাছে গিয়েছে ?'

'আমাদের সঙ্গে পড়ত একটি নেপালী ছেলে, তার কাছে।'

'কি নাম তার ?'

'সুনীল প্রধান। ওখানকার কলেজে পড়ে। কার্শিয়াং-এ থাকে।'

'দার্জিলিং না কার্শিয়াং ?'

'কার্শিয়াং।'

'অতীন একা গিয়েছে ?'

'হ্যাঁ। আজ সকালে টিকিট একটা কিনেছে ও।'

'টাকা পেল কোথায় ?'

দিলীপ আর একবার চেষ্টা করল মিথ্যে কথা বলতে কিন্তু সে এমন ভেঙ্গে

পড়েছিল যে পারল না। সবকথা জেনে প্রণব দিলীপের বাবাকে বলল, 'আপনার ছেলেকে আমি থানায় নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু ওর কথা যদি সত্যি হয় আমি কিছু বলব না। ওকে বাড়িতে আটকে রাখুন।'

সেই রাত্রেই প্রণব অতীনের মায়ের হারের হদিশ বের করল। স্যাকরা স্বীকার করল তেরশ টাকায় সে হারটা কিনেছে। মাঝরাত্রে স্বপ্নেন্দুকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে প্রণব বলল, 'মনে হচ্ছে মেয়েটা অতীনের সঙ্গেই গিয়েছে। আমি এখনই লালবাজারে খবর দিচ্ছি যাতে এন. জে. পি. স্টেশনে ওদের ধরে ফেলতে পারে। তুমি চিন্তা করো না কিছু।'

বাড়িতে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেলেন স্বপ্নেন্দু। সুর্মার মা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে অন্ধকার ঘরে। স্খলিত পায়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন তিনি। আলো জ্বালাতেই দেওয়ালের দিকে চোখ চলে গেল। পেছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সুর্মা ঘাড়ে মুখ রেখে হাসছে। সহজ ঝকঝকে হাসি। একটু মলিনতা নেই কোথাও। সন্ধে থেকে যা হয়নি, নিজেকে সামলে রেখেছিলেন প্রাণপণে, ওই ছবির দিকে তাকিয়ে আর পারলেন না। হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন স্বপ্নেন্দু। ওই উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগলেন, 'এ তুই কি করলি মা, আমি যে তোকে— !'

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। কাল অনেক রাত অবধি জেগেছিলাম। সুর্মা কথা রেখেছিল, আর কান্নাকাটি করেনি। ঘুম ভাঙ্গতেই চেয়ে দেখলাম, ও ছোট্টটি হয়ে ঘুমুচ্চে। ভীষণ মায়া হল দেখে। তারপরেই মনে পড়ল ওর টিকিট নেই। রাত্রিবে আমার অনুস্থতা কিংবা রেলপুলিশের অনুরোধে, যাই হোক না কেন, টি. টি. আমাদের কাছে টিকিট চায়নি। মালদা থেকে যে উঠেছিল তাকে আমাদের কথা বলে গিয়েছিল লোকটা। কিন্তু মেইন গেট পেরোতে গেলেই তো টিকিট দেখাতে হবে। আমি নামলাম। নতুন টি. টি. বসে ঢুলছিল। তার কাছে গিয়ে বললাম, 'শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলব !'

লোকটা চোখ খুলে আমায় দেখল। তারপর বলল, 'কি কথা ?'

আমি অম্লান বদনে বললাম 'আপনার আগের টি. টি. আপনাকে পনেরটা টাকা দিতে বলে গেছেন !' কথা শেষ করেই ওর হাতে টাকাটা গুঁজে দিলাম। লোকটা সেটাকে বেমালুম পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে বের হতে হবে। ট্রেন থামলেই নেমে পড়বে।'

একটা ফাঁড়া কাটলো। বাইরে তখন আলো ফুটছে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। দূরে পাহাড়ের রেখা ফুটছে আকাশের গায়ে। এদিকে আমি কখনও এর

আগে আসিনি। কিন্তু সেদিকে আমার তাকানোর সময় নেই। যদি সুমার বাবা পুলিশকে খবর দেন আর পুলিশ যদি কোন রকমে জানতে পারে তাহলে হয়তো—। অবশ্য আমার দার্জিলিং-এ আসার খবর দিলীপ ছাড়া আর কেউ জানে না। দিলীপ শপথ করেছে কাউকে বলবে না তবু বিশ্বাস কিছু নেই। আমি ঠিক করলাম কোনরকম ঝুঁকি নেব না।

সুমার পায়ের পাশে বসতেই ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। মুখচোখ ফোলা, কপালের ওপর ভাঙ্গাচুল, চট করে উঠে বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন লাগছে এখন?' প্রশ্নটা করার কোন মানে নেই, তবু কিছু বলতে হবে তো! ও আমার দিকে তাকাল। ট্রেনটাকে দেখল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কটা বাজে!' আমার হাতে ঘড়ি নেই। আন্দাজে বললাম, 'ছটা বেজে গেছে মনে হয়।'

ও উদাস চোখে কামরার ভেতরে তাকাল। ও কি ভাবছে এখন? এই সময় কলেজে যাওয়ার কথা, ওর কি তাই মনে পড়ছে? আমি উঠে জানলার খড়খড়ি তুলে দিলাম। টাটকা বাতাস এসে শরীর জুড়িয়ে দিল। দূরে পাহাড়ের আদল এখন অনেকটা স্পষ্ট। অতি দ্রুত বলে উঠলাম, 'দ্যাখ দ্যাখ কি সুন্দর পাহাড়!'

সুমা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ওর চোখে মুখে ভাললাগা ছড়িয়ে পড়তেই আমার মন ভরে গেল। মুগ্ধ হয়ে সুমা উত্তর বাংলার প্রকৃতি দেখছে। উল্টো দিকে সূর্য উঠছে কিন্তু তার আলো মাখছে এদিকের আকাশ। মাঠ-জঙ্গলকে দুপাশে ছুঁড়ে ফেলে আমাদের ট্রেনটা ছুটছে। কিছু দূরে ভিজে পিচের রাস্তায় ভাবী ভারী লরি চলেছে একের পর এক।

হঠাৎ আমার মনে হল কাল রাত থেকে একবারও আমি আমার বাড়ির কথা ভাবিনি। মা কিংবা দাদাদের মুখ একবারের জন্যেও মনে পড়েনি। আর আর। সে কথা একটুও ভাবতে চাই না। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে কখনও ভাবব না। আমার অতীত আমি এই মুহূর্তে একদম ভুলে যেতে চাই। দার্জিলিং কিংবা কার্শিয়াং-এ আমি চাকরি পেলেই একটা বাড়ি ভাড়া নেব। সুমার যদি ইচ্ছে হয় তাহলে পড়াশুনা করবে, আমি কোন আপত্তি করব না। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার খুব ভাল লাগছিল।

ট্রেনের স্পিড কমে আসতে আমি দূরে লোকালয় পেলাম। সুমা চুপচাপ বসেছিল। আমি তোয়ালেটা বের করে বললাম, 'যা. বেসিন থেকে মুখ ধুয়ে আয়।'

ও ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকাল, কি ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেল

টয়লেটে। আমি ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে অন্য টয়লেট থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখলাম সুর্মা ব্যাগটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকছে। যাত্রীদের ঠেলাঠুলির মধ্যে আমরা চেকারের পেছন পেছন বেরিয়ে এলাম। সবাই যে দিকে যাচ্ছে চেকার সেদিকে গেল না। বাঁদিকের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, 'ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও।' সেখানে আরো কিছু কালোকোট পরা লোক ছিল তারা আমাদের দেখে হাসল। আমি আর কথা বাড়ালাম না। সুর্মাকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটু ঘুরে ওভারব্রিজ পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক দঙ্গল রিক্সা আর ট্যাক্সির সঙ্গে কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে চায়ের স্টল দেখে সুর্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চা খাবি ?'

সুর্মা মাথা নাড়ল, 'আমি চা খাই না।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আমরা কোথায় যাব ?'

'কার্শিয়াং।'

খোঁজাখুঁজির পর একটা ছোট বাসে আমরা উঠলাম। বাসটা দার্জিলিং যাচ্ছে। বেশির ভাগ লোকই দেহাতি, দুতিনজন বাঙালি অবশ্য আছে। আমরা জানলার ধারে জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। গাড়িটা যখন ছেড়েছে ঠিক তখনই নজরে পড়ল একটা পুলিশের জিপ দ্রুত এসে স্টেশনের বাইরে থামল। জিপটাকে দেখেই আমার বুক ছ্যাৎ করে উঠেছিল। আমি জানি না কি জন্যে জিপটা স্টেশনে এল, কিন্তু মনে হল আমরা যে সময়মত বাসে উঠে বসেছি সেটা ভাগ্য ভাল বলেই। কথাটা সুর্মাকে বলব কিনা বুঝতে পারছি না। ও যদি নার্ভাস হয়ে যায় কিংবা পুলিশের কাছে ধরা দেয় ? আমি এখনও ওকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করব না। একটু বাদেই বুঝলাম এই বাসটাতে টুরিস্টদের ভিড় নেই কেন। এমন লড়ঝড়ে বাস পাহাড়ে উঠতে পারবে কি না আমার সন্দেহ হচ্ছিল।

মনের মধ্যে পুলিশ দেখার পর যে ভয়টা জন্মেছিল সেটা তাড়াবার জন্যে সুর্মার সঙ্গে কথা বললাম, 'এই তুই এর আগে কখনও দার্জিলিং যাসনি তো, না ?

সুর্মা মাথা নাড়ল, 'না'।

আমি একটু দ্বিধা নিয়ে বললাম, 'তোর মন এখন হাল্কা হয়েছে ?'

সুর্মা বলল, 'জানি না।'

আমি বললাম, 'আমাকে একটু ভালবাসতে পারবি তো ?'

ওর ঠোঁটে একটুকরো হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। আমার খুব ইচ্ছে করছিল ওর হাত ধরি, কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। আজ সকাল থেকেই কেন

জানি না মনে হচ্ছে সুর্মা আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে, আমার চেয়ে ও অনেক গম্ভীর। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে ওর তুলনায়। অথচ ও তো আমার চেয়ে দশ মাসের ছোট।

বেশ জমজমাট একটা শহরে আমরা এলাম। প্রচুর লোক আর রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। সুর্মাকে বললাম, 'কিছু খাবি না? খুব খিদে পেয়েছে।'

'কি খাবি?'

'দাঁড়া, তুই বোস আমি দেখে আসি কি পাওয়া যায়! ব্যাগটাকে লক্ষ্য রাখিস।'

বাস থেকে কোনমতে নামলাম। কারণ প্রচুর নেপালি ওঠার জন্যে ঠেলাঠুলি করছে। বেশ ঠান্ডা লাগল মাটিতে নেমে। জায়গাটা মোটেই পাহাড়ি নয়। আমি একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে সিঙ্গাড়া আর জিলিপি কিনলাম। তারপর চট করে এক গেলাস চা নিয়ে চুমুক দিলাম। সুর্মা খায় না তাই খাবার খাওয়ার আগেই চা খেয়ে নিই।

বাসটা হর্ন দিচ্ছিল আর কন্ডাক্টার চেঁচাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাসের দরজায় পা রাখলাম। মানুষে ঠাসাঠাসি হয়ে গিয়েছে ভেতরটা। একে ঠেলে ওকে ঠেলে কোনরকমে যখন সুর্মার পাশে বসলাম তখন দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়! আমার ঘাড়ের কাছে একটি নেপালী বউ ঝুঁকে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সুর্মার হাতে ঠোঙ্গা দিতে ও নিচু গলায় বলল, 'পুলিশ এসেছিল।'

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আমার। বললাম, 'কখন?'

তুই নামবার পরেই। 'জানালা দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল কি নাম আমার?'

'তুই কি বললি?'

মিথ্যে বললাম। তারপর জিজ্ঞাসা করল, সঙ্গে কে আছে? আমি বললাম, মামা। 'লোকটা আমাকে ভাল করে দেখে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছি?'

'তুই কার্শিয়াং বললি?'

'না, শুকনা বললাম।'

আমি অবাক হলাম। শুকনা যে এই রাস্তার কোন জায়গার নাম আমিই জানি না। সুর্মা হেসে বলল, 'কন্ডাক্টর জায়গার নাম ধরে চেঁচাচ্ছিল তাই জেনেছিলাম।'

'লোকটা কি বলল?'

'আর কিছু না বলে চলে যাচ্ছিল আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, কেন প্রশ্ন করছেন ? ও উত্তর দিল, আমরা দুটো বাচ্চাকে খুঁজছি। মনে হয় আমার কথা অবিশ্বাস করেনি।'

কথাটা শোনামাত্র আমার ভয় কেটে আনন্দ হল। গাড়ির চাকা ঘুরতেই আমি খপ করে ওর হাত চেপে ধরলাম খুশীতে। সুর্মা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আঃ লাগছে।'

খাবারটা খেয়ে নিয়ে আমি চোখ বন্ধ করলাম। তাহলে সত্যি পুলিশ আমাদের খুঁজছে। আমরা যে এদিকে এসেছি তাও টের পেয়ে গেছে। তার মানে দিলীপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অথচ ও শপথ করেছিল—কোনদিন যদি ব্যাটাকে পাই আমি দেখে নেব। দিলীপ যদি সব কথা বলে থাকে তাহলে সুনীল প্রধানের নামও পুলিশ জেনে যাবে। অথচ ওর ওখানে না গিয়েও তো আমাদের কোন উপায় নেই। কি যে করি বুঝতে পারছি না। তবে পুলিশ যখন শিলিগুড়ি কিংবা স্টেশনে আমাদের সন্ধান পায়নি তখন হয়তো ভাবতে পারে আমরা দার্জিলিং-এ যাচ্ছি না। সেইটুকুই যা চান্স। দেখি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে আমার যেটা লাভ হল সেটার সঙ্গে এই দুশ্চিন্তার কোন তুলনা হয় না। সুর্মা আমার দলে এসে গিয়েছে। পুলিশের লোকটাকে ও যেভাবে কাটিয়েছে তার তুলনা হয় না। ও তো স্বচ্ছন্দে পুলিশকে সব কথা বলে দিতে পারত। কিন্তু তা করেনি। এতেই বোঝা যাচ্ছে ওর কাছ থেকে আমার কোন ভয় নেই। কাল রাত্রে আমি ভাবছিলাম স্টেশনে চমৎকার অভিনয় করেছি রেলের পুলিশের সঙ্গে। কিন্তু তখন ও যা করেছে তা আমার চেয়ে কম কিছু নয়। আমরা দুজনে একসঙ্গে যদি ফন্দি আঁটতে পারি তাহলে পুলিশকে এড়ানো সম্ভব হবেই।

এই সময় সুর্মা বলল, 'দ্যাখ, কি সুন্দর !'

আমি বাইরে তাকালাম। যদিও নেপালি বউটা আমায় খুব চাপ দিচ্ছে তবু পাহাড়টাকে এগিয়ে আসতে দেখে খুব ভাল লাগল। আমরা এখন লোকালয় ছাড়িয়ে এসেছি ! চারধারে গাছপালা এবং সূর্য বেশ ওপরে। সুর্মা বলল, 'ওগুলো নিশ্চয়ই চায়ের গাছ, না রে ?'

চা-গাছ আমি কখনও দেখিনি। তবে ছবিতে চা-তোলা কামিনদের ছবি দেখেছি। বললাম, 'হ্যাঁ।'

সুর্মা বলল, 'বিউটিফুল ! এরকম জায়গায় আমি সারাজীবন থাকতে পারি !' সুর্মার কথা বলার ভঙ্গি এখন বেশ সহজ, সাবলীল, তার মানে ও এতক্ষণে মন

ঠিক করে নিতে পেরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে তাহলে নামি, কি বল?'

ও চকচকে চোখে হাসল, 'তুই না—'

'আমি কি?'

'মিথ্যেবাদী।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল সুর্মা।

আমি বললাম, 'নিজে কি? পুলিশটাকে যা বললি তাতে আমার চেয়ে কম যাস না।' আমি কি শেষ পর্যন্ত সুর্মার মন পেয়ে গেছি! ব্যাস, আমার মনের সব কষ্ট দূরে হয়ে গেল।

লালবাজার থেকে দুপুরে খবর এল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দার্জিলিং মেল থেকে যারা নেমেছে তাদের মধ্যে সুর্মাদের পাওয়া যায় নি, শিলিগুড়ি শহরেও চেক করা হয়েছে! দার্জিলিং-এর এস-পিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যদি কোন ফাঁকে ওরা ওখানে পেঁছে যায় তাহলে লোকেট করতে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রণব যে খবরটা আনল তাতে স্বপ্নেন্দু উত্তেজিত হলেন। গতকাল সন্ধ্যেবেলায় শিয়ালদার প্লাটফর্মে দুটি তরুণ-তরুণী ঝগড়া করছিল। রেলের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানে তারা ভাইবোন। মেয়েটিও একই কথা বলায় পুলিশ তাদের ট্রেনে তুলে দিয়েছে। পোশাকের বর্ণনা শুনে কারো বুঝতে বাকি রইল না মেয়েটি সুর্মা।

প্রণব বলল, 'ওরা পুলিশকে ধাপ্পা দিয়েছে। তোমার মেয়ে যদি ছেলেটির সঙ্গে প্ল্যান না করে থাকে তাহলে সে-ও মিথ্যে বলল কেন?'

স্বপ্নেন্দু নার্ভাস গলায় বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না হয়তো লজ্জা কিংবা আমাদের অপমান হবে ভেবে, কি জানি। সুর্মি এত সেণ্টিমেণ্টাল, চাপা, যে ওর মনে কি হচ্ছে বোঝা মুস্কিল। কিন্তু ওদের যদি ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কোথায় গেল? নিউজলপাইগুড়িতে পাওয়া যায়নি বলছে!'

প্রণব বলল, 'সেটাই কথা। হয় তো মাঝখানের কোন স্টেশনে নেমে গেছে। যাই বল, এখন মনে হচ্ছে তোমার মেয়ের সহযোগিতা আছে।'

স্বপ্নেন্দু কথাটাকে কিছুতেই মানতে পারছেন না, অথচ প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। সুর্মা তো স্বচ্ছন্দে পুলিশকে সব কথা বলতে পারত।

স্বপ্নেন্দু অসহায় চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কাল সারারাত কান্নাকাটির পর আজ সুর্মার মা অনেক শক্ত হয়ে গেছেন। তিনি চুপচাপ এঁদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, 'পুলিশ তো ভুল করতেও পারে। আমার মনে

হচ্ছে ওরা দার্জিলিং-এ গেছে। তুমি আমাকে আজই সেখানে নিয়ে চল।'

স্বপ্নেন্দু বিহ্বল গলায় বললেন, 'দার্জিলিং-এ যাবে?'

সুর্মার মা বললেন, 'হ্যাঁ! আমি নিজে গিয়ে ওকে নিয়ে আসব। আজকেই কোনমতে ওখানে পৌঁছানো যায় না?' প্রশ্নটা প্রণবের উদ্দেশ্যে।

প্রণব ঘড়ি দেখল, 'না, আজ ওখানে পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। প্লেন ধরতে পারবেন না। যদি যেতেই হয় তাহলে দার্জিলিং মেল ধরাই ভাল।'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'টিকিট পাওয়া যাবে?' বলেই লজ্জিত হলেন। কাল ওই বাচ্চা মেয়েটা তো বিনা টিকিটেই হয়তো ট্রেনে উঠেছে আর তিনি টিকিটের কথা চিন্তা করছেন।

প্রণব উঠল, 'আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি একবার থানা ঘুরে যেও! প্রণবকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরছেন এমন সময় স্বপ্নেন্দু দেখলেন অতীনের বড়দা আসছে যতীন বোধহয় ভদ্রলোকের নাম, স্বপ্নেন্দু গুলিয়ে ফেললেন।'

যতীন কাছে আসতেই স্বপ্নেন্দু বললেন, 'আমরা খবর পেয়েছি যে ওরা দার্জিলিং গিয়েছে। পুলিশ ওদের খুঁজছে যদিও, তবু আজ আমরা ওখানে রওনা হচ্ছি। আপনারা কেউ আমার সঙ্গে যাবেন?'

যতীন বিরক্ত হল, 'পুলিশে খবর দিতে গেলেন কেন? ঘরের খবর কাগজে বের হবে! না, আমাদের যাওয়ার সময় নেই।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হলেন, 'ওরা অল্পবয়সী, যে কোন মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারে, আপনাদের দুশ্চিন্তা হচ্ছে না?'

'দুশ্চিন্তা করে কি করব বলুন! ওইটুকু ছেলে একটা মেয়ের জন্যে পাগল হয়ে যাবে ভাবা যায়? তাছাড়া হাসপাতাল থেকে বলেছে ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। ওর মনের চাহিদা পূরণ না হলে হয়তো আবার পাগল হয়ে যেতে পারে। আপনার মেয়ে সঙ্গে যাওয়ায় মা খুব নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ওঁর ধারণা যে অতীন যদি বিয়ে করতে পারে সুর্মাকে, তাহলে আর পাগল হবে না। সে ক্ষেত্রে খামোকা চেজ করতে যাব কেন?'

যতীন চলে গেলে স্বপ্নেন্দু খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। একি যুক্তি তিনি শুনলেন? তার পরেই খেয়াল হল মেয়েটা একটা পাগলের সঙ্গে রয়েছে। যদিও ওই পাগলের হাতে বেশ কিছু টাকা আছে এই মুহূর্তে তবু কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি কি করতে পারেন! যদি যাওয়ার চিন্তাটা আর একটু আগে মাথায় আসতো তাহলে আজই প্লেন ধরতে পারতেন। গত রাতটা ওরা ট্রেনে কাটিয়েছে, আজ কোথাও ওঠার আগেই যদি ধরতে পারতেন!

সুর্মার যা অভ্যেস তাতে ও এখন একা একা কি করছে কে জানে। যে মেয়ে রাত্তিরে একা শুতে পারে না সে কি করে—! কথাগুলো যত ভাবছিলেন তত বুকের মধ্যে হিম ঝরছিল। তিনি চেয়ে দেখলেন সকালের কলেজ ছেড়ে পাড়ার মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। দাঁতে ঠোঁট চাপলেন স্বপ্নেন্দু। তারপর কিশোরীদের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'বোকা মেয়েরা।'

পাহাড় যে এত সুন্দর হয় জানতাম না। অনেকের শুনেছি পাহাড়ে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে, বমি হয়, কিন্তু আমার কিছুই হয়নি। জানালা অবশ্য বন্ধ করে দিতে হয়েছিল খানিক পরেই, কারণ ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। আমার সঙ্গে তো কোন দ্বিতীয় রুমাল পর্যন্ত নেই। কি করে পাহাড়ের ঠাণ্ডায় থাকব বুঝতে পারছিলাম না। বাসি জামাকাপড় কাল থেকে পরে আছি, কিন্তু মনে কোন বিকার হচ্ছে না। মা থাকলে হয়ে যেত আমার! আজ সকাল থেকে মা বাবার জন্যে কষ্ট হচ্ছে যদিও, তবু বুঝতে পারছি আর আমার ফেরার কোন উপায় নেই। বাবাকে সব কথা খুলে চিঠি লিখব, আমি ঠিক জানি বাবা আমাকে বুঝতে পারবে। উনি বলেন, 'মানুষ ভুল করে এবং মানুষ বলেই সেটা শুধরে নেয়। কিন্তু আমি তো কোন ভুলই করিনি। একথা, জানি এখন কেউ বুঝবে না। বাবাও কি বুঝবে না?

অতীন সেই পাহাড়ে ওঠার পর থেকেই সিটে মাথা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেন জানি না অন্যরকম লাগছিল। কি সরল, এবং ভাল মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব অসহায়ও। আসলে অতীন তো ঠিক ক্রিমিনাল কিংবা লম্পট নয়। এটুকু বুঝতে পেরেছি আমি না চাইলেও ও আমাকে পাগলের মত ভালবাসে। কি জানি কেন, এতে আমার বেশ গর্ব হচ্ছে। আমার জন্যে একটা ছেলে এ রকম ঝুঁকি নিচ্ছে। বোধহয় এই কারণেই আমি শিলিগুড়িতে মিথ্যে কথা বললাম পুলিশের কাছে। মিথ্যে কথা একবার বলতে আরম্ভ করলে আর অসুবিধে হবে না। বেশ নাটক নাটক মনে হয়।

এবার আমার বেশ শীত করছে। শীত-শীত ভাবটা অনেকক্ষণ থেকেই ছিল, এবার জাঁকিয়ে এল। আমার তো গরম জামাকাপড় নেই, বাসে যার দিকেই তাকাই তার গায়ে কিছু না কিছু রয়েছে। এভাবে দার্জিলিং-এ নিশ্চয়ই কেউ যায় না। অতীনেরও বোধহয় শীত করছিল কারণ ও বেশ কুঁকড়ে আছে। হঠাৎ চোখ মেলে বলল, 'খুব শীত করছে রে!' তারপর দ্রুত ব্যাগটা

টেনে নিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সোয়েটার বের করল। তারপর আর একটা। বলল, 'ভাগ্যিস আসার সময় দুটো এনেছিলাম। ময়লা হলে অন্যটা পরব ভেবেছিলাম। তুই এই লালটা পর।'

দুটোই ফুল-স্লিভ! আমি আর দ্বিরুক্তি করলাম না। সোয়েটারটা মাথা গলিয়ে নিলাম। একটু টাইট হলেও বেশ ভাল লাগছে। আমারটা গলা তোলা, আর শীত লাগছে না। নিজেকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু উপায় নেই। অতীন হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম আমাকে নিশ্চয়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। গাড়িটা এখন এঁকে বেঁকে শুধু উঠছে তো উঠছেই। মাঝে মাঝে জনবসতি পেলেই কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছে। বাঁ দিকে গভীর খাদ আর ডান দিকে খাড়া পাহাড়, একটু বেঁকে গেলেই নিচে গড়িয়ে পড়ব। হঠাৎ হাতস্পর্শ পেতেই ফিরে তাকালাম। অতীন একটা ছোট চিরুনি এগিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ল আমি সকাল থেকে চুল আঁচড়াইনি। কৃতজ্ঞ হলাম, অতীনের ওপর মনটা খুশীতে ভরে গেল। অত ছোট চিরুনিতে আমার চুল ম্যানেজ করা যায় না ভাল করে, তবু গুছিয়ে নিলাম। অতীন ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোকে ভীষণ ভালবাসি সুমি'!'

ওর গলার স্বরে কি যেন ছিল, আমি সোয়েটারের ভেতরেও কেঁপে উঠলাম। আমি জানি না কেন, ওর দিকে আর তাকাতে পারলাম না। অতীন চোখ বন্ধ করল। আমার হাত ধরল না কিংবা অন্যভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। শুধু শরীরটাকে বাসের সিটে এলিয়ে দিল। যেন ডুবে থাকল।

কার্সিয়াং-এ আমরা নামলাম না। তার আগের একটা ছোট্ট বাজারমত এলাকায় বাস দাঁড়াতেই অতীন উঠে বসল। তারপর ওপাশে দাঁড়ানো একটা নেপালিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কার্সিয়াং আর কতদূর?'

'দো মাইল।'

অতীন বলল, 'এই সুমি', উঠে পড়। আমরা এখানেই নামব।'

'এখানে? এটা তো কার্সিয়াং নয়।' আমি অবাক হলাম।

'জানি। কিন্তু কার্সিয়াং-এ নামলে বিপদ হতে পারে। এখানে নেমে তারপর ভাবব কি করে যাওয়া যায় ওখানে।' ব্যাগটাকে হাতে নিয়ে অতীন ভিড় সরিয়ে আমাকে নামিয়ে আনল কি সুন্দর। কুয়াশারা দল বেঁধে নেমে আসছে আমাদের দিকে। ছোট ছোট টিনের ছাদ-ওয়ালা কাঠের ঘর। দু-তিনটে সবজির দোকান। সবাই নেপালি নয়, কয়েকটি মাড়োয়ারী আছে। বাস ছাড়িয়ে আমরা একটু এগোতেই অতীন বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ, ওঃ, কি সুন্দর।'

ততক্ষণে আমারও চোখ পড়েছে। বাঁ দিকে আকাশের গায়ে ঝকঝক করছে বরফের চূড়া। ওখানে মেঘ নেই, কুয়াশা নেই। এত নীল আকাশ, ওরকম সোনালী বরফের পাহাড় আমাকে পাথর করে দিল। নিশ্চয়ই ওটা কাঞ্চনজঙ্ঘা। আমার হঠাৎ ওই দিকে তাকিয়ে কান্না পেয়ে গেল। কেন পেল জানি না। অতীন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুমি', তুই কাঁদছিস ?'

আমি দ্রুত চোখ মুছে নিলাম। তারপর বললাম, 'কোথায় যাবি এখন ?'

অতীন চারপাশে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'তোর চোখে জল দেখলে আমার নিজেকে ক্রিমিনাল মনে হয়! কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি তোকে ভালবাসি।'

আমি হাসবার চেষ্টা করলাম, 'না, আর কাঁদব না। তবে তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস আমাকে একটা খাম আর কলম এনে দিবি ?'

'কেন ?'

'বাবাকে সবকথা খুলে একটা চিঠি লিখব।'

'কেন ?'

'বাবার কাছ থেকে আমি কিছুই লুকোতে পারব না।'

'ঠিক আছে।' অতীন কথাটা বলল বটে কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে ও মন থেকে কথাটা বলল না। সামনেই একটা খাবারের দোকান দেখে ও এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডাকল, 'আয়, এখানে আমরা খেয়ে নিই।'

এরকম মোটা রুটি আর তরকারি আমি কখনও খাইনি। কোনরকমে যা পারি খেয়ে হাত ধুতেই মনে পড়ল ডায়েরিটার কথা। কাল স্বপ্নাদের বাড়ি থেকে বের হবার পর ওটা হাতে ছিল। কোথায় ফেললাম ? ট্যাক্সিতে না ট্রেনে ? ওতে অনেক জরুরী নোটস্ ঠিকানা লিখেছিলাম। তারপরেই ভাবলাম যাক, এখন ওই ডায়েরিতে আর আমার কি দরকার !

বিকেলবেলায় আমরা সোজা দার্জিলিং-এ চলে এলাম। অতীনের এরকম ইচ্ছে ছিল না। খাওয়ার পর ও আমাকে একটা কালভার্টের ওপর বসে সব কথা বলছে। সুনীল প্রধান-এর বাড়ি যদিও কার্সিয়াং-এ কিন্তু ও পড়ে দার্জিলিং কলেজে। সুনীলের বাড়িতেই ওঠার পরিকল্পনা ছিল অতীনের। কারণ দার্জিলিং-এ সবাই বেড়াতে যায়, সেখানে চেনা লোকের দেখা পাওয়া যাবেই। আমরা ঠিক করলাম বাসে উঠব না। কারণ বাস স্ট্যান্ডে পুলিশ থাকতে পারে। অতীন বিদেশের কায়দায় হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাচ্ছিল। আমাদের কপাল ভাল তাই দ্বিতীয় গাড়িটাই দাঁড়িয়ে গেল। একটা নেপালি মেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। খুব স্মার্ট এবং সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা

করল, 'লিফট্ চাও ?'

আমরা দুজনেই এক সঙ্গে ঘাড় নাড়তে সে পেছনের দরজা খুলে দিল। গাড়িতে উঠে আমি বুঝলাম যাকে আমি মেয়ে ভেবেছি সে আসলে মহিলা। ত্রিশের অনেক বেশী বয়স। গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে আসছ ?'

আমি জবাব দিলাম, 'কোলকাতা।'

'কোথায় উঠবে ?'

অতীন উত্তর দিল, 'হোটেলে।'

মহিলা সামনের আয়নায় আমাদের দেখে নিল কিন্তু কিছু বলল না। একটু বাদেই কার্সিয়াং এসে গেল। আমরা সাইনবোর্ডে জায়গার নাম দেখতে পেয়ে নড়ে চড়ে বসলাম। একটা চৌমাথার মোড়ে ভিড়ের জন্য গাড়িটা আটকে গেল। চারজন পুলিশ দুটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে জেরা করছে। ওরা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও পুলিশরা বোধহয় বিশ্বাস করছে না। রাস্তার লোক এই দেখে মজা পেয়ে ভিড় জমিয়েছে। মহিলা গাড়ি ছাড়লে অতীন যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। আমাকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কার্সিয়াং-এ নামব না, দার্জিলিং-এই চল।' ভাগ্যিস মহিলাকে আমরা গন্তব্যস্থল বলিনি তাই তিনি প্রশ্ন না করে গাড়ি চালাতে লাগলেন এক মনে। ছায়া ঘনিয়ে আসছে। শীত সোয়েটারের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। হঠাৎ মহিলা কথা বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই ভাই বোন নও! তাই না ?' উনি আমাদের দিকে মুখ ফেরাননি। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, 'কি করে বুঝলেন ?'

'তোমরা আমার বয়সে এলেই বুঝতে পারবে। দার্জিলিং-এ এর আগে এসেছ ?'

'না ?'

'কোন্ হোটেলে উঠবে ঠিক করেছ ?'

'গিয়ে খুঁজে নেব একটা।'

'দ্যাটস নট সো ইজি মাই ফ্রেণ্ড! এখন দার্জিলিং-এ হেভি রাস তার ওপর সন্ধ্যে হয়ে যাবে পেঁছাতে। ইউ উইল বি ইন রিয়েল ট্রাব্‌ল!'

ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম। শীতের মধ্যে দার্জিলিং-এ রাত্রে কোথায় থাকব ? আর তারপরেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। রাত্রে আমি কখনও একা শুতে পারি না। ছেলেবেলা থেকেই এইরকম অভ্যেস হয়ে গেছে ; আজকে আমার সঙ্গে কে শোবে ? আমি অতীনের দিকে তাকালাম! অতীন ? না, অসম্ভব।

আমি ওর সঙ্গে এক ঘরে শুতে পারব না। আবার কান্না পাচ্ছিল কিন্তু সেই সময় অতীন চাপা গলায় বলল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই! সুনীল ঠিক ম্যানেজ করে দেবে।'

দার্জিলিং-এ পৌঁছে মহিলা বলল, 'তোমাদের কোথায় নামাব?'

অতীন জবাব দিল, 'এখানেই নামিয়ে দিন না!'

'এখানে নেমে কি করবে? এখানে কোন হোটেল নেই। এখানে তোমার জানাশোনা কেউ আছে?' মহিলাকে চিন্তা করতে দেখলাম।

'হ্যাঁ। কলেজ হোস্টেলে—।'

'দ্যাটস্ গুড। তোমরা এক কাজ করতে পার। আমার ওখানে গিয়ে ফ্রেস হয়ে তুমি ফ্রেন্ডকে খুঁজে বের করে হোটেল দেখে ওকে নিয়ে যেও। ওকে নিয়ে হোটেলে হোটেলে ঘোরা ঠিক হবে না।' বলে সম্মতির অপেক্ষা না করে গাড়ি চালাতে লাগলেন। অতীনের এই ব্যবস্থা পছন্দ হল না বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার মন্দ লাগল না। আমার এখন বাথরুমে গিয়ে ফ্রেস হওয়া একান্তই দরকার।

মহিলার বাড়ি স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। এটা বলতে পারছি কারণ আসার সময় স্টেশনটাকে দেখতে পেয়েছিলাম। সুন্দর লন পেরিয়ে গাড়িটা থামল। মহিলা জানলার কাঁচ তুলে দিয়ে বললেন, এবারে এস। বাড়িটাকে স্পষ্ট বুঝতে না পারলে বুঝতে পারলাম এঁরা বেশ বড় লোক। একটা দারোয়ান গোছের লোক মহিলাকে সেলাম করল। প্রথমেই একটা বিরাট হল ঘর। পায়ের তলায় পুরু কার্পেট। মহিলা বলল, 'তোমরা এখানে বিশ্রাম করো। ওপাশে একটা টয়লেট আছে ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পার। আমি চেঞ্জ করে আসছি।'

অতীন খুব নার্ভাস হয়ে গেছে, আমারই মতন। কি সুন্দর সোফা, ঘরে একটা হালকা নীল আলো জ্বলছে। অতীন বলল, 'যাচ্চলে! কোথায় এলাম।' তারপর সোফায় বসল। দেখলাম অনেকখানি ডুবে গেল ও। আমি একটু দ্বিধা করে টয়লেটে গেলাম। এমন সুন্দর টয়লেট আমি জীবনে দেখিনি। ইংরেজি সিনেমার মতন। ইচ্ছে করছিল গরম জলের শাওয়ার খুলে স্নান করে নিই। কিন্তু নতুন জায়গায় সাহস পেলাম না। আয়নায় নিজেকে দেখলাম। ইস, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় আমার চেহারা কতখানি পাল্টে গেছে!

চা খেতে খেতে মহিলা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার পরিচিতজন কোথায় থাকেন, ঠিকানাটা কি?'

অতীন সুনীল প্রধানের ঠিকানা জানাল। মহিলার কপালে ভাজ পড়ল,

'একে তুমি কি করে চিনলে ? ছেলেটি তো নেপালি।'

অতীন জবাব দিল, 'আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

চা-খাওয়ার পর মহিলার কাছ থেকে পথের নির্দেশ নিয়ে অতীন উঠল। আমার হঠাৎ মনে হল অতীন চলে গেলে আমি খুব একা হয়ে যাব। আমিও তো ওর সঙ্গে যেতে পারি ! কিন্তু অতীনটা আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে না। অতএব এই অপরিচিত মহিলার বাড়িতে আমি একাই রয়ে গেলাম।

চা খেতে নামার সময় মহিলা পোষাক পাল্টে এসেছেন। ম্যাক্সির ওপর সোয়েটার মনে হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্য করে বুঝলাম ওটা ঠিক ম্যাক্সি নয়। কোলকাতায় ভুটানিদের পরতে দেখেছি। ছুম্বা না কি একটা বলে ওটাকে। মহিলা বলল, 'এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাক।' বলে উঠে দাঁড়ালেন। আমি ওকে অনুসরণ করে কাঠের রঙিন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এলাম। পাশাপাশি চারটে ঘরের একটায় ঢুকে আলো জ্বাললেন। একটা ডাব্‌ল বেড সোফা এবং টি, ভি সেট।

সোফায় বসে মহিলা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি ?'

একটু ইতস্তত করে সত্যি কথা বললাম। আমার নামটা কয়েকবার উচ্চারণ করল মহিলা তারপর বলল, 'বাঃ দারুণ নাম। পড়াশুনা কর !'

'হ্যাঁ, কলেজে।' কলেজ বলতে ভাল লাগল।

'ওকে তুমি ভালবাসো ?'

কি বলব ? গতকাল কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি চিৎকার করে না বলতে পারতাম কিন্তু এখন সেকথা বলতে পারছি কি ! মহিলা হাসল, বুঝেছি, কিন্তু তোমরা যে এখানে এসেছ তা তোমাদের মা বাবা জানেন ?'

আমি বললাম, 'আমি জানাবার সুযোগ পাইনি।'

'আই সি ! কি নাম ওর ?'

'অতীন।'

'এখানে কি শুধুই বেড়াতে এসেছ ?'

'না। অতীন চাকরির খোঁজে এসেছে।'

'আচ্ছা ! সুনীল ওকে কথা দিয়েছে ?'

'হ্যাঁ !'

'তুমি একটি বোকা, ভীষণ বোকা মেয়ে। এইভাবে অনিশ্চয়তার ভেসে পড়তে হয় ? জানো না, আমাদের মেয়েদের জন্যে পায়ে পায়ে বিপদ হাঁ করে বসে আছে। এত ইমোশনাল হলে চলে ! তোমার সঙ্গে তো একটাই ব্যাগ

দেখছি। জামাকাপড় ওতে আছে ?'

'অতীনের আছে, আমার নেই !'

'স্ট্রেঞ্জ, তুমি নিশ্চয়ই বলবে না এক কাপড়ে চলে এসেছ !'

মাথা নামালাম, 'হ্যাঁ, তাই।'

মহিলা বোধহয় কিছুক্ষণ আমায় দেখল, তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জানি না এসব কথা একে বলে ভাল করলাম কিনা ! অতীন জানলে হয়তো রেগে যেতে পারে। কিন্তু ওর কথা বলার ভঙ্গিতে এমন আন্তরিকতা মাখানো যে না বলে পারিনি। একটু বাদেই মহিলা সুন্দর একটা ম্যাক্সি আর শাল নিয়ে ফিরে এলো। 'যাও ওই টয়লেট থেকে এগুলো পরে এসো। এক জামাকাপড়ে বেশিদিন থাকতে নেই।'

আমি কখনও অন্যের জামা-কাপড় পরিনি এক অতীনের এই সোয়েটারটা ছাড়া। তব মনে হল ওগুলো পরলে আমি ফ্রেশ হবো। এ ঘরের লাগোয়া টয়লেটে চেঞ্জ করে এলাম। মহিলা বলল, 'বাঃ, চমৎকার। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নাইস্ ! বসো। তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে না। আচ্ছা বলো আমার বয়স কত ?'

আমি সত্যি অনুমান করতে পারিনি। ওর বয়স এখন চল্লিশ। কথাটা মোটেই মানতে ইচ্ছে করে না অবশ্য। চব্বিশ পঁচিশ বছরের হলে মানিয়ে যায়। কিন্তু ওর মেয়ের বয়স নাকি আঠারো। কোলকাতার লরেটো কলেজে পড়ে। আজ দুপুরে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে তাকে তুলে দিয়ে ফেরার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা। মেয়ের ছবি আছে ওর লকেটে, দেখলাম। এতক্ষণে আমি ওঁকে বেশ শ্রদ্ধা করতে লাগলাম। মহিলার নাম জিনা দোরজি। সিকমের মানুষ। তাই অমন লম্বাটে, নাক চোখও চাপা নয়। ওঁর স্বামী বছর তিনেক হল মারা গিয়েছেন। এই বাড়িটায় উনি একা থাকেন। ইচ্ছে করেই দার্জিলিং-এ পড়ান নি মেয়েকে। সে নাকি পড়াশুনায় ভাল কিন্তু চেহারা এত সুন্দর যে ছেলেরা ওর মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল। বিশেষ করে ওই সুনীল। কোলকাতায় গিয়ে রপ্ত হতে হতে কলেজটা শেষ করে ফেলবে বলে ওঁর বিশ্বাস। আমি আর অতীন তো প্রায় ওঁর মেয়েরই বয়সী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি একা থাকতে পারেন ?'

'অ্যাদ্দিন পারছিলাম। ঝি-চাকর, এর সঙ্গে মেয়ে ছিল। কিন্তু এখন আর ওরা থাকতে দেবে না !' জিনা হাসলেন।

'কারা ?'

'ওই যারা আমাকে বিয়ে করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। আসলে, আমার এই শরীরটাও চায় না যে আমি একা থাকি। মেয়ে পর্যন্ত বলে গেল মা তুমি বিয়ে কর। থাক আমার কথা। তোমাকে আমার বেশ লেগেছে। আমি বলি কি, তোমরা আজ রাত্রে এখানেই থেকে যাও! কাল দিনের আলোয় না হয় শিফ্‌ট করো!' প্রস্তাবটা আমার খুব পছন্দ হল এখন। এই মহিলার কাছে থাকলে আমি নিরাপদে থাকব—এই রকম মনে হচ্ছিল। জানি না অতীন এসে কি বলবে।

সুনীল আমাদের অনেকটা পথ এগিয়ে ফিরে গেল। বাইরে এত ঠাণ্ডা যে আমি কাঁপছিলাম। এই সোয়েটারে কোন কাজ হচ্ছে না এখন। রাস্তায় একটাও লোক নেই। দোকানপাটও বন্ধ হচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় যখন মহিলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নেমেছিলাম তখন দার্জিলিংকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল আলোয় হীরে গলায় দুলিয়ে দার্জিলিং তখন হাসছে। জিজ্ঞাসা করে করে সুনীলের হোস্টেলে গিয়ে পেঁছেছিলাম ঠিকই। ওদের দারোয়ান আমাকে সুনীলের খোঁজ দিল। সুনীল তখন হোস্টেলে নেই। ম্যালের কাছে একটা রেস্তোরাঁর ঠিকানা দিয়ে সেখানে খোঁজ নিতে বলল। ম্যালের পথে সাজুগুজু লোকের ভিড়। বেশির ভাগই বাঙালি। যদি চেনালোকের মুখোমুখি হতে হয় তাই সাবধানে হাঁটছিলাম।

রেস্তোরাঁ যে বেশ বড়লোকী তা দূর থেকে বুঝতে পারলাম। ওটা আসলে বার। বেশ ঝকমকিয়ে বাজনা বাজছে এবং একদল নারীপুরুষে সেই বাজনার সঙ্গে নৃত্য করছে। আমি দরজার সামনে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে সুনীলকে খুঁজতে লাগলাম। ওই আলো আঁধারিতে চট করে কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশ্কিল। তাছাড়া সিগারেটের ধোঁয়ায় হল ভরতি। আমাকে একটা টেবিল দেখিয়ে বসতে বলল বেয়ারা। আমি তাকে সুনীলের নাম বললাম সে মাথা নেড়ে দ্রুত ভেতরে চলে গেল। আমি আর অপেক্ষা না করে তাকে অনুসরণ করলাম। নাচিয়ে নারী-পুরুষের শরীর বাঁচিয়ে এগিয়ে গেলাম ভেতরে। কোণের দিকে জনা পাঁচেক ছেলেমেয়ে প্রায় নেতিয়ে বসে রয়েছে। সুনীলকে বেয়ারা কিছু বলা মাত্র সে মুখ তুলে আমাকে দেখে প্রথমে যেন চিনতেই পারল না। তারপর বোধহয় খেয়াল হতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাই! কবে এসেছ?'

বললাম, 'একটু আগে।'

'কোথায় উঠেছ?' ও আমার সঙ্গে হাত মেলালো।

ঠিক কোথাও উঠিনি এখনও। আমার চিঠি পেয়েছ?'

পেয়েছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বসো তো আগে। 'কি খাবে বল?'

চেয়ার টেনে বসলাম। 'কিন্তু আমার থাকার জায়গাটা—।'

'আরে তুমি দার্জিলিং-এ আছো কোলকাতায় নয়। আজ রাত্রে তুমি আমার হোস্টেলে থাকবে। এই বেয়ারা, আউর এক হুইস্কি।' সুনীল চেঁচিয়ে হুকুম করল। ওরা মদ্যপান করছিল বুঝতে পারছি। সুনীলের এই অভ্যাসটার কথা আমার জানা ছিল না। অন্য চারজন আমায় দেখছে। এই পরিবেশে কি কথা বলব বুঝতে পারছি না। আমার বাঁ পাশের মেয়েটা বলে উঠল, 'এক নেহি টু।' সুনীল হাত নাড়ল, 'নো। তোমার প্রচুর হয়ে গেছে। মিট মাই ফ্রেন্ড ফ্রম ক্যালকাটা অতীন। এরা আমার বন্ধু। শ্যাম, লিলি, হ্যারি আর লায়লা।'

ওরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'হা-ই!'

আমি কি করব বুঝতে না পেরে বোকার মত হাসলাম।

আমার বিস্ময় কমার আগেই বেয়ারা হুইস্কি আর জল রেখে গেল। আমি বললাম, 'সুনীল, আমি ড্রিঙ্ক করিনে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁ পাশের মেয়েটি ছোঁ মেরে গেলাশটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে আমাকে আলটপকা চুমু খেল, 'ওঃ, হাই নাইস য়ু আর। আই অ্যাম হেল্পিং য়ু আর।' বলে সামান্য জল মিশিয়ে ঢক করে গিলল মদ।

সুনীল চিৎকার করে উঠল, 'ইউবিচ্।' অন্য সবাই খিলখিল করে হাসতে লাগল সুনীলের চিৎকার শুনে। এই সময় একটি নেপালী ছেলে দ্রুত আমাদের টেবিলে এসে সুনীলের পাশে গিয়ে তার কানে কানে কিছু বলল। সুনীলকে খুব অবাক দেখাচ্ছে। সে চাপা গলায় কিছু জিজ্ঞাসা করল। ছেলেটি চটপট উত্তর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে দুটো একশ টাকার নোট বের করে টেবিলে ফেলে বললো, 'এনজয় ইওরসেল্ফ। কেউ যদি আমাকে খোঁজে বলবে দ্যাখো নি।' তারপর আমাকে ইশারা করে বাঁ দিকে চলে গেল। আমি যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম এটা তার উল্টো দিক। একটা দরজা ঠেলে করিডোর দিয়ে এগিয়ে আর একটা দরজার সামনে পৌঁছে সুনীল দাঁড়াল, 'কি ব্যাপার তোমার?'

'মানে?'

'তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পুলিশ আমাকে খুঁজছে কেন?'

'পুলিশ তোমাকে খুঁজছে?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র জানতে পারলাম। তুমি কি আমার হোস্টেলে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। দারোয়ানের কাছে শুনলাম তুমি এখানে।'

'তুমি চলে আসার পরই পুলিশ সেখানে গিয়েছে। যদি দারোয়ান তাদের বলে দেয় জায়গাটার কথা। নাউ, লেটস মুভ।' পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সুনীল আমাকে নিচে নামিয়ে আনল। তারপর জোরে পা চালিয়ে বেশ কয়েকটা গলি পেরিয়ে একটা দর্জির দোকানে ঢুকে পড়ল। দোকানে তখন বুড়ো বসে ঢুলছে। তাকে বিদেয় করে সুনীল বলল, 'কি হয়েছে বল, শুনি।'

আমি তখন তাকে সবকথা খুলে বললাম। সুর্মাকে আমার সঙ্গে আনার কোন পরিকল্পনা ছিল না। ওকে আনার ফলেই এই সমস্যা এসেছে। আমরা পুলিশ স্টেশনে, শিলিগুড়িতে এবং সম্ভবত এখানকার বাসস্ট্যাণ্ডে ফাঁকি দিয়েছি। পুলিশ কিছুতেই জানতে পারেনি আমরা দার্জিলিং-এ এসেছি।

সুনীল হাসল, 'তুমি তো দারুণ রোমাণ্টিক! মেয়েটি দেখতে কেমন?'

'আমার চোখে ওর মত সুন্দরী কেউ নেই।'

'ইজ ইট? কিন্তু এই রাত্তিরে তাকে রেখেছ কোথায়?'

তখন আমি ওই মহিলার কথা বললাম। আমি তার নাম জানি না কিন্তু চেহারা, আর গাড়ির বর্ণনা দিতেই সুনীল বুঝে ফেলল, 'আই সি! শি ইজ কল্‌ড দার্জিলিং কুইন। বিরাট লাইন ওর পেছনে। ইউ আর লাকি! ওই যে শ্যামকে দেখলে, ওর মেয়েকে শ্যাম সিডিউস করেছিল।'

'ওর মেয়ে? ওর বড় মেয়ে আছে?'

'ইয়েস। সি ইজ অ্যারাউণ্ড আওয়ার এজ। তুমি কি কচি খুকী ভেবেছিলে? ছেড়ে দাও। চেষ্টা কর ওখানে আজকের রাতটা থেকে যেতে।'

'কি করে বলব?'

'বলবে আমার দেখা পাওনি। ট্রাই টু ম্যানেজ হার। তোমার ভাগ্য খুবই ভাল যে হোটেলে ওঠনি। আর হ্যাঁ, ওকে আমার নাম বলবে না। আমি আজ রাত্রেই কার্শিয়াং-এ নেমে যাচ্ছি। তুমি কাল সকালে তোমার প্রেমিকাকে নিয়ে কার্শিয়াং চলে এসো। স্টেশনের বাঁ দিকে পানবাহার নামে একটা দোকান আছে। সেখানে আমার কথা বললে তুমি পৌঁছে যাবে। ওকে?'

'কিন্তু সুনীল, আমার একটা চাকরি চাই!' আমি ওর হাত ধরলাম।

'সিওর। আমি ব্যবস্থা করব। কিন্তু আগে হাওয়াটাকে ঠাণ্ডা হতে দাও। আমার বাড়িতে তোমরা স্রেফ্ থাকবে! চল তোমাকে এগিয়ে দিই।'

আমরা একটু ঘুরপথ হয়েই বোধহয় বড় রাস্তায় এলাম। আর আসতেই ওর দলটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লায়লা বলে মেয়েটি একটা ছেলেকে খুব সাধছিল

কিন্তু সে আপত্তি করছে। সুনীলকে দেখামাত্র লিলি ছুটে এল, 'তুমি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র পুলিশ এসেছিল।'

'কি বললে ?'

'বললাম, তোমায় আমরা দেখিনি। কি ব্যাপার ?'

'কিছু না। গুডনাইট।'

লায়লা বলল, 'সুনীল, আই অ্যাম নট ফিলিং ওয়েল, একটু এগিয়ে দেবে ?'

সুনীল একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'বাঃ, ভালই হয়েছে। তুমি যেদিকে যাবে সেদিকেই লায়লা যাচ্ছে! তোমরা একসঙ্গে যাও, সুবিধে হবে। লায়লাকে সবাই চেনে এখানে। আমার আর দেরী করা উচিত নয়! চল, তোমাদের ওই মোড় অবধি আমি এগিয়ে দিচ্ছি।' লায়লা আর আমি পাশাপাশি ওর সঙ্গে মোড়ে আসতেই ও হাত নেড়ে বলল, 'কাল সকালে।' বলে ডানদিকের রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

লায়লার পায়ের ব্যালেন্স ছিল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাবে ?' আমি তো নাম জানি না, তাই জবাব দিলাম, 'মিনিট দশেকের রাস্তা।'

'গুড। তাহলে আমার বাড়ি আগেই পড়বে। তুমি একটু ধরো আমাকে। আমি টিপসি হয়ে গেছি। কি যেন নাম তোমার, অতীন ? ইজন্‌ট ইট ?'

'হ্যাঁ।' আমাকে ধরতে হল না। লায়লা আমাকে জড়িয়ে ধরল তারপর আমার শরীরের ওপর সমস্ত ভর দিয়ে হাঁটতে লাগল। এভাবে আমার হাঁটা অভ্যাস নেই তারপর এরকম রাস্তায় এর আগে হাঁটিও নি। ভাগ্যিস রাস্তায় এখন একদম লোক নেই। দোকানপাটও বন্ধ। এই ঠাণ্ডায় লায়লা একটা স্কার্ট আর জ্যাকেট পরেছে।

আমি বললাম, 'অত ভর দিও না।'

লায়লা বলল, 'উম্‌। তুমি ভার বইতে পারো না ? ঠিক আছে, আমাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটো। তোমার পক্ষে ইজি হবে। আই অ্যাম রিয়েল টিপসি।'

মনে হল সেইটেই সহজ। আমি ওর পিঠের ওপর একটা হাত দিয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করতে ও আর একটা হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। একরকম ভঙ্গিতে অচেনা অজানা পুরুষের সঙ্গে হাঁটতে ওর একদম সঙ্কোচ হচ্ছে না। হঠাৎ আমার শরীরের মধ্যে কি রকম করতে লাগল। ওর শরীরের সঙ্গে যতই ঘর্ষণ হচ্ছে ততই এই অনুভূতিটা বাড়তে লাগল। কান মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। এরকম আমার কখনই হয়নি। গলা শুকিয়ে গেল! হঠাৎ লায়লা বলল, 'তুমি কাঁপছ কেন ?' আমার হাত সত্যি কাঁপছিল এবং তা ঠাণ্ডায় নয়। আমি কোন

কথা বলতে পারলাম না। ও হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'ইউ আর বিউটিফুল। আই নেভার হ্যাড ইট উইদ্ এ বেঙ্গলি। আমি তোমাকে তখন চুমু খেয়েছি তুমি এখন রিটার্ন দাও।

সেই নির্জন রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রচণ্ড শীতে দাঁড়িয়ে আমি ঘেমে উঠলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম এটা অন্যায়, আমার কিছুতেই এরকম করা উচিত নয়! কিন্তু শরীরে একটুও শক্তি ছিল না। বলতে কি আমার শরীর যে বিদ্রোহ করতে পারে সেই সময় আমি আবিষ্কার করলাম। লায়লার ঠোঁট আমার ঠোঁটের কাছে। উচ্চতায় আমার সমান। ওর নিশ্বাসের হল্কা লাগছে আমার নাকে। জোঁকের মত ওর ঠোঁট আমার ঠোঁটে আটকে গেল। কতক্ষণ ওই অবস্থায় ছিলাম জানি না।' হঠাৎ লায়লার গলা শুনতে পেলাম, 'আমার বাড়ি ওইটে! তুমি ঠিক আধঘণ্টা পরে ডানদিকে জানালায় নক্ করো, কেমন? উই উইল এনজয় দ্য নাইট। কিন্তু একদম শব্দ করো না। আমার মা একটি হাউণ্ড। আধঘণ্টা পরে। গুডবাই!' আমি দেখলাম ও ধীরে ধীরে নিচে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পরপর চারটে জানলা বাড়িটার।

হঠাৎ যেন হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আমার শরীরে ঢুকতে লাগল। নিজের অজান্তেই আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'না।' তারপর ছুটতে লাগলাম। খুব নোংরা লাগছিল নিজেকে। চোখের সামনে সুর্মার মুখটা চলে আসতেই ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। একি করলাম আমি। আমি সুর্মাকে মুখ দেখাবো কি করে! রাস্তার পাশে একটা কল থেকে জল পড়ছিল। একটুও ভ্রুক্ষেপ না করে সেই ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুলাম! ঠোঁট ঘষতে লাগলাম! কনকনে শীতও আমার উপযুক্ত শাস্তি নয়। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না।

বাড়ির গেট পার হতেই একটা লোক আমার পথ আটকালো, 'কিসকো চাহিয়ে?' সেই বিকেলের দারোয়ানটা নয়, নতুন লোক আগাগোড়া শীতবস্ত্রে মোড়া এই লোকটিকে কি করে বোঝাই কাকে চাই! বিকেলের ঘটনাটা বললাম। লোকটা হাসল 'নিকাল যাইয়ে, হিয়াসে, নেহিতো—।' লোকটার একটা হাত কোমরে। সেখানে কুক্‌রি ঝুলছিল।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'একি বলছ? তোমার মেমসাহেব আমাদের নিয়ে এল—!'

'ফির ঝুট বাৎ, কোই মেমসাব ইয়ে কুঠিমে নেহি রহতা হ্যায়।' প্রায় আমাকে ঠেলে বার করে দিল সে রাস্তায়। আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না। সুর্মা ভেতরে আছে অথচ—! এই রাত্রে আমি কার কাছে সাহায্যের জন্যে যাব?

ভীষণ ভয় করতে লাগল আমার! ভাবলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুর্মার নাম ধরে চেঁচাই। একটু সরে আসতে পাশের বাড়িটার দিকে নজর পড়ল। হুবহু একই রকমের গেট, একই রকমের বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। আমি ভুল বাড়িতে গিয়েছি! হঠাৎ একধরনের আনন্দে শিহরিত হলাম। এবার আর আমাকে বাধা দিল না। সটান ভেতরের দরজায় পেঁছে বেল বাজালাম! সেই দারোয়ানটা দরজা খুলে আমায় দেখে সেলাম করল। আমি হলঘরের উত্তাপে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম। সুর্মা এখানে নেই। দারোয়ানটা বলল 'উপরে যাইয়ে সাব!'

কাঠের রঙিন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বুঝলাম মহিলা খুব বড়লোক। একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমাকে দেখে এগিয়ে এল, 'আইয়ে, ডিনার রেডি।' নিজেকে হঠাৎ নবাব মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমি সুর্মাকে দেখার জন্যে ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিলাম। ওরা সোফায় বসে গল্প করছিল। ওদিকে টেবিলে খাবার সাজানো হচ্ছে। মহিলা আমায় দেখে উঠে দাঁড়ালেন, 'এসো অতীন, সুনীলকে পেলে?'

বুঝলাম সুর্মার সঙ্গে ওর এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি বললাম, 'না! ও দার্জিলিং-এ নেই!'

'বাঃ, গুড। আজকের রাতটা তাহলে এখানেই থেকে যাও। এসো, খেয়ে নিই আমরা।'

খাওয়ার টেবিলে বসে আবিষ্কার করলাম আমি সুর্মার মুখের দিকে কিছুতেই তাকাতে পারছি না। একটু আগে লায়লার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটল তা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমরা প্রায় নিঃশব্দেই খেয়ে নিলাম। যা কিছু কথা মহিলার সঙ্গে হচ্ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মহিলা বললেন, 'তোমাদের কি ওয়াইন খাওয়ার অভ্যেস আছে?' আমরা দুজনে একসঙ্গে মাথা নাড়ালাম। উনি হেসে সেলার থেকে ওয়াইন গ্লাসে ঢেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় ফিরে এলেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। ঘুম পাচ্ছে?'

সত্যি ক্লান্ত লাগছিল। উনি সেই মেয়েটিকে ডেকে আমাকে ঘর দেখিয়ে দিতে বললেন। আমি উঠে দাঁড়াতে বললেন, 'আমার স্বামীর একটা স্লিপিং গাউন আছে ও ঘরে, চেঞ্জ করে নিও! আর হ্যাঁ, গুডনাইট!'

আমি এবার সুর্মার দিকে তাকালাম। নতুন পোশাকে ওকে বেশ দেখাচ্ছে। আর হঠাৎ আমার শরীরে সেই উত্তাপটা ফিরে এল। আমি কোনরকমে বললাম,

'কাল খুব ভোরে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।' তারপর আর দাঁড়ালাম না।

ঘরে এসে নিজের বিছানায় আলো নিভিয়ে শুয়েও আমার ঘুম এল না। লায়লা আমার শরীরে আগুন জেবলে গিয়েছে। বারংবার সুর্মার মুখ মনে পড়ছে। সুর্মাকে আমি ভালবাসি। আমরা এক বাড়িতে আছি অথচ—। আমার খুব ইচ্ছে করছিল সুর্মাকে চুমু খেতে। কিন্তু ওই মহিলা, সুর্মা মহিলাকে কতটুকু বলেছে কে জানে! সুর্মাকে কোন্ ঘরে শুতে দিতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম! ওপরে তো তিনটে শোওয়ার ঘর লক্ষ্য করেছি। নিশ্চয়ই পরেরটা। মাঝখানে একটা দরজা আছে এবং সেটা ভারী পর্দাতে ঢাকা। দরজাটা কি খোলা? আমি বিছানায় উঠে বসলাম। আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না।

প্রায় ঘন্টাখানেক আমি নিঃশব্দে বসে থাকলাম। সুর্মাকে এবার দেখার বাসনা তীব্র হয়ে উঠছে। পা টিপে টিপে পর্দাটা সরালাম। সামান্য চাপ দিয়ে বুঝলাম দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ। এটা কি কখনও খোলা হয় না। ভাবলাম বাথরুমে গিয়ে মুখে জল দিলে ঘুম আসবে। ঝকঝকে বাথরুমে ঢুকে নীলচে আলো জবালাতেই নজরে পড়ল ওপাশে আর একটা দরজা আছে। দুটো ঘরের জন্য কেমন বাথরুম? খুব সন্তর্পণে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। আমি চোরের মত অন্য ঘরটিতে প্রবেশ করলাম। কোন আলো জবলছে না। অন্ধকারে নিজের চোখকে অভ্যস্ত করতে কিছু সময় দিলাম। ঘরের ঠিক ডানদিকে একটা খাট আর তাতে গলা অবধি কম্বল ঢাকা দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। এগিয়ে যেতেই চমকে উঠলাম। খাটের ওপাশে কাঠের মেঝেতে বিছানা করে আর একজন শুয়ে। অনুমানে বুঝলাম সেই মেয়েটি। নিশ্চয়ই সুর্মা। কিন্তু সুর্মা না হয়ে যদি ওই মহিলা হন, বুকে কাঁপুনি এল। এই ঘরে রাত্রে ওর কাছে ধরা পড়লে কি পরিণতি হবে বলা মুশকিল। তবু আমি শেষবার খাটে শোওয়া শরীরটির মুখ দেখতে চাইলাম। অন্ধকার মানুষের মুখকে এত আড়ালে রাখে কেন? আমি আবার নিঃশব্দে আমার ঘরে ফিরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়লাম।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটা বেশি দেরীতেই পেঁছেছিল স্বপ্নেন্দু সুর্মার মাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করলেন। বললেন, 'ভাই খুব বিপদে পড়ে এসেছি কার্শিয়াং-এ পেঁছে দিন।'

ড্রাইভার নেপালি হলেও পরিষ্কার বাংলা বোঝে এবং বেশ বয়স্ক বলেই বিপদের কথা শুনে একটু সচকিত হল। গাড়ি চালু করে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা

করলেন, 'কেউ হাসপাতালে আছে ?'

'না ভাই। আমার কলেজে পড়া মেয়েকে ওই বয়সী ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে গতকাল। আমরা তাকে খুঁজতে যাচ্ছি।' স্বপ্নেন্দু বললেন।

অন্যসময় হলে চট করে কাউকে এরকম কথা তিনি বলতে পারতেন না। কিন্তু এখন বলে বলে এই বলাটা তাঁর কাছে সহজ হয়ে গিয়েছে।

ড্রাইভার বলল, 'পুলিশে খবর দিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ ড্রাইভারের কিছু মনে পড়ল। সে সামনের কাচে চোখ রেখে শুধোল, 'আপনার মেয়ে কি প্যান্ট পরে ? সুন্দরী ?'

সুর্মার মা এতক্ষণ এদের কথা শুনছিলেন এবার সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও প্যান্ট সার্ট পরেই এসেছিল। আপনি দেখেছেন ?'

ড্রাইভার বলল, 'ছেলেটি ওর চেয়ে অল্পবয়সী ? মুখে দাড়ি আছে ?'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'না অল্পবয়েসী নয়, তবে দাড়ি আছে। ঠিকই দেখেছেন আপনি। ও ভগবান! যাক্ তাহলে আমরা ভুল জায়গায় যাচ্ছি না। ভাই, ওদের আপনি কোথায় দেখেছেন ?'

ড্রাইভার জানালো কাল বিকেলে সে যখন কার্শিয়াং যাচ্ছিল তখন ওই দুটি ছেলেমেয়ে হাত তুলে তার গাড়ি থামাতে চেয়েছিল। ওরকম সাধারণ পাহাড়ি গাঁয়ে এইরকম চেহারার বাঙালি ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সঙ্গে যাত্রী থাকায় সে আর থামেনি। এই ছেলেমেয়ে দুটিকে ফেরার পথে কিন্তু চোখে পড়েনি। তার মানে ওরা গাড়ি পেয়ে গিয়েছিল।

স্বপ্নেন্দু উৎসাহ পেলেন। মেয়েকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেনই।

পাহাড়ে যখন গাড়িটা উঠছিল তখন স্বপ্নেন্দুর মন খারাপ হয়ে গেল। অনেক জায়গায় সুর্মাকে নিয়ে তিনি বেড়াতে গিয়েছেন, কিন্তু এই দার্জিলিংটা হয়ে ওঠেনি। সেই এলেন, কিভাবে এলেন ? গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে ভাবছিলেন, দুটো রাত কেটে গেল। কিরকম আছে সুর্মা কে জানে!

কার্শিয়াং পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলেন না স্বপ্নেন্দু। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন। অফিসার ইন চার্জ বাঙালি, রিটায়ার্ড হতে আর বেশী দেরী নেই। স্বপ্নেন্দু ওর সমস্যার কথা বলতে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ তারা তো কার্শিয়াং আসেনি।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ?'

'সিওর। এখানকার সব হোটেলে সার্চ করেছি। গতকাল অল্পবয়সী

ছেলেমেয়ে পেলেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাই নিয়ে কি ঝামেলাটাই না হ'ল। উফ্।

'না, কার্শিয়াং-এ আপনার মেয়ে আসেনি।

'সুনীল, সুনীল প্রধানের বাড়িতে—।'

অফিসার বললেন, 'সুনীল দার্জিলিং-এর হোস্টেলে। কাল বিকেলে খোঁজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। না মশাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার মেয়ে এদিকে মোটেই আসেনি। এলে স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড এবং এই কার্শিয়াং-এর বাস স্টপেজে ধরা পড়ে যেতোই। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড্ড ব্লাফ দেয়।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়লেন, 'না, ওরা এদিকেই এসেছে। আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার গতকাল ওদের দেখেছে হাত নেড়ে লিফট চাইতে। আমি একবার সুনীলের বাড়িতে যেতে চাই। কি ভাবে যাব?'

অফিসার খুব জোরে মাথা নাড়লেন, 'সে চেষ্টা একদম করবেন না। খুব ডেঞ্জারাস এলাকায় ওদের বাড়ি। আমি ফোর্স না নিয়ে যাই না। ওর বাবার খুব পয়সা আছে, কিন্তু এই শহরের এক নম্বর কুখ্যাত লোক, খুনজখম ওই বস্তিতে লেগেই আছে। আপনি বরং এক কাজ করুন, সোজা দার্জিলিং-এ গিয়ে সুনীলের সঙ্গে দেখা করুন।'

স্টেশনের পাশে একটি হিন্দুস্থানীর দোকান থেকে ওরা সকালের চা খেলেন। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরে গিয়ে বললেন, 'দার্জিলিং-এ যেতে হবে।' লোকটা সম্মতি জানালো। সুর্মার মাকে গাড়িতে বসিয়ে দুটো পান কিনে দিয়ে স্বপ্নেন্দু যখন ফিরছেন তখন উল্টোদিকে একটা শাট্ল জিপ থেকে ওরা নামল। অতীন পানের দোকানের ওপর ইংরেজিতে পানবাহার কথাটা লক্ষ্য করে সুর্মাকে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে এল। আর তখনই স্বপ্নেন্দু ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে স্ত্রীর হাতে পান দিলেন। ট্যাক্সিতে বসে ঘাড় ঘোরালেই মেয়েকে দেখতে পেতেন কিংবা সুর্মা চলে যাওয়া ট্যাক্সিটার দিকে আর একটু আগে তাকালেই বাবাকে দেখতে পেত। দুজনের কেউ জানল না, জানতে পারল না।

অতীন সুনীল প্রধানের নাম বলতেই পানের দোকানের লোকটা একটা ছোকরাকে ডাকল, 'এ কাঞ্চা, এত্তা আও।'

ছোকরা যেন নির্দেশিত ছিল। সে অতীনকে বলল, 'চলিয়ে। অতীন সুর্মাকে ইসারায় ডেকে ওর সঙ্গে চলতে শুরু করল। দার্জিলিং থেকে এসে এই জায়গাটাকে তেমন পছন্দ হচ্ছিল না সুর্মার। অবশ্য দার্জিলিং-এর কিছুই সে দেখতে পায়নি। তবু জিনা দোরজির জন্যে দার্জিলিংটাকে ওর বেশ পছন্দ

হচ্ছিল! আজ ভোরে ঘুম ভেঙে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যখন আকাশের দিকে তাকিয়েছিল তখন সেদিকটা ছিল ঘোলাটে আচ্ছন্ন। তারপর হঠাৎ একটা লালচে সোনার মুকুট উঁকি দিল কুয়াশা ফুঁড়ে। তখনি চট করে সরে যেতে লাগল কুয়াশারা, আর ঝকমকিয়ে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘা। সুর্মা এক অনির্বচনীয় আনন্দে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক সেই সময় পেছনে হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে দেখল জিনা পেছনে দাঁড়িয়ে। হেসে বললেন, 'ওই দিকে তাকালে পৃথিবীর সব অহঙ্কার ভেঙে যায় তাই না? কেমন ঘুম হয়েছে?'

ঘাড় কাৎ করে সুর্মা বলেছিল, 'ভাল।'

'আজতো তোমারা কার্শিয়াং-এ চলে যাবে?'

সুর্মা মাথা নাড়ল। কি বলবে সে!

'শোন, এভাবে পালিয়ে থেকে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। যা সত্যি তার মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে ভাল। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি! তোমাদের কোলকাতার বাড়িতে টেলিফোন আছে?'

সুর্মা মাথা নেড়ে না বলল।

'ভেবে দ্যাখো, তুমি চাইলে আমি পুলিশকে খবর দিতে পারি যাতে তোমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

'কিন্তু—?' অতীনের মুখ মনে পড়ল সুর্মার। বাবা কি কখনও তাকে ক্ষমা করবেন? করলেও অতীনকে মেনে নেবেন? সে যতদূর জানে কখনও তা সম্ভব নয়। সে মাথা নাড়ল, না। আর অতীনকে ছেড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এখন যা হোক তা একসঙ্গেই হবে। জিনা দোরজি হেসেছিলেন, 'জীবনটা কখনই অ্যাডভেঞ্চার নয়। আমার উচিত ছিল তোমাদের এইভাবে ছেড়ে না দেওয়া, কিন্তু তোমরা যখন নিজেই চাইছ।

যাহোক, দার্জিলিং-এর কাছাকাছি থেকে যদি বিপদে পড় তাহলে সোজা আমার কাছে চলে এসো।'

কার্শিয়াং-এ আসার পথে সুর্মা ভাবছিল কেন জিনা দোরজি তাদের পুলিশে না ধরিয়ে দিয়ে অমন যত্ন আত্তি করলেন? কিছুতেই একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তৈরী করতে পারল না সে।

কিন্তু এখন অতীনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওর ক্রমশ ভাল লাগছিল। বেশ উত্তেজনা আছে এইভাবে পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে। বিদেশী বইতেই শুধু এইরকম অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাওয়া যায়।

বড় রাস্তা থেকে অনেকটা নিচে নেমে এল ওরা। খুব গরীব এলাকা দিয়ে

কিছুটা হাঁটার পর ছেলেটা বলল, 'আ গিশা।'

খুব সাধারণ একটা কাঠের বাড়ির বারান্দায় সুনীল দাঁড়িয়েছিল। ওদের দেখে নেমে এল সহাস্যে, 'হ্যালো, গুড মর্নিং।'

অতীন হাসল। তারপর সুনীলের প্রসারিত হাতে হাত রাখল, 'তোমার বাড়ি?' সুনীল মাথা নাড়ল, 'ইয়েস। তোমার গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও!' অতীন তাড়াতাড়ি সুর্মাকে বলল, 'এই হ'ল সুনীল, তুই তো নাম জানিস। আর এই হ'ল সুর্মা।'

'সুর্মা! বাঃ, দারুণ নাম! অতীন ইউ আর লাকিয়েস্ট ম্যান অব ওয়ার্ল্ড! আপনি খুব সুন্দরী, রিয়েলি।" সুনীল হ্যাণ্ড শেক করার জন্যে হাত বাড়ালে সুর্মা কি করবে বুঝতে পারল না। এইভাবে তাকে কখনও সামনাসামনি কেউ রূপের প্রশংসা করেনি। সে কোনরকমে হাত ছুঁইয়ে নামিয়ে নিল।

সুনীল বলল, 'নাউ, লেট্‌স মুভ। আমার বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে তাই তোমাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছি।' ছোকরাটিকে বিদায় করে সে ওদের নিয়ে চলল। সুর্মা লক্ষ্য সুনীল খুব করল সেজেছে। জিন্‌স-এর প্যান্টটা এত চাপা যেন ওর শরীর আঁকড়ে আছে। ভাল করে তাকাতে লজ্জা করল সুর্মার। ওপরে একটা চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় কায়দা করা টুপিতে খুব স্মার্ট লাগছে ছেলেটাকে। কিন্তু প্রথমবার দেখেই সুর্মার ওকে পছন্দ হয়নি। ছেলেটার চাহনির মধ্যে এমন কিছু আছে যা অতীনের নেই। ছেলেটিকে ঈশ্বর সরলতা দেননি।

সুনীল দু'ঘরের একটা বাড়িতে ওদের তুলল। একজন বুড়ি নেপালি মহিলা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল, সুনীল তাকে বলল, 'দিদি এরা আমার বন্ধু, তোমার কাছে কদিন থাকবে!'

বুড়ি পেতলে বাঁধানো দাঁত দেখিয়ে হাসল। ঘরে ঢুকে সুর্মা দেখল একটা খাটের ওপর পাতলা তোষক, চাদর আর টেবিল ছাড়া আর কোন সরঞ্জাম নেই। সুনীল বুড়িকে বলল, 'কম্বল ছইনা?'

'ছ।'

সুনীল বলল, পাশেই বাথরুম আছে। দিদি তোমাদের খাবার তৈরী করে দেবে। ওকে রোজ বিশ টাকা দিতে হবে। তোমার কাছে টাকা আছে অতীন?'

অতীন বলল, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। আমি এখন যাচ্ছি, তোমরা ঘর থেকে বেশি বেরিয়ো না।

যত কম লোকে তোমাদের দেখে তত ভাল। আই হোপ য়্যু উইল লাইক টু স্টে ইন দিস কোজি রুম! বাই।' সুনীল একটা চোখ টিপে চলে গেল।

দার্জিলিং থানার অফিসার ইনচার্জ-এর বক্তব্য শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন স্বপ্নেন্দু। না, সুর্মারা এখানেও আসেনি। প্রতিটি হোটেল চেক করা হয়েছে কিন্তু ওদের পাওয়া যায়নি। এবং সুনীল প্রধানকে কাল বিকেলের পর ওর হোস্টেলে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বপ্নেন্দু কি করবেন প্রথমে ভেবে পেলেন না। তিনি অফিসারকে ট্যাক্সি ড্রাইভার যা দেখেছিল তাই বললেন। শুনে ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে চলুন আপনারা। উই শুড ফাইণ্ড হিম ফার্স্ট। ছেলেটির মোটেই সুনাম নেই। আপনার মিসেস ইচ্ছে করলে এখানে অপেক্ষা করতে পারেন।'

কিন্তু সুর্মার মা বেঁকে বসলেন, 'না, আমিও যাব।'

অফিসারের সঙ্গে হেঁটে ওরা হোস্টেলে এলেন। সুনীলের রুমমেট কিছুই বলতে পারল না। অনেক প্রশ্ন করে ক্লান্ত হয়ে ওঁরা যখন বেরিয়ে আসছেন তখন স্বপ্নেন্দু দারোয়ানকে দেখতে পেলেন। তিনি দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ভাই, সুনীল কোথায় গিয়েছে জানো?'

'নেহি সাব।'

অফিসার প্রশ্ন করলেন, 'কাল কোথায় গিয়েছিল?'

'সাইদ রুবয় রেস্টুরেণ্টে। ওহি জায়গাতে ডেইলি যাতা থা।'

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল ওকে কেউ খুঁজতে এসেছিল?'

'পুলিশ আয়া থা রাতমে।'

'আর কেউ?'

'হ্যাঁ সাব। এক বাঙ্গালি লেড়কা আয়া থা সাত বাজে।'

অফিসার সচকিত হলেন, 'বাঙালী? কি রকম দেখতে?'

'থোড়াসা দাড়ি হ্যায়।'

স্বপ্নেন্দু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অতীন। নিশ্চয়ই অতীন।'

দারোয়ানের কথামত ওঁরা রুবয়-তে উপস্থিত হল। এখন বার একদম ফাঁকা। পুলিশ অফিসারকে দেখে ম্যানেজার এগিয়ে এল, 'ইয়েস স্যার?'

'আপনার এখানে রোজ সন্ধ্যেবেলায় সুনীল প্রধান আসে?'

ম্যানেজার একটু ইতস্তত করে বলল, 'ইয়েস।'

'গতকাল এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওর টেবিলে কোন বেয়ারা ছিল ?'

বেয়ারাকে ডেকে আনা হ'লে সে জানাল সুনীল তার চার বন্ধু বান্ধবীকে নিয়ে বিকেল থেকে এখানে বসে ড্রিঙ্ক করেছে। হ্যাঁ, একজন বাঙালি ছেলে ওর খোঁজে এসেছিল। তার মুখে দাড়ি আছে। তাকে মনে আছে যে সুনীল প্রধানের এক বান্ধবী তার ড্রিংকস নিয়ে চুমু ছুঁড়ে দিয়েছিল। স্বপেন্দু অবাক হলেন। অতীনকে অপরিচিত মেয়ে চুমু খাচ্ছে ? কি কাণ্ড।

বেয়ারা তারপর আর ওদের লক্ষ্য করেনি বলে জানাল। অফিসার মেয়েটির নাম জেনে হেসে ফেললেন, 'সি ইজ হেডেক অফ হার ফ্যামিলি। দার্জিলিং-এর ছেলেদের নষ্ট করছে। কুড়ি বছর বয়সেই কতবার যে প্রেমিক চেঞ্জ করল কে জানে। ওকে চাপ দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া যাবে।'

লায়লাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। স্বপেন্দু দেখলেন মেয়েটির শরীরে যৌবন যেন বিপর্যস্ত। একটা হালকা হাউসকোট পরে আছে। ওর মা কড়াগলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি দরকার আমার মেয়ের সঙ্গে ?'

'আমি ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সুনীল প্রধান কোথায় ?'

লায়লা হাসল, 'আই ডোণ্ট নো। কাল রাত্রে আমাদের ছেড়ে ও একা চলে গেছে। আপনারা তো সন্ধ্যে থেকে ওর পেছনে লেগেছেন !'

'আচ্ছা, তুমি জানো ?'

'ইয়া। সেটা শুনেই ও ছেলেটাকে নিয়ে ব্লু-বয় থেকে পালিয়েছিল। অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই রাস্তায় আমাদের দেখা হয়েছিল। হি হিজ হিরো।'

'হুম, ছেলেটা কোথায় ?'

'দ্যাট বেঙ্গলি বয় ? বোনালেশ ক্রিয়েচার ! আমার সঙ্গে এই বাড়ি অবধি এগিয়ে গেল। আশে পাশের কোন বাড়িতে উঠেছে সে।'

'তুই ঠিক বলছ ? দাড়িওয়ালা বাঙালি ছেলে ?'

'ইয়া। আই অ্যাম স্টিল ফিলিং হিজ বিয়ার্ড। বাট হি ইজ নট এ ম্যান। ঠোঁট বেঁকালো লায়লা। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ লায়লা, সাট আপ !'

রাস্তায় নেমে অফিসার বললেন, মিস্টিরিয়াস। ওরা এখানে কার বাড়িতে উঠতে পারে ? চেনা শোনা হ'ল কি করে ?'

ভদ্রলোক স্বপেন্দুদের নিয়ে বাড়িবাড়ি ঘুরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অনেকগুলো বাড়ির পর একটা দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় চমকে উঠলেন ওঁরা।

হ্যাঁ, এই বর্ণনার একটি ছেলে অনেক রাত্রে বাড়িতে ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তাকে ঢুকতে দেয়নি। কারণ ছেলেটি একজন মেমসাহেবের খোঁজ নিচ্ছিল আর বলছিল তার কাছে ছেলেটির আত্মীয়া আছে। তাড়া খেয়ে ছেলেটির পাশের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পাশের বাড়িতে নক্ করে পুলিশ অফিসার বললেন, 'এখানে কি করে আসবে বুঝতে পারছি না। মিসেস দোরজি খুব রেসপেক্টবল্ মহিলা।'

মিসেস দোরজি নিজেই নেমে এলেন, 'ইয়েস অফিসার।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। গতকাল আপনার এখানে দুটো অল্পবয়সী বাঙালী ছেলেমেয়ে এসেছিল ?'

জিনা, স্বপ্নেন্দু এবং সুমির মাকে দেখলেন, 'হ্যাঁ, এসেছিল।'

স্বপ্নেন্দু উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এসেছিল! তারা আছে ?'

মাথা নাড়লেন জিনা, 'না। তারা আজই কার্সিয়াং চলে গেছে।'

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার্সিয়াং-এ কোথায় ?'

'আই ডোণ্ট নো। কাল বাগডোগরা থেকে ফেরার পথে ওরা আমার কাছে লিফট চাইল। রাত হয়ে গেছে এবং ওরা নিউকামার বলে আমার একটু সফ্ট হতে ইচ্ছে করল। ছেলেটি যার ওপর ডিপেণ্ড করেছিল তাকে এখানে পায়নি। ফলে আমার এখানে শেল্টার নিয়েছিল ওরা। আজ সকালে ওরা চলে গেছে। হোয়াই, এনিথিং রং ?' মিসেস দোরজি জিজ্ঞাসা করলেন!

'হ্যাঁ। ওরা পালিয়ে এসেছে। এঁরা হলেন মেয়েটির মা-বাবা। ওই ছেলেটি সুস্থ নয়। অনেক ধন্যবাদ।' অফিসার উঠে দাঁড়ালেন।

'এক মিনিট!' জিনা এগিয়ে এলেন সুমির মায়ের কাছে, 'আমি আপনার কষ্ট বুঝতে পারছি। আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। শি ইজ গুড গার্ল। কি নরম। এটুকু বলতে পারি এখন অবধি সে ভাল আছে।'

সুমির মা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। স্বপ্নেন্দু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন, 'যে মেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তার জন্য কাঁদছ কেন? চল।'

মিসেস দোরজি বললেন, 'অফিসার, মে আই গিভ ইউ লিফট ?'

'আপনি বেরুবেন ?'

'হ্যাঁ।'

ওঁরা মিসেস দোরজির গাড়িতে থানায় ফিরে এলেন। এখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। সারাদিন ওঁদের খাওয়া হয়নি। কিন্তু, সামান্য ক্ষুধা বোধ করছিলেন

না। অফিসারের ধারণা ওরা সুনীলের কাছেই গিয়েছে। সুনীলকে অ্যারেস্ট করে আনতে হবে। এস. পি-র কাছ থেকে ফোর্স নিয়ে যাওয়ার অর্ডারটা আনতে সামান্য দেরী হবে। ওদের কোন রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিয়ে নিতে বললেন অফিসার। জিনা আর অপেক্ষা করেননি, উনি বুঝতে পারছিলেন কাজটা ঠিক হয়নি। সুনীল মোটেই ভাল ছেলে নয়! তবু ওর কথা এঁদের বলতে পারলেন না। এই টিন অ্যাডভেঞ্চারটা তিনি কেন জানেননা পছন্দ করে ফেলেছেন। নিজের মেয়ে হ'লে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন, কিন্তু নিজে ওই বয়সে এমন ভেসে পড়তে পারলে হয়তো খুশী হতেন। এই চল্লিশ বছর বয়সে কাউকে বিয়ে করতে যে দ্বিধা আসছে তাঁর ছেলেমেয়ে দুটোর তা নেই। নিজের ইচ্ছেটা গোপনে গোপনে ওদের মধ্যে কি দেখতে পেয়েছেন তিনি? সুর্মার মাকে দেখে তার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তাই পালিয়ে বাঁচলেন। কাজ আছে বলে বিদায় নিয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি দুপুরটা ফুরিয়ে আসছিল দার্জিলিং-এ।

একটু আগে ভাত আর মাংসের ঝোল খেয়েছি আমরা। রান্নাটা মোটেই ভাল নয়। অতীন দেখলাম খুব খেল। আমি সামান্য। খাওয়া দাওয়ার পর অতীন খাটে শুয়ে পড়লে আমি কি করব বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ খেয়াল হল, এই ঘরে আমাকে অতীনের সঙ্গে থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খুব অস্বস্তি হল, সেই সঙ্গে লজ্জা। আমাদের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক এখনও গড়ে ওঠেনি যে এভাবে থাকা যায়। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কেউ এরকম থাকে? আমি যদি পাশের ঘরে বুড়ির সঙ্গে থাকি? এই সময় অতীন আমাকে ডাকল, 'এই, তুই কি ভাবছিস?'

'কিছু না।' আমি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা ভারী লোহার রড স্পর্শ করলাম।

'দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এখানে আয়।'

'কেন?'

'বারে। ওইভাবে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবি?'

'আমি তোর সঙ্গে একঘরে থাকতে পারব না!' কথাটা বলেই ফেললাম।

'কেন?' অতীন উঠে বসল।

'বাঃ। থাকা যায়?'

'কেন? থাকা যায় না কেন?'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ওকি কিছু বোঝে না? না কোন ফন্দি করে এই কথা বলছে। বললাম, 'যায় না তাই।'

অতীন নেমে এল। এসে আমার কাঁধে হাত রাখল, 'এই সুর্মি', তুই আমাকে

'একটুও ভালবাসিস না ? আমি তোর জন্যে প্রাণ দিতে পারি !'

কথাটা শোনামাত্র আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। ও হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'এই কি হয়েছে তোর ? কাঁপছিস কেন ?'

আমি বললাম, 'ছেড়ে দে, আঃ।'

ও বলল, 'না ছাড়ব না। আমি তোকে ভালবাসি তাই এভাবে বুকে জড়িয়ে ধরব।' ও আমাকে ছাড়ছিল না কিন্তু বুঝলাম ও হাঁপাচ্ছে। আমি প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু অতীনের গায়ের জোর যেন অনেক-গুণ বেড়ে গেছে। আমরা সারা ঘরে যেন লড়াই করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম অতীনের মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, নিশ্বাস গরম। শেষ পর্যন্ত আমরা খাটের ওপর আছড়ে পড়লাম। আমার পিঠে খুব ব্যথা করল আর আমি হেরে গেলাম। অতীন তখনি আমার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখল। এই প্রথম কোন পুরুষ আমাকে চুম্বন করল। অতীন পাগলের মত আমাকে চুমু খেয়ে যাচ্ছে, ঠোঁটে, গালে, চোখে, গলায়। আমি স্থির হয়ে পড়ে আছি। এবং এই সময় আমার কান্না পেতে লাগল। হঠাৎ অতীন চুমু খাওয়া থামিয়ে বলল, সুমি', তুই আমাকে চুমু খা। একটু চুমু, প্লিজ। তোকে আমি কি ভীষণ ভালবাসি !' ও আমার কাছে ভিক্ষে চাওয়ার মত বলতে লাগল। তারপরেই ওর চোখ পড়ল আমার চোখে। দেখলাম অতীনের ঠোঁট নেমে আসছে। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে পরম যত্নে ও ঠোঁট দিয়ে আমার চোখের জল শুষে নিল। তারপর আমার গলায় মুখ রেখে পড়ে রইল। কি হল জানি না, এই প্রথম আমি ওকে অস্বীকার করতে পারলাম না। অজান্তেই ওর মাথায় আমার ডান হাত উঠে এল। আমি চুপচাপ সেই অবস্থায় ওর চুলে বিলি কাটতে লাগলাম। এবং এই প্রথম আমি, কেমন করে জানি না, অতীনকে ভালবেসে ফেললাম।

এই ঘরে ইলেকট্রিক আলো নেই। আমার পাশে শুয়ে অতীন বলল, 'আজ থেকে তুই আমার বউ। আমার হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা কর কোন অবস্থায় আমাকে ছেড়ে যাবি না।'

আমি ওর হাতে হাত রেখে হাসলাম, 'ঠিক আছে।'

'না ঠিক আছে বললে চলবে না। পুরোটা বল।'

আমি হাসলাম, 'তুই ভীষণ ছেলেমানুষ।'

ওর দুই চোখ তৃপ্তিতে ভরে গেল। আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আমার পাশে। এখন ঘরে বেশ ঘন ছায়া। সারাটা দুপুর ও আমাকে আদর করেছে। কিন্তু মেয়ে বলে আমি যে কারণে সিটিয়ে ছিলাম ও তার ধার দিয়েই গেল না।

শুধু চুমু আর স্পর্শেই ওর শান্তি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ও মোটেই বড় হয়নি। আমার চেয়ে অনেক কম বোঝে। তাই বোধহয় স্বস্তিতে ছিলাম। ক্রমশ আমার মনে হতে লাগল আমি যা বলব ও তাই করবে। একধরনের নিরাপত্তা বোধ এল এই অহঙ্কার থেকে।

এই সময় দরজায় কেউ শব্দ করল। অতীন ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে?'

'বুড়িটা হতে পারে! দ্যাখ না।'

অতীন উঠে দরজা খুলল। একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'আপকো বোলাতা হ্যায়।'

'কৌন?'

'সুনীল।'

আমি খাটে উঠে বসেছিলাম। অতীন বলল, 'কি ব্যাপার কে জানে। তুই ঘরে থাক আমি ঘুরে আসছি।'

'তাড়াতাড়ি আসিস।'

অতীন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ছেলেটার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। আমি উঠলাম। অন্যমনস্কভাবে চুলে হাত দিতে গিয়ে মনে পড়ল আমার চিরুনি নেই। অতীনকে বলতে হবে কয়েকটা জিনিস কিনতে। আমার আর একটা পোশাক দরকার। এই সার্ট প্যান্টে কতদিন থাকা যায়!

আমার আজ বেশ ভাল লাগছিল। আমার ভেতরে যে আর একটা আমি আছে তা আজ প্রথম টের পেলাম। অতীনটা সত্যি ছেলেমানুষ। সত্যি।

বাইরে কারো জুতোর শব্দ হল। তাকিয়ে দেখলাম সুনীল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার কোথায়।'

কথাটা আমার একটুও ভাল লাগল না। তবু জবাব দিলাম, 'আপনার কাছে গেল। একটা ছেলে ডাকতে এসেছিল।'

'কিন্তু আমি অপেক্ষা করে চলে এলাম! তোমাদের আগে ডিস্টার্ব করতে চাইনি। সারাটা দুপুর কেমন এনজয় করলে?'

আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আমি কি বলব ওকে? অতীন এখনও আসছে না কেন? সুনীল ভেতরে ঢুকল, তুমি দারুণ দেখতে। অতীনকে আমি একটা চাকরী জুটিয়ে দেব। কিন্তু তোমাকে আমার অন্য কাজে দরকার হবে।'

'কি কাজ?'

'নট সো কুইক। ইউ ডোণ্ট লাভ হিম, ইজণ্ট ইট?' তোমাকে একবার দেখেই বুঝতে পেরেছি অতীন তোমাকে জোর করে নিয়ে এসেছে। ও হাসল, 'আমাকে তোমার কেমন লাগছে?' সুনীল আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমার খুব ভয় করল। ওর মতলব যে ভাল নয় তা বুঝতে পারছি।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনি এগিয়ে আসছেন কেন?'

'টু সেভ ইউ ফ্রম পুলিশ। একটা চুমু খাও তো আমাকে। দেখি ওটা মিষ্টি না নোনতা? মাইণ্ড ইট, এই কথা অতীনকে বললে আমি তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেব।' ও চোখ বন্ধ করে আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল।

রাগে আমার মাথা ঘুরে গেল। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা লোহার রডটা তুলে প্রাণপণে ওর মাথায় আঘাতে সুনীলের দুটো চোখে অবাক বিস্ময়ে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। আমি দেখলাম ওর শরীরটা যেন খসে পড়ল মাটিতে আর মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল! আমি চিৎকার করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপরে অতীনের ব্যাগটা তুলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বুড়িকে চোখে পড়ল না, আর তখনই অতীনকে দেখতে পেলাম। দ্রুত ফিরে আসছে। আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?' আমি কথা বলতে পারছিলাম না। দ্রুত ওর হাতে ধরে নিঃশ্বাস নিলাম তাড়াতাড়ি। চল।'

'কোথায়?'

'এখান থেকে পালিয়ে যাব। প্লিজ, পরে কথা হবে।'

কিন্তু সুনীলকে পেলাম না। ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাব কেন?'

'পরে, পরে কথা বলব।' আমি ওকে নিয়ে প্রায় দৌড়াচ্ছিলাম। অতীন নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছিল। বস্তিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে আমরা গাড়ির শব্দ পেলাম। খুব জোরে আসছে। আমার কি মনে হ'ল জানি না তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে অতীনকে টেনে নিয়ে দাঁড়ালাম। এখন সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসছে। পুলিশের দুটো জিপকে ছুটে যেতে দেখলাম। অতীন ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওরা আমাদের জন্যে আসছে নিশ্চয়ই।'

গাড়িদুটো চোখের আড়ালে যেতেই আমরা ছুটতে লাগলাম। রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে আমাদের দেখছে। স্টেশনের কাছে এসে অতীন বলল, 'কি করবি? কোথায় যাবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

সেইসময় একটা ট্রেন স্টেশন থেকে হুইসেল দিতে দিতে বের হ'ল। ছোট

ট্রেনটা আমাদের সামনে দিয়ে এগোচ্ছে। আমরা আর কোন চিন্তা না করে দৌড়ে ওই ধীরে চলা ট্রেনটায় উঠে পড়লাম।

সুনীলের বাবা পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। না, এরকম কোন বাঙালি ছেলেমেয়ে আজ তাদের কাছে আসেনি। পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজল। অনেককে জেরা করল। স্বপ্নেন্দু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। অফিসার বলছিলেন, 'মুশকিল কি জানেন, এরা একজন যে কথা বলে আর কেউ তার উল্টো বলতে পারে না কিছুতেই। সত্যি কথাটা এদের মুখ থেকে বের করা যায় না।' স্বপ্নেন্দু ভাবছিলেন সুর্মা কি করে এইরকম পরিবেশে আসবে? মেয়েটা এত বছরের সংস্কার, অভ্যাস একদিনেই পাল্টে গেল।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ পুলিশ চলে গেলে সুনীলের বাবা খবরটা পেলেন। সেই বুড়ি একটু আগে সুনীলকে আবিষ্কার করেও পুলিশের ভয়ে কিছু বলেনি। তার ফলে বেশ দেরী হয়ে গেছে। সুনীলকে বাঁচানো গেল না।

মৃতদেহ সামনে নিয়ে সুনীলের বাবা কিছুক্ষণ বসে থাকল। তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না ওই ছেলেমেয়ে দুটো এই হত্যার জন্য দায়ী। কিন্তু এই কথা এখন পুলিশকে জানানো যাবে না। যাদের অস্তিত্বের কথা সে নিজে অস্বীকার করেছে তারাই যে ছেলেকে খুন করতে পারে এখন আর বলা যায় না। সে আটজন বিশ্বাসী লোককে ডাকল। তাদের ওপর দায়িত্ব দিল যেমন করেই হোক ওই বাঙালি ছেলেমেয়ে দুটিকে খুঁজে নিয়ে আসতে। পুলিশ যখন ওদের খুঁজছে তখন তারা কিছুতেই বেশীদূর যেতে পারবে না। নিজের সন্তানের মৃত্যুর বদলা নিয়ে তবে অন্য কথা। দুটো জিপ সঙ্গে সঙ্গে দুদিকে বেরিয়ে গেল। তন্ন তন্ন করে তারা খুঁজতে লাগল শহরের সব অলিগলি। তারপর রাত হলে বেরিয়ে পড়ল একদল দার্জিলিং-এর পথে আর একদল শিলিগুড়ির দিকে। প্রতিটি লোকই নিরুত্তাপ কিন্তু নির্দয়।

কার্সিয়াং থানায় বসে প্রথমে পুলিশ এসব টের পায়নি। দার্জিলিং-এর অফিসার বললেন, 'আমার বিশ্বাস সুনীলের বাবা মিথ্যে কথা বলছে। ওরা এখানেই এসেছিল এবং সুনীল ওদের নিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে। কোথায় যেতে পারে? এক, শিলিগুড়িতে নেমে যেতে পারে। ওখানকার পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হোক যাতে প্রতিটি হোটেলে সার্চ করে।

স্বপ্নেন্দুর খুব অসহায় লাগছিল! তিনি জানেন তাঁর স্ত্রী মনের জোরে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। এই ছুটোছুটি সহ্য করার মত শরীর তাঁর নয়। এখন

তিনি কি করবেন। এইসময় একটি লোক এসে খবর দিল সুনীল প্রধানদের দুটো জিপ দার্জিলিং-এর দিকে ছুটে গেল। পানবাহার দোকানের মালিক বলছে যে ছেলেমেয়ে দুটো সন্ধ্যের ট্রেনে উঠেছে। এখান থেকে আর একটা খবর কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে যে সুনীল প্রধান নাকি খুন হয়েছে। ওই জিপ যাচ্ছে বদলা নিতে। সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ পড়ে গেল। দার্জিলিং-এর অফিসার কার্সিয়াং-এর অফিসারকে বললেন সুনীলের ব্যাপারটা সত্যি কিনা খবর নিতে।

একটু বাদেই দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে দুটো জিপ বেরিয়ে এল থানা থেকে। অফিসার প্রথমে স্বপ্নেন্দুদের সঙ্গে নিতে চাইছিলেন না, কিন্তু ওঁর পীড়াপীড়িতে রাজী হলেন। পুলিশের লক্ষ্য এখন জিপ।

এঁকে বেঁকে ট্রেনটা চলছিল, এই প্রথম ওরা দার্জিলিং-এর টয়ট্রেনে উঠল, অথচ ওদের দুজনেরই মনে হচ্ছিল কেন সেই দার্জিলিং মেইলের মত এই ট্রেনটা হু হু করে ছুটছে না। ট্রামের চেয়েও অল্প স্পিডে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ে উঠেছে গাড়িটা। মাঝে মাঝে যখন আবার পিছিয়ে যাচ্ছে দম নিতে তখন এক ধরনের ভয় এসে জমছে, ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্সিয়াং থেকে পালাতে চায়।

বাইরে এখন চুরচুরে কুয়াশা। অন্ধকার সেই কুয়াশা মিশে গিয়ে একটা ঘোলাটে সমুদ্র হয়ে গিয়েছে। সুর্মা অতীনের দিকে তাকাল। কার্সিয়াং ছাড়াবার পর থেকেই কেমন চুপ করে গেছে ও। সমস্ত ঘটনা শোনার পর ওর দুটো হাত ধরে শুধু বলেছিল 'তুই ঠিক করেছিস, ঠিক করেছিস।'

কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পায়নি সুর্মা। মনের মধ্যে বিঁধে থাকা কাঁটাটা দপদপাচ্ছিল। সে খুন করল শেষ পর্যন্ত! খুনই ত! ছেলেটার মাথা থেকে যেভাবে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছে তাতে খুন ছাড়া কি হতে পারে! ও যদি সুনীলকে বুঝিয়ে বলতো তাহলে সুনীল কি শান্ত হোত না! একটা মন বলছে হোত, অন্য মন বলছে না, হোত না। হঠাৎ সমস্ত শরীরে কনকনে বাতাস লাগল যেন। ও অতীনের হাত চেপে ধরল, 'এই অতীন, খুন করলে ফাঁসি হয়, না রে?'

অতীন তাকাল, 'কি বাজে বকছিস!' হঠাৎ তার মাথার ভেতরে দ্রিমি দ্রিমি শব্দ শুরু হল।

'সত্যি করে বল না। খুন করলে ফাঁসি হয়?'

'তুই খুন করেছিস কে বলল? সুনীল তো বেঁচেও যেতে পারে। তাছাড়া কি প্রমাণ আছে যে তুই খুন করেছিস? কে দেখেছে? পুলিশ যদি আমাদের ধরে তবেই তো এসব কথা উঠবে। সে আমি ম্যানেজ করে নেব।'

'কি করে ?'

'মিথ্যে কথা বলে। তুই তো জানিস আমি খুব সুন্দর মিথ্যে কথা বলি।' সুর্মা ওর দিকে তাকাল। ওর খুব কান্না পাচ্ছিল। ও মনে মনে চাইছিল সুনীল যেন কোন বিপদে না পড়ে।

ঠিক তখনই একটা জিপের হেডলাইটের আলো এসে পড়ল ট্রেনের গায়ে। কুয়াশার জন্যে দেখা যায়নি, আচমকা বাঁক পেরিয়ে জিপটা ট্রেনের ঠিক পাশে চলে এল। অতীন প্রথমে লক্ষ্য করেনি কিন্তু তিনটে লোক জিপ থেকে মুখ বের করে যেভাবে তাকাচ্ছে তাতে সতর্ক হল। জিপটা সাঁ করে এগিয়ে যেতে ট্রেনটা থেমে গিয়ে খুব জোরে জোরে হুইসল দিতে লাগল। অতীন মুখ বের করে দেখল ট্রেনের আলোয় জিপটাকে দেখা যাচ্ছে, ঠিক লাইনের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ওটাকে। টপাটপ কয়েকটা লোক নেমে এল টর্চ হাতে। এসে প্রথম কামরায় উঠে গেল। একটু বাদেই তারা নেমে এসে আবার দ্বিতীয় কামরায় উঠল।

অতীনের মাথার ভেতরটা টলে উঠল। পুলিশ! নিশ্চয়ই তাদের খুঁজতে এসেছে। না, কিছুতেই ধরা দেবে না ওরা! ও চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সুর্মার হাত ধরে টানল, 'চল, পালাই, পুলিশ!' মাথার যন্ত্রণাটাকে আমল দিল না সে।

সুর্মাও লক্ষ্য করেছিল, ফ্যাশফেশে গলায় বলল, 'কি হবে ?'

'কিছু হবে না। এই পাহাড়ে কেউ আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না। চল, আর কথা বলার সময় নেই।' কামরায় অন্য যাত্রীদের অবাক করে চোখের সামনে দিয়ে ওরা লাফিয়ে পাশের রাস্তায় নামল। তারপর এক দৌড়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের গায়ে চলে এল।

হয়তো আগে এই পথে ঝরনার জল গড়িয়ে আসতো, কিন্তু এখন তার শুকনো দাগ ছাড়া কিছু নেই। অতীন সুর্মার হাত ধরে দ্রুত ওপরে উঠছিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না প্রায়, সুর্মা একবার আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেল। ওরা যখন বেশ কিছুটা ওপরে উঠে গেছে তখনই জিপটা ঘুরে এসে ঠিক ওদের নীচে দাঁড়াল। অতীন বুঝল ওদের পালানোটা ধরা পড়ে গেছে। এখনই ওরা পিছু ধাওয়া করবে। অনেক নীচে মানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

অতীন সামনে তাকাতেই দেখল আকাশের মেঘ কেটে যাচ্ছে আর সেখানে একটা পানসে চাঁদ। তার ফিকে আলোয় চারধার সাদা। হঠাৎ ওর চারপাশে কেউ থাকল না। সেই যন্ত্রণাটা ফিরে এল মাথায়। আচমকা নিজের চুল খিমচে ধরে চিৎকার করে উঠল সে।

সুর্মা আর পারছিল না। এর মধ্যেই ওর পা থেকে রক্ত ঝরছিল। অতীনের চিৎকারে চমকে উঠে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে, চিৎকার করছিস কেন?'

অথচ অতীন জবাব দিল না। দ্রুত ছুটে গেল ওপরে। সেখানে পাহাড়টা আচমকা শেষ হয়ে কেমন সমান হয়ে গিয়েছে। সেই মসৃণ পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে অতীন আকাশের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে শুরু করল। সুর্মা বুঝতে পারছিল না অতীনের কি হয়েছে, এরকম আচরণ করছে কেন। সে মরিয়া হয়ে ছুটে এল ওপরে। ঠিক সেই সময় দুটো জিপ হেড লাইট জ্বালিয়ে এসে দাঁড়াল নিচে। সুর্মার কানে বোধহয় গুলির শব্দ এল। কিন্তু সেটিকে মন দেবার সময় ছিল না ওর। দুহাতে অতীনকে আঁকড়ে ধরে সে চিৎকার করে উঠল, 'অতীন, তুই এমন করছিস কেন? কি হয়েছে, বল?'

অতীন প্রচণ্ড শক্তিতে ওকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বিকৃত মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে কঁকিয়ে উঠল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।'

সুর্মা ছিটকে পড়েছিল পাথরের ওপর। অতীন যে তাকে এভাবে জোরে ঠেলে দেবে ভাবতেও পারেনি। তার পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবু সে উঠে দাঁড়াল তার দুহাত বাড়িয়ে কেঁদে উঠল, 'অতীন, তোর কি হয়েছে, এমন করছিস কেন?'

অতীন ঘুরে দাঁড়াল। তার ঘোলাটে চোখ সুর্মা দেখতে পেল না আবছা চাঁদের আলোয়। নিজের চুল মুঠোয় ধরে অতীন চিৎকার করল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।'

সুর্মা ছুটে গেল অতীনের কাছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, 'অতীন, তোকে আমি ভালবাসি। বিশ্বাস কর, এখন আমি তোকে ভালবাসি।'

অতীন আলিঙ্গনে ছটফট করছিল। তার মুখ এখনও আকাশের দিকে। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত। সে বিড়বিড় করছিল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।'

সুর্মার সমস্ত শরীর যেন পাথর হয়ে গেল। ও হঠাৎ আবিষ্কার করল তার দু'হাতের শক্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকেও অতীন যেন তার কাছে নেই। সেই বদ্ধ উন্মাদ শরীরটার বুকে মাথা ঠুকতে ঠুকতে ও প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলতে লাগল, 'অতীন, কথা বল, আমি তোকে ভালবেসেছি রে। অতীন, কথা বল।'

অনেক নীচে অন্ধকার রাস্তায় দুজন পুলিশের সঙ্গে দাঁড়ানো স্বপ্নেন্দু কিংবা সুর্মার মা এদের দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সুর্মা ঘাড় ফেরালে হয়তো

অবস্থা দেখতে পেত ওদের। উঠে আসা পুলিসের দল এর মধ্যেই বদলা নিতে আসা লোকগুলোকে কবজা করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল ওপরে।

ওরা হঠাৎ দেখতে পেল পাহাড়ের একেবারে চুড়োয়, যার ওপাশে অতলান্ত খাদ, সেখানে উন্মত্ত একটি তরুণকে দুহাতে আঁকড়ে একটি প্রায় তরুণী কাঁদছে। উন্মাদ চিৎকার করে উঠল আচমকা, 'সুনীলকে আমিই মেরেছি, আমি, আই লাভ ইউ সুর্মা।' এবার মেয়েটি যেন প্রচণ্ড বিস্ময়ে ধীরে ধীরে মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। তরুণটি তখনও সম্রাটের মত চিৎকার করছিল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।' খোলা আকাশে শব্দগুলো যেন তার সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল।



ইমদাদুল হক মিলন

ও রাধা ও কৃষ্ণ

IMDADUL HAQ MILAN
51/1 RAJANI CHOWDHUARY ROAD
GANDARIA DHAKA 1204
PHONE 235324

'দুই বাংলার প্রথম প্রেমের উপন্যাস' সংকলনে আমার 'রাধা ও কৃষ্ণ' উপন্যাসটি প্রকাশের অনুমতি দিলাম।

ইমদাদুল হক মিলন

ইমদাদুল হক মিলন

অলি

লাভলি বলল, কোন মেয়েটা সবচেয়ে সুন্দর বল তো ?

আমি ছবিটার দিকে হা করে চেয়ে থাকি। গ্রুপ ছবি। একসঙ্গে তেরটা মেয়ে।

লাভলি বলল, আমার সব বন্ধু। আমাদের ডিপার্টমেন্টে তেরটাই মেয়ে।

সব কটিই তোমার বন্ধু ?

হ্যাঁ। মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি মেয়েদের বন্ধু হয়।

আমি আবার ছবিটা দেখতে থাকি। তেরটার মধ্যে মাত্র একটা মেয়েকেই আমি চিনি। লাভলি। লাভলি বসে আছে মাঝখানে। তেরটা মেয়ের তিনটে রো। ছজন দাঁড়িয়ে, তাদের কোমরের কাছে চেয়ারে বসা পাঁচজন। আর দুজন চেয়ারে বসা মেয়েগুলোর দুধারে হাঁটু ভেঙে মেঝেতে বসে আছে। সবগুলো মেয়েই সুন্দর।

আমি বললাম, লাভলি তোমার সব বন্ধুই সুন্দর।

সবচে সুন্দর কে ? তোমার পছন্দ কাকে ?

পছন্দ করে কি হবে, বিয়ে দেবে নাকি ?

দেখব তোমার পছন্দ কেমন।

পরীক্ষা নিচ্ছ ?

হ্যাঁ।

আমি আবার ছবিটা দেখতে থাকি। লাভলি বসে আছে চেয়ারে বসা মেয়েগুলোর মাঝখানে। এই এক অদ্ভুত ব্যাপার। আজ পর্যন্ত যতগুলো গ্রুপ ছবি দেখেছি আমি, যে ছবি দেখায় সে বরাবরই মাঝখানে থাকে। এই ছবিটার মাঝখানে লাভলি। লাভলি আমাকে ছবিটা দেখাচ্ছে। লাভলিকেই সবচে সুন্দর বলে দেব নাকি! লাভলিই আমার পছন্দ! না। ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যাবে। লাভলি আমার বন্ধুর বোন। লাভলির বড়পা সুলতানা আমার বন্ধু।

বছর খানেক আগে সুলতানার সঙ্গে আমার পরিচয়। সুলতানা তখন এম এ পরীক্ষা দিয়ে বেকার ঘুরে বেড়ায়। ওর অনেক ছেলে বন্ধু। আমার সঙ্গে আলাপ রহমানের থ্রোতে। রহমান কবিতা লেখে আর মতিঝিলে বাবার দোকানে বসে। দোকানে বিক্রি ফিক্রির চে আড্ডা চলে বেশি। রহমানের ম্যালা

বন্ধুবান্ধব। কবি হাফকবি ফ্যান। রহমান খুব সুন্দর করে কথা বলে। জমিয়ে গল্প করে।

এক দুপুরে রহমানের দোকানে সুলতানার সঙ্গে আমার পরিচয়। পাতলা টিংটিংয়ে একটা মেয়ে। বেটে ফর্সা। চশমা পরে। মুখটা খুব মিষ্টি। কবিতা টবিতা লেখে। দু মিনিটে মেয়েটার সঙ্গে আমার জমে যায়। সুলতানার ভেতরে কোনো জড়তা নেই। আমার ভেতর নেই ভনিতা। ফলে ফ্রেন্ডশিপ। পাঁচ মিনিটের মাথায় আমরা আপনি থেকে তুমি।

সুলতানা বলল, আমাকে একটা চাকরি দাও না।

তুমি চাকরি করবে?

হ্যাঁ, বেকার ভাল্লাগে না।

কোয়ালিফিকেশান?

এই কথাটা আমি বলি ভয়েস চেঞ্জ করে। শুনে সুলতানা খিল খিল করে হেসে ওঠে। ওর হাসি শুনে আমি সিওর হয়ে যাই, এই মেয়ের সঙ্গে আমার কখনো প্রেম হবে না।

সুলতানা বলল, এম এ দিয়েছি।

শুনে আমি চমকে উঠি। তাহলে তো তোমাকে সুলতানা আপা বলতে হয়।

বলতে পার, আমি তোমার চে বড়ই হব।

রহমান বলল, প্যাচাল ছাড়। ওকে একটা চাকরি পারলে দে।

আমি রহমানের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি রহমান আজ একটু রেগে আছে। ওকে ঘাটান ঠিক হবে না। শালা খাতারনাক জিনিশ।

এসব এক বছর আগের কথা। পরের মাসে সুলতানাকে আমি একটা চারশো টাকা মাইনের চাকরি ম্যানেজ করে দিই। বাবার এক বন্ধুর ফার্মে। ফলে আমাদের ফ্রেন্ডশিপটা দারুণ জমে যায়। আমি সুলতানাদের বাসায় যাই। সুলতানা আমাদের বাসায়। সুলতানা আমার মা বাবাকে বলে খালাম্মা খালু। আমি ওর মা বাবাকে বলি খালাম্মা খালু। সুলতানার তিনটে বোন অল্প কদিনেই আমার মহাভক্ত হয়ে যায়। আমি ছাড়া আমার আর কোনো ভাই বোন নেই বলে সুলতানার কেউ ভক্ত হয় না।

এসব ভাবতে ভাবতে আমি একটু চমকে উঠি। তেরটার মধ্যে একটা মেয়ে তো দারুণ সুন্দর।

আমি মনোযোগ দিয়ে মেয়েটিকে দেখতে থাকি।

হাঁটু ভেঙে মাটিতে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে মেয়েটি। দারুণ দেখতে।

মুখটা রসগোল্লার মত মিষ্টি। চোখ দুটো একটু উদাস। অনেকটা মোঘল রানীদের মত। আমি মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকি।

মেয়েটাকে দেখতে দেখতে আমার আরো কত কি যে মনে হতে থাকে! মনে হয় এ মেয়ে রোজ রাতে স্বপ্ন দেখে। ও হেঁটে গেলে মাটি টের পায় না। ও হাত দিয়ে গোলাপ চারা স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে ফুটে যাবে একটি লাল গোলাপ।

এত সুন্দর মেয়ে আমি কি কখনো দেখেছি!

ছবিটার দিকে, শুধু ওই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলি, ও মেয়ে তোমার নাম কি গো?

লাভলি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে বলল, পছন্দ হল?

হয়েছে।

কোনটা!

লাভলি ঝুঁকে আমার মুখের কাছে চলে আসে। ওর উৎসাহ দেখে আমি লজ্জা পাই। আমি অন্য কোনো মেয়েকে সুন্দর বললে লাভলি যদি দুঃখ পায়!

চায়ে চুমুক দিয়ে ভাবতে থাকি, বলব কি বলব না।

লাভলি আবার বলে, কি হল?

আমি তখন আস্তে করে ছবির সুন্দর মেয়েটার গাল ছুঁয়ে দিই। দেখে লাভলি হাততালি দিয়ে ওঠে। তোমার তো দারুণ রুচি!

আমি বলি, মেয়েটার নাম কি?

মিমি।

বাহ চমৎকার নাম তো। চুইংগামের মত।

মেয়েটা খুব সুন্দর না?

দারুণ। কোথায় থাকে?

সেগুন বাগিচা।

ওখান থেকে রোজ জাহাঙ্গীরনগরে যায়?

হ্যাঁ। বারে, আমিও তো যাই।

শুনে আমার মনে হয় লাভলির যাওয়া আর মিমির যাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা পার্থক্য আছে। কিন্তু মুখে ওসব বলা যায় না। লাভলি রাগ করবে।

আমি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলি, লাভলি তোমার বন্ধুকে কাল ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে বলবে একজন ওর ছবি দেখেই পাগল হয়ে গেছে।

জ্যান্ত দেখলে বোধহয় হার্টফেল করবে।

তারপর একটু থেমে বলি, হার্টফেল করার জন্যে হলেও তাকে আমি একদিন দেখব। জাহাঙ্গীরনগরে যাব।

লাভলি হেসে বলল, আমি কাল গিয়েই মিমিকে বলব।

মিমি প্রসঙ্গ একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে আমি ছবিটা উল্টে রেখে অন্য কথা বলি। বাবলি কই ?

ও ঘরে।

বিউটি ?

ও ঘরেই।

আমি এসেছি ওরা শোনেনি ?

শুনেছে।

তাহলে একবারও যে এ ঘরে এল না।

এ বাড়িতে আমার সবচে ভক্ত বাবলি। বাবলি নাইনে পড়ে। হলে কি হবে, বাবলির ফিগার টিগার দারুণ। দেখতে লাভলির চেয়েও বড় লাগে। বাবলি বড় পাগল মেয়ে। যখন যা ইচ্ছে করে, যা খুশি বলে। বাড়ির ছোট মেয়ে, ওকে কেউ কিছু বলে না।

লাভলি বলল, বাবলিকে মা বকেছে। বাবলি বোধহয় কাঁদছে।

যাহ।

হ্যাঁ, ও ঘরে যাও না।

আমি লাফিয়ে উঠে পাশের ঘরে যাই। বাপরে, বাবলি কাঁদছে আর আমি এখনো থামাতে যাইনি। শুনলে কান্না থামিয়ে বাবলি নির্ঘাৎ ছুটে আসবে আমাকে মারতে।

আমাকে ছুটতে দেখে লাভলি খিল খিল করে হাসে।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি বাবলি হাত পা ছড়িয়ে খাটের ওপর বসে আছে। দু হাতে চোখ ডলছে। বাবলিকে আজ দারুণ লাগছে। বাবলি পরেছে জিনসের প্যান্ট। শার্ট ইন করা। বাবলি সব সময়ই ছেলেদের মত ড্রেস পরে। ওর কোনো ভাই নেই বলে বাবলিকে সবাই সাজিয়েও রাখে ছেলের মত করে। বাবলির কোনো মেয়েলি ড্রেস নেই। বাবলির চুল বব করা। আজকাল এই সাইজের চুল সব ইয়াং ছেলেদের। আমার চুলও বাবলির মত।

আমাকে দেখে বাবলি বলল, কখন এসেছ ?

সঙ্গে কান্নার একটা হেঁচকি।

বাবলিকে দেখে আমি কাঁদব না হাসব বুঝতে পারি না। হাসলে বাবলি উঠে নির্ঘাৎ একটা রো মেরে বসবে।

আমি চেপে যাই। বাবলির পাশে বসে বলি, বাবলি তুমি কাঁদছ কেন?

আমাকে সবাই বকে। একটুও আদর করে না।

আমি ওর হাত ধরে বলি, চল। আমি তোমাকে খুব আদর করি।

ছাই কর। তাহলে আমি কাঁদছি শুনে একবারও এলে না কেন?

আমাকে তো কেউ বলেনি। আমি ভেবেছি তুমি বাড়ি নেই। ঠিক আছে আর কখনো এমন হবে না। আজ মাফ করে দাও।

বাবলি হেসে আমার হাত ধরে।

পাশের ঘরে এসে দেখি বিউটিও এসে গেছে। আমাকে দেখে বলল, কখন এসেছ?

অনেকক্ষণ। তুমি কোথায় ছিলে?

পড়ছিলাম।

সুলতানার বোনদের মধ্যে বিউটি খুব অন্যরকম। কথাটথা বলে কম। আড্ডা ফাড্ডায় নেই। বিউটি দেখতেও খুব সুন্দর। কিন্তু মিমির মত নয়।

বিউটিকে দেখে আমার আবার মিমির কথা মনে পড়ে। মিমিদের ছবিটা এখন বিউটির হাতে। বিউটি ভারি কাঁচের চশমায় মিমিদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

সুলতানার চার বোনের তিনজনই চশমা পরে। বাবলি পরে না। বাবলির চোখে কোনো ডিফেক্ট নেই।

এ ঘরে এসে বাবলি কান্না ভুলে গেল। বলল, অলি ভাই, আমার ববিতা এ্যলবাম দেখবে।

দেখেছি।

কোথায়?

বিচিত্রায়।

ধুৎ ওটা না। আমার পার্সোনাল।

আন তো।

বাবলি লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

বিউটি বলল, ববিতাকে তোমার ভাল লাগে?

দারুণ।

লাভলি বলল, আমারও। ববিতা কি সুন্দর, না?

হ্যাঁ। ববিতাকে দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, না ববিতা মিমির চেয়ে সুন্দর নয়।

শুনে আমি চমকে উঠি। তাই তো, ববিতা কি মিমির মত সুন্দর!

ঠিক তখুনি দরজায় টুকটুক করে শব্দ হল। লাভলি উঠে দরজা খুলে দিল। সুলতানা। আমাকে দেখে কিছু একটা বলতে যাবে, আমি বললাম, আসুন ম্যাডাম, ষোলকলা পূর্ণ হোক।

বিউটি চোখ তুলে বলল, মানে?

তোমরা তিনজন ছিলে!

ও। বিউটি হেসে ফেলে।

সুলতানা বলল, তুমি সোবহানবাগ চেন না?

জি?

ফাজলামো কর না।

তুমি কি সাত নাম্বার রোড চেন না?

আমি কি তোমার মত বেকার নাকি। অফিস করতে হয় না!

রাতের বেলাও কি আপনার অফিস!

আজ অফিস থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলাম। তুমি কখন এসেছ?

অনেকক্ষণ।

সুলতানা লাভলির দিকে তাকিয়ে বলল, চা দিয়েছিস?

আমি বললাম, ভদ্রতা রাখুন। যান নিজেকে ওয়াস টোয়াস করে আসুন।

ঠিক তখুনি বাবলি আমার কোলের ওপর ছোট্ট একটা এ্যালবাম ফেলে দিল। আমার নিজের কালেকশান।

আমি উল্টে পাল্টে ববিতার ছবি দেখতে থাকি। সবগুলোই সিনেমার স্টিল। দু তিনটে আমার দেখা।

আমি এ্যালবাম দেখছি, সুলতানার মা, আমি বলি খালাম্মা, ঘরে ঢুকে বললেন, কেমন আছ বাবা?

আমি ভাল মন্দ বলতে যাব, বাবলি বলল, মা ববিতা অত সুন্দর কেন?

শুনে সবাই হেসে ওঠে। খালাম্মা বেরিয়ে যান।

ববিতার ছবি দেখতে দেখতে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল মিমির কথা। এত সুন্দর কোনো মেয়ের ছবি আমি কখনো দেখিনি। জ্যান্ত তো নয়ই। ইচ্ছে

করে ববিতার ছবির পাশাপাশি মিমির ছবিটা রেখে দেখি কে বেশি সুন্দর। কিন্তু ওটা করতে গেলে লাভলিরা খুব হাসবে। আমাকে টিটকিরি মারবে, পাগল করে ফেলবে।

বাবলির এ্যালবাম শেষ করে আমি আবার লাভলিরটা টেনে নিই। মিমির ছবিটা সংগোপনে আর একবার দেখব। খুলে দেখতে থাকি। তখন সুলতানার কোনো এক বোন আর তার হাজবেন্ড আসে। ওরা সবাই ছুটে যায়। এই চান্স। আমি চট করে ছবিটা খুলে হিপ পকেটে রাখি। তোমাকে আমি দেখব মেয়ে, তোমাকে আমি দেখব।

খানিকপর বিদায় নেব, বাবলি বলল, অলি ভাই তুমি মোহামেডান না আবাহনী?

আবাহনী।

যাহ।

হ্যাঁ।

আমি মোহামেডান।

কাল থেকে আবাহনী সাপোর্ট করবে।

বাবলি বাধ্যক মেয়ের মতন বলল, আচ্ছা।

বাবলি সহজে কিছু মেনে নেয় না। এটা মানল কেন?

নিচে নেমে ভেসপা স্টার্ট দেব, মন বলল, মিমি মিমি। আমি হিপ পকেট থেকে ছবিটা বুক পকেটে এনে রাখি।

সাত নাম্বার রোডে ঢুকে আস্তে ধীরে ভেসপা চালাই। আজ ওয়েদারটা খুব ভাল। রাত নটায় বেশ ঝির ঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। গোল চাঁদ উঠেছে আকাশে। পূর্ণিমা নাকি!

ধানমণ্ডির মেঘলা গাছপালায় লেকে চাঁদের শাদা আলো পড়ে স্বপ্নের মত পরিবেশ হয়েছে। রাস্তায় টিউব লাইট আছে। তারও শাদা আলো। দুটো শাদা মিলেমিশে পুরো ধানমণ্ডি শাদা করে দিয়েছে। হাওয়ায় গাছের পাতা পড়ে। মনে হয় টুপটাপ জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে পাতার ফাঁক ফোকর দিয়ে। রাত নটায়ই নির্জন হয়ে গেছে চারদিক। দু একজন লোক হেঁটে যায়, দু একটা গাড়ি রিকশা। আমি আস্তে ধীরে আয়েশ করে ভেসপা চালাই। মনটা বিকেল থেকেই খুব ভাল হয়ে আছে। সুলতানাদের বাসায় গেলে এই এক মজা। চারটে মেয়ের সঙ্গে একা গল্প করা যায়। ওরা খুব ফ্রি। সব রকমের

কথা বলা যায়। কেউ কিছু মাইণ্ড করে না।

সাত নাম্বার রোডের মাঝামাঝি আমাদের বাড়ির রাস্তায় ঢুকতে চমৎকার ব্রিজ। আমি শ্লোলি ব্রিজটা পেরিয়ে যাই। লেকের ধারে বেশ কজন লোক বসে গল্প টল্প করছে, হাওয়া খাচ্ছে। ব্রিজের ওপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে দুটো খারাপ মেয়ে।

ব্রিজ পেরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তায় আমাদের বাড়ি। রাস্তাটা এখন একেবারেই নির্জন। আমার ভেসপার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। লেকের এধারটায় খোলা মাঠের মতন আরেকটা জায়গা। আগাছার জঙ্গল হয়ে আছে। বাড়ি টাড়ি হবে। সিরামিকের ইঁট স্টেক দিয়ে রাখা হয়েছে। হাজার হাজার। দু বছর ধরে পড়ে আছে ইঁটগুলো। রোদে বৃষ্টিতে কালচে হয়ে গেছে। শ্যাওলা পড়ে, আগাছা গজিয়ে গেছে। সন্ধের পর পাড়ার বুলি টেগিরা আড্ডা জমায় ওখানে। গাঁজা টানে। মনখারাপ থাকলে আমিও বসি দুএকদিন। দুচারটে টানও দিই। বুলিটা এডিকটেড হয়ে গেছে। চৌপর দিন খায়। পকেটে কলকে পুরিয়া রাখে।

কাল বুলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দুপুর বেলা। বুলির চোখ দেখে আমি বুঝতে পারি দু মিনিট আগেই টেনেছে। বুলির স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে। জিনসের শার্ট পরা ছিল। বুকের বোতাম খোলা। গলায় শাদা চেনে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ ছোট্ট মূর্তি। এসব ছাপিয়ে বুলির বুকের হাড় দেখা যাচ্ছিল।

বুলি গাঁজা খায় কেন?

বুলির দুঃখটা কি?

আমি বুঝতে পারি না। বুলির বাবা বিরাট বড়লোক। কি সব ইণ্ডাস্ট্রি আছে। গাড়ি বাড়িতে জমজমাট অবস্থা বুলিদের। বড় ভাইবোনগুলো সবাই প্রায় বিদেশে আছে। বুলি সবচে ছোট। আদরের। ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে লেখাপড়া ছেড়ে দিল। কিছুদিন রেগুলার ব্যায়াম করল। কি সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল বুলির। তারপর হঠাৎ করে ভাঙচুর। ভেতরে ভেতরে কি যে ঘটে গেল।

বুলির জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়।

বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ করে মনে হল বুলিদের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি। এখন মাত্র নটা বাজে। এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে কি করব।

ভেসপা ঘুরিয়ে লেকের ধারে বুলিদের আড্ডায় চলে আসি।

যা ভেবেছিলাম। সবাই আছে। চারদিকে স্টেক দেয়া ইঁট, মাঝখানে পরিষ্কার ঘাস। সেখানে চার পাঁচজন বসে। আবছা আলো আঁধারিতে অদ্ভুত দেখায় ওদের। কাছাকাছি না গিয়েই আমি বুঝতে পারি, গাঁজা চলছে। হাওয়ায় মৃদু গন্ধ।

আমাকে দেখে বুলি বলল, বোস দোস্ত।

রাজা টেঁগি ওরা একটু সরে আমার বসার জায়গা করে দিল। কলকেটা ছিল বুলির হাতে। বুলি দীর্ঘটান দিয়ে আমার হাতে দেয়। নে।

আমি ধরতে যাব, ঠিক তখনি বুক পকেটে বারটি মেয়ের সঙ্গে বসে মিমি মৃদু গলায় বলে উঠল, তুমি ওসব খেয়ো না অলি।

শুনে আমি চমকে উঠি। মিমির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বুকে হাত দিয়ে ছবিটা ছুঁয়ে বলি, আমি খাব না।

কথাটা কাকে বলি, মিমিকে না বুলিকে!

বুলি কিছু বলে না। কলকেটা নেয় টেঁগি। নিয়েই ফোঁস ফোঁস করে দম দিতে থাকে। হাওয়ায় ধোঁয়ার ওড়াওড়ি। মৃদু গন্ধ। সবাই ঝিম মেরে বসে আছে। রাজা বাঁ হাতের তালুতে গাঁজা নিয়ে ডলছে। আর একটা ছেলে মুখ চেনা, নাম জানি না, নারকেলের ছোবড়া খুলে গুলটি বানাচ্ছে। আয়োজন দেখে মনে হয় হোল নাইট চলবে। আমার ওঠা উচিত। বাড়ি গিয়ে আমিও হোল নাইট ধরে মিমিকে দেখব আজ।

বুলিকে বলি, আমি যাই বুলি।

কেন এসেছিলি? বুলির গলা ভারি হয়ে গেছে।

এমনিই।

দুটো টাকা দিয়ে যা।

আমি মানিব্যাগ খুলে চাঁদের আলোয় দেখি একটাও খুচরো টাকা নেই।

পাঁচ টাকার একটা নোট তুলে বুলির হাতে দিই। বুলি অবাক হয়ে বলে, এক টাকা কেন? শুনে আমি হেসে ফেলি। এক টাকা নারে পাঁচ টাকা।

শুনে রাজা টেঁগিরা হো হো করে হেসে ওঠে। বুঝতে পারি সব শালার হয়ে গেছে। কেটে পড়া বিধেয়।

ভেসপাটা স্টার্ট দেয়ার আগে আমি আর একবার বুকে হাত দিয়ে মিমির ছবিটা ছুঁই। মনে মনে বলি, আজ হোল নাইট প্রোগ্রাম মিমি।

শুনে কি মিমি হাসে!

মজা লাগে। সুন্দর একটা খেলা পেয়ে গেলাম।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দুবার হর্ন দিই। দারোয়ান ঘর ঘর করে বিরাট লোহার গেট খুলে দেয়। গেট খুলতেই আমার চোখ পড়ে দূরে, বাগানের পর চওড়া গাড়ি বারান্দায় ফুটবলের মত কিংবা পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল আলোটা জ্বলছে। জ্যোৎস্নার মৃদু একটা আলো ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। তার তলায় পাশাপাশি দুটো গাড়ি। একটা পুরনো ঘি রঙের ভক্সওয়াগন আর একটা ঝকঝকে নীল রঙের ডাটসান সেভেনটি ফাইভ মডেল। ভক্সওয়াগনটা বেকার পড়ে আছে বহুদিন। আগে আমি মাঝে মাঝে চালাতাম। গাড়ি ফাড়ি সব সময় ভাল্লাগে না। ফেলে রেখে ভেসপাটা কিনি। ডাটসান ইউজ করে বাবা। বিজনেসের কাজে দু একদিন পর পরই আজ চিটাগাং কাল খুলনা পরশু সিলেট যেতে হয় বাবাকে। ঢাকা থাকলে মতিঝিল অফিসে বসে। বাবার কণ্ট্রাকটরি ব্যবসা। শুনেছি বিশ পঁচিশ লাখের নিচে বাবা কোনো কাজ করে না। ফার্মের নাম চৌধুরী কনস্ট্রাকশন। দুটো কাজ চলছে এখন। একটা মংলা পোর্টে আর একটা ঢাকাতেই। মিউনিসিপ্যালিটিতে। ওটা সাপ্লাইয়ের কাজ। তিনটে আইটেম পেয়েছে বাবা। স্টোন সিংগেলস, সিলেট স্যান্ড আর ত্রিশ লাখ ফার্স্ট ক্লাশ ব্রিক। আমি এসব খোঁজ খবর রাখি না। কাল ঘুরতে ঘুরতে মতিঝিল গিয়েছিলাম। আলমগীর ছোট্ট সুন্দর অফিস করেছে মতিঝিলে। পার্টনার আছে। সাপ্লাইয়ের কাজ করবে। বছর খানেক ধরে টুকটাক কাজ করছিল আলমগীর। ভেতরে ভেতরে দ্রুত বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। অফিস হয়েছে, এখন কাজ টাজ জমবে বেশ। আলমগীরকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই ও কখনো ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ভাবে। চুটিয়ে আড্ডা দেয় আলমগীর, মজাদার কথা বলে। আমরা ওর নাম দিয়েছি চার্লি। আলমগীরের মা বাবা ভাই বোন সবাই পাপুয়া নিউগিনিতে। বাবা বিরাট চাকরি করে। ওখানে সেটেলড। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে আলমগীরও চলে গিয়েছিল। কিন্তু কি যেন কি কারণে ফিরে আসে। আসার সময় বাবার কাছে থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল। সেই টাকায় ভেতরে ভেতরে টুকটাক ব্যবসা করছিল। আর করছিল প্রেম। আমরা জানি না, আলমগীর একদিন বিয়ে করে এল। এখন বউ নিয়ে লালমাটিয়ায় থাকে।

আলমগীরের অফিসে বেশ আড্ডা হল দুপুর বেলা। ম্যালা বন্ধুবান্ধব আলমগীরের। যেতে আসতে আমারও বন্ধু হয়ে গেছে। একজন আছে মিলন। গল্প উপন্যাস লেখে। এধরনের ছেলে টেলেদের বেশ লাগে আমার। আলমগীরও বোধহয় একটু আধটু লেখে। শিল্প সাহিত্য নিয়ে চমৎকার আলাপ

করে দেখি।

আলমগীরের ওখানে প্রচুর চা খাই, সিগারেট খাই। তারপর উঠি। উঠে কেন যে নিজেদের ব্যবসা ট্যবসার কথা মনে পড়ে। আলমগীরের অফিস দেখে আমারও কি মনে হয় সুন্দর একটা অফিস করে আলমগীরের মত রিভলবিং চেয়ার, গ্লাসটপ টেবিল, টেলিফোন নিয়ে কার্পেট মোড়া এয়ারকণ্ডিশানড ঘরে বসতে! বাবাকে বললে খুশি হয়ে দুদিনের মধ্যে সব করে দেবে। দু পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে দেবে আমার একাউণ্টে।

ধুত শালা, কে যায় ওসব গ্যাঞ্জামে।

বি কম করলাম ছমাস আগে। বিরাট উৎসব হল বাড়িতে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ম্যালা এসেছিল। বাবা বলল, বিজনেস করবে না এম কমটা করবে?

আমি স্ট্রেট বললাম, লেখাপড়া আর করব না। ভাল্লাগে না। বিজনেস ফিজনেসও পারব না।

মা হেসে বলল, একটা কিছু তো করবি।

আমি বললাম, পরে।

বাবা মা কেউ কিছু বলল না। একটাই মাত্র ছেলে আমি কিছু না করলে কি এসে যায়। বাবা যা করেছে সাত জীবন ধরে খাওয়া যাবে।

এসব ভাবতে ভাবতে নিজেদের অফিসে গিয়ে উঠি। বাবা ছিল না। ম্যানেজার বলল, কি ব্যাপার ছোট সাহেব?

আমি পকেট থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট বের করে ঠোঁটে সিগারেট গুঁজি।

ম্যানেজার মাঝ বয়সী ভদ্রলোক, বুক পকেট থেকে পুরনো আমলের ঝক্কা রনসন লাইটার বের করে সিগারেট ধরিয়ে দিল। আমি মুখভরা ধোঁয়া ছেড়ে বলি, আমাদের কাজটাজ কোথায় কি হচ্ছে ম্যানেজার সাহেব?

ম্যানেজার খুশি হয়ে বলল, মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা সাপ্লাই হচ্ছে আর মংলা পোর্টে কনস্ট্রাকশান।

বাবা কই?

ব্যাংকে গেলেন।

অফিসটা সেন্ট্রালি এয়ারকণ্ডিশানড। দামী সব ফার্নিচার, পুরু ঘাসের মতন কার্পেট। বসে থাকতে বেশ লাগে। বসব নাকি এরকম একটা অফিস নিয়ে!

বাবার রুমের পাশে ছোট আর একটা রুম। বাবার সেক্রেটারি রীতা বসে। রীতা স্কার্ট পরে। কলা গাছের মতন শাদা ধবধবে উরু হরদম দোলায় আর টেলিফোন ধরে। আমার ইচ্ছে করে রীতার উরু একটু ছুঁয়ে দিয়ে যাই।

দরজা ঠেলে ঢুকতেই রীতা বলল, হ্যালো।

আমি বললাম, কেমন আছ রীতা?

নাইস। লাল টুকটুকে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে রীতা।

একটা মেয়ের ঠোঁট দেখে এই প্রথম আমার একটু গা গুলোয়। রীতা আরো ফর্সা হয়ে গেছে। ধোঁয়া আতপ চালের মত গায়ের রঙ। ঘেন্না লাগে। ওর উরু ছুঁয়ে দিলে হাত নষ্ট হয়ে যাবে।

রীতা বলল, কি ব্যাপার বস?

কিছু না। তোমাকে দেখে গেলাম।

ভাল করে দেখ।

আমি হেসে বলি, এখানে ভাল করে দেখা যাবে না।

তাহলে অন্য কোথাও চল।

যাব একদিন।

শুনে রীতা অফ হয়ে যায়। এ্যাংলো মেয়ে। বসদের সঙ্গে লটর পটর করে অভ্যস্ত। বাবার সঙ্গে বোধহয়।

বাবার কথা ভাবতেই মতিকে জিজ্ঞেস করি, বাবা কই মতি?

আছে।

আমি ভেসপা লক করে ওপরে উঠে যাই। মতিকে বলি, খানা লাগা।

মতি আমার পার্সোনাল কাজের লোক। আমার বয়সী। অনেক কাল ধরে এ বাড়িতে আছে। বাড়ি থাকলে মতি ছায়ার মত আমার সঙ্গে। এই তো আমি এসেছি, ভেসপার শব্দ পেয়েই মতি হাজির।

কিন্তু মার কথা যে মতিকে জিজ্ঞেস করলাম না। মা কি শুয়ে পড়েছে? মার কি শরীর খারাপ?

দু একদিন পর পরই শরীর খারাপ হয় মার। চিরকালের বাঁধা রোগ। রেগুলার ওষুধ খায়। এমনিতে দেখে বোঝার উপায় নেই মার শরীরে কোন অসুখ আছে। সুন্দর স্বাস্থ্য। কিন্তু ভেতরে বাঁধা অসুখ। কোনদিন যে হুট করে মরে যাবে!

আমার রুমটা দোতালায়। একটাই রুম দোতালায়। সিঁড়ির সঙ্গে। বেশ বড় সড় সাজান গোছান। আগাগোড়া কার্পেট মোড়া। ফোমের খাট বুকসেলফ

সোফা রাইটিং টেবিল ওয়্যারড্রব সব আছে রুমে। হঠাৎ ঢুকলে ছোট খাটো একটা হলরুম মনে হবে। খাটের সঙ্গেই সানিও সিকস পিসের ডেক। শোকেসের মত কাচের ফ্রেমে ভরা জিনিশটা। ওটার মধ্যে রেকর্ড ক্যাসেট বই এসব রাখার ব্যবস্থাও আছে। চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে বাবা গত বছর কিনে দিল।

আমার ঘরে টেলিভিশান ছিল না। এ বাড়িতে একটাই টেলিভিশান, নিচে ড্রইংরুমে। ওঘরে টেলিভিশান দেখতে আমার ভাল্লাগে না। মাস তিনেক আগে চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়ে একটা কালারড টেলিভিশান কিনে ফেললাম।

আমাদের বাসায় দুটো টেলিফোন। একটা বাবার আর একটা আমার। এসবই আমার ইচ্ছেয় হয়েছে। আমি মা বাবার একমাত্র। বাবা কোটিপতি। একা কত খরচ করব আমি। ইচ্ছে করলে ফ্রিজ এয়ারকুলার সব করতে পারি আমি আমার রুমের জন্যেই। আমার ইচ্ছে করে না। কি লাভ এত কিছু করে!

রুমে ঢুকে লাইট জ্বালি। রুমটা হালকা আকাশি রঙে ডিসটেম্পার করা। পর্দা কার্পেট বিছানার চাদর সবই হালকা আকাশি রঙের। আমার ডিম লাইটের রঙও আকাশি। আকাশি আমার ফেবারিট কালার। লাইট জ্বাললেই রুমটা আকাশি রঙে ভরে যায়।

রুমে ঢুকে আমি শার্ট প্যান্ট খুলে ইণ্ডিয়ান প্রিন্টের লুঙ্গি পরি। কাজ করা পাতলা আদ্দির একটা ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরি। আজ এটা আমার নাইট ড্রেস। যদিও আমার দু তিনটে চমৎকার নাইট ড্রেস আছে। পাজামা আর ফুল স্লিভ শার্ট, পরলে হেভি স্মার্ট লাগে। কিন্তু ওগুলোর একটাও আজ আমি পরবো না। আজ এই ড্রেসটাই আমার পছন্দ।

শার্ট খুলতেই পকেট থেকে ছবিটা বেরিয়ে কার্পেটের ওপর পড়ে। দেখে আমি হাঁটুগেড়ে ছবিটার সামনে বসি। বসে মিমির একেবারে চোখের ভেতর তাকাই। তাকিয়ে থাকি।

মতি ততক্ষণে আমার খাবার রেডি করে ওপরে উঠে এসেছে। রুমে ঢুকে আমার শার্ট প্যান্ট গুছিয়ে রাখে। আমি মিমির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলি, খাবার দিয়েছিস?

হ্যাঁ।

তারপর আমার দিকে একটু ঝুঁকে মতি বলে, কি দেখতাছেন?

ফটো।

কথাটা বলে আমি একটু লজ্জা পেয়ে যাই। মতিকে কখনো কোনো ব্যাপারে লজ্জা পাই না আমি। ও আমার অনেক কিছু জানে। বললে অনেক কিছু

ম্যানেজ করে দেয়।

একবার আমাদের বাসায় চমৎকার একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছিল। মেয়েটির ফিগার টিগার দারুণ। এক দুপুরে মেয়েটিকে দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। হাত ইশারায় ডাকতেই ঘরে এসে ঢুকল। মেয়েটা এসবে এক্সপিরিয়েন্সড ছিল। বাঁধা দিল না।

কাজ সেরে আমি মেয়েটার হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিই। পারমানাণ্ট ব্যবস্থা হয়ে গেল। দেবে আর নেবে।

তারপর থেকে রেগুলার। মতি একদিন দেখে ফেলল। দেখে আমাকে বলল, সাবধান। কেলেংকারি বাদাইয়েন না।

তারপর নিজেই প্রোটেকশানের জিনিষপত্র এনে দিত।

এই মতিকে দেখে আমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তবুও কেন যে এমন হয়!

ছবিটি বালিশের নিচে রেখে বাথরুমে গিয়ে ঢুকি। বাথরুমের চারদিকের দেয়ালে হালকা আকাশি রংয়ের টাইলস বসান। বেসিন কমোড সবই ওই এক রঙের। এই বাথরুমটায় ঢুকলে আমার মন খুব ভাল হয়ে যায়।

বেসিনে হাত মুখ ধুতে ধুতে আমি আয়নায় নিজেকে দেখি। দেখে বলি, শালা লোচ্চা, তোমার জন্যে বাসায় যুবতি চাকরানী রাখা বন্ধ হয়ে গেছে।

শুনে আয়নার ভেতর থেকে দু নাম্বার আমি বলি, তোমার জন্যে না তোমার বাবার জন্যে।

ধুৎ কি সব ভাবছি। তখুনি প্রমিস করি আজ রাতে একটিও খারাপ কথা ভাবব না। পর্ণোগ্রাফিগুলো একবারও ঘাটব না। আজ আমার ছুটি। আজ সারারাত আমি মিমির ছবি দেখব। এত সুন্দর মেয়ে আমি জীবনেও দেখিনি। মিমি, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

নিচে এসে দেখি ডাইনিং টেবিলের সামনে মা বসে আছে। মতিও আছে তার সামনে। মার চেহারা দেখেই বুঝতে পারি শরীর ভাল নেই। বলি, তুমি আবার উঠে এলে কেন?

মা নরম গলায় বলল, তুই খেয়ে যা তারপর শোব।

আমি খেয়ে নেব। তুমি যাও।

মতি বলল, আপনে যান আম্মা।

মা তবু বসে থাকে। মা কি আমাকে কিছু বলবে!

আমি খেতে শুরু করি। মা চুপচাপ বসে আছে দেখে বলি, বাবা খেয়েছে·

মা ?

হ্যাঁ।

তুমি ?

খেয়েছি।

ডাক্তার চাচা এসেছিলেন ?

কাল এসেছিল।

আবার কথা থেমে যায়। মা কখনো খুব বেশি কথা বলে না। একটা দুটো বলে। কেন যে! আমার ছেলেবেলায় মা খুব উচ্ছল ছিল। আমি বড় হতে থাকি মারও উচ্ছলতা কমতে থাকে। অবশ্য মা আগে এরকম ছিল না। এখন তো মা রেগুলার অসুস্থ। একদিন দুদিন পর পরই ডাক্তার আসে, নতুন নতুন ওষুধ আসে। ওষুদের ওপরই টিকে আছে মা।

খানিক পর মা বলল, খোকা তুই বিয়ে কর।

শুনে আমি হেসে উঠি। আমার কি বিয়ের বয়স হয়েছে ?

তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে তো অনেকেই বিয়ে করে। তুইও করে ফেল বাবা। একা আমার আর ভাল লাগে না।

একা কোথায়, আমি আছি না ?

ছেলে কি সব সময় কাছে পাওয়া যায়।

আমি সারাদিনই প্রায় বাইরে থাকি, এটাই কি মার দুঃখ!

তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বলি, ঠিক আছে কাল থেকে সারাদিন তোমার কাছে থাকব মা।

মা ম্লান হেসে বলে, পাগল ছেলে। তোকে থাকতে হবে কেন ? একটা বউ নিয়ে আয় সেই থাকবে আমার কাছে।

আর কিছুদিন যাক মা। কদিন ফ্রি থাকতে দাও।

মা আর কথা বলে না। উঠে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

মা কি আমার ওপর রাগ করল। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ঢাকাইয়া ফিলিম স্টাইলে খানিকটা আদর করি। মা ওমা ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই না। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে আমার রুমে চলে আসি। আসার আগে দেখি বাবার ঘরের পর্দা উড়ছে। হাওয়ায় এলকোহলের মৃদু গন্ধ। বাবা আমার জিনিস নিয়ে বসে গেছে। লোকটা আছে বেশ। সারাদিন বিজনেস, রাতের বেলা ড্রিংক। মেয়েমানুষের দোষও আছে। কথাটা আমাকে বলেছিল বাবার আগের সেক্রেটারি নাসরীন।

ওপরে এসে দেখি প্যাকেটে একটাও সিগারেট নেই। চিৎকার করে মতিকে ডাকি। খাওয়ার পর সিগারেট না হলে পাগল হয়ে যাব আমি।

মতি বলল, কি অইলো ?

সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।

আইন্না দিমু ?

তাতো দিবিই। যেতে হবে তো সেই রাস্তার মোড়ে। অতক্ষণ আমি দেরি করতে পারব না।

মতি বলল, বড় সাহেবের কাছ থিকা আইন্না দিমু ?

কেমন করে ?

দেহেন না কেমনে আনি। বলে মতি আবার নেমে যায়।

বাবা নিশ্চয় এতক্ষণে বেশ ড্রাংকড হয়েছে। কিন্তু ড্রাংকড হলে শুনেছি লোকটার চোখ কান সার্ফ হয়ে যায়। তাহলে ? মতি কেমন করে কি করবে আমি বুঝতে পারি না। আনতে পারলে ভাল। বাবার আর আমার একই ব্রাণ্ড। ট্রিপল ফাইভ।

বাবা কি জানে আমি সিগারেট খাই ?

জানার তো কথা।

আমি সিগারেট খাই ফার্স্ট ইয়ার থেকে। শিখিয়েছিল তারেক। আমার বন্ধু। বয়সে আমার চার পাঁচ বছরের বড়। কিন্তু বয়সের ব্যবধানে আমাদের বন্ধুত্ব আটকায়নি।

আমি যখন নটরডেমে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি, ফার্স্ট ইয়ার, মনে আছে তারেক তখন ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল দিচ্ছিল। বেটে খাটো পাতলা মতন তারেক। ভারী কাচের চশমা পরে। গলার স্বর বয়সের তুলনায় অত্যধিক ভারি।

একদিন তারেক আর আমি পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়া গিয়েছিলাম ঘুরতে। রেল লাইন ধরে হাঁটছি, তারেক পকেট থেকে ক্যাপস্টানের প্যাকেট বের করল। নিজে একটা ধরিয়ে আমাকেও একটা দিল, নে খা। সিগারেট খেলে কিছু হয় না।

সেই ক্যাপস্টান টানতে টানতে রেললাইন ধরে আমি আর তারেক নারিন্দায় তারেকের বাসায় যাই। তারেক তখন হলে থাকে। সপ্তাহে সপ্তাহে মা বাবার সঙ্গে নারিন্দায় দেখা করতে যায়।

তারেক এখন চিটাগাংয়ে। পিডিবিতে চাকরি করে। এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

তারেকের কথা ভাবছি। মতি সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে দিল। আমি

চমকে উঠি। মতি মতি পুরো প্যাকেট পেল কোথায় !

আমি বললাম, পুরো প্যাকেট পেলি কোথায় ?

সাহেবের টেবুলে দুই তিন প্যাক আছিল।

বাবা কোথায় ?

বাথরুমে। মনে অইলো উকাল করতাছে।

শুনে আমি চমকে উঠি। বাবা তো মদ খেয়ে কখনো বমি করে না। আজ শরীর খারাপ করল ! যাব নাকি একবার দেখতে।

না। বাবা তাহলে ভীষণ রেগে যাবে। মা শুনলে সিওর জুতো পেটা করবে।

বাবার রুমে আমার যাওয়াই নিষেধ। তাছাড়া এ অবস্থায় গেলে বাবা খুবই আনইজি ফিল করবে। সেটা ঠিক হবে না।

সিগারেট ধরিয়ে মতিকে বলি, তুই একটু বাবার কাছে যা। ধরে শুইয়ে দিস।

তারপর একটু থেমে বলি, আলী আসেনি ?

না।

কবে আসবে ?

বইলা তো গেল দুয়েক দিনের মধ্যেই আইয়া পড়বো।

আচ্ছা তুই যা। তোকে আর ওপরে আসতে হবে না। তুই বাবার কাছাকাছি থাক।

বাবার তদারকি করে আলী। তিন চারদিন আগে দেশে গেছে লোকটা। বাবা তখন মংলা পোর্টে। আলী ভেবেছে সাহেব ফিরে আসার আগেই সে ফিরে আসবে। কিন্তু বাবা পরদিনই চলে আসে। জরুরী কি কাজ পড়েছে।

বাসায় পুরুষ কাজের লোক দুজনই। মতি আর আলী। ঝি আছে দুজন। ময়না, ময়নার মা। ঝিদের বাবার কাছে যাওয়া নিষেধ। মা এই ব্যবস্থাটা করেছে। মেয়েমানুষ দেখলেই বাবার চোখ নরম হয়ে যায়। ময়নার মা মাঝ বয়সী। হলে হবে কি, বাবার চোখ পড়লে অসুবিধা আছে। ময়না তো আরো উপাদেয়। বার তের বছর বয়স। শরীর খুলতে শুরু করেছে।

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মিমির কথা মনে পড়ে আমার। শোফায় কাত হয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম, উঠে বালিশের তলা থেকে ছবিটা বের করি। তাকিয়ে থাকি। কেবল মিমিকে দেখি, মিমিকে দেখি। লাভলি সহ বাকি বারটা মেয়ে হাওয়া হয়ে যায়। কোন ফাঁকে যে ! কখন যে ! কোনো মেয়ে দেখে জীবনেও এমন হয়নি আমার।

একে কি বলে ?

প্রেম ?

বুঝতে পারি না।

আমি কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়িনি। দেখে ভাল লেগেছে অনেককে। সিরিয়াস হলে প্রেম টেম হয়ে যেত। আমি কখনো সিরিয়াস হইনি, সিরিয়াসলি আমার কাউকে ভালও লাগেনি।

আমাদের পাশের বাড়ির রানু আমার ব্যাপারে ইণ্টরেস্টেড ছিল। রানু তখন ক্লাশ নাইনে পড়ে। আমি সেকেণ্ড ইয়ারে। রানু দেখতে বেশ। ফিগার চেহারা দারুণ। রাতের বেলা আমি খুব রানুর কথা ভাবতাম! খুব উত্তেজিত হয়ে গেলে বাথরুমে ঢুকে মাস্টারবেশান করতাম।

সেই রানু একদিন আমার ঘরে এসে হাজির। রানুর সঙ্গে ধীরে জমে যায় আমার। কিন্তু কথা টথা বলে কেন যে মনে হয় রানুর সঙ্গে প্রেম করা যায় না। রানুর ভেতর প্রেম নেই। ও আমাকে অন্য কিছু দিতে পারে। আমি তাই করি। রানুকে বিছানায় নিই। রেগুলার চলতে থাকে। ক্লাশ নাইনে পড়া মেয়ে, হলে হবে কি, রানু ওসব ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট।

মা আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করল, রানুকে তুই বিয়ে করবি ?

আমি স্ট্রেট বলি, না।

তাহলে রোজ ও আসে কেন ?

আড্ডা মারতে।

এসব খারাপ।

মা এরচে বেশি আর কিছু বলেনি। কিন্তু আমার হয়ে যায়। রানু এ বাসায় আসুক মা চায় না। আমিও ডিসিশান নিই রানুকে মানা করে দেব।

সেদিন দুপুরের পর রানু এল। আমি কলেজ থেকে ফিরে, খেয়ে রেস্ট নিচ্ছি। রানু বোধহয় সেদিন স্কুলেই যায়নি। ঘরে ঢুকেই আমার গা ঘেঁষে বসল। রানু পরেছিল মোটা কাপড়ের শার্ট আর একই কাপড়ের প্যাণ্ট। আমি শার্টের একটা বোতাম খুলে অবলীলায় রানুর বুকে হাত দিই। তারপর প্যাণ্টের চেন টেনে নামিয়ে দিই।

রানু উদাস গলায় বলল, আইয়েম কেরিং।

এ্যাঁ। আমি চমকে উঠি। কি বলছ রানু ?

সত্যি। দু মাস ধরে বন্ধ। আমার আগে দুয়েকবার এমন হয়েছে। মাঝে-মধ্যে হতই না। পেটে অসম্ভব ব্যথা হত। কিন্তু এবার ব্যথা ট্যাথাও নেই।

রানু কথা বলছিল খুবই সহজভাবে। প্রেগন্যাণ্ট হয়ে গেছে, ব্যাপারটাকে পুরুত্বই দিচ্ছিল না।

আমি নার্ভাস গলায় বললাম, এখন কি করবে রানু ?

রানু অবলীলায় বলল, চল বিয়ে করে ফেলি।

শুনে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এই মেয়েকে বিয়ে করব আমি ! এই মেয়ে হবে আমার বউ। সারাজীবন ধরে ওর মুখই দেখতে হবে আমাকে ! মাত্র ছ সাত মাসের ব্যাপার, এই অল্প দিনেই তো ওকে আজকাল আর ভাল লাগে না আমার। কাছাকাছি এলে বিরক্ত হই। এই মেয়ের সঙ্গে সারা জীবন কেমন করে থাকব আমি ?

বললাম, বিয়ে এখন করা যাবে না।

কেন ?

গ্রাজুয়েট না হয়ে বিয়ে করলে বাবা বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

এটা পুরোপুরি মিথ্যে কথা। গুল। এসব ব্যাপারে আমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। মা বাবা কিছু বলবে না। আমি তাদের একমাত্র ছেলে। আমাকে ফেলে বাঁচবে কেমন করে !

রানু বলল, তাহলে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।

দুদিন পর আগামসিহ লেনের এক নার্সিংহোম থেকে সাড়ে আটশো টাকা খরচ করে রানুকে ওয়াস করিয়ে আনি। সেই শেষ। তারপর থেকে রানুকে আমি এভয়েড করি। রানুও কি বোঝে কে জানে, অন্যদিকে ঝুঁকে যায়। আজকাল ওকে একেকদিন একেকজনের সঙ্গে দেখি।

রানুর ব্যাপারটার পর থেকে আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি। আজকাল খুব হিশেব করে চলি। তাছাড়া শরীরটা আর আগের মত নেইও। খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছি।

তখুনি মনে হল মিমির ছবিটা কেটে আমি ভিন্ন করে রাখব। সারারাত ধরে শুধু মিমিকে আজ দেখব। আর কাউকে নয়। মিমি আমার বুকের ভেতর অচেনা এক আবেশ তুলেছে। ছবি দেখেই কি আমি মিমির প্রেমে পড়ে গেলাম ! প্রেম কি এইরকম !

ত্রিস্তান আর সোনালির গল্পটা মনে পড়ে। সুন্দর দোয়েল পাখি জানালায় সোনালি একগুচ্ছ চুল রেখে গেল। সেই চুল দেখে রাজা পাগল। এই সোনালি চুলের কন্যাকে আমার চাই।

মিমির ছবি দেখে আমার দশাও হয়েছে সেই রাজার মত। মিমিকে আমার

চাই। কাল থেকে মিমিকে আমি খংজব। প্রয়োজনে সমগ্র বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে ফেলব। মিমিকে আমার চাই।

কিন্তু এখন একটা কাঁচি খোঁজা দরকার। তেরটা মেয়ের মধ্য থেকে মিমিকে সরিয়ে নেব।

ছবি রেখে কাঁচি খংজতে থাকি। আমার ঘরেই তো থাকার কথা। প্রথমে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খংলি। এলোমেলো হয়ে আছে ড্রয়ারটা। রাজ্যের টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি হয়ে আছে। দংটো লাল পাথরের কপালিন মংনড্রপসের সবংজ কনটেইনার অনেকগংলো খংচরো পয়সা মোমবাতি ম্যাচ কত কি। কেবল কাঁচিটাই নেই। আয়নার সামনে জমে আছে পাউডার স্নো লোশন পারফিউম হেয়ার ব্রাস। আমার চুলটা খংব কোঁকড়ান। চিরংণী দিয়ে আঁচড়ান যায় না। কিন্তু এখন আমার কাঁচির দরকার। মিমিকে কাটব।

হঠাৎ মনে পড়ে বিছানার তলায় কাঁচি আছে। আমার পর্ণোছবি কালেকশানের অভ্যেস। যেখানে যা পাই কেটে রাখি।

বিছানার দিকে এগংনোর আগে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চোখ পড়ে। নিজের চেহারা দেখে হেসে উঠি আমি। শালা।

ফোম তুলতেই চোখে পড়ে দংনিয়ার মেয়েদের ন্যাংটো ফটো ছড়িয়ে আছে তলায়। বিভিন্ন পোজের। বেশির ভাগই খোলা বংকের ছবি। দং একটা আছে শংধং নিম্নাঙ্গের। কয়েকটা ম্যাগাজিনও আছে। প্লেবয় পেন্ট হাউজ হোয়াইট হাউজ। আজ কিন্তু ছবিগংলো দেখেই মেজাজ বিগড়ে যায় আমার। দ্রংত এক সঙ্গে করি সব। তারপর চেঁচিয়ে মতিকে ডাকি। মতি, মতি।

মতি এলে ছবি আর ম্যাগাজিনগংলো দেখিয়ে বলি, নিয়ে যা। সবগংলো পংড়িয়ে ফেলবি।

ছবিগংলো তুলতে তুলতে মতি হাসে।

আমি বলি, একটা কাঁচি এনে দিস।

আপনের বাথরংমে আছে না?

শংনে আমি অবাক হই। তাই তো। বাথরংমে আমার সেভের সব যন্ত্রপাতি। সেখানে কাঁচিও নিশ্চয় আছে।

আমি দ্রংত বাথরংমে গিয়ে ঢুকি। বাথরংমে, বেসিনের ওপর টুকটাক কত কি রাখা আছে। রেজার ব্রাস শেভিং ক্রিম আফটার সেভ পেস্ট সাবান। নেল কাটার আছে। আর গোঁফ ছাটার জন্যে ছোট্ট একটা কাঁচি।

কাঁচি নিয়ে ফিরে এসে দেখি বিছানাটা আগের মত ক্লেস করে রেখে মতি

চলে গেছে। বাক নোংরা ফটোগুলো সব বিদেয় হয়েছে। মিমির ছবিটা আমার হাতেই ছিল। একপলক মিমির দিকে তাকিয়ে বলি, মিমি আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি। এসব তোমার জন্যে।

খুব যত্ন করে মিমির ছবিটা কাটি। তারপর বালিশের কাছে রেখে, লাভলি সহ বাকি বারটা মেয়ের ছবি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি। এখন একটু রেলিংয়ে যেতে হবে। টুকরোগুলো ফেলে দেব। মিমি ছাড়া আর কাউকে আমি এঘরে রাখব না। রাখতে চাই না। আমার রুমের পরেই খোলা ছাদ। গ্রিল দেয়া। গ্রিলের ধারে ধারে ফুলের টব বসান। ম্যালা গাছপালা আমাদের বাড়িতে। হাজারো রকমের ফুল লতা আর ফলের গাছ। বাইরে থেকে আমাদের বাড়িটাকে গভীর অরণ্যের ভেতর ফরেস্ট বাংলোর মত দেখায়। দেড় বিঘার ওপর বাড়ি। বাবার ইচ্ছে ছিল দোতলা পুরো করে ওপরের তলায় আমরা থাকব, নিচের তলাটা ভাড়া দেবে। মা বলল, না। বাড়িটা নিয়ে বিজনেস নাই বা করলে।

বাবা আর মাথা ঘামালেন না। দোতলায় আমার রুমটা কমপ্লিট করেই ক্ষেমা দিল।

রেলিংয়ের কাছে গিয়ে ছবির টুকরোগুলো ফেলতে ফেলতে আমার চোখ যায় লেকের দিকে। একেবারে নির্জন হয়ে আছে লেকটা। চাঁদের আলোয় ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে। দিনের বেলা ম্যালা লোকজন থাকে। লেকে মাছ ধরতে আসে। গাড়িটাড়ি নিয়ে আসে অনেকে। কেউ কেউ বউ ছেলে মেয়েও। ছিপ ফেলে মাচার ওপর একঠায় বসে থাকে। মাছরাঙার মত।

লেকের ওপারে রাসান এ্যামবেসির বাড়িটা বড় সুন্দর দেখায়। স্বপ্নের মতন। আজ বেশ হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ আছে গাছপালার ওপর। পৃথিবী খুব সুন্দর লাগে। আমি রেলিংয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়াই। এই জায়গাটা যে এত সুন্দর কখনো দেখিনি তো। মিমি কি আমার চোখ খুলে দিল! আমি কি এখন থেকে সব সুন্দর দৃশ্য চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাব! মিমির কথা মনে পড়তেই ঘরে ফিরে আসি। তার আগে শুনি বাড়ির পেছন দিকের বাগানে কি একটা পাখি ডাকছে। রাত পাখি।

আমাদের বাড়ির পেছন দিকটায় সব ফল ফলারির গাছ। পেয়ারা আতা সফেদা কত কি। সব মার ইচ্ছেয় হয়েছে। সামনে ফুলের, পেছনে ফলের। শরীর খারাপ নিয়েও গাছপালার তদারক করে মা। মালীটাকে রোজই গালাগাল দেয়। গাছপালার জন্যে কাঁদতেও দেখেছি মাকে।

একবার একটা কি ফলের গাছ এনে লাগিয়েছিল। সেই গাছটা মরে গেলে এক সকালে সে কি কান্না মার। আমি থামাতেই পারি না।

মার ভেতরটা খুব নরম। তার গাছের ফলফলারি সব পাড়ার ছেলেমেয়েরাই খায়। মা ডেকে ডেকে খাওয়ায়।

রুমে ঢুকে আমি দরজা আটকে দিই। তারপর ডিম লাইট জ্বালি। ভ্যাপসা গরম ছিল। ফ্যানটা ফুল স্পিডে চালিয়ে দিই।

ঘরটা এখন হালকা আকাশি রঙে ভাসছে। আবছা আলোয় মিমির ছোট্ট ছবিটা আমার বালিশের কাছে পড়ে আছে দেখা যায়। আমি ছবিটার দিকে ঝুঁকে বলি, দাঁড়াও আসছি।

তারপর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে এয়ার ফ্রেসনার বের করে মিমির ছবিটার দিকে স্প্রে করে দিই। আমার বিছানার চারদিকেও ছড়াই। তীব্র গন্ধে রুম ভরে যায়। আহ্ বড় চমৎকার পরিবেশ। নোংরা ভ্যাপসা গন্ধের ভেতর মিমিকে মানায় না। মিমির জন্য চাই পৃথিবীর যাবতীয় সুগন্ধ। যাবতীয় ফুলের সুবাস।

আমি বুকের তলায় বালিশ দিয়ে ডান হাতে মিমির ছবিটা ধরি। তারপর মিমির চোখের দিকে গভীর করে তাকিয়ে কোনো ভনিতা ছাড়াই বলতে শুরু করি, আমার নাম অলি। অলি চৌধুরী। পিতা হাসমত চৌধুরী, পেশা বিজনেস। আমাদের আদি বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। গ্রামের নাম পয়সা। সব পয়সাঅলা লোকজনের বাস ছিল, ফলে গ্রামের নাম হয়ে যায় পয়সা। আমরা পয়সার বিখ্যাত চৌধুরী। পয়সায় আমার পূর্বপুরুষদের জমিদারি ছিল। আমার জন্মের আগে বাবা পয়সা ছেড়ে আসে। জমিদারি তখন শেষ পর্যায়ে। যা ছিল বাবা বিক্রি করে দেয়। সেই টাকায় বিজনেস। আমার জন্মের পর থেকে দ্রুত উন্নতি করতে লাগল বাবা। এ জন্যে সংসারে সবাই আমাকে ভাগ্যবান বলে। ওসব বুজরুকি আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না। ভাগ্য ফাগ্য আবার কি! উন্নতিটা বাবা পরিশ্রম করে করেছে। এতে আমার জন্ম কিংবা ভাগ্যের কোনো ক্রেডিট নেই।

আমি মা বাবার একমাত্র। এটা চৌধুরী বংশের ট্রেডিসান। একটার বেশি সন্তান হয় না কারু। তাও ছেলে। আবার বাবা তার বাবার একমাত্র। আমার দাদা ছিলেন তাঁর বাবার একমাত্র। এভাবে সাত পুরুষ। গল্পটা আমায় বলেছে আমার মা।

আমার মা এক দারুণ মহিলা। দয়ালু, খুবই নরম মনের মানুষ। মার

কাছে সাহায্যের জন্যে এসে আজ পর্যন্ত কেউ খালি হাতে ফিরে যায়নি। কত লোক যে মার কাছ থেকে মিথ্যে সাহায্য নিয়ে মাকে ঠকিয়ে গেছে, মা টের পায়নি। পরে কেউ যখন মাকে বলেছে লোকটা তো আপনাকে মিথ্যে বলে ঠকিয়ে গেছে! শুনে মা বিষণ্ণ হেসেছে। যারা মনে করে অন্যকে ঠকিয়ে নিজে খুব জিতে গেছে তাদের মত বোকা পৃথিবীতে নেই। মানুষ কখনো অন্যকে ঠকাতে পারে না। আসলে নিজেকেই নিজে ঠকায়।

মার অত সব ভারি কথা আমি বুঝি না।

আমি হচ্ছি মা বাবার মিকসিং।

আমার বাবা লোক হিসেবে খুব বাজে। খুবই। পার মাতাল। মেয়েমানুষের দোষ আছে। লোক ঠকাতে ওস্তাদ। পৃথিবীর সব পয়সাঅলা লোকই বোধহয় বাবার মতন। লোভী স্বার্থপর নিচ। ছেলেবেলায় দুএকদিন মা বাবার ঝগড়া শুনেছি আমি। মা বাবাকে বলত তুমি তো নর্দমা থেকে দাঁতে কামড়ে পয়সা তোল। তুমি কি মানুষ!

বাবা বলত, ওসব করি বলেই তো ধানমণ্ডিতে বাড়ি, রাজরানির মত আছ। অভাব কাকে বলে চোখে দেখ না।

এরকম রাজরানি হতে আমি চাইনি।

বাবার সঙ্গে মার সম্পর্ক একটু আলগা ধরনের।

বাবা বাবাকে নিয়ে আছে। তার বিজনেস, মদ আর মেয়েমানুষ। মা সংসার নিয়ে, আমাকে নিয়ে।

মা কি সুখী?

জানি না। ওসব জটিলতার ভেতর আমি কখনো যেতে চাই না।

তো বাবার চরিত্রের নোংরা টাচ আমার ওপরও খানিকটা পড়েছে। মদ, মেয়েমানুষের প্রতি খানিকটা লোভ। সপ্তাহে দুএকদিন ড্রিংক করি। মেয়েমানুষ পেলে নিযে নিই।

কিন্তু ওসব করার পর নিজেকে মাঝে মধ্যে ভীষণ ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। একদিন পার মাতাল হয়ে, মেয়েবাজী করে ইচ্ছে হয়েছিল মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদি। তখন সবে বি কম পরীক্ষা দিয়েছি। কায়দা করে নিজেই সেদিন চেক দিয়েছিলাম। মাতাল অবস্থায় মার কাছে যাব! মা আমার দুঃখে তাহলে মরে যাবে। মাকে অত বড় দুঃখ দিতে চাইনি আমি।

যেদিন রানুকে ক্লিয়ার করিয়ে আনি সেদিনও এরকম মনে হয়েছিল।

এই অপরাধবোধটা কোত্থেকে এল আমার? মার সাইড থেকে? হবে হয়ত।

বাবার চরিত্রে তো অপরাধবোধ বলতে কিছু নেই। অফিসের পুরনো বুড়ো ম্যানেজারকে বাবা স্যাক করল। লোকটার অপরাধ, অফিসের ভেতর বাবার একটা রেস্টরুম আছে, ওয়েল ফার্নিসড, বাবা যখন তখন সেখানে মদ মেয়েমানুষ নিয়ে বসে যেত। ম্যানেজার বুড়ো মানুষ, তার খারাপ লাগে। বাবাকে বোধহয় কিছু একটা বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পনের বছরের পুরনো লোক, ওয়েল এক্সপিরিয়েন্সড, বাবা তাকে তিন মাসের মাইনে হাতে ধরিয়ে বিদেয় করে দিল। লোকটা পরে এসে মার কাছে খুব কাঁদল। মা কি করবে, বাবার ওপর কথা বলার সাহস কিংবা ক্ষমতা কোনোটাই তার নেই। অশান্তি বাড়িয়ে কি লাভ! মা গোপনে লোকটাকে হাজার দুয়েক টাকা দিয়ে দিল। কত বছর আগের কথা। বুড়ো মানুষটা তারপর থেকে প্রায়ই গোপনে মার সঙ্গে দেখা করে যেত। এলেই মা তাকে যত্ন করে খাওয়াত, যাওয়ার সময় কিছু পয়সা গুঁজে দিত হাতে। দুবছর আগে সেই লোকটা মারা যায়। কথাটা আমি মার কাছে শুনি।

বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও কেমন যেন। একটু দূরের। প্রয়োজন ছাড়া বাবার সঙ্গে আমার কখনো কোনো কথা হয় না। নাগাড়ে অনেকদিন বাবার সঙ্গে দেখাও হয় না। অথচ একই ছাদের তলায় আছি আমরা। কখনো কখনো এমনও হয়েছে, অনেকদিন বাবার সঙ্গে দেখা নেই, হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হতেই চমকে উঠেছি। চেনা বয়স্ক লোক দেখলে আমার বয়সী বিনীত ধরনের যুবকদের যা হয়, সালাম দেয়ার জন্যে ডান হাত উঠে যায় কপালে, আমার তেমনু হয়েছে।

আমি কি হাত তুলে সালাম দেব বাবাকে!

তারপরই অবাক হয়ে ভেবেছি, নিজের বাবাকে কি কেউ সালাম দেয়!

তবে দীর্ঘদিন পর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বাবা কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, ভাল আছ অলি?

আমি মাথা নেড়ে দ্রুত সরে গেছি।

বাবা আমাকে অলি বলে ডাকে। মা ডাকে খোকা। আমার সবকিছু মায়ের কাছে। চাওয়া, প্রয়োজন। মার কাছে যখন যা বলি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। তাছাড়া আমার হাত খরচার জন্যে প্রতিমাসে বাবা টাকা জমা দিয়ে দেয় আমার একাউন্টে। প্রয়োজনে তুলে নিই। বাবার সবকিছুর পরোক্ষ মালিক আমি, অলি চৌধুরী। ওসব ভেবে আমি কখনো খুশি হই না। বাবার মত বিজনেসম্যান আমি কখনো হতে পারব না। হতে চাইও না। বাবার জন্ম ১৯৩০ এ আমার ১৯৫৫ তে। বাবা ম্যাট্রিক পাস, আমি গ্রাজুয়েট। বাবার সঙ্গে আমার বেসিক পার্থক্যটাই এখানে। তাছাড়া আমি তো সম্পূর্ণ বাবার

নই, খানিকটা মায়েরও। দুটো মিলিত ধারা আমার ভেতর। আমি পুরোপুরি বাবার মত হব কেমন করে! হব কেন? বি কম পাস করার পর বাবা বলল, বিলেত থেকে বিজনেস এডমিনিসট্রেশান করে এস। বিজনেসে ভাল করবে।

মা বলল, না খোকা যাবে না।

মা আমাকে বাঁচিয়ে দিল। ওসবে আমি নেই। যেতে চাই না। লেখাপড়া আর করব না। বোরিং ব্যাপার। গ্রাজুয়েসান এনাফ। তাছাড়া বাবা মারা গেলেও আমার হস্তক্ষেপ ছাড়াই ব্যবসা চলবে। বাবার যা আছে আমার মত সাতটা অলি সাত জীবন ধরে খেয়েও ফুরোতে পারবে না। আমি কাজহীন থাকতে চাই।

মানুষ কি কাজহীন থাকতে পারে?

আমি ট্রাই করব।

তবে এ সবই ছেলেমানুষি ভাবনা। ছমাসে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। কাজহীন থাকা বড় কঠিন কাজ।

এম কমটা শুরু করব নাকি! বাবার সঙ্গে বিসনেসটা দেখব! বাবা তাহলে খুশি হবে খুব। আমার হাতে ছেড়ে দেবে সব। ভয় হয়। আমি অত কিছু পারব না।

তাহলে আমি এখন কি করব মিমি?

ছবির ভেতরে বসে মিমি কি আমার কথা শুনে হাসে! আমি গা করি না। পাগলের মত বলে যাই। আমার ওয়েট একশো একুশ পাউণ্ড। হাইট পাঁচ ফুট সাড়ে ছয়। বুকের মাপ প'য়ত্রিশ। রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। এখানেও মা বাবার মিকসিং। মা ধবধবে ফর্সা বাবা শ্যামলা। এসব যোগ্যতা নিয়ে কি করা যায় মিমি?

প্রেম?

সে কোনো যোগ্যতার ব্যাপার নয়। তোমাকে নিয়ে আমি তা প্রমাণ করব।

শুনে কি মিমি আবার হাসে! আমি কেয়ার করি না। বলতে থাকি। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির পাশে এক সুইডিস সাহেবের বাড়ি ছিল। টুকটুকে ফর্সা, খেলনা পুতুলের মত সাহেব মেমের একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল। বিকেলবেলা আয়ার সঙ্গে ঘুরতে বেরুতো মেয়েটা। আমি তখন বাড়ির ভেতর বাগানে রাবারের সুন্দর বল নিয়ে একাকী খেলা করি। এক বিকেলে বলটা ছিটকে গেটের বাইরে চলে যায়। আয়ার সঙ্গে মেম মেয়েটা তখন রাস্তায় ঘুরছিল। বলটা গিয়ে মেয়েটার পায়ের কাছে পড়ে। মেয়েটা চমকে আমার দিকে চায়। তারপর হেসে বলটা আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়। আমি ক্যাচ ধরতে গিয়েও পারি

না। বলটা হাতের ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। দেখে সেই মেয়ে খিলখিল করে হাসছিল। ভারি একটা লজ্জা পেয়েছিলাম আমি।

আসলে সেটা বোধহয় লজ্জা ছিল না। ছিল দুঃখ। বলটা ঠিকঠাক মত ধরতে পারলে মেয়েটার সঙ্গে কিছু একটা কি হত আমার! কি, সেটা কি! হৃদয় বিনিময়!

কথাটা আজকাল মনে হয়। মাঝে মধ্যে ওরকম একটা দৃশ্য স্বপ্নেও দেখি। কে যেন রঙিন একটা বল ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার দিকে। আমি ক্যাচ ধরতে চাই। পারি না।

এই বলটা কি আসলে কোমল কোনো হৃদয়। কেউ আমাকে দিতে চেয়েছিল! সে হৃদয় আমি স্পর্শ করতে পারিনি। তাহলে কি ছেলেবেলায় প্রেম এইভাবে আমার হাতে এসেছিল! আমি ধরতে পারিনি। তারপর এই তেইশ বছর বয়সে, আজ বিকেলে, মিমি তুমি আবার রঙিন একটা বল ছুঁড়ে দিলে আমার দিকে। সেকেণ্ড টাইম। এবার আমি আর মিস করব না। ধরবই। 'কতকাল ধরে যে এই বলের অপেক্ষায় আছি আমি, মিমি তুমি তা জান না।

রানুকে দেখে আমি মজেছিলাম। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মত রূপ ছিল রানুর। আর ছিল ফিগার। ফিগার টিগারের ব্যাপারে বাবার প্রভাব আছে আমার ভেতর। সুন্দর ফিগারের মেয়ে দেখলে আমার এক ধরনের ছটফটানী শুরু হয়ে যায়। রানুকে দেখে তাই হয়েছিল। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। ওটা প্রেম নয়। যৌনতা। রানুকে আমি ইজিলি পেয়েছিলাম। এত সহজ পাওয়া কি প্রেম হতে পারে?

প্রেগন্যান্ট রানু বলেছিল, চল বিয়ে করি।

শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। গুলটুল মেরে রানুকে ম্যানেজ করেছিলাম। রানু বেশি জোর করেনি। কেন যে করেনি! করলে আমি বাধ্য হতাম। ট্রাপে ফেলে রানু আমাকে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু রানু তা করেনি। ও কি বুঝে গিয়েছিল ওর সঙ্গে আমার প্রেম নেই। যা আছে তা শরীরে শরীরে দেয়া। প্রেম নহে।

শুধু শরীরের সম্পর্ক নিয়ে কি আজীবন দুটো মানুষ পাশাপাশি থাকতে পারে!

কেউ কেউ হয়ত পারে। আমি পারব না। তাই রানু যখন বলেছিল চল বিয়ে করি, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রানুর সঙ্গে আজীবন থাকতে আমি পারব না। সত্যি বলতে কি, রানুকে তখন আমার আর একটুও ভাল

লাগছিল না। ওকে দেখলে কাম ছাড়া আর কিছু টের পেতাম না। ওসব হয়ে গেলে ইচ্ছে করত লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দিই।

রানু কি এসব টের পেয়েছিল! তাই কি নিজ থেকে বলল, আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল। নিয়ে গেলাম। এক দুপুরে রানুর ওয়াস হয়। ব্যাপারটা রানুকে রিয়্যাক্ট করল না। মেয়েরা এত সহজে সন্তান নষ্ট করতে পারে, আমার জানা ছিল না।

একটা খারাপ মেয়ের কথা জানি। মেয়েটাকে আমি চিনি। তোতা। পুরনো টাউনে আমার এক বন্ধুর অফিসে ঠিলা ভরে পানি এনে দিত। ওটা ছিল লোক দেখান। ফাঁকে ফাঁকে শরীরের কারবার করত। চার পাঁচ বছর ধরে চালাচ্ছে। বন্ধুটির অফিসের তিনতলা চারতলায় কিছু লোক দেখান ফিল্ম অফিস আছে, তমুক ছায়াছবি অমুক প্রডাকশন ধরনের নাম। ঘরময় পুরনো ফিল্মের পোস্টার আর কিছু স্টিল ফটোগ্রাফ লাগান। চেয়ার টেবিল নিয়ে খুবই লোচ্চা ধরনের কিছু লোক বসে থাকে। একজন দুজন পুরুষ আর চার পাঁচটি মেয়ে। মাঝে মধ্যে বাইরে থেকে লোকজন আসে, একটি দুটি মেয়েকে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার জায়গা না থাকলে রুমের ভেতরেই, হার্ডবোর্ডের পার্টিশানের ওপাশে নিয়ে চকির ওপর শোয়। ফিল্ম অফিস নয়, আসলে ওগুলো এক একটা মিনি বেশ্যাখানা। তোতা ওখানকার একজন কম রেটের বেশ্যা। চার পাঁচ বছর ধরে করে খাচ্ছে, কখনো কিছু হয়নি। পিল খেত। হঠাৎ করে কি হল, তোতা প্রেগন্যান্ট হয়ে যায়। কাস্টমাররা বলল, তোতা খালাস কর। তোতা রাজি হয় না। শেষমেষ আমার বন্ধুটাও বলল। শুনে তোতা খুব কাঁদে। না আমি ফালামু না।

একে বেশ্যা, তার ওপর পেটে বাচ্চা, এমন মেয়েকে কে বিয়ে করবে! তারপর থেকে যাকে পায় তাকেই ধরে তোতা, আমারে বিয়া করবা?

কেউ রাজি হয় না।

তোতা বেশ্যা। তোতা জানত না তার পেটে কার বাচ্চা। জানলে নিশ্চই সেই লোকটাকে ধরত, আমারে বিয়া করতে অইব।

কিন্তু রানুর তো এরকম প্রবলেম ছিল না। রানু জানত তার পেটে আমার বাচ্চা। জোর করলে আমি তাকে বিয়েও করতাম! রানু জোর করেনি। অবলীলায় বাচ্চা ফেলে দিল।

ফেরার পথে রানু একটা কথাও বলেনি আমার সঙ্গে। আমিও বলিনি। আমি তখন বাচ্চাটির কথা ভাবছিলাম। দু তিন মাসের বাচ্চা। তখনো ধর

আসেনি। একতাল রক্ত মাংসের পিণ্ড। তার কথা ভেবেই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল আমার। আমাদের বংশে একটার বেশি সন্তান হয়না কারু। তাও ছেলে। আমি আমার এক মাত্র ছেলে কি রানুর গর্ভেই নষ্ট করে দিলাম! এ আমি কি করলাম. কি করলাম মিনি।

কখন ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুরু করেছি, টের পাইনি। কেন যে এ রকম কান্না পেল। কি যে দুঃখে, বুঝতে পারি না।

তবু কেঁদে ভাল লাগে। কতকাল যে কাঁদিনি।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে দেখি মিমির ছবিটা আমার বুকের তলায় পড়ে আছে। দেয়াল ঘড়িতে আটটা বেজে কয়েক মিনিট। আমি হাত ঘড়ি পরি না। ভাল্লাগে না। তাছাড়া সময় দেখার বড় একটা দরকার হয় না আমার। কাজহীন মানুষ। সময়ের কি দরকার আমার। তবু ঘড়ি একটা কিনেছিলাম। সিকো ফাইভ। অটোমেটিক। নীল সুন্দর ডায়ালের। কদিন পরে দেখি বিচ্ছিরি লাগে। ফেলে রাখি। এখন আমার বাঁহাতে রুপোর শিকলের মতন একটা চেন। তাতে লেখা আছে, কিস মি। আজকাল অনেকে এসব পরে। মেয়েরাও।

ঘড়ির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মিমির ছবিটা দেখি। মিমিকে সকালবেলা অন্যরকম লাগে। মিমির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাল রাতের সব কিছু মনে পড়ে আমার। এই ছবিটার কাছে আমি আমার জীবনের গোপনতম কথাটিও বলে ফেলেছি। ভেবে হাসি পায়। কাল রাতে আমি কি শালা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

ছবিটা বালিশের নিচে রেখে উঠে বসি। শরীরটা একটু ম্যাজ ম্যাজ করে। সারারাত ফ্যানের হাওয়ায় ঘুমোলে এরকম হয়। কালরাতে ফ্যানটা ফুলস্পিডে ঘুরেছে। এখনো ঘুরছে। আমি ফ্যান চালিয়েই ঘুমোই। কিন্তু স্পিড কমিয়ে। কালরাতে এসব একদম মনে ছিল না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি।

উঠে ফ্যান অফ করি। লাইট নেভাই। তারপর দরজা খুলে ছাদে এসে দাঁড়াই। ছাদে এখন সকালবেলার রোদ। গাছপালার ওপর রোদ পড়ে কাঁচা একটা গন্ধ উঠেছে। রাস্তার গাড়ি ঘোড়া চলছে। মানুষ চলছে। লেকের জলে রোদ পড়ে চকচক করছে। লোকজন এর মধ্যেই দু চারজন বসে গেছে ছিপ নিয়ে। ভারি সুন্দর দিন। দূরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে আমার মনে হয় এত সুন্দর দিন আজকের আগে আমি কখনো দেখিনি। মায়ের গর্ভ থেকে পড়ে এই প্রথম যেন পৃথিবীর আলো বাতাস গাছপালা আর জলের দিকে তাকালাম আমি। অচেনা আনন্দে মনটা ভরে যায়।

মতি ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে। হাতে গরম কফির কাপ। ঘুম ভেঙে হাত মুখ না ধুয়ে আমি এক কাপ কফি খাই। কফিতে আড়ষ্টতা কাটে। প্রতিদিন ঠিক সাড়ে আটটায় কফির কাপ হাতে মতি ওপরে আসে। এসে দরজা ধাক্কায়। সাড়ে আটটা নটার আগে আমার কখনো ঘুম ভাঙে না। কিংবা ভাঙলেও বিছানা ছাড়ি না। চোখ বুঁজে পড়ে থাকি। কখনো শুয়ে থেকেই ডেকে ক্যাসেট চালিয়ে দিই।

সকালবেলা আমি সাধারণত মিউজিক শুনি। বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই রবিশঙ্করের কিংবা বিটেলসের সুন্দর কোনো মিউজিক। মনটা ফ্রেস হয়ে যায়। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানি আর মিউজিক শুনি।

আজ ওসবের কিছুই করিনি। উঠেছিও সাড়ে আটটার আগে। উঠেই সোজা চলে গেছি ছাদে, রেলিংয়ের কাছে।

আমাকে ছাদে দেখে মতি হা করে থাকে। আমি মতিকে বলি, এখানেই দে।

মতি কফি দেয়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে থাকি। মতি ঘরে গিয়ে ঢোকে। বিছানাপত্র ঠিক ঠাক করতে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করি, মতি, বাবা উঠেছে।

হ। অনেক সকালে উঠেছে। উইঠাই গাড়ি লইয়া বাইর অইয়া গেল। বেগম সাবেরে কইয়া গেল সিলেট যাইব। তিন চাইর দিন পরে আইব।

আমি আর কিছু না বলে কাপটা মতির হাতে ফিরিয়ে দেই।

বাবা রিয়েল বিজনেস ম্যান। এই বয়সেও পরিশ্রমটা করে কি! এত সব নিজে না করলেও পারে। ম্যালা লোকজন আছে। ওরাই পারে চালিয়ে নিতে। বাবা অফিসে বসে থাকলেই পারে। না, বাবার বসে থাকতে ভাল্লাগে না। নিজেই দৌড়বে সব জায়গায়। আমি বুঝতে পারি না কি হবে অত টাকা দিয়ে। কে খাবে! ছেলে তো আমি একাই।

মাস তিনেক আগে দুতিনদিন শরীর খারাপ ছিল বাবার। ডাক্তার চাচা বলল মাসখানেক রেস্ট নাও। কে শোনে কার কথা। চারদিনের মাথায়ই বেরিয়ে গেল বাবা। মা কি কি বলল, গ্রাহ্যও করল না। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এল আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। বাবাকে দেখেই আমি থমকে যাই। মেজাজটা একটু খারাপ ছিল। বললাম, তুমি না বেরিয়ে পার না? ডাক্তার চাচা না তোমাকে রেস্ট নিতে বলল! শুনে মৃদু হাসল বাবা। বাড়ি বসে থাকতে ভাল লাগে না।

বাবার দিকে ভাল করে তাকিয়ে আমি সেদিন চমকে উঠেছিলাম। বাবার

হাসিটা ম্লান দেখায়। বাবার চোখের কোণে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। ক্লান্তির ছাপ, না বয়সের। জুলপি দুটো পুরোপুরি শাদা হয়ে গেছে। বাবার বয়স কত? খুব বেশি তো নয়। তাহলে?

বাবা তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলে আমার অকারণেই একটা কথা মনে হয়েছিল। বাবার ভেতরে কি কোনো গোপন দুঃখ লুকিয়ে আছে! নয়তো এই বয়সেও লোকটা এত অস্থির কেন? ইয়াং ছেলেদের মত চলাফেরা করে, দেদারসে মদ খায়, মেয়েবাজী করে! ঠিক বুঝি না। বাবার প্রবলেমটা কি!

বাথরুমে ঢুকে আমি তারপর সকালবেলার কাজগুলো সারি। সেভ করতে যাব, তখন মিমির কথা মনে পড়ে। মিমিকে আমি খুঁজে বের করব, মিমিকে আমি ভালবাসব। মিমিও আমাকে ভালবাসবে। প্রেম। রাধা কৃষ্ণ, ত্রিস্তান সোনালি, তিন নাম্বারে হবে মিমি অলি। তক্ষুনি মাথায় একটা পাগলামি বুদ্ধি খেলা করে যায়। মিমিকে আমি চাই। যতদিন না পাব ততদিন সেভ করব না।

ঘরে ফিরে বালিশের তলা থেকে মিমির ছবিটা বের করি। তারপর মিমির চোখের ভেতর তাকিয়ে বলি, উই মাস্ট লাভ ওয়ান এনাদার অর ডাই।

দশটার দিকে গোসল টোসল করে বেরুই। পরেছি নীল রঙের জিনসের প্যান্ট আর শাদা শার্ট। তীব্র রোদ ওঠে বলে আমি খুব ঘামি। মুনভ্রূপস মেখে নিয়েছি। মুনভ্রূপসের তীব্র গন্ধে ঘামের গন্ধটা মরে যায়।

ভেসপা স্টার্ট দিতে যাব দেখি বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে আছে। মাকে কেমন বিষণ্ণ দেখায়। গাছপালার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে আস্তে করে বলল, কোথায় যাচ্ছিস খোকা?

আমি মার দিকে তাকিয়ে বলি, একটু বাইরে যাব মা।

কখন ফিরবি?

দুপুরের দিকে।

আলায় বালায় ঘুরিস না। রোদটা খারাপ, জ্বর জারি হবে।

আলায় বালায় শব্দটা বিক্রমপুরের কালোকাল। মা কখনো কখনো বিক্রমপুরের কালোকাল ইউজ করে। শুনতে বেশ লাগে আমার।

ভেসপা স্টার্ট দিয়ে আমি আবার মার দিকে তাকাই। মা গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে কি রকম উদাস দৃষ্টি। মা কি কিছু ভাবছে!

গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে এই প্রথম আমার মনে হয়, মা বড় একা।

এ কথাটা মনে হতেই আমি ফিসফিস করে বলি, মা তোমাকে আমি একজন এনে দেব। সারাক্ষণ তোমার পাশাপাশি থাকবে সে। কখনো তোমার অবাধ্য হবে না।

কিন্তু এখন আমি কোথায় যাব? ইউনিভার্সিটির দিকে? টিএসসিতে কিংবা পাবলিক লাইব্রেরী অঞ্চলে ম্যালা বন্ধু বান্ধব থাকবে এসময়। সিরাজ হাবিব সারোয়ার। গেলে চা সিগারেট আড্ডা আর মেয়ে দেখা।

না, ভাল্লাগে না। অন্য কোথাও যাওয়া উচিত। ইউনিভার্সিটির আড্ডা আজকাল ভাল্লাগে না। চা সিগারেট খেতে খেতে মুখ তেত হয়ে যায়। তাছাড়া রোজই একধরনের আড্ডা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় বসে থাকা। বসে থাকতে ভাল না লাগলে সূর্যসেন কিংবা জহুরুল হক হলে গিয়ে রাজু কিংবা সারোয়ারের রুমে দশপাই পাঁচপাই সিরিজের জুয়ো খেলা। সিরাজ হয়ত দুপুর বেলাই দুবোতল বাংলা নিয়ে হাজির হবে। মচ্ছব শুরু হয়ে যাবে।

সিরাজটা বাতিল হয়ে গেল। ও বোধহয় এস এস সি পাশ করেনি। কিছুদিন আর্ট শিখেছে, কিছুদিন কবিতা লিখেছে, কিছুদিন একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থা চালাল। সিরাজদের বাড়ির অবস্থা বিরাট। বাবা চিটাগংয়ের বিরাট সওদাগর, বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে ফ্রিজ প্রেজেন্ট করে, এই রকম। বড় ভাইটা ছোটখাট একটা ইন্ডাস্ট্রির মালিক। সিরাজকে এডভার্টাইজিং ফার্ম করে দিয়েছিল বাবা, নাম ছিল অধুনা। মতিঝিলে চমৎকার অফিস ছিল সিরাজের। কর্মচারি ছিল সাত আটজন। বছর খানেক চালিয়ে ফার্মটা বন্ধ করে দিল সিরাজ। জাত বোহেমিয়ান পোলা। আজ চিটাগাং কাল কুমিল্লা পরশু ঢাকা। সিরাজ কখন কোথায় থাকে কেউ জানে না। একদিন হঠাৎ করে দেখা গেল কাঁধে ঝোলা রাত এগারটায় হাতে সিগারেটের ঠোঙায় দু বোতল বাংলা মদ, সিরাজ দাঁড়িয়ে আছে রাজুর রুমের সামনে। এক সময় ফাইভ ফিফটি ফাইভ ছাড়া খেত না। বন্ধু বান্ধবের জন্যে দেদার খরচ করত। পকেটের শেষ পয়সাটি পর্যন্ত। দামি বিদেশী গেঞ্জি পরত। আজকাল স্টার খায়, যার তার কাছ থেকে দুএক টাকা ধার নেয়। একটা শার্ট প্যান্ট পরে মাসখানেক কাটিয়ে দেয়। বাবা ওকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না। ভাইর কাছে গেলে গালাগাল শুনতে হয়। সিরাজের জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। মদ গাঁজা খেয়ে জীবনটা নষ্ট করে দিল। কোনো কোনো মানুষ কি নিজের আত্মক্ষয়ের জন্যেই জন্মায়!

সিরাজকে দেখে আমার এসব মনে হয়। ওর তো কোনো অভাব ছিল না, দুঃখ ছিল না। তাহলে? মা বাবার সঙ্গে থাকলে গাড়ি দাবড়ে বেড়াতে পারে

সিরাজ। সিরাজ থাকবে না। বাড়ি থাকলে ইচ্ছা মত মদ খাওয়া যায় না, নেশা করা যায় না। সিরাজ কি আসলে স্বাধীনতা প্রিয়! কোনো বন্ধনের ভেতর কি সে থাকতে চায় না! থাকতে পারে না!

শাহবাগে আমার এক বন্ধু রানার দোকান আছে। ঘরদোর সাজাবার টুকটাক জিনিশপত্রের দোকান। সিরাজ মাঝে মধ্যে সেখানে আড্ডা দেয়। একদিন বিকেলে আমরা কজন বসে আছি, সিরাজ ওভারলোড হয়ে এল। দোকানে একজন অচেনা পাণ্ডা গোছের লোক ছিল। সিরাজ এসেই সেই লোকটাকে বলল, মাল আছে?

লোকটা সিরাজের দিকে তাকাল। তাকিয়ে হাসল। বোঝা গেল লোকটা সিরাজের চেনা। আমি অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাচ্ছিলাম। সিরাজ আবার বলল, নেই?

লোকটা একবার আমার দিকে তাকিয়ে শীতল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় সিরাজের চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিল। নিয়েই টেনে একটা ব্লো মারল সিরাজের মুখে। সিরাজ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আর একটা। আমি মাগীর ব্যবসা করি শালা। শুয়োরের বাচ্চা, অচেনা লোকজনের সামনে অপমান!

সিরাজের নাক মুখ দিয়ে তখন রক্ত পড়ছে। আমি উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছি। হাত দুটো নিশপিশ করছিল। গুণে গুণে আমি ঠিক দুটো ব্লো মারব লোকটার মুখে। জিউগ্রাফি পাল্টে দেব শালার!

রানা বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারে, আমাকে টেনে বসিয়ে দেয়।

তারপর থেকে সিরাজকে দেখলেই আমার সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে। মার খেয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে। নাক মুখে রক্ত। আমি সিরাজের দিকে ভাল করে তাকাতে পারি না।

না ইউনিভার্সিটির আড্ডায় যাব না।

তাহলে কোথায় যাব এখন? কোথায়?

ম্যালা আড্ডাখানা আছে আমার। পুরনো টাউনের বাংলাবাজারে আছে একটা আড্ডা, কিছু নাটক পাগল বন্ধু বান্ধব আছে। নারায়ণগঞ্জেও যাওয়া যায়। ধলা মাসুদরা আছে। চমৎকার সময় কাটিয়ে আসা যাবে। মাসুদ আবার কারখানায় বসতে শুরু করেছে। মৃতসঞ্জিবনীর কারখানা। নৌকা নিয়ে শীতলক্ষ্যায়, মৃতসঞ্জিবনীর পাইট হাতে, দৃশ্যটা ভাবতে ভাল লাগে না।

তাহলে যাব কোথায়!

হঠাৎ মনে পড়ে সেগুন বাগিচায় শীরুদের একটা আড্ডাখানা আছে। এ জি অফিসের পেছন দিকে ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্টে শীরু বেলাল সাঈদ খসরু কিশলু রুমা বসে। আড্ডাটা চমৎকার। রুমার মত সুন্দর একটা মেয়ে ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে বসে দেদারসে চা সিগারেট খায়! গাঁজা মদ খায়, ব্লু ফিল্মও দেখে।

আমি সেগুন বাগিচার দিকে ভেসপা চালাই। তখন মনে পড়ে, লাভলি বলেছিল, মিমি সেগুন বাগিচায় থাকে। মনে পড়তেই চমকে উঠি। মিমিকে খুঁজব বলেই তো বেরিয়েছি। ইচ্ছে করলে সহজেই খুঁজে বের করা যায় মিমিকে। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে গেলেই হয়। ইকনমিক্স ডিপার্টম্যান্ট। লাভলি আছে।

না এত সহজে মিমিকে আমি পেতে চাই না। ঠিকানাবিহীন মিমিকে আমি খুঁজে বের করব। তারপর প্রেম। যতদিন না হবে সেভ করব না। একটা মজার কাজ পাওয়া গেল।

ভেসপা চালাতে চালাতে খরখরা গালে একবার বা হাত বুলাই। মৃদু হাসি। মিমি, আজ ওপেনিং ডে। আজ থেকে তোমাকে খোঁজার কাজ শুরু আমার।

রেস্টুরেন্টে দেখি সবাই আছে। আমি ভেসপা লক করেই সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছি। টানতে টানতে ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে যাই। দেখে সবাই হৈ হৈ করে ওঠে। শীরু বলে, বাকাপ দোসত। আয়।

আমি হাসতে হাসতে রুমার পাশে বসি।

রুমা বলল, তোর সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা। কেমন আছিস অলি?

আমি হাসতে হাসতে রুমার উরুতে হাত রাখি। ভাল। তুই ভাল ছিলি?

রুমার হাতে সিগারেট। ও পরেছে আজ পাতলা পাঞ্জাবী আর কালো প্যান্ট। হাতে ছেলেদের মত ভারি ঘড়ি। রুমার পকেটে সবসময় ডানহিলের প্যাকেট থাকে। রুমার একটি সাইকেল আছে। ছেলেদের মত অবলীলায় সাইকেল দাবড়ে বেড়ায় সে। থাকে পুরনা পল্টন। পড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। অনার্স ফাইনাল ইয়ার। সাবজেক্ট জানি না। ওর কোনো মেয়ে বন্ধু নেই। আমাদের মত ছেলেদের সঙ্গেই ওর বন্ধুত্ব।

রুমা দেখতে বেশ। টল। ফিগার টিগার ভাল। ফর্সা। অনর্গল ইংরেজি বলে। ওর বাবা ইংরেজির প্রোফেসর। রুমা বেশ কিছুদিন লণ্ডনে ছিল।

কিন্তু আমি আজ রুমার উরুর ওপর হাত রাখায় রুমা যে কিছু বলল না! ওর হাতটাত ধরা যায়। অন্য কোথায়ও হাত দিলে রুমা খুব রেগে যায়। ঘুষি-টুষিও মেরে বসে। একদিন শীরু খুব মুডে মুডে রুমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। রুমা

কায়দা করে নিজেকে ছাড়িয়েই শীরুর চোয়ালে পর পর দুটো ঘুষি মারে। রুমা অবিকল ছেলেদের কায়দায় মারপিট করতে পারে।

কিন্তু রুমাকে আজ খানিকটা অন্যরকম লাগছে। একটু এবসেন মাইন্ডেড। রুমা কিরকম একটু ফ্যাকাশেও হয়ে গেছে।

আমি বললাম, কিরে শালা কি ভাবছিস ?

রুমা সিগারেট টানছিল। চমকে উঠল, কি ভাবব।

শীরু বলল, তোর ফরেন জিনিশটির কথা ভাবছিস ?

শুনে সবাই হেসে ওঠে। কাজল শহীদ শীরু আমি, কিশলু খশরু দুজনের মধ্যেও একজন হাসে। কে যে, কিশলু না খশরু ঠিক বুঝতে পারি না।

ওরা যমজ ভাই। দুটোই দেখতে একরকম। কপি টু কপি। কোনটা কিশলু কোনটা খশরু আমি কখনোই বুঝতে পারি না। কিশলুকে যে কতদিন খশরু বলেছি, খশরুকে কিশলু। ওরা মাইন্ড করে না। দুভাইয়ের গলায় গলায় ভাব। সারাক্ষণ এক সঙ্গে। মদ গাঁজা খায়, এক মেয়েকেই দুই ভাইয়ে পর পর ব্যবহার করে। কিশলু খশরুর একটা গোপন ব্যবসাও আছে। ব্লু ফিলমের। সিক্সটিন মিলিমিটারের একটা প্রোজেক্টর আছে। পার হেড দশ টাকা করে নিয়ে দেখায়। ভাল ইনকাম। বছরখানেক করেই দুজনে হানড্রেট সি সি হোন্ডা কিনে নিয়েছে। এখন হেলমেট লাগিয়ে পাশাপাশি হোন্ডা চালায় দুভাই।

শীরু বলল, চা খাবি ?

বল।

শীরু চেঁচিয়ে বলল, মাথা গুনে চা দে।

শুনে আমি হেসে ফেলি। কি বে এটা বের করলি কবে ?

এটা রুমার ফরেন জিনিশটির কথা। এখন ঢাকায় রুমা চালিয়ে বেড়াচ্ছে।

শুনে আরেক রাউন্ড হাসি।

লন্ডনে একটা ছেলের সাথে রুমার প্রেম। রুমা যখন লন্ডনে তখন ঘটেছিল ব্যাপারটা। রুমা চলে আসে। আসার সময় ছেলেটাকে বলে আসে দুবছর পর ফিরে এসে তোমাকে বিয়ে করব। দুবছরের আর মাস ছয়েক বাকি আছে। পরীক্ষা শেষ করেই লন্ডনে জনের কাছে ফিরে যাবে রুমা।

চা খেতে খেতে আমি জিজ্ঞেস করি, রুমা তুই যাচ্ছিস কবে ?

রুমা সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলে, আমার যাওয়া হবে না অঞ্জি।

কেন রে !

না যাব না।

জন যে তাহলে মরে যাবে গো।

কথাটা বলে কাজল। শুনে আমরা হো হো করে হেসে উঠি। রুমা হাসে না। চায়ে চুমুক দেয়। পকেট থেকে সিগারেট বের করে আমাকে একটা দেয় আর কারু দিকে ফিরেও তাকায় না। আমি ঠোঁটে সিগারেট গুঁজি, রুমা লাইটার বের করে ধরিয়ে দেয়। রুমা আজ খুব গম্ভীর হয়ে আছে। ও খুব উচ্ছল মেয়ে। কিন্তু আজ এমন ভারি হয়ে আছে কেন?

আমি বললাম, কি বে শালা মুড অফ কেন?

কই? রুমা ম্লান হাসে। ওকে খুব ফ্যাকাশে দেখায়। রেশনের আতপ চালের মত। আজ সবাই যেন একটু অফ। শীরু কাজল কিশলু খশরু সবাই। কি, হয়েছে কি শালাদের!

খানিক পর রুমা উঠে দাঁড়ায়। অলি তুই আমাকে একটা লিফট দিবি?

তোর ডাটসান কই? রুমা তার সাইকেলকে বলে ডাটসান।

আনিনি।

কোথায় যাবি?

বাসায়।

ঠিক হায় চালো ইয়ার।

আমি উঠে দাঁড়াই।

তখন আবার মনে পড়ে লাভলি বলেছিল মিমি সেগুন বাগিচায় থাকে। বুক পকেটে মিমির ছবিটা আছে। বের করে শীরুকে দেখাব! শীরু তো সেগুন বাগিচায়ই থাকে, মিমিকে হয়ত চিনবে।

না, মিমিকে আমিই খুঁজে নেব। আমার কোনো সাহায্যকারী লাগবে না।

শীরুর দিকে তাকিয়ে বললাম, চলি দোসত।

ও কে!

বাইরে এসে ভেসপা স্টার্ট দেব, রুমা বলল, তোর সঙ্গে কথা আছে। চল কোথাও নিরিবিলিতে বসি।

আমি বলি, কোথায় যাওয়া যায়?

চল কোনো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বসি।

কি এমন কথা রে?

আছে।

আমি ভেসপা স্টার্ট দিই। রুমা পেছনে বসে একহাতে আমার কোমর

জড়িয়ে ধরে। আগে রুমার এই জড়িয়ে ধরাটা সাংঘাতিক ভাল লাগতো। রুমা একটু জড়িয়ে ধরবে এই লোভে রুমাকে কতদিন লিফট দিয়েছি। আজ কিন্তু ব্যাপারটা ভাল্লাগে না। মিমি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ে আর কখনো আমাকে ছুঁতে পারবে না। আমি রুমাকে বলি, কোমর ছাড় রুমা, ডিস্টার্ব হয়।

রুমা কোমর ছেড়ে বসে।

আমার মাথায় তখন হঠাৎ একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। রুমা সিরিয়াস ভঙ্গিতে পটিয়ে পাটিয়ে আমাকে চাইনিজ রেস্টুরেণ্টে নিয়ে যাচ্ছে, লাঞ্চটা আমার ওপর দিয়ে সেরে নেবে না তো! শালা বড় হারামী মেয়ে, অনেকবার এমন করেছে। আমি চালাকি করে বললাম, রুমা চল না পার্কেই বসি।

রুমা বলল, চল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার হয়ে যায়। রুমার সত্যি সত্যি কথা আছে দেখি। শালা বলবে না তো, তোকে ভালবাসি অলি। তাহলে তো মাডার।

পার্কের ভেতর লেকের ধারে নিরিবিলিতে বসি আমরা। দুপুর হয়ে গেছে। পার্কটা খুব নির্জন। দূরে কোথায় একটা পাখি উদাস স্বরে ডাকে। রুমা পকেট থেকে সিগারেট বের করে। আমিও বের করতে যাচ্ছিলাম। রুমা বলল, এখান থেকে নে।

রুমা কখনো এমন করে না। নিজের সিগারেটটা বাঁচিয়ে রেখে অন্যেরটা খায়। আজ রুমা হঠাৎ করে এমন বদলে গেল কেন?

আমি সিগারেট ঠোঁটে গুঁজি, রুমা আন্তরিক ভঙ্গিতে লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দেয়। নিজে ধরায়। গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, তুই আমাকে মিস করলি অলি?

মানে?

আমাকে পেলি না।

তোকে আমি পেতে চেয়েছি কবে?

চাসনি? সবাই তো চেয়েছিল। পেয়েছেও।

কি বলছিস রুমা, বুঝতে পারছি না!

রুমা ম্লান হাসে। তুই ছাড়া আর সবাই আমাকে পেয়েছে। একবার দুবার করে। ওদের অনেকদিনের চাওয়া ছিল।

ক্লিয়ার করে বল। বুঝতে পারছি না।

রুমা কথা বলে না, উদাস হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। সিগারেট খায়। একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে গেল অলি।

রমা কখনো হেয়ালি করে না। যা বলার স্ট্রেট বলে দেয়। ওকে আমরা কখনো মেয়ে হিশেবে ট্রিট করি না। রুমা আজ অত ভণিতা করছে কেন? কি হয়েছে? কিসের অ্যাকসিডেণ্ট!

আমি রেগে যাই। রুমা তোর কি হয়েছে পরিষ্কার করে বলত। নকড়া ভাল্লাগে না। বাড়ি যাব।

রুমা বলল, সেদিন দুপুরবেলা শীরুর বাসায় প্রোগ্রাম ছিল ব্লু দেখার। শীরুর বাসাটা একেবারে খালি ছিল। মা বাবা ভাই বোন সব গিয়েছিল গুলশানে ওর বোনের বাসায়। এই চান্সে কিশলু খশরু প্রোজেক্টার আর রিল ফিল নিয়ে হাজির। শীরু কাজল শহীদ আর আমি বসেছিলাম হোটেলে। প্রোগ্রামটা বোধহয় আগেই করে রেখেছিল ওরা। কিশলু খশরু আসতেই শীরু বলল, রুমা দেখবি নাকি?

আমি রাজি হয়ে যাই। তুই তো জানিসই ওসবে আমার কোন আপত্তি থাকে না। যাই, গিয়ে দেখি একটা ছাব্বিশ আউন্সের বোতলও আছে। দোতলায় শীরুর রুমে সব রেডি। ভালই লাগে। বহুদিন মালফাল খাই না। শীরুদের বাসায় চাকর ছেলেটা ছাড়া আর কেউ নেই। রুম বন্ধ করে আমরা বসি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিশলু খসরু সব ঠিক করে শীরুর শাদা দেয়ালে ব্লু চালিয়ে দেয়। আমাদের প্রত্যেক হাতে তখন একটা করে গ্লাস।

রুমা অত ডিটেইল বলছে কেন। আমার বিরক্ত লাগে। স্ট্রেট বললেই তো পারে মূল ঘটনা কি। কিন্তু রুমাকে বলি না কিছু। চেপে থেকে শুনে যাই।

সিগারেট ফেলে দিয়ে রুমা এবার আমার দিকে তাকায়। তারপর আবার জলের দিকে। তুই ওটা দেখেছিলি! ঐ যে একটি মেয়েকে চারজন নিগ্রো রেপ করেছে?

না।

ওটাই প্রথমে চালায়। শেষ হতে না হতে আমাদের গ্লাস প্রায় শেষ। একটু একটু নেশা হয়েছে। ব্লু দেখে আমি স্লাইট উত্তেজিত। হঠাৎ শীরু আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আমি বাধা দেই। বাঁধা দিতেই শীরু ক্ষেপে গেল। দুহাতে জড়িয়ে ধরে মেঝের ওপর ফেলে দিল আমাকে। কিশলু খসরুরা কেউ কিছু বলছে না। আমি চেঁচিয়ে উঠি, ছেড়ে দে ছেড়ে দে শীরু। ভাল হচ্ছে না কিন্তু। শীরু গ্রাহ্যই করল না। টেনে হিঁচড়ে আমার শার্টের বোতাম খুলে ফেলল। প্যাণ্টের চেইন নামিয়ে দিল। ততক্ষণে আমি খুব টায়ার্ড

হয়ে গেছি। আর পারি না। চেঁচিয়ে উঠলাম, হেলপ হেলপ। কে একজন আমার মুখ চেপে ধরল। তারপর একের পর এক। অলি, আমি সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলাম।

রুমা থামে। আমি হা করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিছু বলতে পারি না। কে যেন দু হাতে গলা চেপে রাখে আমার।

রুমা আবার বলে, লণ্ডন থেকে চলে আসার আগের দিন জন আমাকে আদর করতে চেয়েছিল। আমি ওকে বুঝিয়েছি এখন সব শেষ হয়ে গেলে বিয়ের পর আমি তোমাকে কি দেবু। বাঙালী মেয়েদের সেন্টিমেণ্ট। ইউরোপের সব মেয়েই বিয়ের আগে ওসব করে। ওদের কাছে ওসব কোন ব্যাপারই নয়। সুতরাং জন আমার কথা শুনে অবাক হয়েছিল তারপর মেনেও নেয়। ছমাস পর জনের কাছে আমার ফিরে যাওয়ার কথা। অলি, ফিরে গিয়ে জনকে আমি কি বলব?

রুমা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

এরকম প্রবলেম আমি কখনো ফেস করিনি। কখনো কোনো মেয়ে এইভাবে আমার সামনে কাঁদেনি। মানুষের কান্না দেখলে ফ্রিজ হয়ে যাই আমি। সান্ত্বনা দিতে পারি না। দুঃখি মানুষকে কেমন করে সান্ত্বনা দিতে হয় আমি জানি না।

রুমা কাঁদতে কাঁদতে বলে, সারাজীবন ধরে যত্ন করে ওই একটা জিনিশ আমি রক্ষা করেছিলাম। ভালবাসার মানুষকে প্রেজেণ্ট করব। সব নষ্ট হয়ে গেল অলি। জন যখন বুঝতে পারবে আমার কিছু নেই, কি ভাববে?

আমি ঢোক গিলে বলি, ওদের কাছে এগুলো কোনো ব্যাপার নয় রুমা। তুই যেভাবে ভাবছিস আমার মনে হয় জন ওভাবে ভাববে না।

কিন্তু আমি যে ওকে কথা দিয়েছিলাম।

এটা তো এ্যাকসিডেণ্ট। তোর হাত ছিল না।

আমি আর জনের কাছে ফিরে যেতে পারি না। আমি নষ্ট হয়ে গেছি।

রুমা কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুই আমাকে মিস করলি অলি। তুই কেন সেদিন থাকলি না। কেন?

আমি ম্লান হেসে বলি, তোর প্রতি আমার কোনো লোভ ছিল না রুমা। শীরুদের ছিল। ওরা অনেকদিন অনেকভাবে বলেছে। আমি রাজি হইনি। পাত্তাও দেইনি। এসব জেনে তুই ওদের সঙ্গে মিশতি কেন?

ঠিক বুঝতে পারিনি। ওদের ভেতর কোথায় যেন একটা আকর্ষণও আছে।

ঠিক আছে তাহলে ঘটনাটা অত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন? পরীক্ষা দিয়ে চলে যা লণ্ডনে। না আর যাওয়া যায় না অলি। জনকে আমি ঠকাতে পারব না।

তাহলে কি করবি?

এখানেই থেকে যাব। তোদের যখন যার দরকার হবে আমাকে ডাকবি

রুমা আবার কাঁদতে থাকে।

এই প্রথম রুমার জন্য আমার বুকের ভেতর একটা মায়া তৈরি হয়। রুমার মত মেয়েও সত্যিকারভাবে একজনকে ভালবাসত। তার জন্য নিজের সব কিছু সাজিয়ে রেখেছিল। জিনিশটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে রুমা আর সেই মানুষটার কাছে ফিরে যেতে চায় না। জন কি রুমার জন্য অপেক্ষা করবে না!

আমি রুমার পিঠে হাত রাখি। কিছু একটা বলতে চাই। পারি না। চোখে জল এসে যায়।

কদিন ধরে ভেসপা নিয়ে খুব ঘুরছি। সকালবেলা ট্যাঙ্ক ভর্তি তেল নিয়ে নিই। তারপর সারাদিন। কোথাও বসি না। সেগুন বাগিচার সব অলি-গলি ভেজে ফেললাম। না মিমিকে পাওয়া গেল না। একদিন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির বাস ফলো করে জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। বাসে মিমি ছিল না। লাভলি ছিল। লাভলি আমাকে দেখেনি। আমি ইচ্ছে করে ওর সামনে যাইনি। দেখা হলে লাভলি অনেক কথা বলবে, অনেক প্রশ্ন। জবাব দিতে ভাল্লাগবে না। লাভলিকে মিমির কথা জিজ্ঞেস করলেই হয়। খুব সহজেই দেখা হয়ে যাবে। লাভলি আমাকে টেনে নিয়ে মিমির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। এই নিয়ে পরে ওদের বাড়িতে সেমিনার হবে। চারবোন মিলে আমাকে জ্বালিয়ে খাবে। হু সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার। খুব চালাচ্ছ না?

লাভলি বলবে, আমি তোমাকে কতদিন বললাম, একদিন ইউনিভার্সিটিতে এস। গেলে না। আর এখন খুব যাওয়া হয়।

এত গ্যাঞ্জাম ভাল্লাগে না। মিমিকে আমি একাই খুঁজে নেব। একা খুঁজে কোনো কিছু পাওয়ার ভেতর বেশ একটা সুখ আছে, আনন্দ আছে। সেই সুখ থেকে সেই আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব কেন।

কদিনে দাঁড়ি গোঁফ আধ ইঞ্চি বড় হয়েছে। আয়নায় নিজের মুখটা অন্ধকার

দেখায়। অলিকে অলিই চিনতে পারে না, এমন।

কাল মা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। পরে বলল, তোর কি হয়েছে খোকা ?

আমি হেসে বলি, কিছু না মা।

শরীর খারাপ ?

না তো

সেভ করিস না কেন ?

দাঁড়ি রাখব।

কি যে পাগলামি করিস ? চুল দাঁড়িতে চেহারাটা কি করেছিস !

আমি সব সময় চুল লম্বা রাখি এটা মার পছন্দ নয়। ব্যাকডেটেড লোকেরা লম্বা চুল পছন্দ করে না। কিন্তু আমাদের জেনারেশানে লম্বা চুলটাই মূল ফ্যাশন। চুল দেখেই লোকজন বলে দেবে, হ্যাঁ, এর জন্ম ১৯৫০ এর পর।

মা বলল, চুল দাঁড়ি কেটে ফেলিস খোকা।

আমি মাকে খুশি করার জন্যে বলি, আচ্ছা মা।

তারপর ভেসপা নিয়ে বেরিয়ে যাই।

কদিন বাবার সঙ্গে দেখা হয় না। দেখা হলে বাবাও কি আমার মুখের দিকে তাকাবে! জিজ্ঞেস করবে, সেভ কর না কেন? না, এ সব ব্যাপারে বাবার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই। রুমার ব্যাপারটা কদিন খুব ভাবছি। মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়। আহা' বেচারী! শীরুদের উপর মেজাজ খুব বিগড়ে আছে আমার। আর কখনো যাব না শালাদের কাছে। কারু কাছেই যাব না আর। শুধু মিমিকে খুঁজব। মিমিকে। মিমিকে খোঁজাই আমার এখন একমাত্র কাজ।

কদিনে ঢাকা শহরের সব মেয়েই প্রায় দেখা হয়ে গেল। রিকশা কিংবা গাড়িতে যে কোনো মেয়ে গেলে আমি কদিন ধরে ভাল করে তাদের দেখি। নিউ মার্কেট রমনা ভবন গ্রীন সুপার মার্কেট, এসব এলাকায়ও যাই। কে জানে কখন কোথায় কিভাবে মিমির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে।

কাল একটা মেয়ে দেখতে গিয়ে প্রায় অ্যাকসিডেণ্ট করে বসছিলাম। লাল প্রিণ্টের শাড়ি পরা একজন রিকশা করে যাচ্ছিল। রমনা পার্কের রাস্তায়। আমি পেছন থেকে দেখি। দেখেই স্পিডে ভেসপা চালিয়ে সামনে আসি। ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে দেখি। না, মিমি নয়। তখুনি কানের কাছে বিশ্রী হর্ণ বাজায় একটা ইণ্টারডিস্ট্রিক্ট ট্রাক। একেবারে মুখোমুখি পড়ে যাই। ট্রাকঅলা শালা শুয়োরের বাচ্চা বলে খুব গালি দেয় আমাকে। সেই গাল শুনে রিকশায়

বসে মেয়েটা হাসে। আমি ভেসপা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পার। মরেছিলাম। শালা মিমির জন্যে কি শহীদ হয়ে যাব নাকি ?

দুদিন দুটো বেশ্যার পাল্লায়ও পড়েছিলাম। ঢাকা শহরে আজকাল ভ্রাম্যমান বেশ্যার অভাব নেই। বিকেল থেকে হাইকোর্ট রমনা আর ইউনিভার্সিটি এলাকায় রিকশা নিয়ে বেরোয় তারা। রিকশাঅলাগুলোই দালাল। মক্কেল পেলে রিকশায় তুলে নেয়। তারপর যাও যেখানে সুবিধে।

এক বিকেলে হাইকোর্টের সামনে রিকশায় বসা একটা মেয়ের দিকে তাকিয়েছিলাম, স্ট্রেট চোখ মারল। দেখেই আমার হয়ে যায়।

বাপরে কাহাদের পাল্লায় পড়ছি আজকাল !

আর একদিন একটার দিকে তাকিয়েছি, রিকশাঅলা বলল, লাগবো স্যার !

আমি কোনো জবাব দিতে পারলাম না। একবার অবশ্য বলতে চেয়েছিলাম, না আব্বাজান লাগবে না। মাফ করে দিন।

মেয়েটার দিকে আমি আর না তাকিয়ে চলে আসি।

একদিন এক মহিলা আমাকে ছোটলোক বলে গাল দিল। নিউমার্কেটে। মহিলাটি খুব সুন্দর। আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম মিমি কিনা !

মহিলাটি আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন। ভুরভুরে ইণ্টিমেটের সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন ছোটলোক কথাটা। আগে হলে আমার খুব প্রেস্টিজে লাগত। আজকাল লাগে না। মিমির জন্যে আমাকে সব সইতে হবে।

এই তো কাল বিকেলে গাড়ি ভর্তি একদল মেয়ে যাচ্ছে গ্রীন রোডের দিকে আমি পেছন থেকে দেখেই ভেসপা ঘোরাই। স্পিডে চলে আসি গাড়িটার পাশে। ভেতরে মেয়েগুলো আমাকে দেখে কি সব বলাবলি করে।

না, এদের মধ্যে একজনও মিমি নয়।

তারপর একটা মেয়ের দিকে ভাল করে তাকিয়েই চমকে উঠি, মেয়েগুলো আমার রিলেটিভ। দূর সম্পর্কের ভাগ্নি কয়েকটি। দুএকটা আছে বোন। আর এক মুহূর্তও নয়, চোখ বন্ধ করে কেটে পড়ি। মনে মনে বলি, মিমি দেখ তোমার জন্যে কত কি করছি। এবার দেখা দাও। আর পারি না। দাঁড়ি বড় হয়ে গেল, টায়ার্ড লাগে।

দুপুর বেলা বাড়ি ফিরছি, দেখি ব্রিজের ওপর রাজা টেগি আর তিন চারটে ছেলে আছে। বুলি নেই।

কাছাকাছি আসতেই রাজা হাত তুলল, অলি দাঁড়া।

ভেসপা দাঁড় করাই। তারপর ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। ফ্যাকাশে, বিষণ্ন চেহারা সব কটির। রাজা আর টেগির চোখ অসম্ভব লাল। সকাল থেকে অনবরত গাঁজা টানছে বোঝা যায়।

রাজা বলল, তুই শুনিস নি কিছু?

না তো। কি হয়েছে!

বুলি মারা গেছে।

বলিস কি!

মুহূর্তে আমার মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। নেশাখোরের মতন টালমাটাল লাগে নিজেকে। খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি না। ফ্রিজ হয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে থাকি। টেগি বলল, কাল রাত দশটা অব্দি আমাদের সঙ্গে ছিল। হেভি টেনেছিল কাল। হাঁটাচলার ক্ষমতা ছিল না। আমি আর রাজা ধরাধরি করে বাড়ি পেঁছে দিই। কথা ছিল আজ সকাল দশটায় আমরা ওর বাড়ি যাব ওকে ডাকতে। হ্যাঁ গিয়েছি। গিয়ে দেখি উঠোনে শাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে বুলিকে।

গলা ভেঙে আসে টেগির। কান্না সামলাতে অন্যদিকে তাকায় সে।

রাজা বলল, যাবি না?

আমি থতমত খেয়ে বলি, কোথায়?

বুলিকে দেখতে?

ও। তারপর একটু থেমে বলি, চল।

টেগি বলল, তুই যা আমরা আসছি।

ওরা সবাই সিগারেট ধরাচ্ছে। স্টার। দেখে আমি বুঝতে পারি ভেতরে গাঁজা ভর্তি। হাত বাড়িয়ে একটা নিই। ধরিয়ে দুটান দিতেই মাথাটা ঝিম করে ওঠে। বুলি মারা গেছে। আমি এখন বুলিকে দেখতে যাব। সাবাস অলি। যাও, সুইসাইড খাওয়া বন্ধুকে দেখতে যাও।

আমি নেশাখোরের ভঙ্গিতে ভেসপা স্টার্ট দিই।

বুলিদের বাড়ির সামনে এসে দেখি ম্যালা লোকজন। গেটের কাছে একটা পাঁচটনি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। ট্রাকে করে বুলিকে গোরস্থানে নেওয়া হবে। বুলি সুইসাইড করেছে। কি দুঃখ ছিল বুলির?

ন্যাংটো বয়স থেকে এক সঙ্গে বড় হয়েছি আমরা। বুলি আমার কতদিনের বন্ধু। বুলির সব কথাই আমি জানি। বুলির কোনো দুঃখ ছিল না।

থাকলে আমি নিশ্চয় জানতাম।

তাহলে ?

বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখি থম ধরে আছে সব লোকজন। দোতলার রেলিংয়ে সার ধরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। আমি কি এক পলক সেদিকেও তাকাই! মিমিকে খুঁজি!

ঘরের ভেতর বুলির মা চিৎকার করে কাঁদছিল। গলা ভেঙে গেছে তার, কান্নার বদলে ফ্যাসফ্যাসে এক ধরনের আওয়াজ বেরোয়। বুলির বাবাকে দেখি বারান্দায় দুজনে ধরে রেখেছে। ভাইবোনগুলোকে কোথাও দেখি না। বুলি শুয়ে আছে উঠোনে। শাদা কাপড়ে শরীর ঢাকা। মাথার কাছে এক থোকা আগরবাতি জ্বলছে। দুজন মৌলভী সুর করে কোরাণ শরীফ পড়ছেন বুলির পাশে বসে। আতর লোবানের মিশ্র একটা গন্ধে ম ম করছে সারা বাড়ি।

হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে আমার। চোখ দুটো একটু টানছে। পেটের ভেতরটা গুলাচ্ছে। খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলে এমন হয় আমার। তাছাড়া খালি পেটে গাঁজা।

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে বুলির দিকে এগিয়ে যাই আমি। লোকজন কি সব আমার দিকে তাকিয়ে আছে এখন? ওপর থেকে মেয়েরা!

আমি খেয়াল করি না। বুলির মাথার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসি। বুলি, বুলি তুই মরে গেলি কেন? আমি টেরও পেলাম না! কি দুঃখ নিয়ে মরে গেলি দোস্ত? তোর কি বেঁচে থাকতে ভাল্লাগছিল না! আমাকে কখনো বলিসনি কেন?

আমার খুব কান্না পেতে থাকে।

মাথার কাছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কে একজন আর একজনকে বলে. নেশাভাঙ করে স্লিপিং পিল খেয়েছিল। কতগুলো খেয়েছে বুঝতে পারেনি। কথাটা শুনে আমার মাথার ভেতর চিন করে ওঠে। রক্ত লাফিয়ে ওঠে মাথায়। রাগে গা হাত পা নিসপিস করে। মরে গেলি কেন শালা!

ইচ্ছে করে টেনে তুলে দুটো ব্লো মারি মুখে। জিউগ্রাফি পাল্টে দিই শালার।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে নিজেকে কন্ট্রোলে রাখি।

সবাই কি তখন আমাকে দেখছে! আমি কি ফিলমের হিরোদের মত এ্যাকটিং করছি? বুঝতে পারি না। আস্তে করে বুলির মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিই। বুলি চোখ বুজে পড়ে আছে। দেখে মনে হয় হেভি টেনে পড়ে আছে। নেশার ঘুম। গায়ের রঙ এত ফর্সা হয়ে গিয়েছিল কবে

বুলির ? আমি তো দেখিনি !

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে বুলিকে দেখতে থাকি। খানিক পর বুঝতে পারি বুলি সুন্দর হয়নি। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। রক্তহীনতা। বুলি নিজের ওপর হেভি টর্চার করেছে। গাঁজা মদ খেয়ে জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে। কেন ? কি দুঃখ ছিল বুলির। বুলি কি নিজেকে ক্ষয় করার জন্যেই জন্মেছিল !

আমি আস্তে করে বুলির গালে একটা হাত রাখি। কি ঠাণ্ডা ! ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতন কেঁপে ওঠে হাতটা। তবুও সরাই না। মনে মনে বলি, বুলি তুই আমাকে মাফ করে দিস দোস্ত।

কেন যে বলি !

বুলির কাছে কি আমার কোনো অপরাধ জমে আছে !

তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলি। রাজা টোগরা এসে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। আড়ালে নিয়ে সিগারেট দেয়। ধরিয়ে টানতে থাকি।

খানিক পর কাউকে কিছু না বলে ভেসপাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। স্টার্ট দিতে যাব, রাজা বলল, কোথায় যাস ?

ঘুরে আসি।

যাবি না ?

কোথায় ?

আরে বুলিকে মাটি দিতে যাবি না ?

শুনে আমার যেন হুট করে মনে পড়ে, হ্যাঁ বুলি তো মরে গেছে ! বুলিকে তো মাটি দিতে হবে।

আমি ভারি গলায় বললাম, আমি যাব না।

বলিস কি, ওরা মাইণ্ড করবে না ?

বুলি নেই, ওদের মাইণ্ড করায় আমার কি এসে যায়। বুলি ছাড়া এ বাড়ির কারুর সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই।

কথাটা বলে আমি আবার কেঁদে ফেলি। তারপর কারুর দিকে না তাকিয়ে স্পিডে ভেসপা চালিয়ে দিই।

আমি এখন কোথায় যাব ? কার কাছে ?

সারাটা দুপুর ভেসপা দাবড়ে বেড়াই। গন্তব্য নেই। যে রাস্তায় ইচ্ছে ভেসপা চালিয়ে দিই। একের পর এক সিগারেট ধরাই। টানি। ভীষণ রোদ উঠেছে আজ। বাঘের মতন। রাস্তায় বেরুলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কে কেয়ার করে ওসব।

ইণ্টারকনের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, ইচ্ছে করে একটু ড্রিংক করি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। পেটে খিদে ছিল, ভুলে গেছি। গাঁজার নেশাটাও জমেনি।

ভেসপা রেখে বারে ঢুকি। এখন দুটো বিশ। আড়াইটায় বার বন্ধ হয়ে যাবে। বারে ঢুকেই ওয়েটার ডেকে দু গ্লাসে দু পেগ ব্ল্যাক লেবেলের অর্ডার দিই। তারপর সিগারেট ধরিয়ে আবার বুলির কথা ভাবতে থাকি। বুলি সুইসাইড করল কেন? সত্যি সুইসাইড না নেশার ঘোরে মৃত্যু! আমি যখন বুলির সামনে বসেছিলাম তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কে যেন কাকে বলছিল, নেশার ঘোরে স্লিপিং পিল খেয়েছিল বুলি। কতগুলো খেয়েছে কে জানে।

আমার মাথার ভেতরটা চিন চিন করে ওঠে। গাঁজা খেয়েও বুঝি ঘুম আসত না বুলির! স্লিপিং পিল খেত। প্যাকেট প্যাকেট সোনেরিল থাকত বুলির বালিশের তলায়। এক দুপুরে বুলির বাসায় ফ্লাশ খেলছিলাম, আমি রাজা টোগ আর বুলি। বুলির এক প্যাকেট জাপানী কার্ড ছিল। নুড মেয়ের ছবি ছাপা ঐ কার্ডের লোভেই আমরা খেলতে যেতাম। সেদিন বুলি দেখিয়েছিল বালিশের তলায় সোনেরিলের প্যাকেট। দুপুরবেলাই আমরা সবাই একটা একটা করে খেয়েছিলাম। বুলি সেদিন বলেছিল, তিন চারটা না খেলে ঘুম আসে না আমার।

একটা খেয়েই আমার টালমাটাল অবস্থা। অবাক হয়ে বললাম, বলিস কি?

হ্যাঁ। সারাদিন তো গাঁজা খাইই। তারপরও ঘুম আসে না। একটা দুটো বেজে যায়। ঘুম না আসার যে কি কষ্ট তোরা বুঝবি না দোস্ত।

এই কষ্ট সইতে না পেরেই কি বুলি মরে গেল!

ওয়েটার দুটো গ্লাস রেখে বলল, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে স্যার। আড়াইটায় বন্ধ হয়ে যাবে।

ঠিক আছে। বলে আমি দুটো গ্লাস ভরে পানি নিই। আর দু টুকর করে বরফ। তারপর দু মিনিটে গ্লাস ফাঁক।

ওয়েটার কি অবাক হয়ে আমাকে দেখে! আমি ড্যাম কেয়ার। বিল দিয়ে উঠে পড়ি। পেটের ভেতরটা বড় গুলায়। বমি বমি লাগে। ভেসপা চালাতে পারব তো! যদি কোনো এ্যাকসিডেণ্ট! ধ্যুৎ শালা, মরলে মরব। বুলিও তো মরে গেল, তাতে কার কি ক্ষতি হয়েছে!

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভেসপা স্টার্ট দিই। হাত দুটো একটু একটু কাঁপে। এখন কোথায় যাব? বাড়ি?

না, মা টের পেলে কান্নাকাটি করবে। অশান্তি। মাকে দুঃখ দিয়ে কি লাভ। মহিলা এমনিতেই খুব দুঃখি।

হঠাৎ করে মাথায় একটা প্ল্যান আসে। রাজুর ওখানে গেলে কেমন হয়। রাজু তো এসময় রুমেই থাকে। না থাকলেই বা কি! ওর চাবি কোথায় থাকে আমি জানি। রুম খুলে সোজা বিছানায় ডাইভ মারব। ঘুমুব। চোখ শালা খুব টানছে।

তিন মিনিটের মধ্যে সূর্যসেন হলে পেঁাছে যাই। মোটর সাইকেল রাখার নিয়ম ভেতরে। ঠেলে ওপরে তুলতে হয় খানিকটা। এখন পারব না, টায়ার্ড লাগছে। বাইরেই ভেসপা লক করে দোতলায় রাজুর রুমে চলে আসি। ভেসপা বাইরে রইল। চুরি টুরি হয়ে যেতে পারে। হলে হবে। আমি এখন এসব ভাবছি না।

কিন্তু রাজু রুমে নেই। দরজায় ছোট্ট বাবর তালা ঝুলছে। দেখে আমি ঘাবড়াই না। বাইরের দিকে দরজার মাথায় চার আঙুল চওড়া একটা স্টেজ আছে। রাজু ওখানে চাবি রেখে যায়। দুপেগ ডিলাক্স হুইস্কি এই কথাটা আমায় ভুলায়নি। একটু একটু টলছি। তবু হাত দিয়ে চাবিটা ঠিক পেয়ে যাই। তারপর তালা খুলে রুমে।

ভেতরে ঢুকে দরজাটা আটকাতে ভুলি না। এখন আমি ঘুমুব। ওই তো রাজুর বিছানা।

ডাইভ মেরে বিছানায় পড়ি। তারপর দেয়ালের দিকে তাকাই। দেয়ালে রাজুর মুখ আঁকা। ওর এক বন্ধু আছে হাবিব। আর্টিস্ট। মাল খেয়ে একদিন পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে রাজুকে এঁকেছিল। সেদিকে তাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে আমি বলি, রাজু বুলি মরে গেছে।

বিকেলবেলা দরোজায় ধাক্কা দিয়ে রাজু ডাকল, কে ভেতরে কে?

কবার ডেকেছে আমি জানি না। হঠাৎ ধরফর করে উঠে বসি। দরজা খুলে দিই।

আমাকে দেখে রাজু বলল, অলি তুই।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, কি হয়েছে দোস্ত?

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে রাজুকে দিই, নিজে নিই। ধরিয়ে টানতেই পেটের ভেতরটা গুলিয়ে ওঠে। মনে পড়ে, সারাদিন কিছু খাইনি।

রাজু বলল, কথা বলছিস না কেন?

তুই বুলিকে চিনতি ?

কোন বুলি ?

আমার বন্ধু।

না, কোথায় থাকে ?

আমাদের ওখানেই থাকত। বুলি কাল মারা গেছে।

এই কথাটা বলে আমি টের পাই বুলিকে নিয়ে আমার দুঃখটা খানিক কমে গেছে। আগের সেই কষ্টটা যেন বুকের ভেতর আর নেই। বাহ্। এইভাবে বুলিকে কি আমি একেবারেই ভুলে যাব একদিন ? কখনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে মনে পড়লে কারু কারু কাছে বুলির গল্প করব। বুলি এই ছিল, বুলি ওই ছিল।

রাজু বলল, কেমন করে ?

রাজুর গলায় কোনো উদ্বেগ নেই। যেন ফর্মালিটি ম্যানটেইন করার জন্য বলছে।

আমি বললাম, সুইসাইড।

বলিস কি !

হ্যাঁ। বুলি খুব গাঁজা খেত। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ইদানীং একেবারেই ঘুমুতে পারত না। সোনেরিল খেত তিনটে চারটে করে। কালরাতে গাঁজা খেয়ে লোড হয়েছিল। তার ওপর খেয়েছিল সোনেরিল। কটা খেয়েছিল কে জানে। সকালবেলা লাশ হয়ে গেল। কথাগুলো আমি বলছিলাম সিগারেট টানতে টানতে, আস্তে ধীরে, গলা ভারি করে। যেন দূর শৈশবের কোনো দুঃখময় ঘটনা কোনো দুর্বল মুহূর্তে বন্ধুর কাছে বলছি। কাল সন্ধ্যার বুলি আজ বিকেলের স্মৃতি হয়ে গেল। শালা মানুষের জীবন কি বোগাস !

রাজু কি ভাবছে কে জানে। আমি জিজ্ঞেস করি, সিরাজ সারোয়ার কই ?

মাসখানেক ধরে সিরাজ হাওয়া। সারোয়ার আছে ওর হলে।

সিরাজ আবার হাওয়া ?

হ্যাঁ ওতো এরকমই। দশদিনের বেশি এক জায়গায় থাকে না।

আমি সিগারেট টানতে টানতে রাজুর ঘরের ভেতরটা দেখি। ফ্লোরে ক্যাপস্টানের টুকরো আর ছাই জমে আছে। দুতিনটে খালি প্যাকেটও। রাজুর বিছানাটা কালাকুষ্টি হয়ে গেছে। দেখে ঘেন্না লাগে। এই বিছানায় শুয়েছিলাম !

টেবিলের ওপর একটা কেরুর জিনের বোতলে জল রাখা। দেখে আমার

পিপাসা পায়। ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা খেয়ে ফেলি। তারপর রাজুকে বলি, আজ তোর এখানে থাকব দোস্ত।

ও কে। এখন কোথায় যাচ্ছিস ?

কিছু খেয়ে আসি। সারাদিন কিছু খাইনি। তুই রুমেই থাকিস।

ঠিক হায়।

কিন্তু ভেসপা স্টার্ট দিতে গিয়ে আমি দিক ঠিক করতে পারি না, কোনদিকে যাব। একবার ভাবি নিউমার্কেটের দিকে যাই চিটাগাং হোটেল থেকে ভাত গোস খেয়ে আসি। কিন্তু ওই শালা লাল টুকটুকে তরকারির কথা মনে পড়তেই গা গুলিয়ে ওঠে। খাওয়া যাবে না।

তাহলে ?

মনে পড়ে শাহবাগে মৌলি আর সিনোরিটা আছে। স্নাকবার। চিকেন রোস্ট বন আর কোক খেলেই চলবে।

রোকেয়া হল ছাড়িয়ে সোজা এসে বাঁ দিকে ঘুরছি হঠাৎ করে দেখি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটের সামনে একটা সুন্দর বাস থামছে। তার পেট ফুড়ে লেখা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। দেখেই আমার বুকের ভেতর সোনা ব্যাঙের মতন টুক করে লাফিয়ে ওঠে হৃদপিণ্ডটা। মুহূর্তের জন্য। এই বাসে মিমি নেই তো ?

মুহূর্তে খাওয়ার কথা ভুলে যাই আমি। রাজুর রুমে ফিরে যাব, ভুলে যাই। বুলি মারা গেছে, ভুলে যাই। ভেসপা ঘুরিয়ে সোজা বাসটার পেছন এসে দাঁড়াই।

বাস থেকে প্রথমে দু তিনটে ছেলে নামে। তারপর একটা মেয়ে। জলপাই রঙের শাড়ি পরা, কাঁধে সুন্দর ফুল লতাপাতা আঁকা চটের ব্যাগ। মেয়েটার নামার ভঙ্গি দেখে আমার মনে হয়, এই মেয়ে হেঁটে গেলে মাটি টের পাবে না তার ওপর দিয়ে হাঁটছে কোনো মানুষ। মনে হবে কোনো হালকা সুন্দর পাখি হাঁটছে।

মেয়েটা বাস থেকে নেমে ফুটপাতে দাঁড়ায়। ডান হাত তুলে মুহূর্তের জন্যে ঘড়ি দেখে। তারপর উদাস হয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকায়। কি দেখে কে জানে।

বাসটা চলে যেতেই আমি ভেসপা নিয়ে মেয়েটার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াই। আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মেয়েটা আলতো করে আমার দিকে তাকায়। একটু যেন কেঁপে ওঠে। তারপর তাকিয়েই থাকে। অপলক।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এই মাত্র ঘুম ভেঙেছে মেয়ের। ঘুমের রেশ এখনো কাটেনি চোখের। কালরাতে দেখা স্বপ্নও কি রয়ে গেছে চোখে! মেয়ে, তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ কাল? কার স্বপ্ন?

আমিও ফ্রিজ হয়ে যাই। মনে হয় দৃশ্যটা বাস্তব নয়। স্বপ্ন। মিমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে! জলপাই রঙের শাড়ি পরা, কাঁধে সুন্দর ব্যাগ। এইমাত্র একটা বাস স্বর্গ থেকে মাটির পৃথিবীতে পেঁাছে দিয়ে গেল ওকে।

ছবির চেয়েও মিমি দেখতে অনেক বেশি সুন্দর। এত সুন্দর মেয়ে আমি কখনো দেখিনি। মুগ্ধ চোখে মিমিকে দেখতে থাকি আমি। ডান হাতে সুন্দর ঘড়ি পরা মিমি। কালো বেল্টের। ধবধবে শাদা হাতের ওপর ঘড়িটা কি যে অদ্ভুত লাগে। অন্য হাতটা একেবারে খালি। হালকা নরম কিছু লোম লেগে আছে। এই হাতটা দেখে আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে। শৈশবে এই রকম একটা হাত কি আমার দিকে সুন্দর এক বল ছুঁড়ে দিয়েছিল!

আমাকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মিমি তারপর লজ্জা পেয়ে যায়। একটা রিকশা ডেকে দ্রুত উঠে পড়ে। ভেসপায় বসে মিমির চলে যাওয়া দেখি আমি।

রিকশাটা খানিক দূরে গেছে, আমার মাথায় একটা প্ল্যান আসে। সঙ্গে গিয়ে মিমিদের বাড়িটা চিনে আসব।

মিমির রিকশার পেছনে শ্লোলি ভেসপা চালাই আমি।

মিমি কি টের পায় তাকে কেউ ফলো করছে। একবার পেছন ফিরে তাকায়। তারপর সেগুনে বাগিচা অব্দি আর একবারও তাকায় না। আমার খুব খিদে পেয়েছিল। এখন একেবারেই ভুলে গেছি। মাসখানেক ধরে, মিমি তোমাকে আমি খুঁজছি। আজ হঠাৎ পেয়ে তোমাকে আর হারিয়ে ফেলতে চাই না।

এই কথা ভেবে আমার মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যায়। মিমিকে আমি একমাস ধরে খুঁজছি, না সেই ছেলেবেলা থেকে! দূরে শৈশবের এক বিকেলে মিমি কি আয়ার হাত ধরে একবার আমার গেটের কাছে আসেনি! আমার ছুঁটে যাওয়া বল কুড়িয়ে নিয়ে আবার আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়নি! মিমির ছুঁড়ে দেয়া বল আমি সেদিন ধরতে পারিনি। সেই দুঃখ আমায় সারাজীবন তাড়া করছে। নো মার। মিমির ছুঁড়ে দেয়া বল এবার আমি ঠিক ধরে নেব। মিমি, তুমি আরেকবার বলটা ছোঁড়।

সেগুন বাগিচার একটা বাড়ির গেটে এসে নামে মিমি। এই রাস্তাটা দিয়ে

কতবার যে গেছি আমি! হায় এত কাছে তোমাকে রেখে সারা ঢাকা শহর চষে ফিরেছি আমি। মিমি, তুমি কেন এতদিন দেখা দাওনি? আমার কষ্ট বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে!

রিকশা ভাড়া দিয়ে মিমি এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর আমার দিকে তাকায়। চোখ নরম করে তাকিয়ে থাকে। ও কি ভেতরে ভেতরে একটু কাঁপছে! আমি ভেসপা চালিয়ে মিমির একেবারে পায়ের কাছে চলে আসি। কান পাতলে বোধহয় ওর হার্টবিটের শব্দও পাব তখন। মিমি একটু সরে যায়। কিছু বলবে, আমি তার আগেই মিমির চোখের ভেতর তাকিয়ে সুন্দর উচ্চারণে বলি, উই মাস্ট লাভ ওয়ান এনাদার অর ডাই।

মিমি

বিকেলবেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে বাস থেকে নেমেছি। ফেরার পথে ওখানেই নামি। আর সকালবেলা যাওয়ার সময় টি এস সির পূব দিকের গেট থেকে উঠি। আমাদের ইউনিভার্সিটির বাস কাছাকাছি এ দুটো জায়গায় থামে। ওখান থেকে সেগুন বাগিচা রিকশায় দেড় টাকা লাগে।

বিকেলবেলা ফেরার পথে রিকশা পেতে দেরি হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানটা পার্ক হয়ে গেছে। বিকেলবেলা রাজ্যের লোকজন বেড়াতে যায়। গেটের কাছে ভিড় লেগে থাকে। ভিড় দেখলে আমি খুব বিরক্ত হই। কিন্তু কি করা, ওখানেই তো নামতে হবে। রিকশা পেতে দেরি হলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে। এই অপেক্ষা জিনিসটি খুব বিরক্তিকর। আমি কখনো কারু জন্যে অপেক্ষা করতে পারি না। ছটফট করি। দশ মিনিট কেটে গেলে মনে হয় এক ঘণ্টা কেটে গেছে।

সকালবেলা বাসের জন্য পাঁচ দশমিনিট দাঁড়াতে হয়। কি যে খারাপ লাগে তখন! কিন্তু কি করব, দাঁড়াতে তো হবেই। ইউনিভার্সিটিতে তো যেতে হবেই।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়লে অবশ্য এই প্রবলেম হত না। অপেক্ষা টপেক্ষার বালাই থাকত না। রিকশা চড়ে সোজা ইউনিভার্সিটি আস আর ফিরে যাও। নো প্রবলেম।

কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে আমার ভাল লাগেনি। আমার চেনা অনেক ছেলেমেয়ে পড়ে ওখানে। ডিস্টারবেন্সটা বেড়ে যাবে। আমি

ওসব এভয়েড করতে চাই। কাঁহাতক আর ভাল লাগে। সেই ছেলেবেলা থেকে শুরু হয়েছে। আজকাল মাঝে মধ্যে নিজের ওপর নিজেরই রাগ ধরে। কেন যে এত সুন্দর হয়ে জন্মেছিলাম !

কালি হেঁদি পেঁচি একটা হলেই তো পারতাম ! ফিরেও তাকাত না কেউ। যেদিকে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও। কেউ তাকিয়ে দেখবে না, পাত্তা দেবে না।

বিকেলবেলাও ফুটপাতে খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হয়। ওই সময়টা খুবই বিরক্তিকর। আনইজি ফিল করি। আমাকে দেখলেই পৃথিবীর সব পুরুষের চোখ টাটায়। হা করে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে। বুড়ো ধুড়ো সব। বাচ্চা ছেলেরাও। কখনো মেয়েরা পর্যন্ত। আমি কারু দিকে তাকাই না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকি। মানুষের তাকাতাকি বিচ্ছিরি লাগে আমার।

ক্লাসের ছেলেরা আমার নাম দিয়েছে ড্রিমগার্ল।

বোম্বের একজন নায়িকা আছে, হেমামালিনী। ওকে সবাই ড্রিমগার্ল বলে। আমি কি হেমামালিনীর মত দেখতে ! একদিন স্টার এণ্ড স্টাইল পত্রিকায় ছাপা হেমামালিনীর একটা ছবির পাশে নিজের একটা ছবি রেখে দেখেছিলাম দুজনে আকাশ পাতাল পার্থক্য। কই আগরতলা কই চৌকিরতলা ! হেমামালিনী কি সুন্দর, মাগো দম বন্ধ হয়ে আসে দেখলে। মানুষ এত সুন্দর হতে পারে !

আমি যে কি বোকা, হেমামালিনীর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে গিয়েছিলাম !

তারপর থেকে ক্লাসের ছেলেরা কেউ আমায় দেখে যদি বলে ড্রিমগার্ল আমার ইচ্ছে করে বলি, অমন করে বলবে না ! হেমামালিনীর সঙ্গে আমার তুলনা হয় !

বলি না। ছেলেগুলো তাহলে লাই পেয়ে যাবে। বাঁদররা লাই পেলে মাথায় ওঠে।

কথাটা আমার মায়ের। ছেলেবেলায় মার মুখে শুনেছি। মা মরে গেছে বার তের বছর হয়ে গেল। আজকাল মার চেহারাটা ইচ্ছে করলেও আমি আর মনে করতে পারি না। ঘরে মার কোনো ছবি নেই। মা যে আমায় কি ভালবাসত ! মানুষ মানুষকে এত ভালবাসতে পারে ! শুধু আমাকে নয়, ভাইয়াকেও।

আমার ছেলেবেলায়, ভাইয়া তখন বেশ বড়। কলেজে পড়ে। একবার বাড়ির কাউকে কিছু না বলে দুদিনের জন্যে কোথায় চলে গিয়েছিল ভাইয়া। সেই দুটো দিন পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছিল মা। কান্নাকাটি করে থানা হাসপাতালে খুঁজে আমাদের সব আত্মীয় স্বজন ডেকে এনে কেলেংকারী।

দুদিন পর ভাইয়া ফিরে এল। অত বড় ছেলেকে পাগলের মত মারল মা। তারপর জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। এই ধরনের কান্নাকেই বোধহয় কান্না বলে। রাতেরবেলা খাওয়ার টেবিলে বসে বাবা হেসে বলল, তোর মার কি অবস্থা বাদল। তোর ফিরতে আর কদিন দেরি হলে ওকে ঠিক পাবনা পাঠাতে হত।

দিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিকেলবেলার সুন্দর আকাশের দিকে তাকিয়ে মার কথা ভাবছিলাম আমি। এক সময় দেখি আমার একেবারে গা ঘেঁষে একটা মোটর সাইকেল, এই জিনিশটাকে বোধহয় ভেসপা বলে, আকাশি রঙের, সুন্দর দেখতে, এসে দাঁড়িয়েছে। ভেসপায় বসে আছে একজন। তেইশ চব্বিশ বছর হবে বয়স। মুখে মাসখানেকের দাঁড়ি গোঁফ। স্বাস্থ্যটা বেশ। বাঁ হাতে শাদা সুন্দর চেন পরা। নীল জিনসের শার্টের বুকের কাছে স্টিকার লাগান, তাতে লেখা আছে লাভ। ছেলেটা সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। মাগো কি চোখ, ধারাল ছুরির মতন। আমি এক পলক তাকিয়েই চমকে উঠি। মনে হয় চোখ দুটো আমার বুকের ভেতর গেঁথে গেছে। এমন তীক্ষ্ণ চোখ কারু দেখিনি আমি। বুকের ভেতর কাঁপন ধরে যায়। একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ি। লাকটা বেশ ফেবার করে। ডাকতেই রিকশা পেয়ে যাই। সুন্দরী মেয়েদের এই এক সুবিধে। ডাকলেই ইয়াং রিকশাঅলারা অন্য লোকজন রেখে আগে এদের তুলে নেয়।

রিকশায় বসা লোকেরাও চান্স পেলে আমার দিকে তাকায়। মিনিটে মিনিটে বাসায় টেলিফোন আসে। প্রতিদিন চিঠি আসে চারটা পাঁচটা। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন থেকে। আমি যখন এইট নাইনের ছাত্রী তখন থেকে সকালবেলা, স্কুলে যাওয়ার পথে আমার ভক্তদের আনাগোনা শুরু হত। আমি বাড়ি থেকে বেরুতাম নটার দিকে। ওরা বোধহয় ঘুম থেকে উঠেই, ছটা সাতটার দিকে চলে আসত। ফিটফাট ড্রেস পরা একেকজন। স্কুল কলেজের ছাত্রই বেশির ভাগ। দুএকজন ছিল মস্তান টাইপের, বেকার। রংবাজি করে বেড়াত শহরময়। আমি বাড়ি থেকে বেরুতে দেরি করলে ওরা আমাদের বাড়ির আশেপাশে চক্কর খেত। দুএকজনের সাইকেল ছিল। আমাদের বাড়ির কাছে চক্কর খেতে খেতে চিরিং চিরিং করে বেল বাজাত তারা। আমি হয়ত তখন বাথরুমে কিংবা ড্রেসিং টেবিলে। গোসল করছি কিংবা স্কুল ড্রেস পরে মাথা আঁচড়াচ্ছি নয়তো মুখে স্নো পাউডার মাখছি। দুএকটা শিসও বেজে উঠতো তখন। বুঝতে পারতাম সবই আমার উদ্দেশ্যে।

ওরা যেন সাইকেলের বেল কিংবা শিস বাজিয়ে বলছে, মিমি আর কত কষ্ট দেবে আমাদের ! একবার দেখা দাও।

আমি রাজরানীর মত আস্তে ধীরে বাড়ি থেকে বেরুই। গর্বে মাটিতে আমার পা পড়ে না। রাস্তায় বেরুতেই চারদিকের পৃথিবীতে স্তব্ধতা নেমে আসত। ভক্তরা সব যে যেখানে থাকত সেখানেই ফ্রিজ হয়ে যেত। তারপর সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। আমি কখনো কারু দিকে তাকাতাম না। আমাকে দেখেই খুশি হয়ে চলে যেত ওরা। আবার দেখা হবে বিকেলে। স্কুল থেকে ফেরার পথে। তখনো সেই একই দৃশ্য। চারদিকে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরছি আমি। গর্বে বুক ভরে থাকত। সত্যি আমি খুব সুন্দর।

তখন থেকেই বাসায় প্রচুর চিঠিপত্র আসতে থাকে আমার। বাবা ভাইয়া এ সব নিয়ে মাথা ঘামত না। কেবল রোববার ঘণ্টা খানেক ধরে বাবা আমাকে মেয়েমানুষের জীবন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তুলত। সুন্দরী মেয়েদের বিপদ পদে পদে। তোমার মা নেই, থাকলে তিনিই এসব বলতেন। এখন আমাকেই বলতে হচ্ছে সব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবার কথায় আমি আরো সাবধান হয়ে যেতাম। স্কুলে যাই, ফিরে আসি। কখনো কারু দিকে চোখ তুলে তাকাই না।

সেই বয়সে আমার সঙ্গে পড়ে এমন দু একজন মেয়ে প্রেম ট্রেম করে বেড়াত। স্কুল পালিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত, সিনেমা দেখতে যেত। দুএকজন আবার সেই বয়সেই প্রেমিক বদলে টদলে নিত। অনেক মেয়েকে দেখেছি আজ এর সঙ্গে কাল ওর সঙ্গে। যখন ক্লাস টেনে পড়ি, আমাদের সঙ্গে পড়ে শিউলি, প্রেগন্যান্ট হয়ে গিয়েছিল। মাগো কি লজ্জা, কি লজ্জা !

শিউলি স্কুল ছেড়ে দিল। শিউলির সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি আমার। শিউলি কি সেই বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলেছিল, না এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। যে ছেলেটার সঙ্গে শিউলি ওসব করেছিল সেই ছেলেটার সঙ্গেই কি ওর বিয়ে হয়েছে ! না হলে খুব দুঃখের কথা। একজনকে দেয়া শরীর আর একজনকে দেবে কেমন করে। লজ্জা করবে না ! পাপ হবে না ! মেয়েদের এই সব নষ্টামির নামই তো পাপ, নাকি ?

শিউলির ব্যাপারটা আমাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। মাগো ওরকম হলে আমি মরেই যেতাম।

তখন থেকেই আমার সাবধানতা বেড়ে গিয়েছিল। নিজেকে নিয়ে, নিজের

শরীর নিয়ে আমি একটু একটু ভয় পেতে থাকি। তখন থেকেই।

এর কিছুকাল পর আমাদের এক বছরের জুনিয়র একটা মেয়ে স্বপ্না, স্কুল থেকে একদিন হাওয়া হয়ে যায়। ওর বাবা এসে হেড মিস্ট্রেসকে খুব একচোট গালাগাল করল। বড়পাকে সেদিন দেখেছিলাম মাথা নিচু করে তাঁর রুমে মেয়েটার বাবার সামনে বসে আছে।

ওই ক্লাশের মেয়েগুলোর মুখে শুনেছিলাম একটা ছেলের সঙ্গে মেয়েটার লাইন ছিল। দারোয়ানকে পয়সা টয়সা দিয়ে টিফিন আওয়ারে প্রায়ই বেরিয়ে যেত। একদিন গেছে আর ফিরে আসেনি।

স্বপ্নার কথাও আমার মাঝে মধ্যে মনে পড়ে। স্বপ্না কি এখনো সেই ছেলেটার সঙ্গে আছে। কথাটা ভাবতেই বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে আমার। মেয়েমানুষের জীবন তো একজন পুরুষের জন্যেই। একটি শরীর একটি মেয়ে কজন পুরুষকে দেবে! কেমন করে দেবে। এর কিছুকাল পর আমার জীবনেও ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটে যায়। পাড়ার একটা মাস্তান ছেলে, নাম টিপু, বছর দুএক ধরে আমার পেছনে খুব ঘুরছিল। স্কুলে যাওয়ার পথে, ফেরার পথে ছেলেটা রোজ আমার পিছু পিছু থাকত। অন্যান্য ছেলেরা ওকে খুব জমা খরচ দিত। টিপুর ভয়ে আমার আশা ছেড়ে দিয়েছিল অনেকে। মাস ছয়েক পর দেখি টিপু ছাড়া আর কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। আসতে যেতে কেবল টিপু। আমার ভক্তরা তখন আমার দুএকজন ক্লাশমেটের সঙ্গে লাইন টাইন করে নিয়েছে। কেউ কেউ করেছে অন্য ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে। কারু আবার হয়নি। তারা অন্যত্র চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এসব দেখে আমার ভালই লাগত। যাক, বাঁচা গেছে।

কিন্তু টিপু তো রয়ে গেছে, টিপুকে কাটাই কেমন করে! টিপুর যা হাবভাব দেখছি, সে নাছোড়বান্দা। আমাকে ছায়ার মতন ফলো করে। স্কুলে ছুটির পর থেকে আমাদের বাড়ির পাশে ঘুরঘুর করে। আমি খবর পাই। দুএকদিন ছাদে উঠলে দেখি। বুকের ভেতরটা কাঁপে। টিপুকে আমি কাটাব কেমন করে! ছেলেটাকে কি আমি ভালবেসে ফেলব! তারপর একদিন বিয়ে।

না। টিপুর মতন একটা ছেলের সঙ্গে সারাজীবন থাকা যাবে না। বাবা ভাইয়া রাজিও হবে না। টিপুকে কি আমি সরাসরি বলে দেব!

কিন্তু আমি তো কখনো বাইরের কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলিনি। শুধু একবার আমার খালাত বোনের বিয়েতে তার বরপক্ষের দুটো ছেলের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ফর্মালিটি। নয়তো ওরা মাইন্ড করত। সেই কথা বলার

ফাঁকেই দেখেছিলাম ছেলে দুটো কেমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পরে খালাতো বোনের কাছে প্রপোজ করেছিল একজন। রাজি থাকলে আমাকে সে বিয়ে করবে। আমি পাত্তা দিইনি।

সেই ছেলেটাকে আমি আর কখনো দেখিনি।

কিন্তু টিপুকে কিছু বলতে হবে। ব্যাপার খুব গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। ততদিনে বাসায় আমার এই অবস্থা, আমার নামে চিঠিপত্র এলে সোজা চুলোয় যায়, টেলিফোন এলে আমায় কেউ ডেকে দেয় না। আমিই মানা করে দিয়েছি। তবু টিপুকে কিছু বলতে হবে। টিপু আমায় ছাড়ছে না।

পরদিন স্কুলে যাচ্ছি, টিপু আমার পেছনে। আমি এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ি। টিপুও দাঁড়ায়, তবে সামান্য দূরে। সামনে আসে না। আমি একবার চারদিকে তাকিয়ে হাত ইসারায় টিপুকে ডাকি। টিপু অন্য দিকে তাকিয়েছিল। প্রথম বার আমার হাত ইসাবা দেখে না।

দ্বিতীয় বার দেখেই পাগলের মত ছুটে আসে। কি ?

তুমি আমার পেছনে ঘুরছ কেন ?

কথাটা এত সরাসরি, শুনে টিপু একদম থতমত খেয়ে যায়। এত সরাসরি আমি কিছু বলব টিপু ভাবেনি। অন্যদিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর বলল, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।

কিন্তু তোমাকে যে আমার ভাল লাগে না।

এতদিন ঘুরিয়ে এই কথা বললে ?

তোমাকে তো আমি ঘুরাইনি।

তাহলে কে ঘুরিয়েছে ?

তুমি নিজেই ঘুরেছ।

তুমি তাহলে আরো আগে বলনি কেন ?

ভেবেছি ঘুরে ঘুরে তুমি নিজেই একদিন সরে যাবে।

আমি কোনো কিছুর পেছনে লাগলে সেটা না দেখে ছাড়ি না।

কিন্তু আমার পেছনে ঘুরে তোমার কোনো লাভ নেই। তুমি যা ভাবছ তা কখনো হবে না।

টিপু হঠাৎ করে আমার একটা হাত ধরে ফেলল। মিমি, আমি মাস্তানি ছেড়ে দেব, আমি ভাল হয়ে যাব।

আমার তখন সেন্সলেস হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। এরকম একটা ছেলে আমার হাত ধরল।

ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিই। রাগে দুঃখে চোখে জল এসে গেছে। টিপুকে আর একটা কথাও বলি না। স্কুলেও যাই না। বাড়ি ফিরে আসি।

মনে আছে বাড়ি ফিরেই সোজা বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিলাম। সাবান দিয়ে ডলে ডলে টিপু যে হাতটা ধরেছিল সেই হাতটা ধুয়ে ফেলি। তারপর সারাদিন শুয়ে শুয়ে কেঁদেছিলাম।

বিকেলবেলা বাবা আর ভাইয়া বাড়ি ফিরে আমাকে দেখে অস্থির। কাঁদতে কাঁদতে মুখ চোখ ফুলে গেছে। ভাবী সারাদিনে অন্তত পঞ্চাশবার আমাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করেছে। খাওয়ার জন্য কত রকমের যে মিনতি করেছে। আমি শুনিনি।

আমার মা নেই, ভাবী মায়ের মত। আদরও করে আমাকে। সাংঘাতিক। কতবার যে জিজ্ঞাসা করেছে, মিমি তোর কি হয়েছে আমাকে বল। আমি কথা বলিনি। শুধু কেঁদেছি।

বিকেলে বাবা আর ভাইয়া আমাকে টেনে নিল খাওয়ার টেবিলে। বাবার কথা আমি কখনো অমান্য করি না। কিন্তু টেবিলে বসেও আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম।

বাবা জিজ্ঞেস করল, মামণি, কি হয়েছে আমাকে বল ?

ভাইয়া বলল, কে কি বলেছে আমাকে বল ?

ভাইয়া খুব বদ মেজাজী। টিপুর কথা বললে এক্ষুণি ছুটে যাবে। ওসব ফালতু রুস্তম ভাইয়া কেয়ার করে না। পাড়ার সব ছোটখাট মাস্তানরা ভাইয়াকে জমা খরচ দেয়। দিনে যতবার দেখা হবে, হাত তুলে সালাম দেবে। বয়সকালে ভাইয়াও বোধহয় টপ রংবাজ ছিল। এসব ভেবে টিপুর কথাটা আমি চেপে যাই। বাবাকে বলি, আমি আর স্কুলে যাব না।

কেন, কে কি বলেছে ?

কেউ কিছু বলেনি। অনেকে আমাকে ডিস্টার্ব করে।

ভাইয়া বলল, অনেকেটা কে ?

আমি কি সবার নাম জানি !

আমার এস এস সি পরীক্ষার খুব বেশিদিন বাকি ছিল না। এসময় স্কুলে না যাওয়া বাজে ব্যাপার। তবুও অনেক দিন যাইনি আমি। পনের বিশদিন পর, স্কুলে যাওয়ার পথে টিপুকে আর দেখিনি। কিছুদিন পরে শুনি, আমার পিছু ছাড়ার পর টিপু খুব ডেয়ারিং হয়ে যায়। আজ এখানে মারপিট, কাল ওখানে। তারপর একদিন গুম হয়ে গেল। খোঁজ খোঁজ। পাঁচদিন পর টিপুর

লাশ পাওয়া গেল এয়ারপোর্টের ওদিককার এক পুকুরে। হাত পা বাঁধা। ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। খবরটা শুনে রাতেরবেলা আমি আর ঘুমুতে পারিনি। বারবার মনে হয়েছে আমার কারণে ছেলেটা মারা গেল। টিপু আমাকে বলেছিল, মিমি আমি মস্তানি ছেড়ে দেব। আমি পাত্তা দিইনি। আমি যদি টিপুকে বলতাম, টিপু তোমাকেও আমার ভাল লাগে, তাহলে কি টিপু সত্যি সত্যি মাস্তানি ছেড়ে দিত! ভাল হয়ে যেত!

সারাটা রাত আমি কেঁদেছিলাম।

টিপুর কথা সময়ে অসময়ে এখনো মনে পড়ে আমার। বুকের ভেতরটা চমকায়। টিপু কি আমার জন্যেই মরে গেল!

বড় অপরাধী লাগে!

কিন্তু আমার কি করার ছিল। টিপুকে যে আমার ভাল লাগত না!

রিকশায় বসে হঠাৎ পেছন দিকে তাকাই। ভেসপার শব্দ পাচ্ছিলাম। তাকিয়েই চমকে উঠি। ছেলেটা খুব শ্লোলি ভেসপা চালিয়ে আমার পেছন পেছন আসছে। কি চায় ও? অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কেন?

বুকের ভেতরটা কাঁপে। টিপুর কথা মনে পড়ে। বহুকাল পর আর একজন টিপু কি আমার পিছু নিল?

বাড়ির কাছে এসে রিকশা থেকে নামি, দেখি ভেসপা নিয়ে ছেলেটা খানিক দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। অতটাদূর থেকেই অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখ দুটো কি তীক্ষ্ণ, মাগো। তাকালে বুকের খুব ভেতরে মৃদু একটা কাঁপন লাগে।

আমি আড়চোখে ছেলেটাকে দেখি। দেখতে বেশ। লম্বা পাঁচফুট ইঞ্চি তিনেক বেশি। ফিগারটা সুন্দর। ফর্সা মুখটা দাঁড়ি গোঁফে বিচ্ছিরি হয়ে আছে।

আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাব, ছেলেটা সাঁ করে ভেসপা নিয়ে এল আমার একেবারে পায়ের কাছে। লাফ দিতে যাব, শুনি গোলাম মুস্তাফার মত ভরাট সুন্দর গলায় সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলছে, উই মাস্ট লাভ ওয়ান এনাদার অর ডাই।

শুনে আমার বুকের ভেতরটা সিরসির করে। ছেলেটা ভেসপা চালিয়ে গলির মোড়ে হারিয়ে যায়। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে থাকি। গেট পেরিয়ে বাড়ি ঢুকব, ভুলে যাই। কেন যে এমন হয়।

রাতেরবেলা কিছুতেই ঘুম আসে না আমার।

আমি থাকি বাবার রুমের পাশে। আমাদের বাড়িটা অনেক কালের পুরনো একতলা। সামনে শাদা উঠোন, তারপর চারধাপ সিঁড়ি। পুরনো আমলের বাড়িগুলো উঠোন থেকে অনেক উঁচু হয়। আমাদের বাড়িটা ওই রকম। বিশাল বিশাল পাঁচটা রুম। রান্নাঘর আর বাথরুমও ছোটখাটো এক একটা রুমের মত। মাথার ওপর কাঠের সার ধরা বিম।

পুরনো আমলের বাড়িটায় জন্ম বলে, বসবাস বলে, আমার মনটাও কি খানিকটা পুরনো ধাঁচের রয়ে গেছে।

কি জানি!

আমি কখনো খুব উগ্র ড্রেস পরতে পারি না! উগ্র পারফিউম ইউজ করতে পারি না। উগ্র মেকাপও নিই না। চুল বেণী করে রাখি। ভাবী এই নিয়ে কত হাসাহাসি করে। তুই ইউনিভার্সিটিতে পড়িস, অন্যান্য মেয়েদের দেখিস না!

ভাবী খুব মর্ডান মেয়ে। ভাবীর ভাইবোনগুলো সব হিপ্পিদের মত চলাফেরা করে। একটা বোন আছে, ধাড়ি মাগি, ম্যালা ছেলে বন্ধু তার। রেগুলার শার্ট প্যান্ট পরে। দেখে আমার খুব ঘেন্না লাগে। ভাবীও মাঝে মধ্যে যা সাজে না! দেখে আমার মাথা ঘুরে যায়। কোনো বিয়ে টিয়েতে গেলে ভাবীকে একেবারে ছুকরিদের মত দেখায়। কচি খুকিটির মত সেজে যায়। দেখে বিশ্বাসই হয় না ভাবীর বিয়ে হয়েছে আট বছর। একটা মেয়ে আছে, টুই, সামনের ডিসেম্বরে পাঁচ বছরে পড়বে।

গতবার ভাইয়ার এক বন্ধুর বিয়েতে গেছে, একটা ছেলে ভাবীর পেছনে লাগল। একটা দুটো কথা বলে জমানোর চেষ্টা করল ভাবীর সঙ্গে। দেখে ভাবী মনে মনে খুব হাসে। ছেলেটাকে খানিকটা নাচানোর ইচ্ছে হয়। একটা দুটো নরম কথা বলে ছেলেটার মাথা ঘুরিয়ে দিলে পর ছেলেটা বলল, আপনি খুব সুন্দর।

ভাবী বলল, কিন্তু ওতো বলে আমি দেখতে খুব বিচ্ছিরি।

শুনে চমকে ওঠে ছেলেটা, ও কে?

আমার হাজবেন্ড। চেনেন না? ওই তো, বলে ভিড়ের মধ্যে থেকে ভাইয়াকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেয়। আ ছেলেটার তখন যা অবস্থা না, দেখার মত।

পরে গল্পটা আমাকে বলতে বলতে ভাবী হেসে কুটিপাটি।

আমি বললাম, তোমার এসব করা উচিত না ভাবী।

উচিত না কি রে! নাচিয়ে দেখলাম একটু! ছেলে নাচানো খুব মজা।

অত নাচানো ভাল না।

ভাবী হেসে বলল, তোর মত সুন্দর হলে দেখতি সারা ঢাকার শহর আমি নাচিয়ে বেড়াচ্ছি।

ভাবীর এ কথায় আমার আবার টিপুর কথা মনে পড়েছিল।

টিপুকে কি আমি নাচিয়েছিলাম। তাল সামলাতে না পেরে টিপু কি অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। সেই দুঃখে মরে গেল!

আমার চালচলন, ড্রেসফেস আর সাজগোজ নিয়ে ভাবী কত কথা যে বলে। আমার ভাল্লাগে না। আমাকে আমার মত চলতে দাও।

কলেজে পড়ার সময় ভাবী একবার নিজের পয়সায় আমাকে কিছু ড্রেস বানিয়ে দিয়েছিল। ম্যাক্সি শার্ট প্যাণ্ট পাঞ্জাবী পাজামা। পরে আমার যে কি লজ্জা, কি লজ্জা! এসব পরে লোকের সামনে যাব কেমন করে! হাসবে না!

আমার সব বন্ধুই শার্ট প্যাণ্ট পরে, পাঞ্জাবী পরে, ছেলেদের মতন চুল ছাটায়। দু একজন সিগারেটও খায়। ঘেন্নায় বাঁচি না আমি। মেয়েগুলো সব ছেলে হয়ে যাচ্ছে। ছি।

কলেজে পড়ার সময় থেকেই শাড়ি পরি আমি। গলায় পাতলা একটা চেন। বেণী বাঁধা চুল। বন্ধুরা আমায় খুব ক্ষেপাত। তোর মতন সুন্দর হলে আমরা যে কি করতাম না।

ভাবীর দেয়া ড্রেসগুলো একদিনও পরিনি আমি। এই নিয়ে ভাবীর যে কি রাগ! মাসখানেক আমার সঙ্গে কথাই বলেনি। পরে আমি একদিন ভাবীকে জড়িয়ে ধরে বললাম, তুমি রাগ কর কেন ভাবী! ওগুলো তো আমি টুইর জন্য রেখে দিয়েছি। টুই বড় হয়ে পরবে।

এই কথাটা বলার সময় আমার মায়ের কথা মনে পড়েছিল। মা তার সব সুন্দর জিনিশ আমার জন্যে সাজিয়ে রেখেছিল। আমি বড় হয়ে পরব, হায়, আমার বড় হওয়া দেখল না মা।

মার রেখে দেয়া জিনিশগুলো ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের ভেতর। ড্রেসিং টেবিলটা পুরনো আমলের। বিশাল একটা আলমারির মতন দেখতে। দুদিকে উঁচু উঁচু ড্রয়ার, মাঝখানে আয়না বসান। চারদিকের কাঠের ওপর ফুল লতাপাতা আঁকা। ড্রেসিং টেবিলটা এখন আমার ঘরে। উঁচু একটা কুশন আছে সামনে। ওটায় বসে মাথা আঁচড়াই আমি, সাজি। কত কথা যে মনে পড়ে তখন! ড্রয়ারের ভেতর থরে বিথরে সাজান মার সব শাড়ি ব্লাউজ ছায়া। একটা লাল টুকটুকে কাশ্মিরী শাল। শীতকালে ঐ শালটা গায়ে দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাই

আমি। মার একটা গাঢ় নীল রঙের জর্জেট আছে। শাড়িটা আমার যা ভাল্লাগে না! যত্ন করে পরি মাঝে মধ্যে। মার গয়নাগুলো সব বাবার কাছে। তার আলমারিতে। মোটা মোটা দুটো বালা অনেকগুলো চুড়ি তিনটে চারটে হার টিকলি কানের সুন্দর দুল সাত আট জোড়া। এখন ওসব গয়না কেউ পরে না। ভাবী আমাকে বলেছিল, ভেঙে ইচ্ছে মতন বানিয়ে নে মিমি।

আমি রাজি হইনি।

মরে যাওয়ার কদিন আগে শাড়ি গয়না সব বের করেছিল মা। মার একটা অভ্যেস ছিল, প্রায়ই আলমারি খুলে, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে জিনিশপত্র সব বের করে রোদে দিত। সেদিনও বের করেছিল।

আমি বললাম, মা তুমি এসব সাজিয়ে রাখ কেন? পর না?

মা বলেছিল, আমার কি পরার বয়স আছে রে! এগুলো তোর, সব তুই পরবি। তোর জন্যেই সাজিয়ে রাখি।

তারপর একটু থেমে বলেছিল, বিয়ের দিন এগুলো সব তোকে পরিয়ে দেব।

সেদিন থেকে আমি বিয়ের কথা ভাবতে শিখি।

কত বয়স হবে আমার তখন! কোন ক্লাশে পড়ি!

মনে নেই।

মার একটা পুরনো আমলের ঘড়ি ছিল। ছোট্ট, কালো বেল্টের। খেলনা ঘড়ির মত দেখতে। আমি সেটা পরতাম। দেখে ভাবীর কি রাগ! এক বিকেলে ভাইয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বড় ডায়ালের একটা ঘড়ি কিনে আনল আমার জন্যে। আমার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, দেখতো কেমন হয়েছে!

ঘড়িটা দেখতে বেশ। সোনালি ডায়ালের। এ রকম ঘড়ি ছেলেরা পরে, মেয়েরাও। এটাই ফ্যাশান আজকাল। আমার ভাল্লাগে না। কি ভারি। এটা বয়ে বেড়াতে আমার হাত ব্যথা করবে না!

কথাটা বলায় ভাবী হাসল। তুই কি মেয়ে হলি রে?

ভাবীর গালাগালের ভয়ে ঘড়িটা পরি আমি। না পরলে ভাবী গালাগাল করবে, তারপর থাকবে গাল ফুলিয়ে। আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে বেচারীর খুব ভাল লাগে। তাকে দুঃখ দিয়ে কি লাভ!

এসব ভাবছি মাথার ওপর চিঁ চিঁ আওয়াজ হয়। শুনে চমকে উঠি। বিমের সঙ্গে চড়ুই বাসা বেঁধেছে। সারাদিন ফুরুৎ ফুরুৎ আসে যায়। ঘর নষ্ট করে ফেলে। পুরনো বাড়িতে চড়ুই বাসা বাঁধবেই। বাবা কাজের ছেলেটাকে বলেছিল যে যে ঘরে চড়ুইয়ের বাসা আছে, ভেঙে দে। ভাবীর ঘর ড্রয়িংরুম আর

বাবার ঘর থেকে তিনটে বাসা ভাঙল ছেলেটা। একটা বাসায় দুটো ডিম ছিল, পড়ে ভেঙে গেল। দেখে আমার যে কি কষ্ট হয়েছিল। ছেলেটা আমার ঘরে এলে বললাম, ভাঙবি না।

আমার ঘরের চড়ুই দুটো সবে বাচ্চা দিয়েছে। আহা এসময় বাসা ভেঙে দেয়া! আমার খুব কষ্ট হবে। ভাঙতে দিই না। রাতেরবেলা শুয়ে শুয়ে বাচ্চাগুলোর চিঁ চিঁ শুনি। কি যে ভাল লাগে! দিনেরবেলা কখনো চড়ুই দুটো ঝগড়া করে, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। মুহূর্তে ঝগড়া মুহূর্তেই ভাব। সুন্দর ঘর সংসার করে পাখি দুটো।

ঘর সংসারের কথা ভাবতেই অনেক দিনের দেখা পুরনো একটা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। স্বপ্নটা আমি প্রায়ই দেখি। গাঢ় সবুজ রঙের একটা বনভূমি। চারিদিকে অজস্র গাছপালা, তাতে ফুটে আছে রঙ বেরঙের হাজারো ফুল। পাখি ডাকে, ফুলের গন্ধে বাতাস ম ম করে। সেই বনভূমির ভেতর দিয়ে একজন পুরুষ মানুষের হাত ধরে আমি ছুটছি। মানুষটার মাথা ভর্তি কোকড়া চুল, লম্বা, আর কি সুন্দর যে গায়ের রঙ! মানুষটার মুখ আমি দেখতে পাই না।

স্বপ্নটার কথা মনে পড়তেই চমকে উঠি আমি। বুকের ভেতরটা সির সির করে ওঠে। উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসি। ঘরের ভেতর মৃদু ডিম লাইট জ্বলছে। সবুজ রঙের। সবুজ আমার প্রিয় রঙ। এই মুহূর্তে আরো প্রিয় লাগে। বিকেলে দেখা ছেলেটার সঙ্গে আমার স্বপ্নে দেখা মানুষটার কোথায় যেন একটা মিল। কোথায় যেন! তাহলে একেই কি আমি সারাজীবন ধরে স্বপ্নের ভেতর দেখে আসছি!

বুকের ভেতরটা কাঁপে।

বিকেলবেলা ছেলেটা আমায় ফলো করে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল। চলে যাওয়ার আগে ভেসপা নিয়ে সিনেমার নায়কদের মত আমার একেবারে গায়ের কাছে এসে বলল, উই মাস্ট লাভ ওয়ান এনাদার অর ডাই।

ভয়েসটা কি সুন্দর। একেবারে গোলাম মুস্তফার মতন। একবার একটা রেডিও নাটকে মুস্তফা কি একটা ইংরেজি কবিতার লাইন আওড়েছিলেন, হুবহু ওরকম শুনতে। আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। ফ্রিজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ছেলেটা ভেসপা চালিয়ে চলে যায়।

তারপর থেকে কেমন যে লাগছে! অসম্ভব একটা উত্তেজনা। যখন তখন বুকের ভেতর সির সির করে। খেতে ভাল্লাগে না। টেবিলে বই খাতা নাড়াচড়া করি, পড়তে ভাল্লাগে না। দশটার দিকে শুয়ে পড়ি, ঘুম আসে না।

ছেলেটা আমার দিকে অমন করে তাকিয়েছিল কেন? ওকে দেখে আমি কি একটু কেঁপে উঠেছিলাম। কেন?

অস্থির লাগে। এ আমার কি হল। সারাজীবন ধরে তো কত ছেলে আমার পিছু নিল। কাউকে দেখে তো আমার এমন লাগেনি! কাউকে দেখে তো কখনো কেঁপে উঠিনি আমি!

তাহলে কি ওকে আমি

ওই কি একদিন ওরকম একটা বনভূমির ভেতর দিয়ে

পাগল পাগল লাগে। ঘুম আসে না, রাত কেটে যায়।

সকালবেলা ভাবী বলল, কি রে রাতেরবেলা ঘুমুসনি, মুখটা অত শুকনো কেন?

আমি কথা বলি না। হাসি।

মুখটা খসখসে হয়ে আছে। রাতেরবেলা একটুও ঘুমুইনি। কত কি যে ভেবেছি! এখন একটু একটু মাথা ধরছে। বাথরুমে গিয়ে চোখ মুখে জল দিয়ে আসি। এখনো সূর্য উঠেনি। কটা বাজে?

আমাদের বাড়িতে খুব সকালবেলাই বিছানা ছাড়ার নিয়ম। রিটায়ার করার পর বাবা রেগুলার মর্নিং ওয়াকে বেরোন। টুই যায় স্কুলে। ভাবী সকালবেলা উঠেই খাবার দাবার রেডি করে। টুইর, আমার।

আমি বেরুই সাতটায়। সাড়ে সাতটায় বাস। টি এস সির পূর্বদিকের গেট থেকে আমি একাই চড়ি।

আমার জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি হওয়া নিয়ে বাবা আর ভাইয়া এখনো কথা বলে। কি দরকার ছিল অত দূরে ভর্তি হওয়ার।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি ভর্তি হইনি ইচ্ছে করে। চেনা জানা ছেলে অনেক। ডিস্টার্ব করবে খুব। আমার ভক্তরা বেশির ভাগই তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বাগে পেয়ে আমাকে জ্বালাতে ছাড়বে না। তাছাড়া লাভলির সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগরে বেড়াতে গিয়ে জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগে যায়।

ভাবী বলল, আজ ইউনিভার্সিটি যাসনে। গোসল টোসল করে নাস্তা খা, তারপর শুয়ে পর।

আমারও আজ ইচ্ছে করছে না যেতে। মাথাটা ধরে আছে। শুয়ে শুয়ে ঘুমুব।

হঠাৎ মনে পড়ে সে যদি সকালবেলাও আমার জন্যে আসে! কিংবা

বিকেলবেলা ! বিকেলবেলা তো আসবেই। ওর চোখের দিকে তাকিয়েই আমি কাল বুঝতে পেরেছিলাম, ও আসবেই ! ওকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

গোসল করতে করতে ডিসিসান নিই, যাব। ওকে আজ ভাল করে দেখতে হবে।

আমি বাথরুমেও কখনো পুরো কাপড় খুলতে পারি না। বাথরুমে বড় একটা আয়না আছে। পুরো শরীর দেখা যায়। শাড়ি বদলানোর সময় ফাঁক ফোকড় দিয়ে আয়নায় শরীরের গোপন অংশ দেখে ফেললে লজ্জায় আমি আর বাঁচি না। বন্ধুদের মুখে শুনি ওরা অনেকেই বাথরুমে পুরোপুরি খুলে গোসল করে। অনেকে রাতেরবেলা শোয়ও কাপড় টাপড় খুলে। ছি।

অনেককাল পর ড্রয়ার খুলে মার একটা পুরনো শাড়ি বের করি আমি। গাঢ় নীল রঙের জর্জেট। শাড়িটা আমার খুব প্রিয় ! পরে ড্রেসিং টেবিলে বসি। মুখে একটু পাউডার মাখি। চুলে বেণী করি না। আঁচড়ে রাবার বেন্ড দিয়ে গোছা করে আটকে রাখি। তারপর বহুকাল পর শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে কপালে একটা গোল টিপ পরি। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে খাওয়ার টেবিলে যাই। ভাইয়া এখনো ওঠেনি। বেলা করে ওঠে বলে এই বয়সেও প্রায়ই বাবার গাল খায়।

বাবা এখনো মর্নিং ওয়াক সেরে ফেরেনি ! কাজের ছেলেটার সঙ্গে টুই স্কুলে চলে গেছে। ভাবীটা আমার দারুণ। একেবারে মায়ের মত আদর করে আমাকে। আমার সব আদর আবদার ভাবীর কাছে ! ভাবীর যে কোন জিনিশ অবলীলায় ব্যবহার করি আমি।

ভাবী বলল, শরীর খারাপ, আজ না গেলেও পারতি !

আমি চেয়ারে বসতে বসতে বলি, একটা ইমপরটেন্ট ক্লাস আছে।

ভাবী খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে আমার দিকে তাকায়। তারপর হেসে ফেলে। তোকে আজ দারুণ লাগছে রে ! অত সেজেছিস কেন ?

তারপর চোখ টিপে বলে, কারু সঙ্গে দেখা করবি নাকি ?

কি যে বল ?

তোর জন্যে ইঞ্জিনিয়ারটা তো খুব ঘুরছে। তোর ভাইয়া কাল বাবার সঙ্গে আলাপ করছিল।

বলে কি লোকটা ?

তোকে সে বিয়ে করবেই।

ওরকম মেন্দা মার্কা লোক আমি বিয়ে করলে তো !

তো কাকে করবি ? পছন্দ আছে কেউ !

শুনে লজ্জায় লাল হয়ে যাই আমি। চোখ পাকিয়ে বলি, ভাবী।

ভাবী হেসে ফেলে।

আমি খেতে খেতে বলি, কেউ থাকলে তুমি তো জানতেই।

ভাবী কথা না বলে চলে যায়।

আমি তখন ইঞ্জিনিয়ারটার কথা ভাবছি। ভাইয়ার অফিসে চাকরি করে লোকটা। ইঞ্জিনিয়াররা দেখতে যেমন হয়, তেমনই। পাতলা, বিশ্রি ফর্সা গায়ের রঙ। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। রেগুলার স্যুট পরে থাকে। ওরকম পুরুষ আমার একদম ভাল্লাগে না। খাওয়া সেরে উঠেছি, ভাবী পেছন থেকে এসে স্প্রে করে প্রচুর সেণ্ট ছড়িয়ে দিল গায়ে।

কি সুন্দর গন্ধ!

ভাবী সব সময় ক্যাসেট ইউজ করে।

আমি অবাক হয়ে বলি, করছো কি?

এত সুন্দর সাজের সঙ্গে সেণ্ট না হলে কি মানায়!

ভাবী হাসতে থাকে।

আমি মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরুই। গেটের কাছে দাঁড়িয়েছি, রিকশা ডাকবো। দেখি বাবা।

বাবা খুব হেঁটেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে তার। আমি বাবার দিকে তাকিয়ে থাকি, তখুনি একটা খালি রিকশা আসে। আমি কথা বলার আগেই বাবা বলল, এই রিকশা যাবে?

টি এস সির সামনে এসে দেখি, সাতটা পঁচিশ বাজে। পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে হবে। অপেক্ষা করতে আমার খারাপ লাগে। আজ লাগছে না। সে যদি আসে!

কথাটা ভেবেছি হঠাৎ দেখি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে ভেসপা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে। দেখেই চমকে উঠি আমি। বুকের ভিতরটা মৃদু কাঁপে। একটু হাসিও পায়। যেখানে বিকেলে বাস থামে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে সে। ভেবেছে সকালেও বুঝি বাস ওখানেই থামে।

আমি মনে মনে বলি, তুমি ভুল করেছ। ওখানে নয়, এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সেই ফাঁকে, নিজের অজান্তে আমি ওকে কি মনে মনে ডাকি। কাছে এস, কাছে এস!

ও কি আমার কথা শুনতে পায়!

ভেসপা চালিয়ে এক মিনিটের মধ্যে কাছে চলে আসে। এক পা মাটিতে রেখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমিও তাকাই। ওর চোখ দুটো ফোলা ফোলা। মুখটাও। কাল রাতে খুব ঘুমিয়েছে নাকি! আর আমি একটুও ঘুমুতে পারিনি!

কথাটা ভেবে আমার এক ধরনের অভিমান হয়। আমাকে জাগিয়ে রেখে নিজে বেশ ঘুমিয়েছে।

ইচ্ছে করে ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই। পারি না। কি অদ্ভুত চোখ ওর! কি তীক্ষ্ন দৃষ্টি। চোখ দিয়ে যেন হিপনোটাইজ করে ফেলে।

আমি তাকিয়ে আছি ও ও তাকিয়ে আছে। ও কি আমাকে কিছু বলবে। ওর ঠোঁটটা একটু কেঁপে উঠল না!

আমি মনে মনে বলি, বল, আমি তোমার সব কথা শুনব।

ঠিক তখুনি বাস এল। আমি থতমত খেয়ে বাসে উঠতে যাব, শুনি ও বলছে, উই মাস্ট লাভ ওয়ান এনাদার অর ডাই।

চমকে ফিরে তাকাই। বাস ছেড়ে দেয়।

আমাকে দেখেই বাসের ভেতর মৃদু গুঞ্জন ওঠে। হেমামালিনী এসে গেছে ধরনের। আমি গা করি না। জানালার পাশে বসি। বসে বাইরে তাকিয়ে থাকি। দেখি ভেসপা চালিয়ে বাসের সঙ্গে সঙ্গে আসছে ও। আমার জানালার একেবারে কাছে ওর ভেসপা। ইচ্ছা করলে আমি ওকে ছুঁয়ে দিতে পারি, কিংবা ও পারে আমাকে। ভেসপায় বসা ওকে দেখতে কি সুন্দর লাগে! সিনেমায় দেখা নায়কদের মতন। নায়িকাকে ফলো করছে।

আমি যখন ওর দিকে তাকিয়ে তখন আমার ঠিক পেছনের সিটের একটা ছেলে আরেকটাকে বলল, ইকবালের বোধহয় ফাঁসি হয়ে যাবে রে?

অন্য একজন বলল, কোন ইকবাল?

মেটসারভেন্টের জন্য ওয়াইফকে যে কচু কাটা করল।

ওই মেটসারভেন্টটা নাকি হেমামালিনীর মত দেখতে।

শুনে আমার গা জ্বলে যায়। পিন মারছে। এখন লাভলি থাকলে ঠিক জবাবটা দিয়ে দিত।

আমি কখনো কারু কথার জবাব দিই না। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কত কি যে বলে যায় ছেলেগুলো। আমি কিন্তু ওসব কথা শুনেও কোনোদিকে তাকাই

না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি।

বাইরে তখন চকচক করছে রোদ। আজকালকার রোদ খুব তীব্র হয়। মা বলত শাওনের ঝরা ভাদ্দরের খরা। কথাটা আমার মনে পড়ে। এই রোদে ভেসপা চালাচ্ছে ও, অসুখ বিসুখ করলে! আমার ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে বলি, বাড়ি ফিরে যাও। আমার জন্যে এত কষ্ট করতে হবে না।

কথাটা ভেবে নিজে নিজেই লজ্জা পেয়ে যাই। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি! ছি। বাসের ছেলেরা যদি ব্যাপারটা কেউ বুঝে ফেলে তাহলে টিটকিরি মেরে আমাকে আর ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যেতে দেবে না। তার আগেই মেরে ফেলবে। এই ভয়ে জানালা থেকে মুখ সরিয়ে আনি।

সোবাহানবাগের মোড়ে আসতেই লাভলি ওঠে। সঙ্গে আর দুটো মেয়ে।

ওদের দেখে আমি বেশ সাহসী হয়ে উঠি। এখন কথা বলে ছেলেগুলো আর সুবিধা করতে পারবে না। লাভলি খুব ডেয়ারিং টাইপের মেয়ে। বাজে কথা বললে তেড়ে মারতে যাবে। লাভলি হাসতে হাসতে আমার পাশে বসে। কেমন আছিস মিমি?

ভাল।

রোজই লাভলি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করে, কেমন আছিস। আমি বলি, ভাল। অভ্যেস হয়ে গেছে।

কিন্তু আজ লাভলি পাশে বসতেই চমকে উঠি আমি। লাভলি যদি বারবার আমাকে দেখে বাইরে তাকাচ্ছি তাহলেও ও তাকাবে। দু মিনিটে বুঝে যাবে ব্যাপারটা। হয়েছে তাহলে। মাডার হয়ে যাব।

আমি জোর করে বাইরে তাকানোটা বন্ধ রাখি।

লাভলি মাসখানেক আগে আমাকে একদিন বলল, মিমি আমাদের গ্রুপ ছবিটা বড়পার এক ছেলে বন্ধুকে দিয়েছি দেখতে। তেরটি মেয়ের মধ্য থেকে তোকেই পছন্দ করল সে। বলল, এত সুন্দর মেয়ে আমি জীবনেও দেখিনি। পাগল হয়ে গেলাম।

শুনে আমি গ্রাহ্য করিনি। সুন্দর কথাটা পুরনো হয়ে গেছে। এত বেশি শুনেছি, আজকাল বিচ্ছিরি লাগে। এই কথাটা মেয়েদের খুব বিয়াক্ট করে শুনেছি, আমার করে না। ডিপার্টম্যান্টের একজন ইয়াং টিচারও তো চান্স পেলে সুন্দর বলে আমাকে। কাইকুই করতে চায়। চান্স দিই না। পুরুষমানুষ এমন হবে কেন? সুন্দর মেয়ে দেখলেই নেড়ি কুত্তার মত ছোক-ছোক করবে!

ও ও কি আমাকে সুন্দর বলবে! নাকি সুন্দর কথাটাই ঘুরিয়ে আরো সুন্দর করে বলবে!

ওর কথা ভাবতেই চমকে রাস্তার দিকে তাকাই। ও কি এখনো আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে! জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত যাবে।

না, রাস্তায় ভেসপা নেই।

খানিক পর আবার তাকাই। না, নেই। তারপর আবার। না।

লাভলি বলল, কি দেখছিস রে?

আমি অবলীলায় বললাম, কিছু না।

লাভলি হঠাৎ বলল, তোকে আজ খুব সুন্দর লাগছে মিমি?

তাই?

হু। ছোকরা মাস্টারটার আজ মাথা ঘুরে যাবে। বলে লাভলি খুব হাসে। আমিও।

একটা ছেলে তখন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে আর একটা ছেলেকে বলছে, সারেং বউতে কবরী কেমন দেখাল রে?

ভালই তো।

কোন দৃশ্যটা সবচে ভাল বলত?

ফারুককে যখন দুধ খাওয়ায়।

কারেক্ট।

ছেলেগুলো হো হো করে হাসতে থাকে। শুনে লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে ওঠে।

লাভলি সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে তাকিয়ে বলে, দুধট কবরী খাওয়ায়নি গাধা, হাতে আঁকা একটা ছবিতে মা তার বাচ্চাকে খাইয়েছিল।

ছেলেটা আমাদের চেনা। গোপনে ওকে আমরা মাগি বলি। অবিকল মেয়েলী ঢঙে কথা বলে! ঝুলে ঝুলে মেয়েদের মতন অঙ্গভঙ্গি করে। ওকে নিয়ে রেগুলার হাসাহাসি করি আমরা।

লাভলির কথা শুনে ছেলেটা বলল, ওই ছেমড়ি তরে কইছিনি?

ছি কী ইতর ভাষা। তবু এই ভাষা শুনে সবাই হাসে।

লাভলি মুখ খুলতে যাবে, আমি বলি, কি শুরু করলি লাভলি।

লাভলি চোখ টিপে বলল, দাঁড়া না জমাই একটু।

তুই তাহলে ওদের সঙ্গে গিয়ে বোস। আমার পাশে বসে এসব করতে পারবি না।

এ কথায় লাভলি চুপ করে বসে। তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকলে রাস্তাটা দ্রুত ফুরিয়ে যায়।

আমি কথা বলি না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি।

আমাদের বাস তখন মিরপুর ব্রিজ পেরিয়ে যাচ্ছে।

বিকেলবেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে নেমেছি, দেখি ও দাঁড়িয়ে আছে। শাদা কাজ করা পাঞ্জাবী আর কালো প্যান্ট পরা। আমাকে দেখেই চমকে ওঠে। তারপর স্পষ্ট দেখি দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তার মানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। ওকে এখন সকালের চেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে। আমি সব ভুলে তাকিয়ে থাকি। আর কি আশ্চর্য তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই প্রথম সবুজ বনভূমির স্বপ্নটা জেগে জেগেই দেখতে পাই। একজন আমার হাত ধরে সুন্দর একটা বনভূমির ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। এবং এই প্রথম মানুষটাকে চিনতেও পারি আমি। ভেসপায় বসা এই যুবকটিই তো!

তখুনি আমার বলতে ইচ্ছে করে, তোমাকে আমি কতদিন স্বপ্ন দেখেছি।

বলা হয় না।

একটা রিকশা পেয়ে চড়ে বসি।

রিকশা চলছে, দেখি ভেসপাটাও চলছে রিকশার পেছন পেছন। আমি বারবার ঘুরে তাকাই। ওকে দেখি।

তারপর থেকে কি যে হয়ে যায় আমার। কিছু ভাল্লাগে না। না খেতে না পড়তে না শুতে। রাতেরবেলা কেবল ওই স্বপ্নটা দেখি। একটুও ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করি। পাগল পাগল লাগে। ঘুম আসে না, রাত কেটে যায়। বাথরুমে ঢুকে চোখ মুখে কতবার যে জল দিই! আর কেবল সকালের অপেক্ষায় থাকি। কখন সকাল হবে, কখন ওর সঙ্গে দেখা হবে!

সকালবেলা পাঁচটার দিকেই উঠে পড়ি। তখনো কেউ ওঠে না। না বাবা, না ভাবী। আমি উঠে চেয়ার নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসি।

একদিন সকালবেলা ভাবী ওভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বলল, কি রে এত সকালে উঠেছিস কেন?

ঘুম ভেঙে গেল।

তোর কি হয়েছে বলত ?

কি হবে !

কেমন যেন পাগল পাগল ! প্রেমে পড়েছিস নাকি ?

কি যে বল !

ইঞ্জিনিয়ারটার কথা ভাবিস নাতো ?

ধোৎ। মনে মনে বলি, কার কথা যে ভাবি, তুমি বুঝবে না।

ক্লাসে বসেও উদাস হয়ে থাকি। শুধু ওর কথা মনে পড়ে। কখন ক্লাস শেষ হবে, কখন ওর সঙ্গে দেখা হবে। ওর সঙ্গে দেখা না হলে মনটা ভীষণ অস্থির হয়ে যায়। পাগল পাগল লাগে। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

একদিন লাভলি বলল, তোর কি হয়েছে রে মিমি ?

কিছু না।

শরীর খারাপ ?

না।

মন খারাপ ?

ধোৎ। আমার রাগ লাগে।

এইভাবে দিন যায়। যেতে থাকে।

কিন্তু ও আমার সঙ্গে কথা বলছে না কেন ? পুরুষ মানুষেরই তো আগে বলার নিয়ম। দেখা হলেই আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করি, এই বুঝি কিছু বলবে।

বলে না। রাগে দুঃখে আমার কান্না পায়। আমি মেয়েমানুষ, আমি কি আগে কিছু বলতে পারি। ছি লজ্জায় মরে যাব না !

রাতেরবেলা বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদি। এ আমার কি হল ! কি হল !

একদিন রাতেরবেলা, বারটা একটার কম হবে না, শুনি ড্রয়িংরুমে টেলিফোন বাজছে। শুনে চমকে উঠি। এত রাতে আমাদের বাসায় কেউ কখনো টেলিফোন করে না। নিশ্চয়ই কোনো জরুরী ব্যাপার। ভাবী বাবা কিংবা অন্য কেউ উঠে হয়তো ধরবে। ধরে না। টেলিফোন বেজে যায়। সবাই গভীর ঘুমে। টেলিফোনের শব্দে কারু ঘুম ভাঙে না।

আমাদের বাড়িতে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ে সবাই। কেবল আমি, ওকে দেখার পর থেকে রাতেরবেলা আমার আজকাল একটুও ঘুম আসে না। কেবল ওর কথা ভাবি। ওর কথা ভাবি।

কিন্তু এত রাতে টেলিফোন করল কে ?

আমি উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরি। হ্যালো ?

ওপাশ থেকে সুন্দর ভরাট গলায় ভেসে আসে, উই মাস্ট লাভ ওয়ান এনাদার অর ডাই। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস।

আমি পাগলের মত বলি, কে কে ?

ওপাশে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ। সেই শব্দে আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে। টেলিফোন ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। অনেকক্ষণ। লাইট জ্বালাই নি। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। আমার কিছু খেয়াল থাকে না। ও আমাকে টেলিফোন করেছিল, কিন্তু কিছু বলল না। কেন, কেন!

রাগে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। টেলিফোন কানে লাগিয়েই কাঁদতে থাকি। আমরা অবশ্যই একে অন্যকে ভালবাসব, নয়তো মরে যাব! সত্যি সত্যি আমি মরে যাব।

ভালবাসার জন্যে মরে যাব।

পরদিন সকালবেলা ও আসে না। সারাটা দিন আমার একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে কাটে।

বিকেলবেলাও আসে না। রিকশা করে বাড়ি ফিরে আসি। কেমন যে লাগে! ইচ্ছে করে রিকশায় বসে চিৎকার করে কাঁদি! ভেবেছিলাম নিজেই আজ ওর সঙ্গে কথা বলব। যেচে। কথা আমাকে বলতেই হবে। উপায় নেই। আমার সব কথা ওকে বলব, নয়তো মরে যাব। ও আজ এল না কেন?

বাড়ি ফিরে আমি কিছু খেতে পারি না। দরজা বন্ধ করে সন্ধেবেলাই শুয়ে পড়ি। ভাবী কত রকমের যে প্রশ্ন করে! আমি সব এড়িয়ে যাই। বলি, শরীর ভাল লাগছে না।

কিন্তু শুয়ে থাকলে কি হবে, ঘুম কি আসে!

দশটার পর আমাদের বাড়িটা একেবারে নির্জন হয়ে যায়। ভাই ভাবী সব ঘুমিয়ে পড়ে। তখন আস্তে ধীরে উঠি আমি। বাথরুমে যাই। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চোখ মুখে ভাল করে জল দিই। তারপর চোরের মতন ড্রইংরুমে ঢুকে টেলিফোন তুলে আনি আমার ঘরে। কাল ও টেলিফোন করেছিল। আজও কি করবে না!

বিছানায় শুয়ে টেলিফোনটা রাখি মাথার কাছে। বিছানার ওপরই। তারপর পাঁচ মিনিট পর পর ঘড়ি দেখি। এগারটা এগারটা পাঁচ দশ পনের বিশ। সময় যায়। আমার বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা লাফাতে থাকে। আজ ও এল না কেন? এখনো টেলিফোন করছে না কেন? হায় আমি কেন যেচে ওর সঙ্গে

কথা বললাম না ! কেন এত লজ্জা আমার ! আজকাল তো সব মেয়েই নিজের ভাল লাগা মানুষকে এপ্রোচ করে। আমি কেন পারলাম না ! ওর কাছে আমার আবার লজ্জা কি ! ও যদি আমার সঙ্গে আর দেখা না করে, টেলিফোন না করে, তাহলে ওকে আমি কোথায় খুঁজব। ওর নামও তো জানি না আমি। হায় আমার কি হবে, কি হবে !

আমি কাঁদতে থাকি। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি। আমার কান্না কেউ দেখে না।

হঠাৎ কানের কাছে টেলিফোন বেজে ওঠে। শুনে আমার বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা এমন করে লাফিয়ে ওঠে যেন গলা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসবে। লাফিয়ে উঠে দুহাতে টেলিফোনটা প্রথমে বুকে তারপর কানে চেপে ধরি। ইচ্ছে করে টেলিফোনটার ওপর চুমু খাই। হ্যালো ?

ওপাশ থেকে ভেসে আসে, আমার নাম অলি চৌধুরী। বাবা হাসান চৌধুরী। আদি নিবাস বিক্রমপুরের পয়সা গ্রাম। বর্তমানে ধানমণ্ডি, সাত নাম্বার রোড।

আমি অত কিছু জানতে চাই না।

কি জানতে চাও ?

আপনি, আপনি

না। তুমি।

তুমি

আমি কমার্স গ্রাজুয়েট। হাইট পাচ ফুট সাড়ে ছয় ইঞ্চ, ওয়েট

না এসব না। তুমি, তুমি

আমি মা বাবার একমাত্র

না তাও না।

তাহলে ?

বুঝতে পারছ না।

ডব্লিও এইচ অডেন নামে একজন কবি ছিলেন, তিনি তোমাকে আমাকে নিয়ে সুন্দর একটা কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতায় একটি লাইন আছে, উই মাস্ট লাভ ওয়ান এনাদার অর ডাই

সত্যি ?

সত্যি।

এতদিন বলনি কেন ?

একটা ভয়, একটা লজ্জা।

পুরুষ মানুষের আবাব লজ্জা কি ?

তুমি যদি মুখের ওপর

না।

সত্যি ?

জান আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখি। গাঢ় সবুজ একটা বনভূমি

একদিন তোমার বুকে মাথা রেখে স্বপ্নটার কথা শুনবো।

কবে ?

দিন আসছে।

তুমি আমার কথা জানতে চাইছ না ?

তোমার মুখ, তোমার চোখ আমাকে সব বলে দিয়েছে।

তবু !

তোমার সব আমি জানি। তোমরা দুভাই বোন। মা নেই। বাবা রিটায়ার করেছেন। তোমার নাম মিমি।

এসব না।

তুমি জাহাঙ্গীরনগরে পড়। তেরটি মেয়ের সঙ্গে তোমার একটা গ্রুপ ফটো আছে।

এসব না।

তোমার জন্যে একটা ছেলে টিপু

ও কথা বল না।

একজন ইঞ্জিনিয়ার তোমার জন্যে

না। আমি তাকে

জানি।

আর কি জান ?

তোমার ডিপার্টমেন্টের একজন ইয়াং লেকচারার

না ওসব না।

তোমাদের টেলিফোন নাম্বার

ধ্যোৎ।

তুমি কখনো কাউকে ভালবাসনি।

সত্যি।

জানি।

আর ?

তুমি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলে যখন তখন ফুটে যাবে একশো একটা লাল গোলাপ। তুমি হেঁটে গেলে মাটি কক্ষণো টের পায় না।

আর?

তুমি শিশির-কণার মত পবিত্র কিংবা গোলাপ পাপড়ির মত

আর?

আমি তোমাকে

আমিও

দেখা হবে।

কবে!

হয়ে যাবে একদিন।

না, আমি মরে যাব। অপেক্ষা আমি সইতে পারি না।

আমিও।

আমার একদম ঘুম আসে না।

আমারও।

কাল আসবে?

দেখা যাক।

না, আসবে নয়তো আমি, আমি

আসব।

অলি কখন আসবে বলেনি। সকালে না বিকেলে! যখনই আসুক আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করব। যতক্ষণ ও না আসবে ততক্ষণ।

খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরুই আমি। ভাবী বলল, এত সকাল সকাল কোথায় যাচ্ছিস?

আজ ইউনিভার্সিটিতে নবীন বরণ।

মিথ্যে কথা। আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি না। আজ প্রথম। ওর জন্যে মিথ্যে কথা কি, প্রয়োজন হলে মরে যাব আমি।

সাড়ে ছটায় টি এস সির পূর্বদিকের গেটে এসে দাঁড়াই। এত সকালে এদিকে বুড়োরা ছাড়া আর কেউ আসে না। সফসটিকটেড বুড়োরা খুব স্বাস্থ্য সচেতন। মাঠে ময়দানে সকালবেলা খুব হাঁটাহাঁটি করে। বাবাও আসে। আজ কিন্তু বুড়ো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টায়ার্ড হয়ে যাই আমি। ও এখনো আসছে না কেন?

সাতটা বেজে যায়। তারপর সাড়ে সাতটা। বাস আসে, ও আসে না।

আমি মন খারাপ করে ইউনিভার্সিটি যাই। নিজের ওপর যে কি রাগ ধরে! কখন আসবে জিজ্ঞেস করিনি কেন! ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম! আমার যে অপেক্ষা করতে খারাপ লাগে, ভুলে গিয়েছিলাম!

ইউনিভার্সিটি গিয়ে আবার অপেক্ষা। কখন ছুটি হবে, কখন ফিরে যাব। কখন ওর সঙ্গে দেখা হবে! ভাল্লাগে না। স্যাররা কি পড়িয়ে যান কানে ঢোকে না। বসে বসে কানের ভেতর থেকে কেবল ওর কথা শুনি। আমার নাম অলি চৌধুরী।

আমি মনে মনে বলি, তুমি আমার। শুধু আমার।

ছুটির পর বাসে চড়তে যাব, হঠাৎ কি মনে করে বাগানে ঢুকি। খুঁজে-খুঁজে একটা বড় লাল গোলাপ ছিঁড়ে যত্ন করে ব্যাগে ভরে রাখি। ওকে দেব। সুন্দর একটা কিছু দিয়েই শুরু করব।

মনে মনে রিহার্সেল দেই। বলব, আমার ভালবাসার নিদর্শন।

ধ্যোৎ। কথাটা আমার পছন্দ হয় না। এভাবে কি কেউ বলে!

তাহলে কি বলব! কেমন করে শুরু করব। ফুল দিয়ে আমি বলব, আমাকে নাও।

বাস থেকে নেমে দেখি কেউ নেই। চারদিকে গিজগিজে লোকজন। শুধু ও নেই। ও কোথাও নেই। আমি পাগলের মত চারদিকে তাকাই। না ও নেই। আমাকে কথা দিয়ে ও এল না কেন। কেন এল না? তাহলে ও কি আমার সঙ্গে? না, আমি তাহলে পাগল হয়ে যাব। মরে যাব।

চোখে জল চলে আসে। একটা ফুল তুলেছিলাম ও নিতে এল না। কেন এল না?

ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ফুলটা বের করি। তারপর টেনে টেনে পাপড়িগুলো ছিঁড়ে চারদিকে রাস্তার ওপর ছড়িয়ে দিই।

রাতেরবেলা অপেক্ষা করি ফোন আসবে। আসে না। ছটফট করি, কাঁদি। ওর কি কোনো এ্যাকসিডেণ্ট। না, না। আমি তাহলে পাগল হয়ে যাব, আমি তাহলে মরে যাব।

পরদিনও ও আসে না। টেলিফোন করে না।

তারপর দিনও না।

আমার চোখের কোলে কালি পড়তে থাকে! স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যেতে থাকে। আমি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিই। এ আমার কি হল।

ভাবী তারপর থেকে দিনমান আমাকে জ্বালাতে শুরু করে। তোর কি হয়েছে আমাকে বল মিমি।

আমি মাথা নাড়ি। কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।

ভাবী তবু বলে। আমি রাগ করে ঘরে গিয়ে দরজা দিই।

ভাইয়া বলে, কি হয়েছে তোর ? কেউ কিছু বলেছে ?

না।

বাবা বলে, মামণি শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ?

আমি বলি, শরীর ভাল যাচ্ছে না বাবা।

ডাক্তারের কাছে যাও।

যাব।

বলি কিন্তু যাই না।

আমার এ রোগ সারাবে কোন ডাক্তার ?

ক্লাশে গেলে লাভলি প্রতিটা মুহূর্তে জ্বালায়। আমাকে বল, কি হয়েছে মিমি ? প্রেমে পড়েছিস ?

ধমকে লাভলিকে থামিয়ে দিই।

একদিন ইয়াং লেকচারারটা জিজ্ঞেস করে, মিমি তোমার কি শরীর খারাপ ?

শুনে আমার গা জ্বলে যায়। বলি, আমার শরীর খারাপ না ভাল তা নিয়ে আপনার অত মাথা ব্যথা কেন ?

শুনে লোকটা একদম থতমত খেয়ে যায়। দেখে আমি একটু লজ্জাও পাই। এভাবে বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু কি করব, আমার যে মাথা ঠিক নেই।

গভীর রাতে একদিন দরজায় মৃদু টুক টুক শব্দ হয়। অলি এল না তো ?

আবার ভাবি, কেমন করে আসবে। ঢাকায় রাত বারটার পর কারফিউ থাকে। তাছাড়া ওকি সাহস করে এতদূর এগুবে !

মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যায় ! উঠে দরজা খুলি ! না ও নয়, ভাবী।

ঘরে ঢুকে ভাবী আমার বিছানায় বসল। আলতো করে আমার মাথায় হাত রেখে বলল, কি হয়েছে আমাকে বল মিমি।

ভাবীর কথায় হঠাৎ করে আমার বুকের ভেতর কান্না ঠেলে ওঠে। দুহাতে ভাবীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠি। তারপর ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকি।

ভাবীও দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, পাগলামী করিস না ? আমাকে বল, কি হয়েছে।

আমি কাঁদতে কাঁদতে অলির কথা বলি।

সব শুনে ভাবী বলল, মরেছিস। এডড্রেসটা নিবি না!

আমি বললাম, ধানমন্ডি সাত নাম্বার রোড।

ওভাবে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাহলে আমি এখন কি করব ?

সে তোকে ভালবাসলে নিশ্চয়ই দেখা করবে।

করে না কেন ?

হয়ত কোনো অসুবিধা আছে। হয়ত জরুরী কোনো কাজে আটকা পড়েছে। কিংবা ঢাকার বাইরে কোথাও চলে গেছে!

তাই যেন হয়, তাই যেন হয়।

আমি আবার কাঁদতে থাকি।

দিন যায়।

যেতে থাকে।

অবশেষে একদিন টেলিফোন বেজে ওঠে। ঠিক এক মাস পর। রাত বারটায়। এই একটা মাস আমার যে কি অবস্থায় কেটেছে! চোখের কোলে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। মুখচোখ শুকনো খসখসে। প্রতিটা ব্লাউজ ঢিলে হয়ে গেছে। ভাবী না থাকলে না খেতে খেতে আমি বোধহয় মরেই যেতাম। জোর করে, বাচ্চা মেয়ের মতন ধরে ধরে ভাবী আমাকে খাইয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে একদিন ভাইয়া সেই ইঞ্জিনিয়ারটিকে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। আমাকে দেখাবে। শুনে ভাবী স্ট্রেট বলল, না মিমির এখন বিয়ে দেব না। এম এ পাশটা করুক।

শুনে আমার বুকের ওপর থেকে ভারী একটা পাথর নেমে যায়।

আমি টেলিফোন ধরে বললাম, হ্যালো।

আমি।

আমি কথা বলি না। কি যে এক অভিমান! অদৃশ্য থেকে কেউ যেন গলা চেপে রাখে।

মিমি, কথা বলবে না ?

আমি তবুও কথা বলি না।

টেলিফোন ছেড়ে দেব ?

একথায় আমি হু হু করে কেঁদে ফেলি। তুমি কি! তুমি কি!

অলি বলল, আমি পুরো দুটো মাস পাগলের মতন তোমার পিছু ঘুরেছি। মিমি তুমি জান না, কিছু চেয়ে না পাওয়ার কি দুঃখ!

তুমি কি আমাকে পাওনি ?

জানি না, আজকাল আমার খুব টায়ার্ড লাগে।

তুমি সেদিন এলে না কেন ?

মিমি, একটা লাল গোলাপের পাপড়ি

আমি তোমার জন্য একটা ফুল রেখেছিলাম। অলি আমি আর পারি না।

কৃষ্ণের জন্য রাধা সব পেরেছিল।

আমিও তোমার জন্য সব পারব।

সারাজীবন আমাকে না দেখে

না। তুমি আমাকে মেরে ফেল। তোমাকে না দেখার কষ্ট আমি সইতে পারি না।

দুমাস আমি যে কি যন্ত্রণা সয়েছি।

আমিও তো একমাস

তুমি আমার অর্ধেকও সইতে পারলে না ?

আমি পারি না।

ভালবাসার জন্যে অনেক সইতে হয়।

আমি সইব।

তাহলে আর একমাস

না না।

আমার সমান কষ্ট করবে না ?

আমি পারি না।

এই সব দুঃখ কষ্টের নামই তো ভালবাসা।

তোমার এড্রেস দাও।

কেন ?

আমি নিজেই যাব।

আমার মা আছেন, বাবা

তাতে কি।

তোমায় ভয় করবে না ?

মা কি আমায়

না। তোমাকে বুকে তুলে রাখবেন। মার বড় দুঃখ তার কোনো মেয়ে নেই।

আমি হব।

আমাদের ফ্যামিলিতে কখনো কারু মেয়ে হয় না। তুমি আমাকে একটা

মেয়ে দেবে মিমি !

দেব। তুমি আমাকে একটা ছেলে ?

দেব।

আজ সারারাত টেলিফোন ধরে রাখবে।

রাখব।

সত্যি ?

সত্যি।

তুমি যে আমার খোঁজ নিলে না, এতদিনে আমি যদি বদলে যেতাম।

অনেক অনেককাল দূরে থেকেও সোনালি বদলে যায়নি, ত্রিস্তান ছিল তার সারা বুক জুড়ে।

আমি সোনালি হব।

আমি ত্রিস্তান।

আমরা দুজন দুজনকে খুব ভালবাসব।

অলির এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর কেমন করে আমার ! গলা আটকে আসে। উইকনেস। টেলিফোন কানে ধরে চুপ করে থাকি। এতকাল কিছু হল না, এখন অলিকে পেয়ে মরে যাচ্ছি আমি ! হায় !

অলি বলল, মিমি।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি আসব ?

এই কথাটা শুনে আমি আবার আস্তে ধীরে ভাল হয়ে উঠি। এখন কেমন করে আসবে ? কটা বাজে জান ?

না।

চারটে।

বল কি ?

কারফিউ শেষ হতে একঘণ্টা বাকি।

আমরা তো খুব বেশি কথা বলিনি। এতটা সময় গেল কখন ?

ভালবাসা মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। মিমি, আমি আসছি।

তারপর কোথায় যাব আমরা ?

মায়ের কাছে।

এক ঘণ্টা অপেক্ষা করব কেমন করে ?

যেমন করে একমাস করেছ ?

দুঃখের স্মৃতি আর মনে করিয়ে দিও না।

মিমি আমি আসছি।

তোমার আসতে কতক্ষণ লাগবে ?

দশ মিনিট।

তাহলে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখ না !

আমার একটু কাজ আছে।

কি কাজ ?

এসে বলব।

পাঁচটা দশে গেটের কাছে একটা ভেসপার শব্দ এসে থামল। আমি রেডি হয়েছিলাম। মার সেই নীল জর্জেট পরে, জীবনে প্রথম আধঘণ্টা ধরে সেজেছি আমি। গলায় সরু সোনার চেন, হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি। আজকাল অনেক মেয়ে নূপুর পরে। ভাবী আমাকে দুটো কিনে দিয়েছিল। পরে ফেলি। শিশি খালি করে ইনটিমেট ছড়াই শাড়িতে। চুল বাঁধতে যাব, তখনই ভেসপার শব্দ। আমি চিরুণী ফেলে ছুটে বেরুই।

বাড়ির কেউ এখনো জাগেনি। ছোটার সময় নূপুরের শব্দ হয় রিনিঝিনি, রিনিঝিনি। সবাই বুঝি জেগে উঠল। উঠুক। আমি গ্রাহ্য করি না। ছুটে গিয়ে গেট খুলি।

এক পা মাটিতে রেখে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে ও। গেট খোলার শব্দ পেয়েই ফিরে তাকায়। দেখে আমি চমকে উঠি, এ কে ? এ তো অলি নয় !

ও বলল, প্রতিজ্ঞা ছিল তোমাকে না পাওয়া পর্যন্ত দাড়ি কাটব না। সেভ করে এলাম।

ও। আমি হেসে ফেলি। বুকের ওপর থেকে একটা পাথর নেমে যায়।

ভেসপা স্টার্ট দিয়ে অলি ডাকল, মিমি এস।

আমি লাফিয়ে পেছনে বসি। বসে দুহাতে অলিকে জড়িয়ে ধরি। এই প্রথম পুরুষমানুষ স্পর্শ। আ কি যে সুখের ! আবেশে চোখ বুজে আসে আমার।

ভেসপা চলতে থাকলে হাওয়ায় আমাদের দুজনেরই চুল ওড়ে। অলি খুব স্পিডে চালাচ্ছে। আমি ওকে জড়িয়ে, পিঠে মুখ গুজে রাখি। তখন আবার সেই স্বপ্ন। গাঢ় সবুজ রঙের একটা বনভূমি। গাছে গাছে ফুটে আছে ফুল। হাওয়ায় মৃদু গন্ধ। অলি আমার হাত ধরে সেই সুন্দর বনভূমির ভিতর দিয়ে ছুটছে। ছুটছে।

আমরা এখন কোথায় যাব ! স্বর্গে !

টানা পোড়েন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



মেয়েরা যখন রান্নাঘরে থাকে তখন পুরুষদের যে-কোনোও সময়েই বিপদ। রান্নাঘরটা স্বভাবতই একটু গরম জায়গা, একজস্ট ফ্যান লাগানো সত্বেও গরম। রাগী মহিলাদের পক্ষে রান্নাঘর মোটেই সুবিধের জায়গা নয়। তার ওপর কাল জামাইষষ্ঠী। আজই বুলা তার বরকে নিয়ে রাতের গাড়িতে এসে হাজির হবে। অর্চনাকে সুতরাং বিশাল আয়োজন করতে হচ্ছে। একটা বাচ্চা চাকর এবং একজন চব্বিশ ঘণ্টার ঝি-কাম-রাঁধুনী থাকা সত্বেও এই গরমে অর্চনাকে গোটা সন্ধেটাই পড়ে থাকতে হচ্ছে রান্নাঘরে। উনপঞ্চাশ বায়ু কুপিত হতে দোষ কী?

তার ওপর ঝুমা আজ গাছে জল দিতে ভুলে গেছে, সামনের ঘর ডাস্টিং করে নি, বাথরুমে যাওয়ার সময় ঘরের লাইট আর ফ্যানের সুইচ অফ করে নি, দুধ খায় নি, মার্কেটিং থেকে ফিরে এসে শাড়ি ভাঁজ করে রাখেনি এবং ইত্যাদি। আঠারো বছর বয়সের মেয়েরা যা যা ভুল করে থাকে আর কি। আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর সুকান্ত লিখে গেছে না। ওই বয়সের মেয়েদের মন কি ঘরমুখী থাকে কখনো? কত দিকে ছুট লাগায়, উধাও হয়ে যায়। কিন্তু ওই অত বড় মেয়ে যে মায়ের সাহায্যে আসে না, সারাদিন যে শুয়ে বসে বই পড়ে এবং টিভি দেখে সময় কাটায়, নিজের এঁটো চায়ের কাপটাও যে বেসিনে রেখে যেতে পারে না এসব সুবীরের চোখে ক্ষমার যোগ্য অপরাধ হলেও অর্চনার চোখে নয়।

আর ঝুমা অপরাধ করলে তার সিংহভাগ তার বাপ সুবীরের ওপরে কী করে যেন অর্শায়। আর ঠিক তখন ঝুমাকে উপলক্ষ করে সুবীরের ওপর অর্চনার শব্দভেদী আক্রমণ ক্রমে ক্রমে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের নানা বঞ্চনার ইতিহাস শাখা প্রশাখায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এবং এমনই মারাত্মক সব বিশেষণ ও ব্যাখ্যা থাকে যা সুবীরের কোনোও সম্ভাব্য জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করতে সাহস পাবে না।

অফিস থেকে ফিরে এই সময় সুবীর স্নান করে। নতুন বাড়ির নতুন বাথরুমে নতুন শাওয়ারের মুখ খুলে পিন-ফোটানো অজস্র জলবিন্দুতে সিক্ত হওয়ার যেমন আরাম আছে, তেমনি জলের শব্দে বাইরের আর সব শব্দ ডুবে যাচ্ছে সেটাও কম কথা নয়।

কিন্তু পুরোটাই যে ব্যর্থ হচ্ছে অর্চনার প্রয়াস তাও নয়। ভাষা বা অর্থ বোঝা না গেলেও অর্চনার কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম এবং উত্তাপ ফোয়ারার শব্দ ভেদ করে ঠিকই এসে বিদ্ধ করছিল সুবীরকে। চোখ বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে বাহান্ন

বছরের ঝুমা সুবীর ভাবছিল, অর্চনার বদলে নন্দিতা তার বউ হলে কি এর চেয়ে বেটার কিছু হতো ? কথাটা সে প্রায়ই ভাবে এবং ভেবে প'চিশ বছরেও প্রশ্নটার কোনোও সমাধানে আসতে পারে নি।

ঝুমা ঠিক এ সময়ে টি ভি খুলে বসে। রাত আটটায় কিছু একটা ভালো প্রোগ্রাম থাকবেই। কিন্তু আজ আর সাহস পায় নি। নিজের ঘরটিতে চুপ করে বই খুলে বসে আছে। পড়ছে না। ভাবছে। এ বাড়িটাকে তার কেমন যেন আজকাল আর আপন বলে মনে হয় না। বাবা মা কেউই যেন তেমন আপনার জন নয় তার। মা বকবে, সে তো ঠিক কথা। কিন্তু এত নিষ্ঠুরভাবে বকে, এত সব সাঙ্ঘাতিক কথা উচ্চারণ করে যে, ঝুমার বুকটা শুকিয়ে যায়। আজকাল তার কান্না পায় না ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন একটা জেদ, একটা কঠিন মনোভাব তাকে ভিতরে ভিতরে মায়াহীন করে তোলে। আর বাবা যে তাকে অত ভালবাসত সেও কি আর তেমন আছে ? কেমন যেন আনমনা, অন্যমনস্ক, নিজের চিন্তায় বিভোর। বাবা আর মায়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সবসময়েই লেগে আছে। এক এক সময়ে সেটা এত বিশ্রী চেহারা নেয়।

খাতা টেনে নিয়ে একটা সাদা পাতায় ঝুমা একটা সুইসাইড নোট লিখল। প্রায়ই লেখে। নতুন কিছু নয়। কী লিখবে, কিভাবে লিখবে তা বহুবার ভেবে দেখেছে সে। সে কি লিখবে "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়," না কি "মা ও বাবার জন্যই আমাকে মরতে হলো," না কি "আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না বলেই মৃত্যুকে ডেকে নিলাম," অথবা

আজ ঝুমা সাদা পাতাটায় একটিমাত্র শব্দ লিখল, "যাই।" তারপর চেয়ে রইল শব্দটার দিকে। বাঃ বেশ তো। ছোট্ট কিন্তু গভীর। পুলিশ হয়তো খুশি হবে না। কিন্তু তাতে তার কী ?

অবিনশ্বর অর্থাৎ অবুর জীবনে কোনোও সমস্যাই নেই। আর এই যে সমস্যা-হীনতা এইটিই তার সমস্যা। বাবা সুবীর ও মা অর্চনার দুই মেয়ের মাঝখানে সে। বলাই বাহুল্য একমাত্র ছেলে বলে তার আদর আর আসকারা একটু বেশীই হয়ে থাকবে। সুখাদ্যের শ্রেষ্ঠ অংশ, বেশী দামী জামাকাপড়, খেলনা, শখের জিনিস সে যত পেয়েছে তত আর কেউ নয়। বকা-ঝকা মারধর তার ভাগ্যেই সবচেয়ে কম জুটেছে। অত যে রাগী মা, যার ভয়ে সবাই তটস্থ, সেই মা অবধি তার সামনে একেবারে জল।

সমস্যা অবুর জীবনে নেই ঠিকই, তবে নন কমিউনিকেশন আছে। সে তার বাবা সুবীরকে একদম পছন্দ করতে পারছে না। মাঝে মাঝে একটু ব্যক্তিত্বের

সংঘর্ষ হচ্ছে আজকাল। তার বাবা সুবীরও যে তাকে একদম পছন্দ করে না এটা সে টের পায়। পছন্দ না করার কতগুলো কারণ আছে। এক হলো, অবু মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে দ্বিধা করে না। অবু তার বাবাকে দেবতা বলেও ভাবে না। সে এই সংসারে মায়ের চেয়ে বাবার গুরুত্বকে অধিক বলে স্বীকার করে না বছরখানেক আগে সুবীর ও অর্চনার মধ্যে দৈনন্দিন ঝগড়ার এক কুৎসিত পরিণতিতে সুবীর একটা কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছিল অর্চনাকে। অর্চনার হাত অনেকটা কেটে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়। অবু রাগ সামলাতে না পেরে তার বাবার হাত মুচড়ে প্রায় ভেঙে ফেলেছিল। সুবীর সামান্য মাতাল অবস্থায় ছিল বলে প্রতিরোধ করতে পারে নি। কিন্তু হাত নিয়ে দুজনেই ভুগেছিল। সেই থেকেই কি ছেলের প্রতি সুবীরের রাগ? কিন্তু লোকটার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বাড়িতে আরও একজন মানুষ সাবালকত্বে পা দিয়েছে, সে আর খোকাটি নেই, শক্তসমর্থ একজন পুরুষ, এবং তার নিজস্ব রুচি, ইচ্ছে এবং অনিচ্ছে, তার নিজস্ব রাগ ও প্রতিহিংসা জন্ম নিয়েছে। সে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

চাকরি পেলে অবু তার মাকে আলাদা করে নিজের কাছে নিয়ে রাখবে। মাকে যে সে ভীষণ ভালবাসে এমন নয়। কিন্তু এই মহিলার প্রতি তার কিছু পক্ষপাত আছে। তার জন্য মা যত করেছে, বাবা তত নয়।

অবু ছাত্র খারাপ নয়। মেক্যানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এ সে প্রথম শ্রেণী পাবে, এটা ধরেই নেওয়া যায়। চাকরির অভাব তার হবে না। আর হলেই এই পরিবারের সঙ্গে তার কাট।

আজ অবু তার স্কুটারে রত্নাকে নিয়ে এসেছে। রত্না তার অনেক বান্ধবীদের মধ্যে একজন। একটু উচ্ছল, গায়ে-পড়া ঢলানী। রত্নাকে সে যে খুব পছন্দ করে তাও নয়। তবে একসঙ্গে অনেকদিন একই স্কুলে পড়েছিল, এই যা। এখন রত্না কলেজে সায়েন্স পড়ে। রত্নার সঙ্গে তার প্রেমটেম নেই, তবে একটা বিশ্বস্ততা আর নির্ভরতার সম্পর্ক আছে।

বান্ধবীদের বাড়িতে আনা কোনো নতুন ব্যাপার নয় তার কাছে। এদের সকলের সঙ্গেই এ বাড়ির লোকদের চেনা জানা ও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। স্কুটারটা শূন্য গ্যারেজে ভরে রোলিং শাটারটা টেনে নামিয়ে তালা লাগাল অবু।

রত্না বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখছিল। সামনে আড়াই কাঠার মতো বাগান। এখনো গাছপালা তেমন ঘনবদ্ধ হয়ে ওঠে নি। বাড়িটারও সব কাজ শেষ হয়ে যায় নি এখনো। তবু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। অবু একটু হেসে বলল, কেমন দেখছিস আমাদের তাজমহল?

ভালোই রে।

বাইরেটাই ভালো। ভিতরে কবরখানা।

তুই অবু, ভীষণ স্ক্যাণ্ডালমঙ্গার! নিজের বাড়ি সম্পর্কে ওরকম কেউ বলে? আমার তো তোর ফ্যামিলিটাকে বেশ ভালোই লাগে।

তুই একটা গাধা। এই সব ধূর্ত মিডলক্লাসকে কি বাইরে থেকে বোঝা যায়। এরা সব মুখোশ পরা মানুষ।

সব বাড়িতেই একটু আধটু গণ্ডগোল থাকে। আমার বাড়িতেই কি কম?

ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, স্কিপ দা ফ্যামিলি বিট। ভিতরে চল আজ খুব খাওয়া-দাওয়া আছে। চোর জামাইটা আজ আসবে।

রত্না খিলখিল করে হেসে ফেলল, তুই না বাঙালদের মতো সরল। চোর কী রে?

আমার ভগ্নীপতি তো চোরই। বড় কোম্পানিতে আছে সেলসে। ট্যুরের নামে হাজার হাজার টাকা ফাঁক করছে, কমিশনে মারছে। ফাণ্ডা দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

আয় না, বাগানে একটু বসি। ঘরে এই গরমে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না। স্কুটারে এতক্ষণ কী সুন্দর হাওয়া খেতে খেতে এলাম।

বসবি। দাঁড়া তবে চেয়ারের জোগাড় করি।

চেয়ার লাগবে না। ওই তো অনেক পাথরকুঁচি পড়ে আছে। ওখানে বসলেই হবে।

তুই বোস, আমি মাকে বলে আসি যে, আমরা বাগানে আছি।

যা।

দরজার বাইরে থেকেই অবু তার মায়ের তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। ডিসগাস্টিং।

কলিংবেল টিপতেই ঝুমা এসে দরজা খুলে দিলো। তার মুখে আষাঢ়ের মেঘ।

আজ আবার কী হয়েছে রে?

ঝুমা মুখটা বিকৃতি করে বলল, কী আর হবে? রোজ যা হয়।

জুতো পায়েই অবু সোজা একেবারে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মাথাটা গরম।

প্রায় ধমকের স্বরে বলল, মা?

অর্চনা একসময়ে যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। আজও আছে। তার মুখশ্রীতে

মন্দির ভাস্কর্যের একটু ছায়াপাত ঘটেছে। রং ভীষণ রকমের ফর্সা শরীরের বাঁধুনী প্রায় কিশোরীদের মতো। অর্চনা খুব লম্বা চওড়া নয়, বরং একটু ছোটো-খাটো, পুতুল-টুতুল।

ছেলের ধমকে ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। অর্চনা মিইয়ে গিয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলল, এই আসবার সময় হলো তোর ?

কণ্ঠে প্রগাঢ় প্রশ্রয় ও অভিমান।

অবু কড়া গলাতেই বলল, তোমাকে না বারণ করেছি, চেঁচামেচি করবে না। ফের করছিলে ?

অর্চনা এই একজন মানুষকেই ভয় খায়। বলল, কখন আমাকে চেঁচাতে শুনলি তুই। কথা বললেই বুঝি চেঁচানো হয় ? যা তো, হাত মুখ ধুয়ে একটু মুগী খা। তন্দুরে করেছি।

এ বাড়িতে আরও একজন আছে। সে বৃদ্ধ এবং নির্বিকার। সে হলো আইক। একটা দোআঁশলা টেরিয়ার। আজকাল তার তেজবীর্য নেই, চেঁচামেচিও বিশেষ করে না। সারাদিন ঝিম মেরে কাটিয়ে দেয়। তার মাঝে মাঝে অত্যন্ত উদাসীন দার্শনিক ডাক ছাড়ে সে।

অসমাপ্ত সিঁড়ির চাতাল থেকে ধীর পায়ে নেমে এলো আইক। এসে অবুকে একটু শুঁকল, পায়ের উপর একটু মাথা ঘষে আদর জানালো। তারপর আর একটা উদাসীন আওয়াজ করে নির্দ্বিধায় চলে গেল ঝুমার টেবিলের তলায়।

অবু বলল, রত্না এসেছে, বাগানে বসছি একটু। খাবার টাবার ওখানেই পাঠিয়ে দিও।

রত্না যাওয়ার আগে যেন দেখা করে যায়। বলিস।

ঠিক আছে।

বাইরে যাওয়ার মুখে অবু বোনের ঘরে একটু উঁকি দিলো। বেশ সাজিয়েছে ঘরটা। খুব দামী একটা স্টিরিও আছে ঝুমার। আর আছে গান-বাজনার সরঞ্জাম। একটা দেয়াল জোড়া ঝকঝকে কাঁচের শো-কেসে সব সাজানো। বুক-কেস, পড়ার টেবিল থেকে ডিভান সবই বেশ পরিপাটি। নিজের ঘরখানা ঝুমা তকতকে রাখার চেষ্টা করে।

আজ টিভিতে এখন কী আছে রে ? ভালো কিছু ?

সিরিয়াল ছিল একটা। দেখছি না।

পড়ছিস না কি ? না অভিনয়

ঝুমা জবাব দিলো না।

অব্‌ তার বোনটিকে মোটামুটি পছন্দ করে। একসময়ে দাদা ছিল তার আইডল। এখন আর নেই। তবু দাদাকে বোধহয় ঝুমা তেমন অপছন্দ করে না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে। দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠছে। দিদির সঙ্গে যেমন হয়েছে আজকাল।

বাইরে যাওয়ার মুখে বাপ সুবীরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হলো অবুর। সুবীর বাথরুম থেকে বেরুচ্ছে! সিক্ত, স্নিগ্ধ শরীর। ভুর ভুর করছে চন্দন সাবানের গন্ধ।

আজকাল বাপ ব্যাটায় বিশেষ কথাবার্তা হয় না। পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। এমন কি খাবার টেবিলেও অবু বাবার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে না।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবু দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

সুবীর আজকাল বাড়িতে স্লিপিং স্যুট পরে থাকে। স্ট্যাটাস বেড়েছে। গোটা দুই ড্রেসিং গাউনও কেনা আছে। এখনো পরে উঠতে পারে নি। স্নানের পর শরীরে একটু পাউডার ছড়িয়ে নিল সুবীর। আজ আর ঊর্ধ্বাঙ্গের জামাটা পরল না। ফ্রিজ খুলে হুইস্কি আর জলের বোতল বের করে নিল। টেবিল থেকে তুলে নিল একটা গেলাস। সিগারেট ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু ড্রিংকস চালিয়ে যেতে ডাক্তার বাধা দেয় নি।

ছাদে ইজিচেয়ার পাতাই থাকে। পাশে ছোটো একটা টুল। বোতল আর গেলাস তার ওপর রেখে জ্যোৎস্নায় একটু ঝুঁকে বাগানে ছেলে আর ছেলের বান্ধবীকে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখল সুবীর।

তারপর ইজিচেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চাঁদ দেখল। একটা বড় হুইস্কি ঢেলে নিয়ে জল মিশিয়ে যখন আস্তে প্রথম চুমুকটা দিলো তখন আপনা থেকেই একটা আরামের শ্বাস বেরিয়ে এলো বুক থেকে। একেই কি সফলতা বলে?

সুবীর প্রায়ই এই ছাদে বসে রাত্রিবেলা নিজের ওপর একটা সমীক্ষা চালায়। নিজেকে যে সবটুকু সে বুঝতে পারে তা নয়। তবে জাগতিক সাফল্যগুলিকে দিয়ে নিজের কৃতিত্বকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করে সে। কতখানি উপরে উঠেছে সে, আরও কতদূর ওঠা যাবে, এবং এই ওপরে ওঠা কোথায় গিয়ে শেষ হবে।

এই পোড়া-দেশে জন্মেও সুবীরকে জীবন-যুদ্ধ তেমন করতে হয় নি। যে

কোনো মানুষের জীবনেই মাঝে মাঝে লীন পিরিয়ড আসে। তার জীবনেও এসেছে বটে, কিন্তু সেটা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম নয়, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাওয়াও নয়। একটু আধটু ওঠাপড়া মাত্র।

সুবীর অতীতচারণ করতে ভালবাসে না, ভবিষ্যতের ভাবনাও তাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করে না। এসব প্রবণতা মানুষকে ধীর করে দেয়! সে এটাও জানে যে, এক ছাদের নিচে বসবাস করলে, বিয়ে করলে বা সন্তানের জন্ম দিলেই যে আপনজন সৃষ্টি করা যাবে তা নয়। সুবীরের সেই অর্থে কোনো আপনজন নেই। বরং এরা, এই বউ ছেলে মেয়ে, এরা সকলেই এক এক অর্থে তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

সুবীর তার হুইস্কিতে চুমুক দিলো। ধীরে ধীরে পানীয় তার দখল নেবে এবং পৃথিবীটা সামান্য ভিন্নরকম লাগবে, খুব সামান্যই।

সুবীর আগে অবুকে নিয়ে ভাবত না। আজকাল ভাবে। অবু আজকাল যথেষ্ট জোরালো এক পুরুষ হয়ে উঠেছে। স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, একটু অবিনয়ী।

সুবীর নিজেও কোনোদিন বিনয়ী ছিল না। এখনো কাটা কাটা কথা, ঝাঁঝালো মেজাজ এবং মানুষকে একটু হীন দৃষ্টিতে দেখাই তার স্বভাবগত। অবু উত্তরাধিকার সূত্রে সেটা পেয়ে থাকতে পারে। আবার পৃথক অর্জনও হতে পারে।

একটু ঝুঁকে বাগানে অবু আর রত্নাকে দেখল সুবীর। ঘন হয়ে বসে আছে। পিছন থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না, হয়তো বা একজনের কোলে অন্যজনের হাত। সুবীরের যৌবনে এতটা ঘনিষ্ঠতার মানেই হতো প্রেম। কিন্তু এখন ওই অতটা কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও প্রেম নয়, নিছকই বন্ধুত্ব।

জ্যোৎস্না জিনিসটা একটা ক্যাটালিটিক এজেন্ট। চারদিকটাকে কেমন পাল্টে একটা স্বপ্নের সর ফেলে দেয়। হুইস্কিও তাই! জ্যোৎস্না আর হুইস্কি এমন ককটেল কি আর হতে পারে?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সুবীরের ঘাড় ঘোরাতে ইচ্ছে করল না।

বাবু।

হুঁ।

মা সসেজ পাঠালেন।

সুবীর একটু অবাক হয়ে সুবালার দিকে তাকাল।

সে কী রে? হঠাৎ সসেজ কেন?

খান না। ফিশ ফিঙ্গারও দিয়েছেন সঙ্গে।

প্লেটটা টুলের ওপর রাখল সুবালা।

সুবীরের কোনো খিদে নেই। আজকাল খিদে বড় একটা হতে চায় না। শরীরের নাড়াচাড়া প্রায় নেই বললেই হয়। অনিচ্ছের সঙ্গে একটা সসেজ তুলে নিয়ে সুবীর মুখে পুরল। আজকাল বাঙালীর বাড়িতে আকছার এসব হয়।

সুবালা চলে যাচ্ছিল।

সুবীর ডাকল, সুবালা শোন।

বাবু ?

কতদিন এ বাড়িতে আছিস ?

তিন মাস হয়ে গেল।

দেশে যেতে ইচ্ছে করে না ?

করবে না ?

তবে যাস না কেন ?

গিয়ে খাবো কী ?

কেন, তোদের জমিজিরেত নেই ?

ছিল তো। মানুষটা সব বেচে খেয়েচে।

বেচল কেন ?

আপনার মতোই ছাইপাঁশ খায় যে। তার ওপর জুয়ো।

সুবীর মাথা নাড়ল। তারপর বলল, যা।

সুবালার সঙ্গে এই সংলাপের কোনো মানে হয় না। কিন্তু এ বাড়িতে আর কারও সঙ্গে এত সহজে সংলাপ রচনা করার সাধ্য সুবীরের নেই। এই আপাত শান্ত ও ভদ্র বাড়ির ভিতরে যারা বাস করে তারা রক্তের সূত্রে আত্মীয় মাত্র। কিন্তু কারও সঙ্গেই কারও যোগাযোগ নেই।

হুইস্কি আর জ্যোৎস্নার একটু ঢুলু ঢুলু ভাব এসে গিয়েছিল সুবীরের। কখন তন্দ্রা এসেছিল কে বলবে। চটকা ভাঙল গেলাস পড়ে ভাঙবার শব্দে।

সুবীর দেখল, বেড়ালটা টুলের ওপর। প্লেটে মুখ।

বোতলটা ভাগ্যিস মেঝের নামিয়ে রেখে গেছে সুবালা। নইলে ওটাও ভাঙত।

সুবীর তাড়া দিলো না। খাচ্ছে খাক। তার তো আর খিদে নেই। তবু ওর আছে।

সেই ব্যথাটা আজও আছে, সেই যে অবু—অর্থাৎ তার ছেলে অবিনশ্বর তার

ডান হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল। অবু কি ক্যারাটে জানে? জানতে পারে। বাইশ বছর বয়সের ছেলের কতটুকু খবর আর রাখে সুবীর?

বয়সের ব্যথা, সহজে সারবে না! হাতটা অবু ভেঙেই দিতে চেয়েছিল। স্পষ্টই ওর চোখে জিঘাংসা দেখতে পেয়েছিল সুবীর। সে চেঁচায় নি। জৈব আত্মরক্ষার তাগিদে, রাগে, বাঁ হাতে ঘুষি মারতে চেষ্টা করেছিল। পারে নি। ধস্তাধস্তিতে গোটা সাজানো ডিনারসেট সমেত উল্টে পড়ে গেল টেবিল, চেয়ার। কী সাংঘাতিক শব্দ হয়েছিল, ঝনঝন ঠনঠন। কাঁচ, চিনেমাটি ভেঙে খান-খান হলো। মেঝেতে গড়াল ভাত, মুর্গী, ডাল, পুডিং, আর তার মধ্যেই এ বাড়ির দুই প্রজন্মের দু'জন পুরুষ একে অন্যকে স্থায়িভাবে নুলো করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সুবীর পারবে কেন? তার বয়স পঞ্চাশের ওপর। আর অবুর হাতে সাংঘাতিক জোর। মুর্গীর ঝোলে পিছলে পড়ে গেল সুবীর। হাতটা তখনও অবুর বাঘা থাবায় ধরা। চূড়ান্ত বেকায়দা অবস্থা। সেই সময় অবু মোচড়ের চাপটা আর একটু বাড়ালেই মট করে ভেঙে যেত কব্জী।

কে জানে কেন, অর্চনা চেঁচিয়ে উঠেছিল, অবু, ছেড়ে দে। যথেষ্ট হয়েছে। অবু ছাড়ল। ঝোল ডাল ভাঙা কাঁচের মধ্যে মধ্যবয়সী সুবীর অসহায়ের মতো শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। পেটে সেদিনও হুইস্কি ছিল। চোখে একটা হলুদ রঙ দেখতে পাচ্ছিল সে। আর বমি আসছিল। ডান হাতটা অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়ে ছিল। লম্বা একটা সাপের মতো। যেন হাতটা তার নয়।

নেশা কেটে গিয়েছিল সেই সময়ে। ব্যথায়, অপমানে। তার চেয়েও বড় কথা, সত্য উদ্ঘাটনে। এইভাবে যে, এক একটা ঘটনার ভিতর দিয়ে জীবন তার সত্যকে উন্মোচিত করে দেখায় তা তো জানত না সুবীর।

কেউ সাহায্য করে নি, সুবীর নিজেই উঠে বসেছিল খুব ধীরে ধীরে। বুকের মধ্যে হাঁফ ধরে গেছে। মাথা টালমাটাল। চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছে। সেই কুয়াশার মধ্যেই আপনজনদের দেখতে পেল। অর্চনা, তার বউ। অবু, তার ছেলে। ঝুমা, তার মেয়ে। সুবীরকে তারা একটু দূরত্ব থেকে দেখছে। দেখছে, ডাল আর ঝোলমাখা একটি কমিক চরিত্রের মতো বসে আছে সুবীর। ঘরের মেঝের ওপর। ডান হাতটা কিছুতেই তুলতে পারছিল না সে; টেরই পাচ্ছিল না হাতটাকে। তবু চেয়ে রইল কিছুক্ষণ হাতটার দিকে।

ঘটনার সাক্ষী ছিল দু'জন ঝি-ও। যাদের পরে তাড়িয়ে দিয়েছে অর্চনা। তাদেরই একজন বুলি। গাঁয়ের মেয়ে, একটু বোকা-সোকা সরল ধরনের।

সুবীরের বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে সে-ই টেনে তুলেছিল সুবীরকে।

টলতে টলতে বাথরুমে গেল সুবীর। অনেকক্ষণ বাথরুমের মেঝেয় স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছিল সে। বাইরে তখন অর্চনা আর অরু ক্রুদ্ধ স্বরে একযোগে তার উদ্দেশ্যে যা বলে যাচ্ছিল সেগুলো যত নগ্ন অপমানই হোক, আর গায়ে লাগছিল না সুবীরের।

তখন শীত ছিল, মনে আছে সুবীরের। ভেজা মেঝের শীতলতায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল সে।

বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে বুলি বলল, বাবু, বরফ বের করছি। হাতে লাগাবে না?

সুবীর জবাব দিতে পারে নি। অত অপমানেও নয়, কিন্তু বুলির এই কথায় তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

সেই কান্না অভিমান থেকে নয়, সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি থেকে নয়, সেই কান্না সর্বস্ব-হারানো এক পুরুষের, যে সদ্য উপলব্ধি করেছে যে, তার আর কেউ নেই। ডান হাতের প্রচণ্ড ব্যথা সেই তুলনায় কিছুই নয়।

পায়জামা ছেড়ে কোমরে তোয়ালে জড়ানোরও সাধ্য ছিল না সুবীরের। ডান হাতটা তখন বিবশ। সেই চেষ্টাও করল না সুবীর। ভেজা পায়জামা, নোংরা জামা যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর সোজা উঠে গেল ছাদে।

ইজিচেয়ার পাতাই ছিল। ওই শীতে খোলা ছাদের ওপর বসে এক অর্ধ-চেতনায় সে তার ভাঙচুরগুলো হিসেব করার চেষ্টা করেছিল। সল্টলেক-এর বিখ্যাত লক্ষ লক্ষ মশা এসে ছেঁকে ধরেছিল তাকে। গ্রাহ্যও করে নি। শুধু চিনেমাটি আর কাঁচই তো নয়, আরও কত কী ভেঙে পড়েছিল সেদিন। জীবনের সবটুকু নির্মাণ ধূলিস্যাৎ।

ওই বুলিই এসেছিল ছাদে তাকে ডেকে নামিয়ে নিতে।

সুবীর শুধু মড়ার মতো পড়ে ছিল ইজিচেয়ারে। পৃথিবীর কিছুই তাকে স্পর্শ করছিল না। মাঝে মাঝে অরুর হুংকার কানে আসছিল, ওই বাস্টার্ড যদি আর কোনোদিন তোমার গায়ে হাত তোলে মা, তাহলে ওকে লাথি মেরে বের করে দেবো। যাক, যেখানে খুশি চলে যাক।

এই বাড়িটা করতে লাখ দুয়েক টাকা বেরিয়ে গেছে সুবীরের। চড়া সুদের ধার আছে, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা আছে, ব্যাঙ্ক থেকেও কিছু নিতে হয়েছে।

অর্চনার নামে বাড়ি। অর্চনাও কিছু দিয়েছে, যতটা তার চাকরির সুবাদে দেওয়া সম্ভব। হয়তো অর্চনা আরও কিছু দিতে পারত। দেয় নি। তার দেওয়া মাত্র সাত হাজার টাকায় বাড়ির কাঠের কাজগুলোও সম্পূর্ণ হয় নি। তবু অর্চনা দিয়েছে, এটা সুবীরকে স্বীকার করতেই হয়। বাড়ি হয়ে যাওয়ার পর অর্চনা চাপ দিতে লাগল, পুরানো আসবাব বেচে দিয়ে নতুন সব ফার্নিচার কিনতে হবে, নতুন পর্দা, নতুন সব আধুনিক ফিটিংস। এ ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে ছেলে আর মেয়েও এক জোট হয়েছিল। অগত্যা ফের টাকার জন্যে সুবীরকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে।

ভারি সুন্দর বাড়ি। অভ্যন্তরের শোভাও মুগ্ধকারী। যে দেখে সে-ই বাহবা দিয়ে যায়।

সুবীর কিন্তু সেই রাতে নিজের বাড়ির ছাদে হাতের যন্ত্রণায় অস্ফুট জান্তব শব্দ করতে করতে বাড়িটার ধ্বংসস্তূপ প্রত্যক্ষ করছিল। এক লহমায় সংসারের অসারতা প্রকট হয়ে গেল চোখের সামনে।

বুলি এসে বলল, বাবু, ঘরে চলুন। মা কাঁদছে।

তুই যা বুলি। আমাকে বিরক্ত করিস না।

তোমাদের যে কেন এত অশান্তি বাবু, রোজ ঝগড়া। ঝগড়া আমাদের বাড়িতেও হয়, কিন্তু আমরা তো ছোটোলোক। তোমাদের কেন হবে?

সুবীর এ কথার কী জবাব দেবে?

সুমন্ত হাওড়ায় নামল বিরস মুখে। এক কোলে ছেলে, অন্য হাতে মাঝারি একটা স্যুটকেস। পিছনে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বুলা। তার হাতে মস্ত বাস্কেট। তাতে বাচ্চার দুধের কৌটো, বোতল, তোয়ালে ইত্যাদি। এ সি চেয়ারকার থেকে দুর্দান্ত গরমের কলকাতায় পা দেওয়া হয়তো একটা বিয়োগান্ত ঘটনা। কিন্তু তার চেয়েও বিয়োগান্ত সুমন্তর অ্যাটাচিকেসটা হাপিস হয়ে যাওয়া। শ্বশুরের কাছ থেকে ধার করে ফেরার টিকিট কাটতে হবে। কী লজ্জা!

এই, তুমি জি আর পি-তে চলো।

লাভ হবে কিছু? রাত বাড়বে। ট্যাক্সিওয়ালা সল্ট লেক-এ যেতে চাইবে না।

বেশি পয়সা দিলে ঠিক যাবে। জি আর পি-তে রিপোর্ট করলে অনেক সময়ে পাওয়া যায়।

সুমন্ত্র যথা নিয়মেই বউকে ভয় পায়। বলল, চলো, কিন্তু বাবাইটার খিদে পেয়েছে।

সহ্য করতে হবে। আমার মুক্তোর দুলজোড়া যে কেন তোমাকে রাখতে দিলাম। ছিঃ।

দোষটা কি শুধু আমার?

তোমার দোষ তো বলিনি। তবে র‍্যাকে অ্যাটাচিকেস রাখা তোমার ঠিক হয় নি। অতগুলো টাকা ছিল, দামী পেন, ক্যামেরা, আমার দুল, দরকারী কাগজ-পত্র। তোমার উচিত ছিল অ্যাটাচিটা সিটের মধ্যেই গুঁজে রাখা।

পাগল! খোঁচা লাগবে না?

লাগতই না হয় একটু। চুরি তো যেত না।

এ সি চেয়ারকার থেকে চুরি যাবে কে ভেবেছিল বলো।

আজকাল লোকের হাতে অনেক টাকা। হেঁজি-পেঁজিরাও এ সি-তে ওঠে। সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

হাওড়া স্টেশনে জি আর পি-টা কোথায় তা জানা ছিল না সুমন্ত্রর। খুঁজে বের করতে অনেকটা সময় লাগল। ততক্ষণে স্যুটকেসের ভারে হাত ব্যথা করছে। ছেলের ভারে বাঁ অঙ্গ অবশ।

বুলা, বাবাইকে একটু নিতে পারবে?

দাও। কিন্তু ও কি আমার কাছে থাকতে চাইবে? যা বাপ-ভক্ত।

কথাটা মিথ্যা নয়। ছেলেটা অসম্ভব বাপ-ন্যাওটা। দেড় বছর বয়সে সে একটা মাত্র আপনজনকে চিনেছে। সে হলো সুমন্ত্র। বাপ যতক্ষণ অফিস করে ততক্ষণ বুলার নাভিশ্বাস।

বুলা বাবাইকে কোলে নিয়ে বলল, কল্পনাকে আনলে হতো। এ সময়ে কাজে লাগত। বাবাই তবু ওর কোলে থাকে।

তুমিই তো আনতে দিলে না।

একগুচ্ছের টাকা খরচ হতো। এখানে তো বাবাইকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মা মাসী মামা দাদুর কোলে কোলে থাকবে। আমার বাপের বাড়িতে দুটো কাজের লোক। আর একটা বাড়তি লোক চাপানো ঠিক হতো না।

জি আর পি-তে বেশ ভীড়। প্রতি মুহূর্তেই নানা অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। বড্ড গণ্ডগোল।

বুলা, হয়ে গেল।

কী হলো?

ডায়েরী লেখাতে গেলে মধ্যরাত্রি হয়ে যাবে।

দাঁড়াও। আমি একটু দেখি। মেয়ে হওয়ার খানিকটা অ্যাডভাণ্টেজ তো আছেই।

সুন্দরী হওয়ারও।

বুলা এক আধজনকে মধুর ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে টেবিলের কাছে পেঁাছে গেল এবং দশ মিনিটের মধ্যে অফিসারকে কব্জা করে ফেলল।

কী ধরনের অ্যাটাচিকেস বলুন তো! কালার?

বুলা মুখ ফিরিয়ে সুমন্ত্রকে বলল, এই এসো না এগিয়ে।

সুমন্ত্র চোরের মতো মুখ করে এগিয়ে গেল।

অ্যাটাচির রঙ? চারকোল ব্ল্যাক। ভিতরে ছিল বাইশশো টাকা, একটা মামিয়া ক্যামেরা, পার্কার ডট পেন, একজোড়া মুক্তোর দুল, কাগজপত্র।

অফিসার সব লিখে নিচ্ছিল।

পাওয়া যাবে?

যেতে পারে। লোকাল অ্যাড্রেস দিয়ে যান। খবর পেলে জানিয়ে দেবো। টেলিফোন থাকলে নম্বরটাও লিখে দেবেন। কোথায় চুরি গেল একটু আন্দাজ দিতে পারবেন?

সুমন্ত্র একটু ভাবল। তারপর বলল, দুর্গাপুরে আমরা চা খেয়েছিলাম। তারপর একটু জাস্ট তন্দ্রামতো…

বুঝেছি। কোথায় এসে দেখলেন যে, অ্যাটাচিটা নেই?

দেখি নি। আসলে আমাদের বাচ্চাটা একটু জ্বালাতন করছিল। আমরা ওকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। হাওড়ায় নামবার একটু আগে হঠাৎ খেয়াল হলো…

বুঝেছি।

বুঝে দেখুন, এ সি চেয়ার কার-এও আমাদের নিরাপত্তা নেই।

কোথাও নেই স্যার। আজকাল দারোগার বাড়িতেও চুরি হয়।

কোনোও আশা আছে?

থাকবে না কেন?

খোঁজ নেবো কি?

নিতে পারেন। আমাদের পরিশ্রম বাঁচে। সই করুন।

বুলা বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিলো সুমন্ত্রর কাছে, নাও তো। বড্ড জ্বালাচ্ছে।

সুমন্ত্র বাচ্চা আর সুটকেস, বুলা বাস্কেট হাতে গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো।

ক'টা বাজে দেখ তো!

দশটা বেজে গেছে।

ইস!

ট্যাক্সি পেতে ঝামেলা হবে। তার চেয়েও বড় কথা, তুমি সল্টলেক-এর বাড়ি চিনবে কি না। একবার তো মোটে এসেছিলে।

ঠিকানা তো আছে। দেখা যাক।

ট্যাক্সির জন্য এই রাতেও বেশ লাইন। তার চেয়েও বড় কথা, বে-লাইনে বিস্তর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ডাকাডাকি করছে।

বুলা সাবধান করে দিলো, এই, লাইনের বাইরে ট্যাক্সি ধোরো না। ওরা ভালো নয়!

ডাকাতি করবে নাকি!

করতে পারে। চলো লাইনে দাঁড়াই।

অগত্যা সুমন্তকে লাইনে দাঁড়াতে হলো। বেশ বড় লাইন। গোটা দুয়েক দূরপাল্লার ট্রেন প্রায় একই সঙ্গে এসে পেঁছৈছে, ফলে এত রাতেও ভীড়।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকা মানেই ঝঞ্ঝাট আর ঝঞ্ঝাট। একটা ঝামেলা মিটতে না মিটতে আর একটা এসে হাজির হয়। বিশেষ করে বিয়ের পর থেকে সুমন্তর জীবনটা এই সব ঝঞ্ঝাটে এত কণ্টকাকীর্ণ হয়ে গেল যে বেঁচে থাকাটাই তার কাছে একটা কাঁটার বিছানায় শুয়ে থাকার মতো। বাজার করো, এটা আনো, সেটা করো। বাচ্চা হলো তো ঝঞ্ঝাট দ্বিগুণ হলো। রাতে পেচ্ছাপ করে, কাঁদে, কখনো পেট ব্যথা করে, খাট থেকে পড়ে যায়। এই তো সেদিন মধ্যরাতে ছেলে পেটের ব্যথায় নীলবর্ণ ধ্যরণ করেছিল। বুলা তাকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘরের বার করে বলল, যেখান থেকে পারো ডাক্তার ধরে আনো।

মধ্যরাতে ডাক্তার খুঁজতে বেরোনো যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার। আসানসোলের যে যে অঞ্চলে তারা থাকে তা মোটেই সুবিধের জায়গা নয়। চুরি ছিনতাই খুন জখম লেগেই আছে। তার মধ্যেই প্রাণ হাতে করে বেরোতে হলো। তার গাড়ি গেছে সারাই হতে। রিকশা নেই, ট্যাক্সি নেই, আধমাইল দূরে এক আধচেনা ডাক্তারকে বিস্তর মেহনতে জাগানো গেল বটে, কিন্তু সে পায়ে হেঁটে এত দূরে আসতে নারাজ। তবে দয়া করে লক্ষণ শুনে ওষুধ লিখে দিলো এবং ভিজিট চেয়ে নিলো। প্রেসক্রিপশন নিয়ে সুমন্ত বোকার মতো পথে নেমে পড়ল বটে, কিন্তু ওষুধ পাবে কোথায়? সব দোকান বন্ধ। আবার ফিরে গিয়ে ডাক্তারকে জাগাতে হলো। ডাক্তার ফের দয়া করে তাঁর স্যাম্পেল ওষুধের কয়েকটা দিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে বুলা আশেপাশের বাড়ির লোকজনকে জাগিয়ে ফেলেছে। তারা এসে ঘর ভরে ফেলল। মা মাসী গোছের যারা ছিল তারা চুনের জল এবং আরো কী কী সব টোটকা খাইয়ে ছেলেকে সুস্থ করে ফেলেছে। সুমন্ত্র যখন ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে চোর-চোর মুখে ফিরল তখন ছেলে এক পাড়াতুতো দিদিমার কোলে গ্যাট হয়ে বসে খেলছে।

তা এই হলো সুমন্ত্রর জীবন। সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকা। সর্বক্ষণ সুতোর ওপর হাঁটা। কখন ঝঞ্ঝাট এসে হাজির হয়।

সুমন্ত্র গুনে দেখেছে, সামনে বত্রিশ জন। বত্রিশটা ট্যাক্সি এত রাতে হাওড়া স্টেশনে বাপের সুপুত্র হয়ে আসবে এমনটা আশা করা আর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় বিশ্বাস করা একই ব্যাপার। তার কোলে ছেলে, কাঁধে মাথা রেখে গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়ায় আরামে ঘুমোচ্ছে। স্যুটকেস পাহারা দিচ্ছে বুলা, সুমন্ত্র পৃথিবীর জটিলতার কথা ভাবতে ভাবতে অতিশয় উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জামাইষষ্ঠী! জামাইষষ্ঠী ব্যাপারটা এখনো কেন তুলে দেয় নি লোকেরা?

আর সল্টলেকে! সেও এক রাক্ষসের পুরী বলে শুনেছে সুমন্ত্র। খাঁ খাঁ রাস্তাঘাট, সুনসান সব বড় বড় ফাঁকা জায়গা। ট্যাক্সি যেতে চায় না, বাস-টাস বিশেষ নেই। সন্ধ্যা রাত্রে সেখানে নিশুতি নেমে আসে।

এই, শোনো।

সুমন্ত্র একটু চমকে উঠে বলল, কী বলছ?

তুমি বরং বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে লাইনের বাইরে ট্যাক্সি ধরো।

পাগল! লাইনের বাইরে ট্যাক্সি ধরা বিপজ্জনক।

তোমার সবতাতেই এত ভয় কেন বলো তো! ওই তো লোহার বেড়ার ওপাশে কত ট্যাক্সি। লোকেরা উঠে উঠে চলে যাচ্ছে। কলকাতার ট্যাক্সি-ওয়ালারা এখনো অত খারাপ হয়ে যায় নি যে, চুরি বা ছিনতাই করবে। আর আমাদের ভয়ই বা কী বলো, আমাদের তো সবই গেছে।

তা বটে, কিন্তু বেশ তো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে রাত বারোটা বেজে যাবে।

এ কথায় আরো একটু যেন আতঙ্কিত হলো সুমন্ত্র। চারদিকে অসহায়ভাবে তাকাল!

বুলা তাড়া দিলো, যাও না, গিয়ে একটু কথা বলেই দেখ। আমি লাইন রাখছি।

অগত্যা সুমন্ত্র পা বাড়াল। ভগবান বলে কিছু কি আছে? না থাকাই

সম্ভব। থাকলে মানুষকে পদে পদে এত বিপদে পড়তে হবে কেন? ওই যে বে-লাইনের ট্যাক্সি ওরা যে সুবিধের লোক না তা সুমন্ত্র জানে। কত টাকা বেশি চাইবে কে জানে। তার ওপর হয়তো অগত্যা সওয়ারি তুলবে। টাকার জন্য সুমন্ত্র চিন্তা করে না। তার অ্যাটাচি চুরি গেলেও বুলার হাতব্যাগে কিছু টাকা আছে। শ্বশুরের কাছ থেকেও ধার নিতে পারবে। কিন্তু এই সব ট্যাক্সিতে ওঠাটাই কি বিপজ্জনক নয়!

সুমন্ত্র চার পা এগোতে না এগোতেই একটা দুর্দান্ত পুরুষালি ভরাট গলার মন্দ্র স্বর শোনা গেল, আরে এই বুলা! তুই কোথ্‌ থেকে?

সুমন্ত্র ফিরে তাকাল। দাড়িওয়ালা দুর্দান্ত চেহারার এক লম্বা-চওড়া গৌর বর্ণ যুবক লোহার রেলিংটা টপকে চলে এলো কাছে।

বুলাও উল্লাসে চেঁচাল, শৌনক! ইস কত'দিন পরে দেখা!

এঃ মা, তুই বিয়ে-ফিয়ে করে একেবারে ফার্টিঁ প্লাস হয়ে গেছিস। জবরজং দেখাচ্ছে তোকে।

এই আয় আমার বরের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিই। ওগো, এসো না।

সুমন্ত্র এগিয়ে এল।

এই হলো শৌনক, মনে আছে? বিয়েতে এসেছিল কিন্তু।

শৌনকের কণ্ঠস্বরটি এত ভালো যে, কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। সেই সম্মোহনকারী গলায় একটু হেসে বলল, আরে যাঃ, আমরা যা বিরাট গ্রুপ গিয়ে কেলো করেছিলাম তোর বিয়েতে, অতজনকে কি এখন মনে রাখা সোজা!

সুমন্ত্র আমতা আমতা করে বলল, একটু একটু মনে আছে।

এ কি তোর ছেলে?

হ্যাঁ।

আরে বাঃ, তুই তো একদম বুড়িটি মেরে গেছিস তাহলে। কিছু মাইণ্ড করবেন না সুমন্ত্রবাবু, বাচ্চাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে আপনাদের। বিয়ের পর একটু ঝাড়া হাত পায়ে দু'চার বছর কাটানো উচিত ছিল।

বুলা চোখ পাকিয়ে বলল, খুব অসভ্যতা হচ্ছে। লোক শুনছে না? ছেলে হয়েছে বেশ হয়েছে। তোর কী?

আচ্ছা আচ্ছা বাবা। আরও হোক। তা এখানে লাইনে চুপসে দাঁড়িয়ে আছিস, চল আমার সঙ্গে।

তোর গাড়ি আছে?

আরে না, ট্যাক্সি। চল চল। আসুন দাদা। এইটে কি তোর স্যুটকেস?

তোকে নিতে হবে না।

শৌনক কথাটা গ্রাহ্য না করে স্যুটকেস তুলে নিল। তাড়া দিয়ে বলল, আয় আয়।

শোন, শোন তুই কোথায় যাবি?

আমি যেখানেই যাই, তোকে সল্ট লেক-এ পৌঁছে দিয়ে যাবো।

বুলা সুমন্ত্রর দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে তো, বে-লাইনে কেমন সবাই যাচ্ছে!

সুমন্ত্র জবাব দিলো না। ভগবান বোধহয় আছেন। কিংবা থাকলেও থাকতে পারেন।

ট্যাক্সিতে আরও একজন ছিল। যুবক। শৌনক তাকে সামনের সীটে পাঠিয়ে দিলো। পিছনে তিনজন।

ট্যাক্সিওয়ালা কী একটু আপত্তি করছিল, ফের সওয়ারি তুললেন দাদা, রাত হয়ে যাচ্ছে।

শৌনক চাপা গলায় বলল, সোজা নিয়ে লক-আপে ভরে দেবো, বুঝলে? আগে সল্টলেক চলো।

ট্যাক্সিওয়ালা বুঝে গেল। তারা জানে কারো সঙ্গে গণ্ডগোল করতে নেই।

সুমন্ত্র ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সব উপলব্ধি হলো, এই দুই যুবকের অতিশয় শক্তিশালী ও উদ্ধত উপস্থিতির কাছে যে-কেউ উদ্যত ফণা নামিয়ে নেবে। এরা জানে কাকে কীভাবে চালাতে হয়।

ট্যাক্সি ছাড়ার পর বুলা বলল, ভাগ্যিস তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। নইলে কী যে মুশকিলে পড়েছিলাম! তুই কোথায় গিয়েছিলি?

সে অনেক দূরে। ট্রেকিং করতে। তমসা ভ্যালি।

ও বাবা!

বাবা ডাকছিস কেন? তমসায় এখন হাজার হাজার ট্রেকার যায়।

বেশ আছিস।

আছিই তো। তোর মতো বিয়ে করে ন্যাদস হয়ে গেছি নাকি?

মারব থাপ্পড়। আমি ন্যাদস?

শৌনক সুমন্ত্রর দিকে চেয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি আমার বেস্ট ফ্রেণ্ডকে প্রায় সীতা হরণের মতো করে নিয়ে গেলেন। আমার খুব ইচ্ছে ছিল বুলাকে বিয়ে করে ফেলি। একটু ঝগড়াটে, একটু বোকা ঠিকই, কিন্তু চলেবল্‌। তাছাড়া পুরনো বন্ধু।

তোকে বিয়ে করতে বয়েই গিয়েছিল আমার। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দিতিস তাহলে।

আমি একটু বেশী কথা বলি ঠিকই, কিন্তু আমার কথা শুনতে কোন্ মেয়ে না ভালবাসে বল।

সুমন্ত্র অতি দ্রুত মনে মনে মিলিয়ে দেখছিল। তার তুলনায় এই শৌনক ছোকরা কি অনেক বেশী সুপুরুষ এবং সাহসী ও পৌরুষযুক্ত নয়?

একপাশে সুমন্ত্র, অন্য পাশে শৌনক মাঝখানে বুলা। বুলা আর শৌনক অতিশয় গাঢ় গলায় পুরনো সব কথা বলতে লাগল। সুমন্ত্র কান দিলো না। সে ছেলেকে কোলে শুইয়ে চোখ বুজে পাহাড়ের কথা ভাবতে লাগল। দুঃসাহসী যুবকেরা দুর্গম সব পাহাড়ে গিয়ে ওঠে, নৌকোয় সমুদ্র পাড়ি দেয়, আরও সব কী কী করে। তার জীবন ওরকম নয়। সে ছিল গুড বয়। ওই গুডনেস আর কখনো ছাড়ে নি তাকে।

কিন্তু গুড বলা কি ঠিক হবে? চাকরিতে সে দেদার ঘুষ পায় এবং খায়। এই বয়সেই সে বেশ কিছু টাকা করে ফেলেছে। আরও আসছে। রাশি রাশি টাকা। সে কি গুড বয়?

তারপর কী হলো?

কী আবার হবে। আমি পাইওনীয়ারিং করলাম। পা রাখার জন্য ঠিক আট ইঞ্চি চওড়া জায়গা ছিল, তাও বরফে পিছল। দুধারেই খাদ, তিন হাজার ফুট, পারফেক্ট রিজ যাকে বলে।

ইস, শুনেই গা শিরশির করে। হেঁটে চলে গেলি?

পাগল: হাঁটতে গেলেই বিপদ। গেলাম হামাগুড়ি দিয়ে। কখনো ঘোড়ায় চাপার মতো দুধারে পা ঝুলিয়ে বুকে হেঁচড়ে।

কতখানি?

পঞ্চাশ মিটার হবে।

শুনে সুমন্ত্রও গা শির শির করছিল। ঘুমন্ত ছেলের দিকে একবার মায়া-ভরে তাকাল সে। না, ছেলেকে কখনো কোনো বিপজ্জনক খেলাধুলো বা অভিযান করতে দেবে না সে।

মাঝে মাঝে এই পৃথিবীর অর্থহীনতা উপলব্ধি করে শরীরের ভিতর থেকে মুখ তুলে আইক দীর্ঘ ও বিষণ্ণ ডাক ছাড়ে। বারো বছর ধরে এ বাড়িতে সে

একনিষ্ঠভাবে রয়ে গেছে। চোর বা আগন্তুক আজকাল সকলকেই সমদর্শীর মতো ক্ষমা করে দেয় সে। বয়সের ভার সমস্ত শরীরে ক্লান্তির মতো ছড়িয়ে থাকে। পিছনের প্রিয় বারান্দায় সারাদিন নিজের মধ্যে ডুবে থাকে সে।

অর্চনা টের পায়, আইক বেশিদিন আর বাঁচবে না। গড়পড়তা চোদ্দ বছর কুকুরদের আয়ু। আইকের বারো বছর হলো। আইক মরে গেলে সবচেয়ে বেশি দুঃখ হবে তার। সারাদিন আর কেউ বাড়িতে থাকে না। আইক থাকে। পায়ে পায়ে আইক-ই ঘুরঘুর করে বেড়ায়, সঙ্গ দেয়। আগে ছিল, যেখানে অর্চনা সেখানেই আইক। আজকাল আইক খুব ঝিমোতে ভালবাসে।

রান্নাঘরের গরম থেকে বেরিয়ে পাখার তলায় একটু জুড়োলো অর্চনা। তারপর স্নান করে পাট-ভাঙা একখানা তাঁতের শাড়ি পরল। অর্চনা স্বভাব-সুন্দরী। না সাজলেও তার চলে। আর এই মধ্য চল্লিশেও ছিপছিপে তার গড়ন। পথে-ঘাটে ছোকরারা এখনো পিছু নেয়, শিস দেয়। প্রেমপত্র এখনো পায় অর্চনা।

স্বামীর বন্ধুদের বা বান্ধবীদের স্বামীর সপ্রশংস বা লোভী চোখ তাকে কিছু কিছু কম জ্বালাতন করে না। আর দুঃসাহসী শরীর লোভীদের আক্রমণ সেই কৈশোর থেকে আজ অবধি কিছু কম ঠেকাতে হয়নি তাকে। এখনো পরিপূর্ণ যুবতীই রয়ে গেছে অর্চনা। ধেড়ে ধেড়ে তিন ছেলে মেয়ের মা তাকে কেউ বলবে না। বললে অবিশ্বাস করে লোক।

আয়নার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে ভালোই লাগে তার। এমন গড়ন তার দুই মেয়ের নেই, বান্ধবীদের নেই। ফিলমে নামবার বহু ডাক পেয়েছিল অর্চনা। দু'বার দুটো ছোটো রোল করেছিল! তারপর ব্যাপারটা তার আর ভালো লাগেনি। নায়িকা হওয়ার সুযোগ পেলে হয়তো আগ্রহ হতো কিন্তু তার গলার স্বরটা একটু তীক্ষ্ন আর সামান্য ভাঙা বলে সে সুযোগ হয় নি।

অর্চনা সিঁদুর দেয় না, শাঁখা বা নোয়া পরে না। একসময়ে সবই পরত। তারপর কেমন যেন মনের মুক্তি ঘটে গেল। বিরক্তি এলো। সব ছেড়ে দিলো।

সুবীরের সঙ্গে এই যে একত্রে বসবাস এটাকে বিবাহিতা জীবন বললে ক্ষতি নেই, না বললেও ক্ষতি নেই। তার সঙ্গে সুবীরের অ-বনিবনা চিরকালের। কেন যে এরকম একটা বিপরীত বিয়ে হলো তার! অথচ সে নিজেই পছন্দ করেছিল সুবীরকে। বার্নপুরে তখন তাদের বাড়িতে আসত চমৎকার ঝল-মলে সেই যুবা।

একটা টিপ পরল অর্চনা। সামান্য প্রসাধনেই তাকে এত ভালো দেখায়

যে, তাকে কোনোদিনই তেমন সাজতে হয় না।

অর্চনার লজ্জা একটাই। সে যখন তার জামাইয়ের চোখে মুগ্ধতা দেখে তখন ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যায়। নইলে জামাই হিসেবে সুমন্ত্র চমৎকার ছেলে। ওকে পছন্দও করে অর্চনা। কিন্তু শত হলেও পুরুষ মানুষ। রূপের সামনে কে না বিহ্বল হয়ে পড়ে।

আইক।

আইক লেজটা সামান্য নাড়ল।

বারান্দার পাখাটা ছেড়ে ইজিচেয়ারে বসল অর্চনা। আইকের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে আদর করল।

আবছায়ায় দেখতে পেল ঝুমা পিছনের বাগানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

ঝুমা।

ঝুমা দাঁড়াল, কী বলছ ?

অবুদের কিছু খেতে দিয়েছিস ?

বলোনি তো।

সবই বুঝি বলতে হবে ?

ঝুমাকে আজকাল এরকমই কথায় কথায় বকুনি খেতে হয় অর্চনার কাছে। অর্চনা যে বকে, বড্ড বকে ওকে তা সে নিজেও জানে। জেনেও কেন যেন সামলাতে পারে না নিজেকে। ওই যে কুমারী বয়সের ভারহীন দিনযাপন ওটাকেই ভারী হিংসে হয় কি তার ? ওই যে নানা সম্ভাবনায় ভরা স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ সামনে রেখে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানো ওটাই জ্বালা ধরায় তার মনে ?

কে জানে !

ঝুমা বারান্দায় উঠে এসে বলল, কী করতে হবে বলো।

গলায় ঝাঁঝ। বিরক্ত। উদ্ধত। অর্চনার ইচ্ছে করল গালে ঠাস করে একটা চড় কষাতে। কিন্তু এই বয়সটা ভালো নয়। আজকালকার মেয়ে, হঠাৎ কী করে বসে। পালিয়ে যেতে পারে, গায়ে আগুন দিতে পারে। ওর টেবিলে দু-একবার সুইসাইডাল নোট পেয়ে অর্চনার নাড়ী ছাড়ার অবস্থা হয়েছিল।

অর্চনা গম্ভীর গলায় বলল, ওরা বাগানে বসে আছে। প্লেটে সাজিয়ে কিছু খাবার দিয়ে আয়।

ঘরে এসে খেলেই তো পারে। বাগানে দিয়ে আসতে হবে কেন ? কোথাকার লাটসাহেব ?

ওভাবে কথা বলছিস কেন? বাগানে চাঁদের আলোয় বসে আছে, থাক না।

জ্যোৎস্নায় আমারও বেড়াতে ইচ্ছে করছে।

ফের মুখে মুখে কথা?

তুমি দাদাকে এত ইম্পর্ট্যান্স দাও কেন? না দিলে তো কথা বলতে হতো না। আমি যদি আমার কোনোও ছেলে বন্ধু নিয়ে এসে বাগানে গিয়ে বসি, তুমি দাদার হাত দিয়ে খাবার পাঠাবে?

এ কথায় অর্চনা এত অবাক হলো। আশ্চর্য স্পর্ধা হয়েছে তো মেয়েটার!

কী বললি? ছেলে-বন্ধু নিয়ে বাগানে এসে বসবি?

যদি বসতাম?

খুব তো মুখ হয়েছে দেখছি।

মোটেই মুখ হয় নি। তুমি মুখ আনতে বাধ্য করছ।

অর্চনা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। হাত বাড়িয়ে মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়েই দিলো।

হারামজাদী।

আশ্চর্যের বিষয়, ঝুমা নড়ল না। সরেও গেল না। ঋজু শরীরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আরও মারবে? মারো না!

এত সাহস কোত্থেকে হলো? কটা ছেলে-বন্ধু জুটিয়েছিস?

কথাটা তোমার ছেলের বান্ধবীকেও তো জিজ্ঞেস করতে পারো। যাও না, গিয়ে জিজ্ঞেস করো তো, তার কেন এত ছেলে-বন্ধু? কেন সে তোমার ছেলের সঙ্গে এত রাত অবধি সল্ট লেক-এ আড্ডা মারছে।

তাতে তোর কী?

ঝুমা সপাটে বলল, আমার কিছুই নয়। শুধু আমি জানতে চাইছি তোমার বিচারটা এত একপেশে কেন।

মেয়েকে চড় মারার উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল অর্চনা। এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলার জন্য যতটা মানসিক শক্তি খরচ হয় ততটা চট করে পূরণ হয় না। বিশেষত মেয়ে যখন ভয় পাচ্ছে না, মাথা নিচু করছে না, অপরাধী ভাবও নেই।

অর্চনা গর্জন করল, চুপ করবি কি না।

আমাকে তুমি আর কত চুপ করিয়ে রাখবে? তুমি কি আমাকে পুতুল পেয়েছো? দুটো কাজের লোক বাড়িতে থাকতেও আমাকে কেন গিয়ে খাবার দিয়ে আসতে হবে ওদের? কাজের লোক খাবার দিয়ে এলে কি দাদার প্রেস্টিজে

লাগে ?

কথাটা যুক্তিযুক্ত। অর্চনার দুটো কাজের লোক। কিন্তু অবু কাজের লোকের হাতে খাবার বা জল পাঠালে সাংঘাতিক রেগে যায়। অর্চনার কোনো যুক্তিবোধ ছেলের ব্যাপারে কাজ করে না। কাজ করে অন্ধ আবেগ।

অর্চনা মেয়ের গালে হয়তো আর একটা চড় মারত। কিন্তু অবু বান্ধবীকে নিয়ে বাগানে বসে আছে। বেশী চেঁচামেচি হলে মুশকিল।

সুতরাং অর্চনা চাপা হিংস্র গলাতেই বলল, নষ্ট! নষ্ট মেয়ে কোথাকার! যা, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

ঝুমা একটু তেজী ভঙ্গিতে অর্চনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করে ঘুরে আবার বাগানে চলে গেল।

পিছনের বাগানে সবজির নিবিড় ফলন হয়েছে। পাতাল রেলের মাটি কয়েক লরি ফেলিয়েছে এখানে অর্চনা। সার দিয়েছে। তারপর বাছাই বীজ আর চারা এনে লাগিয়েছে নিজের হাতে। এই তার শখ। বাগান। এই গ্রীষ্মে ঢেঁড়স, পটল, লঙ্কা সবই ফলাতে পেরেছে সে। পিছনে আড়াই কাঠার মতো জমি সবুজে সবুজ। নিবিড় গাছপালার ভিতর দিয়ে পায়েচলার সরু পথ।

গ্রীষ্মকালে বাগানটা খুব নিরাপদ নয়। সল্ট লেক-এ সাপের প্রচণ্ড উৎপাত। এ বাড়িতে আসার পর অন্তত দশ বারোটা গোখরো আর কেউটে মারা হয়েছে। মেয়েটা ঘুরছে বাগানে। কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা কে জানে!

অর্চনা মেয়েকে ঘরে আসতে বলবে কি না তা বুঝে উঠতে পারল না। হয়তো কথা শুনবে না। হয়তো বাজে একটা জবাব দেবে।

অর্চনা উঠে এলো। সুবালাকে দিয়েই খাবার পাঠাল। তারপর নিজের ঘরে এসে চুপচাপ কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। রাগে, ক্ষোভে, অসহায়-তায় তার শরীর দিয়ে আগুন ছুটছে। চোখে সহজে জল আসে না। অর্চনার। এলে বোধহয় খানিকটা উত্তাপ বেরিয়ে যেতে পারত শরীর থেকে। কথায় কথায় সে কাঁদতে পারে না। আর তার পাগলা অনিয়ন্ত্রিত রাগটা তাকেই ছিঁড়ে খায়।

ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জলের বোতল বের করে সরাসরি কনকনে ঠাণ্ডা জল খেল সে। টনসিলাইটিস তার আছেই, সর্দির ধাতও। কিন্তু ঠাণ্ডা ভিতরে না গেলেই নয় এখন। বোতলটা কপালে, গালে, কানে বার বার চেপে চেপে ধরল সে।

নিজের ঘরে ফিরে আসবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ঝপ্ করে অভদ্রের মতো

নিবে গেল আলো। ইনভার্টারের জোরে আবার জ্বলল। অপ্রয়োজনীয় আলো আর পাখাগুলো নিবিয়ে দিলো সে। নইলে ইনভার্টারের সব তেজ ফুরিয়ে যাবে। শুধু বসবার ঘরের একটা স্টিকলাইট জ্বালানো রইল।

টেলিফোনটা বাজতেই অস্থির অর্চনা চমকে উঠে স্থির হলো। ন'টা বাজে কি ?

সদর দরজার মাথায় চমৎকার ইলেকট্রনিক দেয়াল ঘড়িটার দিকে আপনা থেকেই চোখ চলে গেল তার। হ্যাঁ, ঠিক ন'টা।

তাহলে কি ও ফোন করছে ?

অর্চনা টেলিফোনে 'হ্যালো' বলতে পছন্দ করে না। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটু হাঁফধরা গলায় বলল, বলুন।

অর্চনা, আমি।

আবার ট্যুর ছিল বুঝি ! অনেকদিন গলাটা শুনিনি।

কুড়ি দিন।

এবার কোথায় কোথায় ?

হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ। এবার সব বাদ।

বেশ চাকরি। বেড়ানোও হচ্ছে, চাকরিও করা হচ্ছে।

হাঁপাচ্ছো কেন ?

কোথায় হাঁপাচ্ছি ?

শ্বাসের শব্দ পাচ্ছি।

অর্চনা একটু হেসে বলল, আজ মেয়ে জামাই আসছে, এতক্ষণ রান্নাবান্না করে এই বেরোলাম রান্নাঘর থেকে। দম নেওয়ার সময় ছিলো না।

একেই বলে সুখের সংসার।

খুব সুখ। এসে দেখে যেও একদিন। আসবার তো মুরোদ নেই।

ও বাবা। তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো ভাবতেই পারি না।

দাঁড়ালে কী হবে ?

হয়তো হার্টফেল হয়ে যাবে।

ইস্, বাড়াবাড়ি। তোমার হার্ট মোটেই অত দুর্বল নয়।

কী করে বুঝলে ?

হার্ট দুর্বল হলে টেলিফোনেও কথা বলতে পারতে না।

টেলিফোন করার সময়েও বুক দুরুদুরু করে।

এ-যুগে কেউ এত নার্ভাস হয় নাকি ? এই তো আমার ছেলে অবু কত অনায়াসে তার মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে মেশে, এমন কি বাড়িতে অবধি নিয়ে আসে।

জানি। এ-যুগে তো রোমান্স নেই। আমাদের আমলে ছিল।

বেশি বোকো না তো! আমাদের আমল আবার কোন্‌টা? তুমি কি বুড়ো নাকি?

তুলনামূলকভাবে বুড়োই।

তাহলে তো আমিও বুড়ি।

কণ্ঠস্বর একটু চুপ করে থেকে এক পর্দা চাপা গলায় বলল, ও-কথা বলো না। বয়সের কথা উঠলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়।

তাহলে নিজেকে বুড়ো ভাববে না বলো!

না, অর্চনা আমি সেই অর্থে বুড়ো নই। কিন্তু মনের দিক থেকে আমি খুব সেকেলে।

সেকেলে সে তো হাড়ে হাড়ে জানি। নইলে কেউ শুধু গলার স্বরের সঙ্গে প্রেমে পড়ে?

অর্চনা, কথাটা ঠিক হলো না। তোমাকে আমি দেখেছি। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। ট্যুরে যাওয়ার আগের শুক্রবারেও দেখেছি।

কোথায় বলো তো!

বাজারে। বেলা তখন ন'টা হবে।

তাহলে দেখেছো। কিন্তু তোমাকে তো দেখিনি কখনো।

হয়তো দেখেছো। কিন্তু কোন্‌জন আমি তা জানো না।

শোনো, একদিন চলে এসো।

এই তো ভালো। মাঝে মাঝে টেলিফোন করব। কথা হবে। এরকম করেই একদিন খেলাটা শেষ হয়ে যাবে।

আমার তো খেলাটা শেষ করতে ইচ্ছে করে না।

আমারও করে না।

বাজারে সেদিন আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল বলো তো!

তোমাকে সবসময়েই তো অপরূপ দেখায়। চওড়া পাড়ের একটা সাদা শাড়ি পরেছিলে। মাথায় একটা সিল্কের স্কার্ফ ছিল।

ও বাবা, পোশাকটা পর্যন্ত মুখস্থ?

মুখস্থ না হয়ে উপায় আছে? গত পঁচিশ দিন ধরেই তো ওই মূর্তি ধ্যান করেছি।

খুব বুড়ি-বুড়ি লাগছিল না তো!

তোমাকে! কোনোদিন লাগবে না।

সেদিন কী হয়েছিল জানো? সকালবেলায় হঠাৎ দেখি ডীপ ফ্রিজে মাছ নেই। আগে খেয়াল করি নি। কর্তাকে তবু ডিম ভাজা দিয়ে চালানো যায়, কিন্তু মাছ না হলে অবুর চলে না। হয়তো বাড়িতে খাবেই না সেদিন। তাই তাড়াতাড়ি সকালের রান্নাটা কোনরকমে নামিয়েই বাজার ছুটেছি। ভালো করে সাজিওনি।

তোমার ছেলেটি কেমন বলো তো!

কেন, ভালোই তো! এ আবার কী প্রশ্ন!

ভাবছিলাম, তুমি বোধহয় ছেলেকে একটু বেশি আসকারা দাও।

আসকারা! তা হয়তো একটু দিই। ছেলেটা ছোটো থেকেই ভীষণ আমার ন্যাওটা।

বাপের সঙ্গে বনিবনা এখন কেমন?

ওই একরকম। এক ছাদের তলায় দু'জন থাকে, এই মাত্র।

বেশ বলেছো, দু'জনের মধ্যে কী একটা গণ্ডগোল চলছিল বলেছিলে, সেটা কি মিটে গেছে?

মিটবে না। পারসোনালিটি ক্ল্যাস কি সহজে মেটে?

কণ্ঠস্বরটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, নিজেকে কেন সেকেলে লাগে জানো? আমার বাবার এখন তিরাশি বছর বয়স। এখনো তাঁর সামনে বসে কথা বলতে পারি না। দাঁড়িয়ে বলি।

তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি।

ছেলেবেলা থেকে ওই অভ্যাস যে! তিরাশি বছর বয়স হলে কী হয়, এখনো সাংঘাতিক তেজ। সেদিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। বলব?

বলো না।

আমাদের একটা ডেশুণ্ড কুকুর আছে।

ওই যে বেঁটে বিচ্ছিরি কুকুরগুলো?

হ্যাঁ। বাবা রোজ ওটাকে নিয়ে সকালে বেড়াতে যান। একদিন সকালে বেরিয়েছেন, হঠাৎ গোটা দুই দেশী কুকুর ডেশুণ্ডটার ওপর হামলা শুরু করল। রোজই করে। কিন্তু সেদিন দেশী কুকুরদের সঙ্গে একটা অ্যালসেশিয়ানও এসে জুটল। আশপাশের কোনো বাড়ির কুকুর হবে। ছাড়া পেয়ে চলে এসেছিল। বাবা পড়লেন মহা বিপদে। লাঠি নিয়ে তিনি তাড়া করলে দেশী কুকুরেরা ভয় পায় বটে, কিন্তু অ্যালসেশিয়ান ঘাবড়ায় না। সে ডেশুণ্ডকে কামড়াবেই। আর আমাদের কুকুরটাও ভয় পেয়ে তখন বাবার পায়ের ফাঁকে ঢুকে কুঁই কুঁই করছে।

পায়ে কুকুরের শেকল জড়িয়ে যাওয়ায় বাবার হাঁটা বন্ধ।

অর্চনা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, পারোও তুমি গল্প বানাতে।

সত্যি বলছি। আমার কাছে কুকুর হচ্ছে পৃথিবীর ভয়াবহতম জীব। ওই অবস্থায় আমি পড়লে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

তুমি কুকুরকে অত ভয় পাও কেন?

কুকুরের কামড় খেয়ে পেটে চোদ্দটা ইনজেকশন নিতে হলে তুমিও ভয় পেতে।

তোমাকে কামড়েছিল?

উঃ সে কথা ভাবতেই কেমন করে।

আমাদের কুকুরটার কী যে হয়েছে। শুধু ঝিমোয়।

আইকের কথা বলছ?

হ্যাঁ। বয়স হলো, ভাবছি এবার বুঝি মরে-টরে যায়। হ্যাঁ, তোমার বাবার কথা কী বলছিলে?

ওঃ? হ্যাঁ, তারপর বাবা এই তিরাশি বছর বয়সেও ওই সিচুয়েশন থেকে ডেশহুন্ডটাকে অক্ষত অবস্থায় ঠিক বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন। শেষ অবধি নাকি উপায়ান্তর না দেখে তিনি নিজেই কুকুরের নকল করে ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু করেন। আর তাতেই ভড়কে গিয়ে অ্যালসেশিয়ানটা পালিয়ে পালিয়ে যায়।

যাঃ! অর্চনা খুব হাসল।

তুমি হাসছো? আমরা কিন্তু হাসি নি।

ও'মা! এটা হাসির কথা নয়?

নিশ্চয়ই। কিন্তু বাবা যখন হাসির কথাও বলেন তখনো আমরা হাসি না। গম্ভীর মুখ করে শুনি। আচ্ছা, ওই কি তোমার আইকের ডাক শোনা গেল?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ওরকম ডেকে ওঠে বিনা কারণে।

কুকুরটাকে তুমি ভীষণ ভালোবাসো। না?

ওই তো আমার সারা দিনের সঙ্গী। বারো বছর হয়ে গেল। মায়া তো পড়বেই। শোনো একদিন সত্যিই চলে এসো। তোমাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

দেখলে কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখতে ইচ্ছে করবে না। আমি কিরকম দেখতে বলো তো।

যেমনই হও, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।

যদি মোটে চার ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা হই, আর ভীষণ কালো, মোটা, তাহলে?

অর্চনা হাসছিল। বলল, তাতেই বা কি?

যদি দেখ যে, আমার একটা পা কাঠের, দাঁত উঁচু এবং ভীষণ ট্যারা?

এরকম তো হতেই পারে। চালাকি কোরো না।

তাহলে তুমি আরো কিছুদিন দেখা দাও, দেখা দাও করো, তাহলে ঠিক দেখা দেবো।

আহা রে, উনি যেন ভগবান যে, 'দেখা দাও, দেখা দাও' করতে হবে।

আমি ভগবান নই অর্চনা, তবে তুমি বোধহয় আমার ঈশ্বরী।

ফের? ফোন রেখে দেবো কিন্তু?

রাখবার বোধহয় সময় হয়েছে।

কেন?

আমাদের ফোনটা আজ আউট অফ অর্ডার। এক ডাক্তার বন্ধুর চেম্বার থেকে ফোন করছি। সে এতক্ষণ ছিল না। এইমাত্র তার গাড়ি এসে থামল।

আজ মেজাজটা খুব খারাপ ছিল, জানো? মেয়েটা, মানে ঝুমু বড্ড বেয়াড়া হয়েছে। এমনভাবে ঝগড়া করল আজ। ঠিক তুমি যখন ফোন করলে তার একটু আগে! ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। তোমার ফোনটা পেয়ে মন ভালো হয়ে গেল। আবার কবে ফোন করবে?

শীগ্‌গীরই।

এর মধ্যে। ট্যুরে যাবে না তো?

গেলে জানাবো। আমার চাকরির অর্ধেকই হলো ট্যুর।

আর শোনো, তোমাকে আমি ঠিক খুঁজে বের করব।

কিভাবে?

একজন বুড়ো মানুষ একটা ডেশ্‌হুন্ড কুকুর নিয়ে সকালে বেড়াতে বেরোন। সল্টলেক-এর মতো ফাঁকা জায়গায় ঠিক আমি তাঁকে খুঁজে বের করব। তারপর ঠিকানা পেতে আর কতক্ষণ।

কণ্ঠস্বর হাসল। বলল, তুমি সেই চেষ্টা কখনোই করবে না জানি।

কিভাবে জানলে?

তোমারও কি ভয় নেই?

না। আমার কথা তো জানো না।

জানি। আর এও জানি, তোমার সেই সাহস আছে। কিন্তু পেরে উঠবে না। অতটা পরিশ্রম করার ইচ্ছেই হবে না।

ঠিক হবে। দেখো।

ঝুমা কোথায় ?

বাগানে ঘুরছে।

ঝুমার কিন্তু বেশ পার্সোনালিটি আছে।

কি করে বুঝলে ?

রোজ তো আর তুমিই প্রথম ফোন ধরো না। এক একদিন এক একজন ধরে! কখনো সুবীরবাবু, কখনো অবু, কখনো ঝুমা। প্রত্যেকের গলা আমার চেনা হয়ে গেছে। ঝুমার গলা যতবার শুনেছি প্রত্যেকবার মনে হয়েছে, দারুণ ব্যক্তিত্ব আছে।

তা হয়তো আছে। একটু বিদ্রোহী টাইপের।

সাবধানে হ্যান্ডেল কোরো। আজ ছাড়ছি।

আবার কবে ফোন করবে বললে না তো ?

এরপর একদিন বেশি রাতে করব। যখন তোমার বাড়ির সবাই ঘুমোবে। তারপর সারা রাত কথা বলব।

অর্চনা একটু হাসল, দু'বার তো তাই করেছো। পাগল একটা।

ফোনটা একটু আকস্মিকভাবেই কেটে গেল। অর্চনা ফোনটা রাখতে গিয়ে দেখল, দরজার কাছ থেকে বিষদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ঝুমা দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল আবার বাইরে।

শুনেছে কি কিছু ? শুনলে শুনেছে, অর্চনা অত গ্রাহ্য করে না। এ সংসারের কাউকেই সে আর গ্রাহ্য করে না ?

অর্চনা শোওয়ার ঘরে এসে আলো জ্বালল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে দেখল নিজেকে।

এখনো দারুণ সুন্দরী সে।

এই যে লোকটা মাঝে মাঝে ফোন করে এ অর্চনার একমাত্র প্রেমিক নয়! উল্টোদিকের দুটো বাড়ির পর অজয় মিত্র নামে যে গায়ক থাকে সেও কি অর্চনার রূপমুগ্ধ নয় ? অর্চনার আরো অনেক ভক্ত সল্টলেক-এ ছড়িয়ে আছে।

তবে টেলিফোনের এই মানুষটা অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। প্রথম যেদিন ওর টেলিফোন এল সেদিন একটু ভয় পেয়েছিল অর্চনা। ভয়টা দ্বিতীয়বারে কাটল। লোকটা ভীতু, নরম প্রকৃতির, অপ্রতিভ। প্রথমে একটা দুটো কথা বলেই ছেড়ে দিত। তারপর সাহস বাড়ল, প্রগলভ হয়ে উঠল। সেই সাহস জুগিয়েছিল অর্চনাই!

অর্চনা তবু শরীরী নয়। তাকে রোমাণ্টিক বলা যেতে পারে, কামুকা

কখনো নয়। শরীরের ব্যাপারটাকে অর্চনা বরাবরই এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু লোভী পুরুষদের হাত থেকে পুরোপুরি আত্মরক্ষা হয়তো সবসময়ে সম্ভব হয় নি। তবু সে মোটামুটি নীতিবাগীশ। স্পর্শকাতর।

প্রিয় বারান্দায় আইকের পাশে এসে ফের বসল অর্চনা। মনটা ভালো হয়ে গেছে। মাথা ধরাটাও আর নেই।

আইকের মাথায় একটু হাত বোলালো সে। বারান্দায় একটু হাওয়া দিচ্ছে এখন। অর্চনা চোখ বুজল। চোখ জুড়িয়ে এল একটা মদির সুখে। পুজো পেতে কে না ভালবাসে?

জানলা বরাবর একসার ক্যাক্টাস। অত্যন্ত ঘনবদ্ধ বলে একটা সবুজ দেয়ালের মতো নীরেট এবং দুর্ভেদ্য। কুটবুদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ মিশিয়ে অর্চনা লাগিয়েছে। এই ক্যাক্টাসের দরুন জানলার কাছাকাছি চোরেরা আসতে পারবে না। অথচ দেখতে কী যে সুন্দর। ক্যাকটাসের সারির পাশেই একটা মানুষ সমান ঝাউগাছের মতো ঝোপ। আর সেই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঝুমা।

অদূরে বাগানে মিথুনমূর্তির মতো জড়াজড়ি অবু আর রত্না। দৃশ্যটা অশ্লীল। তার কারণ, ঝুমা জানে, রত্না এবং তার দাদা অবু কখনোই প্রেমিক প্রেমিকা নয়। ওরা কখনো বিয়ে করবে না, বিয়ের কথা ভাববে না পর্যন্ত।

তার দাদাকে কি সে হিংসে করে? এরকম প্রশ্ন কেউ করলে ঝুমা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলবে, করি। ভীষণ হিংসে করি। বরাবর ওর সঙ্গে ঝগড়া হলে মা আমাকেই তো মেরেছে বা শাসন করেছে! আমাকে কি দাদার বইপত্র বিছানা গোছাতে হয় নি বরাবর? পিট চুলকে দিতে হয় নি ওর পড়ার সময়? বড় মাছটা, দুধের সরটা আমাদের দুই বোনকে বঞ্চিত করে কে খেয়েছে বরাবর? কে পেয়েছে চাওয়া মাত্র সাইকেল, দামী স্কুটার, দুর্দান্ত সব জামাকাপড়? এমন কি বাড়িতে বান্ধবীদের নিয়ে আসার স্বাধীনতাও?

শুধু আনাই নয়, অবু এ বাড়িতে অন্তত দু রাত কাটিয়েছে দুই বান্ধবীকে নিয়ে। একবার ঝড়-বৃষ্টির অছিলায় মঞ্জু বাড়ি ফিরে যেতে পারল না। তাকে রাখা হলো গ্যারাজের ওপরে মেজেনাইন ঘরে। ওটাই গেস্টরুম। ঝুমার ঘরেই থাকতে পারত, থাকে নি। সকালবেলায় চা দিতে গিয়ে ঝি ওদের এক বিছানায় দেখতে পায়। বেচারা ঝি এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে যখন চোখ বড় বড়

করে ছুটে এল অর্চনাকে বলতে, তখন অর্চনা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। সুপ্রিয়া নামে আর এক বান্ধবী একবার বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এল। সে নাকি আর ফিরে যাবে না। তাকেও রাখা হয়েছিল এই একই ঘরে। পরদিন আর ঝিকে দিয়ে চা পাঠায় নি অর্চনা। ওরাই একটু বেলায় নিচে নেমে এসেছিল। এবং খুব বেশি লজ্জার ভাবও ছিল না তাদের চোখে মুখে।

দিদি ছিল ভীষণ ঠোঁটকাটা আর ডাকাবুকো। দিদি থাকলে অবুকে ঝামরে দিত। কিন্তু এসব ঘটনা ঘটেছিল দিদির বিয়ের পর।

আবছা জ্যোৎস্নায় ওদের যুগল-মূর্তি দেখতে দেখতে ঝুমা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

তার মা কি আশা করে টেলিফোনের প্রেমিকটির সঙ্গে একদিন শরীরেও ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব? কে জানে কী। কিন্তু টেলিফোনটা যখন আসে তারপর থেকেই অর্চনা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। একটু যেন বেশি ভালো, একটু যেন ক্ষমাশীলা, একটু বুঝি স্বপ্নাতুর।

ছাদে যথারীতি সুবীর তার ইজিচেয়ারে খানিকটা নেশায় আর খানিকটা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট টেবিলের ওপর জলের বোতল আর গেলাস, টেবিলের পায়ার কাছে রাখা হুইস্কির বোতল। তার পাশেই খাবারের প্লেট ভেঙে টুকরো হয়ে পড়ে আছে। ছত্রাখান ফিশ-ফ্রাই খেয়ে গেছে বেড়াল।

ঝুমা একটু টিপি টিপি পায়ে এগিয়ে গেল বাবার কাছে। সুবীরের নাক ডাকছে। সে যে আজকাল খুব বেশি নেশা করে তা নয়। আজকাল একটু খেলেই তার নেশা নয়। বেশি খেতে পারে না।

ঝুমা গেলাসে দু'আঙুল পরিমাণ হুইস্কি ঢেলে নিল। অনেকটা জল মেশাল। তারপর চোঁ করে খানিকটা খেয়ে চোখ বুজে ফেলল গলার জ্বলুনিতে। তারপর বাকিটা খেল ছোটো ছোটো চুমুকে।

এই চুরিটুকু সে সম্প্রতি শিখেছে। হুইস্কি খেলেই দু'ধারে তার ডানার মতো কিছু একটা গজায় আর তারপর সে যে কোথায় কোথায় চলে যায়। কোন্ কল্পরাজ্যে ঘুরতে থাকে।

সে ঠিক জানে, সে এই নোংরা পৃথিবীর কেউ নয়। একদিন বিভ্রমবশে এক স্বপ্ন রাজ্যের দরজা খুলে সে ঢুকে পড়েছিল রূঢ় নিষ্ঠুর নোংরা এই বাস্তবতায়, একদিন ফিরে যাবে।

দোতলা উঠবে বলে ছাদের রেলিং হয় নি। কার্নিশের ওপর দিয়ে নির্ভয় পায়ে হাঁটছিল ঝুমা। একটু টালমাটাল, সামান্য ঘোর-লাগা দৃষ্টি। প্রায়ই

হাঁটে, সে কখনো পড়ে না।

কে রে? কে রে তুই?

বিকট এই চিৎকারে ঝুমা এত চমকে গিয়েছিল যে, তার বাড়ানো পা কার্নিশে পড়ল না, পড়ল শূন্যে। ঝিম করে উঠল মাথা, আর বোবা অ্যানিম্যাল ইনস্টিংট-এর বশে সে যা পারল আঁকড়ে ধরল।

পড়ল না ঝুমা, তবে শরীরটাকে হাঁচোর পাঁচোর করে টেনে তুলতে হলো ঝুল-খাওয়া অবস্থা থেকে।

"আমি বাবা! আমি।"

পরমুহূর্তেই ভুল বুঝতে পারল। সুবীর অর্থাৎ তার বাবা তাকে দেখতেই পায় নি। সুবীর কথা বলছে অন্য কারো সঙ্গে। কোনো অদৃশ্য মানুষ বা ভূতের সঙ্গে।

ঝুমা বসে পড়ে হাঁফাচ্ছিল।

সুবীর নিচু হয়ে বোতলটা তুলে গেলাসে হুইস্কি ঢালল। জল মিশিয়ে একবার দুবার চুমুক দিয়েই গেলাস রেখে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

তার বাবা এরকম করে। নেশায় বা স্বপ্নের ঘোরে কথা বলে ওঠে, চেঁচায় বা গালাগাল দেয়। কার উদ্দেশ্যে যে করে তা কে জানে।

এবড়োখেবড়ো শানে কনুই ছড়ে গেছে ঝুমার। জ্বালা করছে। রক্ত পড়ছে। ব্যথায় টুঁশব্দটিও না করে ঝুমা কার্নিশ দিয়ে আবার ঝুলে পড়ল। নিচে তার ঘরের জানলার রেন শেড। তার ওপর নামতে কোনো অসুবিধে নেই। তারপর আর একবার ঝুল খেলেই বেড়ালের মতো মাটিতে নেমে দাঁড়াবে ঝুমা।

আইক চেঁচাল, আউফ।

দেখতে পেয়েছে? নাকি এমনিই অভ্যাসবশে নালিশ জানাল কাউকে?

ঝুমা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে কৌটো খুঁজতে লাগল।

সুবালা রুটি বেলতে বেলতে বলল, কী খুঁজছো?

গোলমরিচের কৌটো।

সুবালা উঠে খুঁজে দিলো। ঝুমা অস্বাভাবিক ভাবে মুখটা ফিরিয়ে রইল অন্য দিকে। হুইস্কির গন্ধ যে সাংঘাতিক তা সে জানে।

কয়েকটা গোলমরিচ মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে ঘরে এল ঝুমা। ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় ওষুধ লাগাল।

তারপর সামনের ঘরে এসে টি ভি ছেড়ে বসল। একজন মাঝ-বয়সী লোক সরোদ বাজাচ্ছে। দশটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

সরোদের মাঝখানেই ট্যাক্সির হর্নটা বেজে উঠল।

দিদি এল নাকি?

একটু লাফিয়ে চমকে উঠল হৃৎপিণ্ড। দিদি যদি গন্ধ পায়?

পরমুহূর্তেই তার মনে হলো, পেলেই বা ক্ষতি কী? কী আর এমন বেশি কিছু হবে? এ বাড়িতে তার না আছে আদর, না কোনো সম্মান। একটু আগেই সামান্য অপরাধে কত অনায়াসে তাকে চড় মারল তার মা।

টি ভিটা বন্ধ করে দিয়ে ঝুমা ফের দ্রুত পায়ে উঠে এল ছাদে।

গন্ধ পাবে? তাহলে ভালো করেই পাক।

সুবীর তার নেশায় জড়ানো ঘুমে অচেতন। বেড়ালের মতো হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঝুমা হুইস্কির বোতলটা খুলল। তার বাবা ইতিমধ্যে গেলাসটা খালি করে রেখেছে। ঝুমা ইচ্ছেমতো ঢালল। জল মিশিয়ে অতি দ্রুত ছোট্ট ছোট্ট চুমুকে গিলে ফেলতে লাগল। গলা জ্বলছে, বুক জ্বলছে, চোখ ভরে এল জলে। তবু তীব্র এক জেদ আর অভিমানে জোর করে গেলাসটা খালি করে ফেলল সে।

তারপর কিছু একটা হুলুস্থুল ঘটতে লাগল তার শরীরের মধ্যে। আচমকা শরীর ভীষণ তপ্ত হয়ে গেল, কানে একটা ঝিনঝিন শব্দ হতে লাগল। বমি পেতে থাকল। আর মাথাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল।

বার দুই ওয়াক তুলল ঝুমা। খানিকটা জল চলকে বেরিয়ে গেল।

সেই শব্দে সুবীর নড়ে উঠে বলল, কে রে? বেড়ালটা নাকি? খা ভালো করে খা···সব খেয়ে ফেল···

ঝুমা আতঙ্কিত হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল কার্নিশে। তারপর ফের ঝুল খেয়ে রেন শেড-এ নেমে এক লাফে মাটিতে।

কিন্তু এবার স্বাভাবিকভাবে পড়ল না ঝুমা। পড়ল একটু পুঁটলির মতো। কোমরে বোধহয় ভালোই চোট পেয়েছে সে, কিন্তু শরীরের বোধ তার এখন এত কম যে তেমন ব্যথা বোধ করল না। সমস্ত শরীরটাই যেন ঝিঁঝি ধরার মতো অবশ।

সে কি মাতাল হয়ে গেছে? সে কি টলছে? কিন্তু কী যে একটা হচ্ছে তার মনের মধ্যে। কী যে অদ্ভুত লাগছে! একটুও খারাপ নয়। বরং দারুণ ভালো। ভারী ভালবাসতে ইচ্ছে করছে পৃথিবীকে। মরতেও ইচ্ছে করছে।

ঝুমা সামান্য অবিন্যস্ত পায়ে পিছনের বাগানের গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। পথ ঠাহর করতে পারছিল না। ডালপালার শব্দ হচ্ছিল।

আইক গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় ডাকল, আউফ! আউফ!

ঝুমা পিছনের ফটকে এসে একটু দাঁড়াল। ব্যবহার হয় না বলে এই ফটকটা তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। কিন্তু ডিঙোতে কোনো অসুবিধে নেই। ঝুমা গ্রিলের ফটকের খাঁজে পা রেখে উঠলো। ডিঙোলো। সারাক্ষণ টলমল করতে করতে। সে যেন অন্য এক শরীরে ঢুকে পড়েছে আজ। এ যেন তার শরীর নয়, সে নয়।

পিছনে একটা খালি জমি। তারপর রাস্তা। তারপর ফাঁকা, হাহা মুক্ত পৃথিবীর বিস্তার। ঝুমা কেন বাঁধা থাকবে এই একটি বাড়ি ও পরিবারের বন্ধনে? দুনিয়ায় আর সবাই যদি তার পর তাহলে এ বাড়ির লোকও তার পর।

ঝুমা টলছে, পৃথিবী টলছে। মাঝে মাঝে খিলখিল করে হেসে উঠছে ঝুমা। অকারণে এত আনন্দ হয় মাঝে মাঝে। ঝুমা জমিটুকু পেরিয়ে গেল। তারপর রাস্তা ধরে ছুটতে গেল। পারল না। খুব ছুটবার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু ইচ্ছের সঙ্গে শরীরটা পাল্লা দিতে পারল না।

পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল ঝুমা। তারপর হাঁটতে লাগল। জোরে। আরো জোরে।

একটা ট্যাক্সি বা গাড়ি যদি পেয়ে যেত সে। কিন্তু সল্ট লেক এখন এত ফাঁকা, এত নির্জন, এত ভূতুড়ে যে, কোনো মানুষই নজরে পড়ে না।

হঠাৎ একটা হলুদ রঙ এসে রাস্তাটাকে রাঙিয়ে দিলো। কোথা থেকে এল আলোটা?

ঝুমা ফিরে চাইতে গেল। অমনি ধাঁধিয়ে গেল চোখ একজোড়া জোরালো আলোয়। একটা গাড়ি কি? ভাবতে ভাবতেই ঝুমা হোঁচট খেল। পড়ো-পড়ো হয়েও পড়ল না। হেসে উঠল হি-হি করে।

হাই! বলে হাত তুলল ঝুমা। গাড়ির অন্ধকার অভ্যন্তরে যে আছে সে সাড়া দিলো না। স্পীড বাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

হাই! হাই। বলে হাত নেড়ে কয়েকবার ডাকল ঝুমা।

গাড়িটা একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো।

ঝুমা দমল না। দুনিয়াটাই তো সৃষ্টিছাড়া আর পাগল। সে মনের আনন্দে টলোমলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মোড়টা ছাড়িয়ে গেল। দুধারেই সুদৃশ্য সব বাড়ি। আলো জ্বলছে। টি ভির শব্দ আসছে। একটা স্কুটার চলে গেল

পাশ দিয়ে। একটা তেজী কুকুর ভীষণ জোরে ডেকে উঠল। একটা বাড়ি পেরিয়ে যেতে যেতে ঝুমা শুনতে পেল কে যেন সিংহ গর্জন করে কাকে বলছে, তুমি একটা রাসক্যাল। আর এই সবকিছু থেকেই ভারী আনন্দ পেতে লাগল ঝুমা। চিৎকার করে সে লোকটার উদ্দেশ্যে বলল, ইউ ব্লাডি ফুল…

তারপর আবার হি হি করে হাসি।

গাড়ির হেড-লাইট আবার উদ্ভাসিত করল পথকে। ধীর গতিতে একটা গাড়ি ঝুমার পিছন থেকে এগিয়ে এল।

ঝুমা হাত তুলল, হাই!

গাড়িটা থামল না। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল ঝুমাকে ছাড়িয়ে। তবে জানলা দিয়ে একটা কৌতূহলী মুখ তাকে দেখে নিল ভালো করে। তারপর বলল, হাই!

ঝুমা জানে, গাড়িটা তাকে নেবে। তারপর বহুদূরে নিয়ে যাবে। সে হাত তুলে চেঁচাল, গিভ মি এ লিফট্। হাই!

গাড়িটা তবু এগিয়ে যাচ্ছিল। ধীর গতিতে। ঝুমা প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, সে ছুটছে কোমর সমান জলের মধ্য দিয়ে। এগোতে পারছে না, শরীর টলমল করছে, মাথা কেমন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে।

কেউ কি পেছন থেকে তাড়া করে আসছে? একজোড়া দৌড়-পায়ের শব্দ না?

ঝুমা! ঝুমা! একটু দাঁড়াও!

সামনের কয়েকটা ফাঁকা প্লট! কোনো বাড়ি নেই। গাড়িটা একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে আছে রাস্তার পাশে।

ঝুমা একবার পিছু ফিরে দেখতে চেষ্টা করল লোকটাকে। দাদা না তো? পাড়া প্রতিবেশী কেউ কি? যে-ই হোক সে আসছে ঝুমাকে ফের অন্ধকূপে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।

ঝুমা প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

ঝুমা! ঝুমা!

একটা লোক গাড়ির দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। আর ঝুমা টলতে টলতে, পড়ো-পড়ো হয়েও ছুটে হেঁচড়ে তার কাছাকাছি চলে এল।

লোকটা হাত বাড়িয়ে ঝুমাকে টেনে নিয়ে গাড়িতে ঢুকেই টেনে দিলো দরজা। তারপর গাড়ি ছুটল নক্ষত্রবেগে।

পিছন থেকে একটা অসহায় স্বর শোনা গেল, শুধু ঝুমা! ঝুমা! নামো,

ওরা তোমার সর্বনাশ করবে।

গাড়ির মধ্যে তিনজন প্রগল্‌ভ অবাঙালী যুবকের কোলে কোলে তখন খিলখিল করে হাসতে হাসতে গড়াচ্ছিল ঝুমা। ওরা যে কী করছে তাকে নিয়ে তা বুঝতে পারছিল না সে। কাতুকুতু দিচ্ছে? না কি অন্যরকম কিছু? খুব খারাপ কিছু? সে যা-ই হোক তার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। ভীষণ…

ঝুমা কোথায় গেল মা। ওকে দেখছি না কেন? এতক্ষণে তো ওর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ার কথা।

অর্চনা ঠোঁট উল্টে বলল, কি জানি, আছে কোথাও। একটু রাগ হয়েছে মেয়ের। সামান্য সামান্য কথাতেই আজকাল গাল ভারী হয়। তুই ছেলেটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আয় তো। সোফায় শুইয়েছিস, কি জানি বাপু, আমার ভয় করে। কখন গড়িয়ে টড়িয়ে পড়বে।

সে তোমার জামাই শোওয়াবে'খন। বলে বুলা তার বরের দিকে তাকাল।

সুমন্ত্র এখনো তমসা উপত্যকার কথা ভাবছে। একফুট চওড়া গিরিশিরার ওপর দিয়ে দু'ধারে তিন হাজার চার হাজার ফুট গভীর খাদের মধ্যে ঠ্যাং ঝুলিয়ে পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব পার হওয়ার একটা মানসিক চেষ্টা করছিল সে। হাত পা এমন শিরশির করছিল তার, মাথাটা এমন ঘুরছিল যে, সে প্রকৃতিস্থ হতে পারছিল না। তার অর্ধেক ওই না-দেখা গিরিশিরার ওপরে বসে আছে, বাকি অর্ধেক সল্ট লেক-এর শ্বশুরবাড়িতে গেরস্ত জামাইয়ের মতো জামাইষষ্ঠী করতে এসেছে। দুটি ঝোড়ো দুরন্ত যুবক আজ তাকে এত ওলটপালট ক'রে দিয়ে গেছে যে, শাশুড়িকে প্রণামটা করতে পর্যন্ত তার ভুল।

অর্চনা তার সুন্দর ভ্রূ ওপরে তুলে বলল, ওমা, সুমন্ত্র। তুমি সেই থেকে যে চুপচাপ বসে আছো। জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও। রাত হয়েছে।

সুমন্ত্র উঠল। একটু ক্লান্ত ও হতাশ স্বরে বলল, ছেলেটাকে বরং আগে শুইয়ে দিই? তিন হাজার ফুট ওপর থেকে পড়ে গেলে…

বলেই জিব কাটল সে। সোফার উচ্চতা তিন ফুটও নয়। বড়জোর দু ফুট হবে। তাড়াতাড়ি লজ্জা ঢাকতে সুমন্ত্র ছেলেকে আড়কোলে তুলে নিল।

শোওয়ার ঘরটা যেন কোন্‌ দিকে!

এসো। তোমাদের জন্য মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরটাই রেডি করে রেখেছি। মেঝে থেকে সিলিং অবধি মস্ত জানালা আছে, দক্ষিণের হাওয়া পাবে। পেডেস্টাল

ফ্যানটাও ওই ঘরে। এই যাঃ—

বাতি হঠাৎ নিবে গেল। ঘচাং করে একটা শব্দ হলো। ভাঙল একটা কাঁচের গেলাস এবং সেই সঙ্গে সুমন্ত্র আর্তস্বর শোনা গেল, ওঃ বাবা।

কী হলো তোমার?

সুমন্ত্র জবাব দিলো না। সেন্টার-টেবিলে তার হাঁটু ঠুকে গেছে জোরে। ছেলে নিয়ে সে পড়ে যেতে পারত। পড়েনি ভাগ্য ভালো বলে। এখন ন যযৌ ন তস্থৌ সে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে। পায়ের চারদিকে অজস্র ভাঙা কাঁচ। সেন্টার-টেবিলের ধারে গেলাসটা সে-ই রেখেছিল, জল খাওয়ার পর।

বুলা ঝংকার দিয়ে বলল, কিন্তু ইনভার্টারটার কী হলো? আলো জ্বলছে না কেন মা?

খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এখানে একটা ভালো মিস্ত্রিও কি পাওয়া যায়। সল্ট লেক বলে কথা। বড্ড বেশি বাবু জায়গা। দাঁড়া, মোম জ্বালাচ্ছি।

রান্নাঘর থেকে সুবালাই মোম নিয়ে বেরিয়ে এলো।

দেখো বাবা, কাঁচটাচ দেখে এসো। ছেলেটাকে বরং আমার কোলে দাও।

না, না, ঠিক আছে। ও ঘুমের মধ্যেও কোল চিনতে পারে। অদল-বদল বুঝলেই চেঁচাবে।

খুব বাপ-ন্যাওটা করে তুলেছো। পরে ঠ্যালা বুঝবে। এসো সাবধানে এসো। দাঁড়াও টর্চটা আনি। সুবালা, ওপরের ঘরে যা বাতাস, মোমবাতি থাকবে না। তুই হ্যারিকেনটা বরং জেলে দিয়ে আসিস।

সুমন্ত্রকে ওপরের ঘরে পৌঁছে দিলো অর্চনা। চারদিকে টর্চ ফেলে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, সব ঠিক আছে তো। হাতের কাছেই জল আছে। ওই কোণে বাথরুম···

ঠিক আছে। সব দেখে নেবো।

পরিপাটি বিছানা করা রয়েছে। মশারি ফেলা এবং গোঁজা। সুমন্ত্র ছেলেকে অয়েল ক্লথের বিছানায় শুইয়ে দিলো। তারপর বলল, আমি বরং এখানে একটু থাকি।

ছেলে পাহারা দেবে বুঝি ঠিক আছে, থাকো। তোমার সঙ্গে শ্বশুরের আজ রাতে দেখা হবে কিনা বুঝতে পারছি না। যদি খাওয়ার টেবিলে এসে বসে তো হবে। অনেক সময়ে খেতেও আসে না। বেশি নেশা হলে গরমে ছাদেই ঘুমিয়ে পড়ে! আমিও ডাকি না।

সুমন্ত্র চুপ করে রইল। এখনো সে তমসা উপত্যকার সেই গিরিশিরা থেকে

সম্পূর্ণ নেমে আসতে পারে নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকার সিঁড়িতে ছাদ থেকে বুলাকে নামতে দেখল অর্চনা।

তোর বাবার কাছে গিয়েছিলি নাকি ?

হ্যাঁ, বাবা বরফ চাইছে। দিয়ে আসি।

সুবালাকে বল না, দেবে।

না, আমিই দিই। আর শোনো মা, ঝুমাকে কিন্তু ছাদেও দেখলাম না।

একটু আগে তো পেছনের বাগানে ঘুরছিল। মাঝখানে একবার ঘরে এসেছিল। আবার বেরিয়ে গেল। আছে কোথাও আশেপাশে।

থাকলে আসছে না কেন ঘরে ? কতকাল পরে আমি এলাম।

বললাম না, রাগ হয়েছে।

ওকে বড্ড বকো তুমি। অবুটাও ওই মেয়েটাকে স্কুটারে নিয়ে যে কোথায় হাওয়া হলো। বাড়িতে কোনো ডিসিপ্লিনই নেই তোমাদের।

মেয়েটাকে পৌঁছে দিতে গেছে। আসবে এখনই।

কত দূরে গেল ?

মেয়েটার বাড়ি তো শুনেছি পাইকপাড়ায়।

ওর মেয়ে-বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে মা। আমার ছেলে-বন্ধু কিন্তু তুমি কোনোদিন অ্যালাউ করোনি। ওকে অত আস্কারা দিচ্ছো কেন ? হুটহাট মেয়েদের বাড়ি নিয়ে আসে কেন ? বাইরে যা খুশি করুক, বাড়িতে কেন ?

কী করব বল। বড় হয়েছে।

সাবধান না হলে একদিন দেখবে একটা গেছো মেয়েকে বিয়ে করে এনে তুলবে।

কপালে থাকলে তাই হবে। কিছু করার নেই।

কী যে খারাপ লাগছে। বাড়িতে এলাম অথচ ঝুমা নেই, অবু নিপাত্তা… কী যে ভূতের বাড়ি করে রেখেছো তোমরা।

বলতে বলতে নেমে গেল বুলা। ফ্রিজ খুলে বরফের ট্রে বের করল। বোল-এ বরফ ভরে নিয়ে ছাদে উঠে এলো।

বাবা, বরফ।

সুবীর সাড়া দিলো না। তাকে এখন ভূতে পেয়েছে। প্রায়ই পায়। এক এক সময়ে সে একটা অদ্ভুত বায়বীয়, কুয়াশাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট এবং অদ্ভুত আকার দেখতে পায়। যেমন এখন সে দেখছে, আকাশের চাঁদ থেকে খুব পেটমোটা একটা

মূর্তি নেমে এলো সাঁতার দিয়ে। লিকলিকে হাত পা, পেট আর বুক যেন একটা বড় ফুটবল, মাথাটা একটা ছোটো ফুটবল। একটার ওপর আর একটা খুব আলতোভাবে বসানো।

নতুন বাড়িতে ভূত থাকাটা কোনো কাজের কথা নয়। সুবীর তাই হাত নেড়ে বলল, যাঃ হ্যাট। এখানে সুবিধে হবে না।

জোড়া ফুটবল ছাদে ডন দিতে দিতে বলল, খুব হবে, খুব হবে। কার জমিতে ঘর তুলেছো হে।

সুবীর একটু ভয় পেল। কার জমি তা সে জানে না। মনেও পড়ল না। তাই সে চুপ করে ভাবতে লাগল, জমিটা কি তবে তার নয়? যার, সে কি ফের কেড়ে নেবে?

সুবীর শুনতে পেল, বাড়ির সামনে দিয়ে বরফওলা হেঁকে যাচ্ছে, কুলপি বরফ···কাঠি বরফ···

সুবীরের পরনে হাফ প্যাণ্ট ন-বছর বয়স। ছাদের ওপর থেকেই সে ডাকল এই বরফওলা।

বরফওয়ালা মুখ তুলে তাকাতেই চিনতে পারল সুবীর। ফটিক। গালে রুখু দাড়ি, চোখদুটো বসা। একসঙ্গে পড়েছে তারা। অথচ তার পরনে হাফ প্যাণ্ট, বয়স মোটে ন বছর, তাহলে ফটিক একদম বুড়ো হয়ে গেল কি করে?

ছাদ থেকেই হাত বাড়াল সুবীর। আশ্চর্যের বিষয় তার হাত লম্বা হয়ে নেমে একদম রাস্তায় পৌঁছে গেল। ফটিক খুব অনিচ্ছের সঙ্গে একটা কাঠি বরফ বের করে দিলো।

বরফ···বরফ···

সুবীর একটু কষ্টেই চোখ মেললো, কে রে?

আমি বাবা, আমি বুলা।

সুবীর প্রথমটায় চিনতে পারল না। নামটি চেনা চেনা···অথচ···ওঃ বুলা। তোরা এসে গেছিস?

কখন। তুমি যে একটু আগে বরফ চাইলে আমার কাছে।

তোর কাছে। হবে।

গেলাসে দেবো বরফ?

দে।

আর কত খাবে বাবা? তোমার বেশ নেশা হয়েছে কিন্তু।

না খেলে যে ঘুমই হবে না।

আজ আর খেও না। তোমার জামাই কী ভাববে বলো তো?

সুমন্ত খায় না বুঝি?

একটু আধটু। পার্টি-টার্টি থাকলে।

আমিও একটু খাবো। আর একটা বড় ঢালবি?

ঢালছি।

তুই তো কম করে দিবি। দে আমি ঢালি।

বুলা বোতলটা ওপরে তুলে দেখে নিয়ে বলল, বেশি তো নেইও।

বলিস কি? বাইশ আউন্সের বোতল। এত তো খাই নি।

খেয়েছো নইলে খাবেটা কে?

বেড়াল ফেলে দেয় নি তো।

না। বোতল খাড়া ছিল। পড়ে নি।

যাঃ বাবা, আজকাল তাহলে মদেও নেশা হচ্ছে না তেমন। শেষে কি ড্রাগ ফাগ ধরতে হবে?

তা কেন বাবা? নেশা করতেই হবে কেন? আজকাল সবাই কেন এত, নেশা করে বলো তো?

ঘ্রাউ করে মস্ত একটা উদ্গার তুলল সুবীর। তারপর কাতর স্বরে বলল, ওঃ নেশা করি বলেই বেঁচে আছি। আজকাল নেশা কি আর ধরতে চায়? দেখ না, বোতল প্রায় খালি, তবু ঠিকমতো নেশাটা হয়নি। কেন হলো না বলতো।···

বুলা অত্যন্ত আহত গলায় বলল, বাবা, আমাদের বাড়িটার কী হলো বল তো! তোমরা যে কেউ ঠিক নেই। তুমি নেশা করছ, অবু বান্ধবীদের এনে তোমাদের নাকের ডগায় যা-খুশি করছে, ঝুমা এত রাত অবধি বাইরে, আর মা···

সুবীর ক্যাবলার মতো খানিকক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে থেকে বলল, আমাকে বকে লাভ নেই। আমি এ বাড়ির কেউ নই। বোঝাপড়া করতে হলে তোর মার সঙ্গে করগে যা। বরফটা গেলাসে দিয়ে বোতলের তলানিটুকু ঢেলে দে তো।

তুমি ওটুকুও খেও না। জামাই বসে আছে তোমার জন্য। আমাদের খিদে পেয়েছে। নাতিটাকে তো একটু কোলেও নিলে না নিচে গিয়ে। চলো বাবা।

যাচ্ছি। শোন, এ বাড়িতে যা যা সব হয় তার জন্য আমাকে দায়ী করিস কেন? আমি তো জোগানদার, আর কিছু তো নই। কোম্পানীতে যেমন সাপ্লায়াররা থাকে, তারা বাইরের লোক, চাহিদামতো জোগান দেয় মাত্র,

ম্যানেজমেন্টে তো তাদের ভূমিকা নেই। তোর মা আর ভাই মিলে আমাকে একরকম টপ্‌কে করে দিয়েছে। আমার ভোটের কোনো দাম নেই।

সেটা জানি। তোমারও দোষ আছে বাবা। তুমি কেন মায়ের গায়ে হাত তুলেছিলে?

সুবীর তলানি হুইস্কিটুকু গেলাসে ঢেলে উত্তেজিত কাঁপা-হাতে একটা চুমুক দিয়ে বলল, পুরোনো কথা তুললে আমি একটু অ্যাজিটেটেড হয়ে পড়ি।

দেখ, আমার হাত কাঁপছে। নার্ভ ঠিক নেই। আজকাল আমি বাড়িতে রাতটা কোনোরকমে কাটাই। আর কোনো সম্পর্ক রাখি না।

খুব খারাপ করো বাবা। সংসারে যদি পুরুষমানুষের কোনো ভূমিকা না থাকে তবে তাতে ভালো হয় না। আমাদেরও হচ্ছে না। আর তুমিও কেমন যেন বিচ্ছিরি হয়ে গেছ। আগে কত স্মার্ট, কত অ্যাজাইল ছিলে। আজ কাল কি তাড়াতাড়ি বুড়ো হওয়ার চেষ্টা করছ?

সুবীর দু হাতে গেলাসটা ধরে একটু ঝুঁকে উল্টোদিকের বাড়িটার একটা জানলার দিকে চেয়ে ছিল। একটা বাহারী লতা জানলার ধার ঘেঁষে ছাদে উঠে যাচেছ। কী উচ্চাশা, ওপরে ওঠবার, ছড়িয়ে পড়বার কী দুর্দম নেশা!

বাবা, চলো।

সুবীর কথাটা কানে তুলল না। আপনমনে বলল, তোর মাকে যে একটা লোক মাঝে মাঝে ফোন করে তা জানিস?

জানি, জানব না কেন?

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে।

তাও জানি।

লোকটাকে আমার একটুও হিংসে হয় না, তোর মায়ের ওপরেও রাগ হয় না। শুধু করুণা হয়।

তোমার তাও হয় না বাবা। তুমি একদম পাথর হয়ে গেছ।

সুবীর ঠাণ্ডা হুইস্কিটা ঢক করে গলা দিয়ে নামিয়ে দিলো। তারপর চিৎপাত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলল, মেঘ করেছে, না রে?

হ্যাঁ। বৃষ্টি এলো বলে।

বড্ড গরম। বৃষ্টিটা হলে বেশ হয়।

তোমাকে মশা কামড়ায় না বাবা?

খুব কামড়ায়, ভীষণ কামড়ায়। তবে আজকাল আর বিশেষ টের পাই না। সয়ে গেছে।

না বাবা ; তুমি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছো। এখানে তো দু মিনিটও দাঁড়ানো যায় না, এখন, এত মশা। ঘরে তবু একটু কম। সন্ধেবেলা স্প্রে করেছিল বোধহয়।

ঘরেও কামড়ায়।

আচ্ছা, তোমাদের কি কারও ঝুমার জন্য কোনো চিন্তা নেই বাবা? এত রাত অবধি মেয়েটা বাইরে কেন থাকবে? আমি আসছি জেনেও বাইরে থাকার মেয়ে তো সে নয়।

আমি ওসব খবর রাখি না। সন্ধেবেলা শুনছিলাম ওর মা ওকে খুব বকেছে আনপার্লামেন্টারি সব ভাষায়। আমি শাওয়ার খুলে শব্দগুলো না শোনবার চেষ্টা করছিলাম। মাগী টাগীও বোধহয় বলছিল। আজকালকার মেয়েরা ওসব ইতর ভাষা ব্যবহার করে বলেও জানা ছিল না।

বকছিল? তাই কি রাগ করে কোথাও লুকিয়ে আছে?

হতে পারে।

কিন্তু আমি তো সব জায়গা খুঁজে এলাম। কোথাও নেই।

পেছনের বাগানটা দেখ তো। অনেক সময়ে ওখানে থাকে। টর্চ নিয়ে যাস। সাপ আছে। চার পাঁচ দিন আগেই একটা গোখরো বেরিয়েছিল।

মা বলছিল কাছেপিঠে কোথাও গেছে!

হতে পারে। কত রাত হয়েছে?

এগারোটা বেজে গেছে। নাঃ, তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। আমি দেখছি।

এই বলে বুলো নেমে এলো ছাদ থেকে। টর্চ নিয়ে পেছনের বাগানটা চক্কর মেরে দেখে এলো। কোথাও ঝুমা নেই। অথচ বাবা দিব্যি ছাদে বসে মদ খাচ্ছে। মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরে শাশুড়ি আর জামাই কথা চলছে। অবু এখনো বান্ধবীকে পৌঁছে দিয়ে ফেরে নি। বাচ্চা চাকরটা বাইরের ঘরে সোফার কাছে মেঝেয় ঘুমোচ্ছে। সুবালা বাসন-টাসন কিছু একটা ধুচ্ছে রান্নাঘরে।

বুলার এত খারাপ লাগছিল। ঝুমার ঘরটা আবার দেখল সে। টেবিলের ওপর একটা খোলা খাতা। পাতা উড়ছে। তারই একটা পাতায় লেখা, যাই। কথাটা মোটেই ভালো লাগল না বুলার। 'যাই' মানে কী? এ কী সুই-সাইডাল নোট?

ফোনটা বাজতেই বুলার বুকটা ধক্‌ করে উঠল। এত রাতে ফোন করে কে? অবু? ঝুমা?

সে গিয়ে ধরল, হ্যাল্লো।

একটা পুরুষ কণ্ঠের হাঁফধরা শব্দ পাওয়া গেল, কে, অর্চনা ?

কী চাই, বলুন তো ?

জানতে চাই, এটা অর্চনার বাড়ি কি না, নাকি রং নাম্বার।

অর্চনারই বাড়ি। তবে মা এখন কাছাকাছি নেই।

আপনি কি বুলা ?

হ্যাঁ। আপনি কে ?

আমি যে-ই হই, আপনার বোন ঝুমাকে কয়েকটা অবাঙালী ছোকরা গাড়ি করে এ বি ব্লকের দিকে নিয়ে গেছে। ওদিকটা ভীষণ ফাঁকা।

কোথায় নিয়ে গেছে ? বলে চিৎকার করে উঠল বুলা।

শুনুন, ঘটনাটা বেশিক্ষণ আগে ঘটে নি। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই ঝুমা যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল ইনটক্সিকেটেড। পা টলছিল। আমি ওই অবস্থা দেখে পিছু নিয়েছিলাম ওর।

তারপর কী হলো ?

একটা গাড়িকে ও হাত দেখিয়ে থামানোর চেষ্টা করে। সেটা থামে নি, কিন্তু ওরা নজর রেখেছিল। ফের ঘুরে এসে ওকে তুলে নেয়।

ঝুমা ইনটক্সিকেটেড ছিল একথা আপনাকে কে বলেছে ?

আমি দেখেছি ও টলছিল। ভালো করে হাঁটতে পারছিল না। মাতালের যেমন হাঁটে তেমনি এলোমেলো পা ফেলছিল।

আপনার নাম কী বলুন তো ! কোথায় থাকেন ?

ওটা বলা যাবে না।

আমার মাকে কি আপনি চেনেন ? প্রথমে তো মায়ের নামই করছিলেন ! আমি চিনি। কিন্তু অর্চনা আমাকে চেনে না। কিন্তু আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করছেন। কয়েক মিনিটের হেরফেরে কত কী হয়ে যেতে পারে। সিচুয়েশনের গুরুত্বটা বুঝে আপনারা কিছু করুন। গাড়ীর নাম্বারটা বলছি, টুকে নিন।

লোকটা শেষদিকে বেশ বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলো বলে ফোনটা রেখে দিলো।

বুলা যতক্ষণ কথা বলছিল ততক্ষণ ঘটনাটা কতখানি গুরুতর তা বুঝতে পারেনি। এখন তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। সে আর্ত একটা চিৎকার দিলো, মা ! মা ! শুনছো ?

দরজা খোলা ছিল। তার আর্ত চিৎকার ওপরের ঘরে শুনতে পেল অর্চনা।

সাড়া দিলো, কী রে, কী হয়েছে ?

শিগগির এসো। ঝুমাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে।

অর্চনা নেমে এলো তাড়াতাড়ি। এলো সুবালা। একটু সময় নিয়ে সুমন্ত্র। বুলা কাউকেই কিছু বলল না। দ্রুত হাতে সে থানার নম্বর ডায়াল করল। তিনবারের চেষ্টায় লাইন পেল।

হ্যালো থানা ? প্লীজ, আপনারা শিগগির আসুন, আমার বোনকে কয়েক-জন ছোকরা ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের ঠিকানাটা নিয়ে নিন…

একটা গম্ভীর গলা বলল, সুবীর বসুর বাড়ী থেকে ফোন করছেন কি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ…

একটু আগেই আর একজন ফোন করে আমাদের খবরটা দিয়েছে। আপনার বোনের নাম ঝুমা তো !

হ্যাঁ, হ্যাঁ…

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি।

প্লীজ, দেরী করবেন না। এখন প্রত্যেকটা মিনিটই ভাইট্যাল।

আমাদের জীপটা একটু বাইরে গেছে। ওয়েট করছি। জীপ এলেই আমরা বেরোচ্ছি।

মাই গড ! জীপ কখন আসবে ?

এখুনি এসে পড়বে।

আপনারা ট্যাকসি করে আসুন, আমরা ভাড়া দিয়ে দেবো। প্লীজ, আর এক মিনিটও দেরী করবেন না।

হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

আমি ঘড়ি দেখছি কিন্তু।

ফোনটা রেখেই বুলা তার মায়ের দিকে তাকাল।

ঝুমা নাকি মদ খেয়েছে, তুমি কিছু জানো ?

অর্চনা আকাশ থেকে পড়ে বলল, মদ খেয়েছে ? কে বলল তোকে ?

তোমার সেই—বলতে গিয়েও থেমে গেল বুলা। তারপর বলল, একজন অচেনা লোক। সে-ই ফোনে খবরটা দিয়েছে।

কারা ওকে ধরে নিয়ে গেছে ?

কী করে বলব ? ঝুমা নাকি নিজেই গাড়িটাকে থামানোর চেষ্টা করেছিল। কয়েকজন ওকে তুলে নিয়েছে।

অর্চনার মুখেচোখে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ ফুটে উঠল বটে, কিন্তু সে বেশ ঠাণ্ডা

গলাতেই বলল, তোর বাবাকে ডেকে আন।

বুলা হতাশ গলায় বলল, বাবা! বাবা কী করবে?

কী করবে তা তাকেই বুঝতে দে। যা, ডেকে আন। এটা তো মদ খেয়ে ফুর্তি করার সময় নয়।

বুলা সিঁড়ি বেয়ে একরকম দৌড়ে ছাদে উঠল।

বাবা!

কী রে?

শিগগির ওঠো। ঝুমাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে।

সুবীরের নেশাটা তেমন জমে নি আজ। মেজাজটা এমনিতেই সব সময়ে খিঁচড়ে থাকে। আজ আরও বেশী। মাথার ভেতরটা যদি সাঁতার না কাটে, যদি না ঘুলিয়ে যায় বাস্তবতা, যদি না দেখা দেয় অদ্ভুত সব ভূতেরা তাহলে এত পয়সার মদ গিলে কী লাভ?

সুবীর কিছুক্ষণ—কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল বুলার দিকে, কী হয়েছে বললি। ঝুমাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে?

ওঠো বাবা, এত কথা বলার সময় নেই। এ বি ব্লকের দিকে গেছে। এক্ষুনি আমাদের কিছু করা দরকার।

সুবীর যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করল। বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেন যে এত নড়ছে! মাথাটা ঘুরপাক খেল। তবু দাঁড়াল সুবীর। বেশ ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। আর সেই হাওয়ায় সারা আকাশময় চলে এল কালো মেঘ। চমকে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ।

সুবীর যখন সিঁড়ির ঘরের দরজায় তখন বৃষ্টিটা নামল।

ট্যাক্সিটা মাঝখানে একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার বনেট খুলে সেটা সারাতে একটু সময় নিল। তারপর চলল।

এসব জায়গা কী ছিল আর কী হয়েছে দেখেছিস? সঞ্জয় বলল।

দেখছি।

ফ্যান্টাস্টিক না? আরকিটেকচারাল এক্সপেরিমেণ্ট সব এসে জুটল সল্ট লেক-এ। আমার কাকা যখন সল্ট লেক-এ লরি লরি মাটি ফেলার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিল তখন প্রায়ই আসতাম। বিশ্বাস হয় নি যে জায়গাটা এরকম দারুণ হবে।

শৌনক একটু হাসল। বলল, জায়গাটার টারগেট ছিল বাঙালীর জন্য পুনর্বাসন। এখন মাড়োয়ারিরা দুনো দামে কিনে নিচ্ছে।

চিড়িয়াটা কে রে?

কোন্ চিড়িয়া?

ওই যে বুলা। তোর সঙ্গে কিছু ছিল?

একটু আধটু ছিল। হবনবিং। নাথিং সিরিয়াস।

দেখতে ভালো কিন্তু। বরটা একটু ন্যাদস মার্কা।

ওরকমই হয়। এদেশে ম্যাচমেকিং বলে কিছু নেই। বরটা যদি ভালো হলো তো বউটার দিকে তাকানো যায় না। বউটা যদি সুন্দর তো বরটা পিপে। কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই।

তবে বুলার মা কিন্তু হেভি সুন্দর। এখনো যা আছে—

খেলোয়াড় মেয়েছেলে। চোখ ফোক দেখেছিস! কটাক্ষ আর কাকে বলে! রেলাও খুব। বুলার কাছে শুনেছি খুব প্যার্সোন্যালিটি আছে। আরে! ওটা কে রে রাস্তার মাঝখানে হাত দেখাচ্ছে! এই ড্রাইভার, রোখকে···ড্রাইভার গাড়ি থামাল না। বরং অ্যাকসেলেটর চেপে বোঁ করে গাড়িটা এগিয়ে নিতে নিতে বলল, দাদা, অনেক রাত হয়েছে। এসব জায়গা রাতের দিকে ভালো নয়।

শৌনক আর সঞ্জয় দুজনেই ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকার রাস্তায় চেয়ে দেখল। লোকটাকে দেখা গেল না।

সঞ্জয় একটা ধমক দিয়ে বলল, গাড়িটা ঘোরান তো! লোকটা কিছু একটা চেঁচিয়ে বলছিল।

রিস্ক নেবেন না দাদা। ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবেন।

শৌনক ঠান্ডা গলায় বলল, আমরা ঝঞ্ঝাটই পছন্দ করি। গাড়ি ঘোরান। অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছি, আমাদের কিছু হবে না।

লোকটা অগত্যা গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল।

একটু জোরে চলুন। লোকটা হয়তো এতক্ষণে রাস্তা বদলে ফেলেছে।

সঞ্জয় একটু জোরে বলে উঠল, না না, ওই তো!

একজন যুবক রাস্তা ধরে দৌড়ে আসছিল। হেড লাইটের আলো পড়তেই ফের হাত তুলে চেঁচাল। বেঁধে দাদা, ভীষণ বিপদ। একটু হেলপ করুন।

শৌনক গলা বার করে বলল, কী হয়েছে?

একটা মেয়েকে কয়েকটা ছেলে একটা অ্যামবাসাডারে তুলে নিয়ে গেছে ওই দিকে। গাড়ির নম্বর ডবলিউ বি সি ওয়ান থ্রি···

আপনি গাড়িতে উঠুন। চলুন দেখছি।

ছেলেটা জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, যেতে পারি। কিন্তু মেয়েটার বাড়িতে একটা ফোন করে খবরটা আগে দেওয়া দরকার। কিন্তু ফোন করতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ওরা বেশীদূরে যায় নি। ডানদিকে ওই এ বি ব্লকে ঢুকলে সামনে একটা পার্ক আছে। আমার ধারণা ওখানে নিয়ে গেছে। প্লীজ, আপনারা একটু হেল্প করুন।

সঞ্জয় একটু চটে গিয়ে বলে, বাঃ মশাই, আমরা সীতা উদ্ধার করব আর আপনি ফোন করার নাম করে কেটে পড়বেন, তাই হয় নাকি ?

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলল, তাহলে প্লীজ একটু অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি, সামনে এক ডাক্তারের বাড়ি আছে যদি ফোন করতে পারি। একটু ওয়েট করবেন তো !

শৌনক ভরাট গলায় বলল, করছি। পালাব না। যান।

ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল।

ড্রাইভার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ঝঞ্চাট পাকিয়ে ফেললেন স্যার। আমার গ্যারেজ কোথায় জানেন ? সেই বৈষ্ণবঘাটা।

সঞ্জয় বলল, আমরা তো সাউথেই যাবো, বলেইছি। মিটাব উঠেছে।

সে তো বুঝলাম। হাঙ্গামায় পড়ে গেলে তো রাতও কাবার হয়ে যেতে পারে।

শৌনক ঠাণ্ডা গলায় বলল, হলে হবে। আপনি তো মানুষ। কেউ বিপদে পড়লে মানুষকেই এগোতে হয়।

ড্রাইভারটা আর কথা বলল না। চুপচাপ সিগারেট টেনে যেতে লাগল। সঞ্জয় নেমে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে বলল, শৌনক, লোকটা গেল কোথায় রে ?

ওই লাল বাড়িটায় ঢুকেছে। আমি নজর রাখছি।

এ পাড়ার লোকগুলো কি খুব আরলি শুয়ে পড়ে ? বেশীর ভাগ বাড়িই অন্ধকার দেখেছিস ?

নির্জন জায়গায় বোধহয় তাড়াতাড়ি ঘুম পায়। পাহাড়ে আমাদেরও পেত। মনে আছে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে তিন দিন আমরা কিরকম সন্ধে হতে না হতেই ওই শীতেও ঘুমিয়ে পড়তাম ! শিখু সিং ঘুম থেকে তুলে গরম খিচুড়ি খাওয়াত।

সঞ্জয় গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, মাইরি কী কপাল বল তো ! এতদিন পাহাড় পর্বত ভেঙে বাড়িতে ফিরছি, কোথায় গিয়ে এখন গরম ভাত

খেয়ে বিছানায় শুয়ে টানা আঠারো ঘণ্টাই ঘুমোবো, না জুটল এসে নারীহরণ।

লাগেজ বুটটা খুলে তোর চপারটা বের কর।

কী হবে ?

যদি ওরা আর্মড হয়ে থাকে !

আরে না, ফুর্তিবাজ ছেলেছোকরাই হবে। এমন হাঁক মারব যে পালাবে।

ড্রাইভার হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে বলল, স্যার, আপনারা খুব পাহাড়ে চড়েন, না ?

জবাবটা দিলো শৌনক, হ্যাঁ।

সেইজন্যেই বেশ কারেজ আছে আপনাদের। অন্য সব সওয়ারী হলে পালাত।

হ্যাঁ, আমরা একটু অন্যরকম। হাঙ্গামা পছন্দ করি।

সে স্যার আমিও করি। নইলে গাড়ি না ঘুরিয়ে সোজা সল্ট লেক পার হয়ে যেতাম।

তাই [illegible] যাচ্ছিলেন।

ড্রাইভার একটু নরম গলায় বলল, সেটা হাঙ্গামার ভয়ে নয় স্যার আমার একটা মাত্র মেয়ে। ছোট্ট। সে খুব জ্বরে ভুগছে। সকালে একশ চার দেখে এসেছি। মনটা ভালো নেই।

এ কথায় সঞ্জয় আর শৌনক একটু মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিল।

সঞ্জয় বলল, ঠিক আছে, মিটারের ওপর কিছু দিয়ে দেবো।

তার দরকার নেই। আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি।

এরপর তিনজন একটু চুপচাপ হয়ে গেল।

লালবাড়ির দরজা খুলে ছেলেটা বেরিয়ে এল। পেছনে একজন মহিলা আর একজন পুরুষ।

মহিলাটি ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে সামান্য উঁচু গলায় বললেন, খুব চিন্তায় থাকব। মেয়েটার কী হলো কাল একবার জানিয়ে যাবেন কিন্তু।

ছেলেটা ট্যাক্সির দিকে আসতে আসতে বলল, ঠিক আছে।

ছেলেটা এখনো হাঁফাচ্ছে। সামনের দরজাটা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ে বলল, চলুন। আমি পথ দেখাচ্ছি।

সঞ্জয় পিছন থেকে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল, মেয়েটা আপনার কে হয় বলুন তো !

ছেলেটা এ কথার চটজলদি জবাব দিলো না। কেন দিলো না কে জানে।

সামান্য একটু সময় নিয়ে বলল, কে আর হবে পাড়ার মেয়ে। চিনি।

কেমন মেয়ে ?

ভালোই। কেন বলুন তো !

কলকাতায় সল্ট লেক-এর মতো পাড়া থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়াটা খুব সাধারণ ব্যাপার নয় কিনা। ইন ফ্যাকট কলকাতা শহরেই এরকম ঘটনা খুব কম ঘটে।

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, তা ঠিক।

তাহলে কেসটা কী ?

ছেলেটা ফের একটু সময় নিয়ে বলল, মেয়েটা যতদূর জানি, ভালো। কিন্তু আজ মেয়েটা খুব স্বাভাবিক ছিল না।

কিরকম ছিল ?

মনে হচ্ছিল ইনটক্সিকেটেড।

মালটাল টানে নাকি ?

সেরকম কথা তো নয়।

তাহলে মেয়েটা ভালো বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন কেন ? মাল টেনে রাত-বিরেতে বাড়ি থেকে বেরোয়।

শৌনক এতক্ষণ কথা বলে নি। এবার বলল, মেয়েটা কি একা ছিল ? নাকি আপনি ওর সঙ্গে ছিলেন ?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, আমি সঙ্গে থাকব কেন ? আর থাকলে ওকে কি তুলে নেওয়া সহজ হতো ?

কিভাবে নিল জোর করে ?

ছেলেটা আবার সময় নিয়ে বলল, না। ঝুমা নিজেই লিফট চাইছিল।

ঝুমা ! নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে। কার মেয়ে বলুন তো ?

ওর বাবার নাম সুবীর বোস।

সুবীর বোস ? লে হালুয়া, এ কি বুলার সেই বোনটা নাকি ?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল, ওরা খুব ঝুমা ঝুমা করছিল বটে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

শৌনক প্রায় চিৎকার করে বলল, মাই গড !

সঞ্জয় ছেলেটার ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আপনার নাম কী ?

নাম নিয়ে কী হবে ?

খুব খারাপ নাম নাকি ? গজানন ফজানন নয় তো !

না। আমার নাম জন্মেজয় দত্ত।

ঠিকানা? ব্লক বি বি, ছেষট্টি। এইবার ডান দিকে।

ট্যাক্সি ডানদিকে মোড় নিতেই বোঝা গেল, এদিকটায় বসতি একদম গড়ে ওঠে নি। এমন কি রাস্তাটাও ভালো নয়। রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে। দু ধারে অন্ধকার খালি প্লট।

জন্মেজয় বলল, আর একটু এগোলেই পার্ক।

শৌনক গাড়ির হ্যান্ডেল ধরেই বসে ছিল। গাড়ির হেডলাইটে দেখা গেল সামনে পার্ক নয়, একটা প্রায়-জঙ্গল। আসলে প্রস্তাবিত পার্ক। এখন শুধু দেয়াল দিয়ে ঘেরা অনেকটা জমি। প্রচুর আগাছা আর বড় গাছের ভীড়।

তিনজন তিনটে দরজা দিয়ে ছিটকে নামল। শৌনক চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে বলল, হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রাখুন।

সঞ্জয় বলল, কিন্তু গাড়িটা কোথায়?

জন্মেজয় বাঁ দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে বলল, ওইদিকে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে। আসুন।

তিনজনেই প্রায় সমান্তরাল ছুটল। জন্মেজয় একটু আগে।

পঞ্চাশ গজ এগোতেই দেখা গেল, পার্কের দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে পরিত্যক্ত অ্যাম্বাসাডারটা নিঃঝুম দাঁড়িয়ে। দরজা লক করা।

কী হচ্ছে কী দাদা? এসব কী? এ আমাদের ফ্রেন্ড আছে। গার্ল ফ্রেন্ড।

সঞ্জয় ছেলেটার গালে একটা চড় মারল। এত জোরে যে, একটা পটকা ফাটার মতো শব্দ হলো। বলল, শুয়োরের বাচ্চা, তোমার গার্ল ফ্রেন্ড! চল শালা থানায়, গার্ল ফ্রেন্ড দেখাচ্ছি।

ছেলেগুলো ভেড়ুয়াই হবে। হঠাৎ চারজন যুবক অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে হুড়মুড় করে নেমে ছুটে পালাতে লাগল।

শ্বশুরবাড়িতে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে এই যে পথটা পার হতে হয়েছে, পোয়াতে হয়েছে বিবিধ ঝক্কাট, অ্যাটাচি হারিয়েছে, পুলিশের কাছে যেতে হয়েছে এতেও দিনের গর্দিশ শেষ হয় নি। শ্বশুরবাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে নির্ঝঞ্ঝাট রাতটা কাটাবে তেমন কপাল কি সুমন্ত্র? কোথাও কিছু না, স্রেফ তাকে হয়রান করার জন্যই শালাটা গায়েব হলো।

শ্বশুরের পা টলছে, শালা বেপাত্তা, চোরদায়ে ধরা পড়ল সুমন্ত্র।

ওগো, তুমি কী করছো ? একটা ছাতা আর টর্চ নিয়ে বেরোতে পারছ না ? এ বি ব্লক, ওদিকটায় একটা পার্ক আছে। যাও না ··

সুমন্ত্র জলে-ডোবা মানুষের মতো চারদিকে চাইল। কোনো উপায় নেই। পেট চুঁই চুঁই করছে খিদেয়, বিছানা তাকে চুম্বকের মতো টানছে। আর বাইরে এখন চলছে দামাল হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি।

সুমন্ত্র অনিচ্ছুক হাতটা বাড়াল। দু হাতই। ছাতা আর টর্চ তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বুলা বলল, মারপিট করতে যেও না। বিপদ দেখলে চেঁচিও। সুমন্ত্রকে একথাটা বলার মানেই হয় না। জীবনে সে কখনো মারপিট করেনি। সেটা বুলাও জানে। কথাটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবেও নেওয়া যায়। অন্তত বুলার তো ভয় আছে যে, সুমন্ত্র মারপিট করলেও করতে পারে! সদর খুলে বেরোতেই দুর্যোগময়ী রাত্রি যেন ডাকিনীর মতো অট্টহাসি হেসে উঠল। আয় রে ন্যালা-ভোলা ক্ষ্যাপা ছেলে তোকে নিয়ে মজা করি। সঞ্জয় নিচু হয়ে সামনের ডানদিকের চাকার হাওয়া খুলে দিতে লাগল। বলল, যাতে পালাতে না পারে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোরা দেখ। দেখলে হাঁক মারিস।

জন্মেজয় আর শৌনক নিচু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকল।

অন্ধকার বেশ ঘন। তার ওপর হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো গাছপালায় মোহময় শব্দ তুলে!

জন্মেজয় উত্তেজিত গলায় বলল, ঝুমার নাম ধরে চেঁচাবো ?

শৌনক হাত তুলে বলল, বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ওরা নিশ্চয়ই শেলটার নিতে গাড়ির দিকেই আসবে।

সেটা তো অনুমান। যদি না আসে ? চেঁচালে উই হ্যাভ নাথিং টু লুজ। জন্মেজয়কে চেঁচাতে হলো না। চেঁচাল ঝুমাই। পার্কের ভেতরে কংক্রিটের একটা গোল ঘর তৈরি হবে বলে ঢালাই হয়ে পড়ে আছে কিছুদিন। দেয়াল নেই, শুধুই ছাদ আর মেঝে। সেদিক থেকেই হঠাৎ ঝুমার চিৎকার ভেসে এলো. মেঘের পর মেঘ জমেছে ·

সম্পূর্ণ বেসুরো বেতালা গলায় গান গেয়ে উঠল ঝুমা। তারপর খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি হতে লাগল।

জন্মেজয় অন্ধকারেই শৌনকের দিকে তাকাল, ওই তো!

শৌনক মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু এ তো আর্ত চিৎকার নয়। মনে হচ্ছে ফূর্তিতেই আছে। চলুন, দেখি।

সঞ্জয় দেয়ালটা টপকে নেমে পড়েছে পার্কে। বলল, কী হচ্ছে রে ওখানে ?

মাইফেল নাকি ?

জন্মেজয় খুব দৃঢ় স্বরে বলল, মেয়েটা ওরকম নয়। কেন মদ খেল, কেন অচেনা কিছু ছোকরার সঙ্গে গাড়িতে উঠে চলে এল সেটা বুঝতেই পারছি না।

শৌনক গম্ভীর হয়ে বলল, এনিওয়ে, মেয়েটাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে।

সঞ্জয় বলল, কেসটা অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স গুরু ? এ তো রেপ কেস নয়।

তাই তো মনে হচ্ছে। চল দেখা যাক। পর্প কিচ্ছু করার দরকার নেই। মেয়েটা তো উইলিং বলেই মনে হচ্ছে।

জঙ্গলে বৃষ্টিপাতের একটা গহীন রহস্যময় শব্দ উঠছিল। চার যুবক ও এক কিশোরী আদিম মানব মানবীর মতো দুর্বোধ্য হেসে উঠল হঠাৎ। আর তিনটে ছায়ামূর্তির মতো শৌনক, সঞ্জয় আর জন্মেজয় ধীর পায়ে পাশাপাশি উঠে এল একই ছাদের নিচে।

দৃশ্যটা খানিকটা অশ্লীল। আবার অন্যভাবে দেখলে, তেমন কিছু নয়। সম্ভবত বিস্তর হিন্দি সিনেমা দেখেছে ঝুমা। সেইরকমই একটা ভঙ্গিতে সে একটা ছেলের কোলে মাথা রেখে শুয়ে গান গাইবার চেষ্টা করছে। ছেলেগুলো মৃত পশুর চারপাশে শকুনের মতো ঘিরে আছে তাকে। ঝুমার পায়ে হাত বোলাচ্ছে একজন, অন্যেরা অন্যান্য জায়গায়। মাঝে মাঝে সম্ভবত সুড়সুড়িতেই খিলখিল করে হেসে উঠছে ঝুমা। তিনজন আগন্তুকের আগমন মিনিট খানেক তারা টের পেল না।

তারপর একজন হঠাৎ টান টান হয়ে বলল, কওন ?

চারজন বনাম তিনজন। ঝুমা কোন্ দলে তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত ওই দলেই। সেক্ষেত্রে তিনজন বনাম পাঁচজন।

চারজন অবাঙালি যুবকের একজন উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে ভাঙা বাংলায় বলল, কী দাদা, কী চাই ?

শৌনক কাউকে কিছু বলল না, শুধু নিচু হয়ে ঝুমার হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল।

একটা বাজ এমন কান ঘেঁষে পড়ল যে সুমন্ত্র যেন ঝলসে গেল তার তাপে। আর কানদুটো ভোঁ ভোঁ হয়ে গেল।

বরাবরই লক্ষ্য করেছে সুমন্ত্র যে, তার কপালে সবকিছু এরকমই হয়।

রাস্তায় নামতেই অটোমেটিক ছাতাটা প্রবল বাতাসে ঝড়াক করে উল্টে গেল। ইচ্ছে হলো, ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির ছাতা বলে ফেলল

না। শুধু রাগ করে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে দিলো। পরে খুঁজে নিলেই হবে।

প্রবল বৃষ্টিতে চোখের পলকে কাকভেজা হয়ে গেল সুমন্ত্র। অন্ধকারে অচেনা রাস্তার সে কোথায় চলেছে তাও বুঝতে পারছিল না। বুলা শুধু অনির্দিষ্ট একটা ইংগিত দিয়েছে, এ বি ব্লকটা কোন্ দিকে। রাস্তায় একটাও লোক নেই যাকে জিজ্ঞেস করা যায়। কোনো বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞেস করতে গেলে কপালে মারধর অপমান জোটা বিচিত্র নয়।

মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বটে, কিন্তু লোডশেডিং-এর নিবিড় অন্ধকারের তাতে কোনো উপকার হচ্ছে না। সুমন্ত্র কিছুক্ষণ পরেই রাস্তা গুলিয়ে ফেলল। ভয় হচ্ছিল, শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতে পারবে কিনা আদৌ।

কংক্রিটের দিক নির্দেশক একটা পেয়ে গেল সুমন্ত্র। টর্চের আলো জ্বালতে গিয়ে দেখল, সেটা জ্বলছে না। দোষ নেই। জল ঢুকেছে টর্চে! অগত্যা উবু হয়ে বসে বিদ্যুৎ-চমকে পড়ে নিল এ বি ব্লক ডানদিকে।

কিন্তু ডানদিকের রাস্তায় ঢুকেই সুমন্ত্র বুঝতে পারল, এদিকে বাড়িঘর নেই। লোক চলাচলের অভাবে রাস্তায় দুর্বাঘাস গজিয়েছে। দু' ধারে ফাঁকা ভূতুড়ে সব প্লট এবং প্রচুর আগাছা।

স্বাভাবিক অবস্থায় সুমন্ত্র ভগবানে বিশ্বাস করে না। কিংবা করলেও সে তা জানে না। সোজা কথায় ভগবান আছে কি নেই তা নিয়ে সুমন্ত্র মাথাও ঘামায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে বিপদে পড়লে তার মনে হয় ভগবান থাকলে বেশ হতো।

আছো নাকি হে? সুমন্ত্র একবার জিজ্ঞেসও করে ফেলল ভগবানকে! কিন্তু জবাব পেল না। বৃষ্টির ঝরোখায় ঢাকা চারদিকটাকে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। কোথায় যাবে সে? কী করবে?

একটা গাড়ির হেডলাইট আদিম অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো হঠাৎ। তার তখন লক্ষ বল্লমের মতো ছুটে আসা বৃষ্টির খরশান চেহারাটা দেখতে পেল সুমন্ত্র।

গাড়িতে অনেক দূরে। সুমন্ত্র তার আলো লক্ষ্য করে একরকম ছুটতে লাগল। সামনেই একটা নিচু দেয়াল। ওটাই কি সেই পার্ক? ভেতরটা জঙ্গলে ভরা।

গাড়িটা এদিকে এল না। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে ভীষণ জোরে বেরিয়ে গেল।

মাথায় ক্রমান্বয়ে চাঁটি মেরে যাচ্ছে টোপা টোপা বৃষ্টির ফোঁটা। ডুগডুগ শব্দ

হচ্ছে। ঝুমাকে যারা ধরে নিয়ে গেছে তারা কি ওই গাড়িতে পালিয়ে গেল ?

সুমন্ত্র পার্কের কাছাকাছি এসে গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এখন কী করবে সে ? কী করা উচিত ? পৃথিবীর কেজো ও সাহসী মানুষেরা এইরকম পরিস্থিতিতে কী করে থাকে ?

আর একটা গাড়ির হেডলাইটও প্রায় একই জায়গায় জ্বলে উঠতে দেখল সুমন্ত্র। সেই গাড়িটাও অন্য পথ দিয়ে চলে গেল।

কিছু একটা করা উচিত, এরকম একটা অনিচ্ছুক তাগিদে সুমন্ত্র পার্কের দেয়ালটা ডিঙোবে বলে দুহাতে রেলিংটা চেপে ধরল।

উঠতে যাবে, ঠিক এমন সময় রাস্তা থেকে একটা গাড়ি ডানদিকে মোড় নিয়ে সোজা পার্কের দিকে চলে আসতে লাগল। হেড লাইটের চোখ ধাঁধানো আলো সোজা তার ওপর পড়েছে।

সুমন্ত্র সভয়ে পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য দু হাতে চাড় দিয়ে রেলিং-এ ওঠবার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে গিয়ে হড়কে পড়ে গেল নিচে। আর একটা মোটা গলা চেঁচিয়ে একটা ধমক দিলো তাকে অ্যাই, খবর্দার নড়বে না !

সুমন্ত্র নড়ল না। এমন কি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা পর্যন্ত করল না। জলকাদার ওপর অতিশয় স্থিরভাবে বসে দেখল, গাড়িটা পুলিশের জীপ। তিনজন বর্ষাতিঢাকা লোক নামল। সঙ্গে এক মহিলাও।

এ কী ! তুমি এখানে বসে রয়েছো কেন ? কী হলো তোমার ?

গলাটা বুলার !

এবার সুমন্ত্র উঠে দাঁড়াল ! কিছু বলার মতো অবস্থা নয়।

কাউকে দেখেছো ?

সুমন্ত্র মাথা নেড়ে বলল, দুটো গাড়ি ওই দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েক মিনিট হলো চলে গেছে।

পুলিশের তিনজন লোকের একজন বুলার দিকে চেয়ে বলল, আপনার হাজব্যান্ড ?

হ্যাঁ।

আপনারা জীপে উঠে বসুন, আমরা দেখছি।

সুমন্ত্র আর বুলা জীপে উঠে বসল। ড্রাইভারও পুলিশের লোক। মুখ ফিরিয়ে বলল, চিন্তা করবেন না। ওয়ারলেসে খবর চলে গেছে। সল্ট লেক থেকে বেরোনোর রাস্তায় গাড়ি চেক করা হবে।

বুলা আর সুমন্ত্র কোনো কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন পুলিশ ফিরে এসে জীপে উঠল।

বুলা আর্তস্বরে বলল, কী হলো ?

বোঝা যাচ্ছে না কিছু। পার্কে কেউ নেই। যে-লোকটা ফোন করেছিল তাকে কোনোরকমে ট্রেস করা গেলে হতো।

লোকটা যে নাম বলল না।

এই লোকটাই আপনার মাকে মাঝে মাঝে ফোন করে ?

হ্যাঁ।

অ্যাননিমাস কল ?

হ্যাঁ।

স্ট্রেঞ্জ!

জীপটা আবার চলতে লাগল।

সুমন্ত্র নিজেকে নিজেই মনে মনে প্রশ্ন করছিল, আমি কি ভীষণ কাপুরুষ ? ভীষণ ? বুলার চোখে এখন আমি কিরকম ? পুলিশরা আমাকে কী ভাবছে ?

ডাইনিং টেবিলের দুটো চেয়ারে আসামীর ভঙ্গিতে বসে আছে সুবীর আর অর্চনা। সামনে দু পা দুদিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল নেড়ে অনেকটা থিয়েটারী ভঙ্গিতে অবু চিৎকার করছিল, তোমরা! তোমরাই এর জন্য দায়ী। প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছো, এখন যা খুশি করছো। এই অসভ্য লোকটা সংসারের দায় ঘাড়ে নেয় না, কোনো রেসপনসিবিলিটি নেই, ছাদে বসে মদ খাওয়াই এই লোকটার এখন একমাত্র কাজ। লাথি মারতে মারতে বের করে দিতে হয় এসব লোককে বাড়ি থেকে

অর্চনা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে অশ্রু রোধ করল। বলল, তোর বন্ধু-বান্ধবদের টেলিফোনে একটু খবর দে না। সবাইকে অ্যালার্ট করাটা ভীষণ দরকার। কোথায় গেছে তার তো ঠিক নেই!

অবু গলা আরও তুলে বলল, কার দায় পড়েছে এই ব্যাড ওয়েদারে তোমার মেয়েকে খুঁজতে বেরোবে ? ঝুমা তো আর কচি খুকি নয়। যা করেছে ভেবে-চিন্তেই করেছে।

ঝুমার জন্য কোনো দুশ্চিন্তাই করছিল না সুবীর। সে তো জানে পৃথিবীর সব সমস্যারই একটা না একটা সমাধান হয়ই। শুধু টাইম ফ্যাক্টর। সময়ই সব সমস্যার নিরসন করে দেয়। যে নিখোঁজ হয় সে যদি আর ফিরে নাও আসে

তাহলেও একদিন সবাই তার কথা ভোলে। যে মরে যায় সে হয়তো কত অসহায় অবস্থায় ফেলে যায় তার পরিবার-পরিজনকে। কিন্তু মরে বেঁচে লড়াই করে সেই পরিবারটাও হয়তো টিঁকে যায় শেষ পর্যন্ত, বা লোপাট হয়ে যায়। কিছু একটা হয়। কোনো কিছুই চিরকাল থাবা গেড়ে তো থাকতে পারে না। সুবীর তাই মনে মনে ঝুমাকে আজ পৃথিবীর হাতে সমর্পণ করেছে। তার আর কোনো চিন্তা নেই।

সামনে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে তার দিকে কিছুটা বিস্ময়ভরে চেয়ে আছে সুবীর। এই যুবকটিও একটি টাইম ফ্যাক্টরের প্রোডাক্ট। যখন ছোটো ছিল তখন শিশু অবস্থায় যুবকটি ছিল খুবই নরম সরম মেয়েলী ধরনের, আর খুব ভীতু। পড়ত কো-এডুকেশনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। প্রচুর ফুটফুটে মেয়ের দঙ্গলে ছেলেটা একরকম হারিয়ে যেত। সুবীর একটু ভয় পেয়েছিল, ছেলেটার মধ্যে পৌরুষের অভাব দেখা দেবে না তো! তাই সুবীর শিশুটির মধ্যে পুরুষালী হাবভাব সঞ্চার করার জন্য রোজ সকালে নিয়ে যেত লেক-এর ধারে। ছেলে আর বাবা দৌড়োতো কেডস পরে। সাইকেল চালানো শেখাল ছেলেকে, সাঁতার শেখাল, তারপর ভর্তি করল একটা ফুটবল ক্লাবে। কিশোর বয়সে হাতে পায়ে রীতিমতো সবল ও রুক্ষ হয়ে উঠল অবু। ঠিক যেমনটি সুবীর চেয়েছিল। ওর গা থেকে পুরুষালী তাপ আর গন্ধ পেত সুবীর। খুশি হতো। বাপের ন্যাওটা এবং বশবর্তী সেই শিশুটিই যখন আজ এই বিদ্রোহী যুবকের রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেটিকেও পৃথিবীর নিয়ম বলেই মেনে নেয় সুবীর। সে আজকাল সবকিছুই মেনে নিতে শিখেছে।

বুকে যে ব্যথাটা থাবা মেরে আছে সেই থেকে সেটাও কি নিয়ম?

অবু চিৎকার করছিল আমাকে বলে কী লাভ? আমি কিছু করতে পারব না। রেসপনসিবিলিটি তোমাদের, তোমরা বোঝো গে!

অর্চনা নরম সুরে বলল, তুই অত রেগে যাচ্ছিস কেন? বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ওরা সবাই গেছে, খবর একটা আসবেই। তুই শুধু একটু গিয়ে ঘুরে আয়। জামাই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল

গেছে যাক। তোমার ননীর পুতুল জামাই আর একজন অপদার্থ। লোকটাকে দেখলেই ঘেন্না হয়

শিশুটিকে বড় করতে অনেক খরচ হয়েছিল সুবীরের। দুজন প্রাইভেট টিউটর, প্রচুর জামাকাপড়, সাইকেল, খেলনা, বিভিন্ন ক্লাবের খরচ। শিশুটি এখন বাস্তবিকই বড় হয়েছে। বাহবা দেওয়ার মতন, হাততালি দেওয়ার মতো বড়।

বুকের ব্যথাটা আচমকা বেড়ে ফের একটু কমে গেল। সুবীর একটু ককিয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জলের জগটা নিল সুবীর। পেটে গ্যাস জমে গিয়ে থাকবে। হার্টে চাপ দিচ্ছে। ঠাণ্ডা জল খানিকটা খেয়ে নিল সুবীর। একটা ঢেঁকুর তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু উঠল না।

শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছে। এই অবস্থায় যুবকটি আরও চেঁচালে তার অসুবিধে হবে।

চুপ! সুবীর হিংস্র গলায় যুবকটিকে বলল।

যুবকটি তার মাকে কিছু বলছিল। ভালো শুনতে পাচ্ছিল না সুবীর। সম্ভবত সুবীরের হিংস্র গলার 'চুপ' শব্দটাও যুবকটি শুনতে পায় নি। হাত পা নেড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

চেঁচাল আইকও। অনেকক্ষণ সহ্য করেছে, আর পারল না।

আউফ! আউফ! আউফ!

একটা গাড়ির শব্দ হলো কি? নাও হতে পারে! সুবীর উঠে দাঁড়ানোর একটা চেষ্টা করল।

গাড়িটা ফটকের সামনে থেমেছে।

বুলা! বুলা! মাসীমা!

সেই ডাকে অর্চনা, অবু, সুবালা, আইক সবাই ছুটে গেল বাইরে।

যেতে পারল না সুবীর। তার কাছে এক পদক্ষেপের দূরত্বও এখন অসীম। তবু সে বুকের প্রচণ্ড ব্যথাটাকে হাত দিয়ে ঘষে মিশিয়ে দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করল। তারপর দেয়াল ধরে নিজের ঘরে এল সে। বাতিটা নেবালো। ভালোই।

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় ঢুকল সুবীর। তারপর উপুড় হয়ে পড়ে রইল। ব্যথা! বড় ব্যথা! ঘাম দিচ্ছে কপালে। শিথিল হয়ে যাচ্ছে হাত পা।

সুবীর চোখ বুজল। তারপর একবার কাউকে ডাকবার চেষ্টা করল। কাকে ডাকল তা সে জানে না। এ বাড়িতে কে আছে তার?

সম্ভবত সে ডাকল, মা।

তারপরেই চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল তার।

ঝুমাকে যখন চড়া আলোর সামনে বাইরের ঘরের মাঝখানে এনে দাঁড় করানো হলো তখনও সে ঘোর মাতাল। টলছে, পড়ো-পড়ো হয়েও দাঁড়াচ্ছে বলছে, ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও···

অর্চনা একটা থাপ্পড় তুলেছিল, শৌনক আটকাল, মারবেন না। বরং যদি পারেন খানিকটা তেঁতুলজল খাইয়ে দিন। বমি করলে নেশা কেটে যাবে। আর নইলে জাস্ট শুইয়ে দিন। ঘুমোক।

তোমরা যা করলে…

তৃতীয় যুবকটিকে ভালো লক্ষ্য করে নি অর্চনা। একটু পিছিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। শৌনক তাকে সামনে টেনে এনে বলল, একে তো বোধহয় চেনেন। জন্মেজয় দত্ত। আপনাদের প্রতিবেশী। ইন ফ্যাকট ইনি না থাকলে কী যে হতো। চেনেন না একে ? ইনিই তো ফোন করেছিলেন…

ফোন ˆ আচমকা অর্চনা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। ছিপছিপে লাজুক সুদর্শন এই যুবকটিই কি তাহলে—

কাতরস্বরে ঝুমা বলছিল, ছেড়ে দাও না আমাকে… আমি ওদের সঙ্গে যাবো। কত আদর করছিল ওরা জানো ? তোমাদের মতো পাষাণ তো নয়। পায়ে পড়ি… ছেড়ে দাও।

ঝুমা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। জন্মেজয় ওকে ধরে ফেলল পেছন থেকে। জরুরী গলায় বলল, ওর শোওয়ার ঘরটা কোন্ দিকে বলুন তো।

অর্চনা গলার স্বরটা শুনে আর একবার শিহরিত হলো। এই তো সেই কণ্ঠ-স্বর ! সে তাড়াতাড়ি মেয়ের অন্য হাতটা ধরে বলল, আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

ঝুমার অন্ধকার ঘরে পা দিয়েই অর্চনা দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। ঘুম-আলোর সুইচ টিপতেই এক মায়াময় সবুজে ভরে গেল ঘর। ঝুমাকে বিছানায় শোওয়ানোর অপেক্ষামাত্র। বালিশে মাথা রেখেই সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ধীরে মুখ তুলল অর্চনা। মুখোমুখি জন্মেজয়। চোখে চে ˆ। আমি যাচ্ছি। একটা কথা ছিল।

বলুন।

আপনার গলার স্বরটা আমার এত চেনা লাগছে কেন বলুন তো ?

অ্যাঁ ! ওঃ !

আপনি আমাদের ফোন নম্বর জানলেন কী করে ?

ডিম লাইটের মৃদু আভায় মুখের ভাব তো বোঝা যায় না। অর্চনাও বুঝতে পারল না। ছেলেটা চোখটা নামিয়ে নিল।

অর্চনা মৃদু স্বরে বলল, আমি কিন্তু রাগ করছি না।

জন্মেজয় হাঁফ-ধরা স্বরে বলল, দরজাটা খুলে দিন।

অর্চনা একটু হেসে বলল, এত ভয় ! টেলিফোনে তো দেখি খুব সাহস !

দরজাটা খুলে দিলো অর্চনা। ধীর পায়ে ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অর্চনা আপনমনে একটু হেসে বলল, বেচারা!

ওরা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ অর্চনার মনের মধ্যে একটা শব্দ ঘুরে ঘুরে টক্কর খেতে লাগল আর কতবার যে বিদ্যুৎ স্পর্শ করল তাকে। জন্মেজয়! জন্মেজয়! সে কি বয়ঃসন্ধিতে ফিরে গেল নাকি? শরীর ও মনে এত পিপাসা জমা হয়েছিল তার সে তো কখনো টের পায়নি! ভেতরে যেন সেতার বেজে যাচ্ছে অবিরল।

তার এই ঘোরের মধ্যেই একটা জীপ এসে থামল। পেছনে তিনজন পুলিশের চালচিত্র নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল বুলা আর সুমন্ত।

মা! ঝুমা!

ঘোরলাগা ভাবটা কাটে নি অর্চনার। পৃথিবীকে ভারী নতুন লাগছে তার। যেন এরকম ছিল না কিছুই এর আগে। আচমকা বিবর্ণ বসন ছেড়ে এক নতুন পৃথিবী জেগে উঠল চারধারে। কী রং, কত না জেল্লা তার!

জড়োসড়ো ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল অর্চনা, চিন্তা নেই। ঝুমা ফিরেছে। কিছু হয় নি, সব ঠিক আছে।

ক্লান্ত বুলা 'উঃ' বলে মুখ ঢেকে সোফায় বসে পড়ল।

অকারণে আইক বিষণ্ণ দীর্ঘ আওয়াজ তুলল, আউফ! আউফ! আউফ!

আইক আরও একবার ডাকল। মধ্যরাতে।

সেই শব্দে সুবীরের চোখ মেলল। বড় ক্লান্তি, বড় ভার বুকে। কে যেন হারিয়ে গিয়েছিল! সে কি ফিরে এল, না কি এল না? কে যেন শিশু থেকে যুবক হলো? টেলিফোনে কে প্রেম নিবেদন করেছিল কাকে?

সুবীরের বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আজ কেউ জল রাখে নি তার ঘরে। বুকের ব্যথাটা থাবা গেড়ে আছে এখনো। তীব্র নয়, কিন্তু আছে।

দেয়াল ধরে ধরে সুবীর বসবার ঘরে এল। ফ্রিজ খুলে একটা ঠাণ্ডা বোতল বের করে সরাসরি মুখে তুলতে গেল। তারপর হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেল সে।

ঘরের মাঝখানে আইক। পেছনের দু' পায়ের ওপর ভর দিয়ে সামনের দুটো পা ওপরে তুলল। করজোড়? দীর্ঘ বিষণ্ণ একটিমাত্র আওয়াজ করল সে, আউফ!

এই পৃথিবীর প্রতি তার গভীর ধিক্কারের শব্দটা ঘরের মধ্যে অশরীরী ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর ধীরে ধীরে রোমশ শরীরটা ঢলে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

আতঙ্কে কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সুবীর। হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল জলের বোতল!

সুবীর নিজের বুকটা চেপে ধরল। ব্যথা! ভীষণ ব্যথা!

তারপর ধীরে ধীরে আবার সহজ হলো সে টাইম ফ্যাক্টর। টাইম ফ্যাক্টর। পৃথিবীতে কিছুই নতুন করে ঘটে না। সব ঘটনাই পুনরাভিনীত হয় মাত্র।

আইকের মৃতদেহ সামনে রেখে ফের একটা বোতল বের করে হিম-ঠাণ্ডা জল ঢকঢক করে আকণ্ঠ পান করতে লাগল সুবীর।

তিন দিন বাদে টেলিফোন এল।

অর্চনা বলল, হ্যালো।

আমি বলছি।

অর্চনা উদ্ভাসিত হয়ে বলল, তুমি!

একটু ঝুমাকে ডেকে দেবেন?

ঝুমা! তাকে কেন বলো তো।

তাকেই দরকার।

খুব ধীরে ধীরে টেলিফোনটা কাত করে টেবিলে রাখল অর্চনা। ফ্যাকাসে মুখে ধীরে ধীরে গিয়ে ঝুমার দরজায় টোকা দিলো।

ঝুমা!

কী বলছো?

তোর টেলিফোন।